অমর্ত্য প্রেমকথা
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অমর্ত্য প্রেমকথা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রসঙ্গত

আরব ও মধ্যএশিয়ার প্রাচীন সাহিত্যে অসংখ্য প্রেমগাথার ছড়াছড়ি। তার মধ্যে তিনটি বিশ্ববিখ্যাত। 'লায়লা-মজনু', 'ইউসুফ-জুলেখা' এবং 'শিরী-ফরহাদ'। এই বইয়ে সেই তিনটি গাথার কাহিনীরূপ সংকলিত হয়েছে।

ইতিহাস-পুরাতত্ত্বের বিচারে এই গাথা তিনটির বীজ প্রাগৈতিহাসিক। প্রসিদ্ধ লোককথা বা কিংবদন্তী থেকে সংগৃহীত। বাইবেলের আদম-ইভের কাহিনীও তাই। কিন্তু আদম-ইভ মিলনান্তক। এই গাথাত্রয় বিয়োগান্তক। দুএকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ধর্ম ট্রাজেডি পছন্দ করে না। যাই হোক, সে জটিল জল্পনা এখানে অবান্তর।

প্রাচীন গ্রীসের নাগরিক সাহিত্যে ট্রাজেডি-চেতনার জোয়ার দেখা যাবে। কিন্তু এ চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল প্রাগৈতিহাসিক সময়ে। বিশ্বের প্রাচীনতম সব লোকগাথায় ট্রাজেডির বিষাদ পরিব্যাপ্ত। মানুষকে যখন প্রতিকূল পরিবেশে কোন মতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে সারাক্ষণ, তখন তার শিল্পচেতনায় ট্রাজেডিই তীব্র হয়ে উঠতে বাধ্য। আধুনিক কম্পারেটিভ মিথলজির গবেষণায় বিশ্বের সব লোকগাথার বীজে ট্রাজেডি-চেতনার তীব্রতা লক্ষ্য করা গেছে।

আলোচ্য গাথাত্রয়ের মধ্যযুগে যে রূপ আমরা দেখছি, তাতে তৎকালীন সমাজের ধ্যানধারণা আরোপিত হয়েছে। সাধুসন্তরা—যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, তাঁরাও এগুলি রূপকাশ্রিত মিথে পরিণত করেছেন এবং নিজেদের অধ্যাত্মবিশ্বাস আরোপ করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনটি গাথাই নর-নারীর প্রেমের সাকার বিগ্রহ হয়ে উঠেছে। এ প্রেম যেমন ভীরু ও কোমল, তেমনি স্পর্শকাতর ও বিস্ফোরকও। ট্রাজেডি তাকে দিয়েছে পরিশুদ্ধ মহিমা। বিশুদ্ধ প্রেম যেন এক শাশ্বত মানবিক বেদনার রক্তিম দ্রাক্ষারস—যা পান করলে প্রজ্ঞার জ্যোতি নীলকণ্ঠ দেবতার গৌরব দান করে মানুষকে। এই বোধ গাথাত্রয়ে সুস্পষ্ট।…

২

প্রথম গাথা 'লায়লা-মজনু।' অজস্র ভার্সান আছে। এই গাথার কাহিনী-কাঠামো মোটামুটি সব ভার্সানেই এক। কিন্তু উপাদানে প্রচুর বিভিন্নতা।

কোথাও নায়ক রাজপুত্র, নায়িকা উষ্ট্রচালকের কন্যা বা বধূ—কোথাও নায়ক কবি, নায়িকা রাজকন্যা—আবার কোথাও নায়ক রাজপুত্র এবং কবি, নায়িকা এক বেদুইন সর্দার কন্যা। বেশি প্রচলিত ভার্সানে নায়ক রাজপুত্র, নায়িকা বণিকনন্দিনী। আসলে ট্রাজেডির স্বার্থেই এ ধরনের সামাজিক বৈষম্য দেখানো হয়েছে।

প্রাচীন আরবে এক কবি ছিলেন। তাঁর নাম কয়েস-বিন-আমর। অর্থাৎ আমরের পুত্র কয়েস। তাঁর অজস্র কবিতায় লায়লা নামে এক যুবতীর কথা আছে। বোঝাই যায়, তিনি প্রচলিত লোক গাথাটির নায়িকা বিমূর্ত লায়লাকে কেন্দ্র করে নিজের প্রেমভাবনা ব্যক্ত করতেন। কিন্তু উৎসাহী ইতিহাসকাররা তাঁকেই 'লায়ল-মজনু' প্রেমগাথার আদি-অকৃত্রিম নায়ক প্রতিপন্ন করে ছাড়েন। তার ফলে পরবর্তী কালে 'মাজনুন' (প্রেমোন্মাদ) বা মজনুর আদি নাম হয়ে ওঠে কয়েস। মজার কথা, প্রাচীন আর্বি-ফার্সি সাহিত্যের একদল মরমী কবি ও কথাকার গাথাটির রূপকাশ্রিত একটি তত্ত্বপ্রচার করতেন। লায়লা শব্দের অর্থ রাত্রি। রাত্রির সঙ্গে দিনের প্রেম এবং শাশ্বত বিরহ ছিল তাঁদের তত্ত্বগত বার্তা। সুফি সাধুরাও গাথাটি রূপকহিসেবে ব্যবহার করতেন। আত্মা ও পরমাত্মার প্রেম-বিরহ-লীলা তাঁদের মরমী সাধনার বিষয়। 'লায়লা-মজনু' গাথা তাঁরা প্রায় আত্মসাৎ করে বসেছিলেন। প্রসঙ্গত অতি উল্লেখযোগ্য : ভারতের রাধা-কৃষ্ণ গাথা। এটিও ট্রাজেডি। বৈষ্ণব মরমী সাধনার উপজীব্য। সুফিবাদী দর্শনের সঙ্গে ঔপনিষদ দর্শনের অসামান্য মিল আছে। বৈষ্ণবতত্ত্বের সঙ্গে মিল তো গভীরতর। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, সুফিবাদের প্রভাব বৈষ্ণবতত্ত্বে প্রবল। সে যাই হোক, 'লায়লা-মজনু' গাথার সঙ্গে 'রাধা-কৃষ্ণ' গাথার যোগসূত্র আধুনিক কম্পারেটিভ মিথলজির চর্চায় একটি অবশ্য স্বীকার্য প্রসঙ্গ। বিজ্ঞপাঠক দুটি গাথার নিউক্লিয়াসে উল্লেখযোগ্য কিছু মিল দেখবেন, তা উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। এমন কি, অনেক পণ্ডিত এও মনে করেন, 'লায়লা-মজনু' মূলত পাঞ্জাবেরই একটি লোকগাথা।

আমি কিন্তু কবি কয়েস-বিন-আমরকেই নায়ক করার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। এর একমাত্র কারণ, লায়লার উদ্দেশে রচিত তাঁর সুন্দর কবিতাগুচ্ছ।…

৩

দ্বিতীয় গাথা 'ইউসুফ-জুলেখা'। আপাতদৃষ্টে এই গাথার উৎস বাইবেল ও কোরাণ শরীফ। দুটি ধর্ম গ্রন্থেই নায়িকা কুলটা ভ্রষ্টচরিত্রা বলে নিন্দিতা।

কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের চোখে এই নায়িকা এক অসামান্যা প্রেমিকা। ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলিম—একই উৎসজাত ধর্মত্রয় যে-নীতিবাক্য প্রচারে গাথাটি ব্যবহার করেছে, কবি-সাহিত্যিকরা তার বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই কলম ধরেছেন। সেমিটিক সংস্কৃতিতে এই বিদ্রোহ বিরল এবং দুঃসাহসিক। কারণ এর নায়ক একজন প্রফেট বা পয়গম্বর। ইহুদী-খৃষ্টানরা তাঁকে বলেন যোসেফ, মুসলিমরা বলেন ইউসুফ। ইনি প্রফেট আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের প্রপৌত্র। অথচ গাথাটির জনপ্রিয়তা আজও বিপুল।

কাহিনীর আকারে সাজাতে আমি সংশিলষ্ট পুরাতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে বাইবেল ও কোরাণের সেই-রেফারেন্সগুলিও দিয়েছি। এই অনধিকারচর্চা এবং অত্যুৎসাহের কৈফিয়ত অনেক কিছু দেওয়া যায়। প্রয়োজন দেখি না। কারণ আমি পাঠকের বিজ্ঞতা ও বিবেচনাবোধে বিশ্বাসী।…

৪

তৃতীয় গাথা 'শিরী ফরহাদ'। মূলত এটি প্রাচীন ইরানীয় লোক গাথা। এটিরও ভার্সান অজস্র। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব, এক সমস্যা। নায়িকা শিরী অবশ্য সব ভার্সানেই রাজ-পরিবারের নারী। কোথাও রাজ্ঞী, কোথাও রাজকন্যা। কিন্তু নায়ক ফরহাদ কোথাও বাঁধ ও জলাধার নির্মাতা অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ, কোথাও স্থপতি, আবার কোথাও ভাস্কর। কাহিনীর গীতি-ধর্মিতা ও কোমলতার স্বার্থে আমি ভাস্কর ফরহাদকেই নিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার নায়কের প্রতি একালীন নায়িকাদের পক্ষপাত আছে। কিন্তু আমার রোমাণ্টিক-স্বভাবী প্রবণতা ভাস্করের মধ্যেই বিশুদ্ধ আর্টিষ্টকে দেখতে পেয়েছে।

এই গাথাটি সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে। সংক্ষেপে বলছি। বিজ্ঞ পাঠক জানেন, ফার্সিভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় (আর্য) ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম মুখ্য একটি ভাষা। শিরী বা শিরীন এবং সংস্কৃত শ্রী মূলত একই শব্দ। উভয়ের অর্থ সৌন্দর্য। কিন্তু সম্প্রসারিত অর্থে শব্দটিতে বৈষয়িক সম্পদ বোঝায়। অতীতে বৈষয়িক সম্পদ বলতে একমাত্র কৃষিকেই বোঝাত। এখনও ভারতে শ্রী ও লক্ষ্মী সমার্থক এবং লোকসমাজে মালক্ষ্মী কৃষির সঙ্গে সম্পার্কিতা।

ভাষা তথা ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে ফরহাদ বা ফর্হাদ শব্দটির সঙ্গে ঋগ্বেদোক্ত 'বৃত্র' শব্দের যোগাযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঋগ্বেদে আর্যপতি ইন্দ্রের বৃত্র-সংহারের কাহিনীটি অনেক পুরাতাত্ত্বিকের মতে একটি রূপক। বৃত্রের যা বর্ণনা, তাকে তাঁরা জলাধারের বাঁধ বলে সনাক্ত করেছেন এবং বৃত্রের গূঢ়ার্থ করেছেন বাঁধ। আদিতে আর্য জনগোষ্ঠী ছিল পশুপালক এবং জঙ্গী। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের

নাম পুরন্দর। নগরধ্বংসকারী। তৎকালীন কৃষিকেন্দ্রিক নগর সভ্যতা ধ্বংসের জন্য আর্য জনগোষ্ঠীগুলিই যে দায়ী, তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেক পণ্ডিত সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের জন্য আর্যদের দায়ী করেন। যাই হোক, কৃষি-কেন্দ্রিক নগরসভ্যতাগুলির পিছনে বাঁধ ও জলাধার ছিল বিরাট নিয়ামক। পশু-জীবীদের পক্ষে বাঁধ চক্ষুশূল হওয়ার কারণ আছে। নদীর অববাহিকায় উর্বর মাটিতে অঢেল তৃণগুল্ম জন্মায়। বাঁধ বেঁধে অববাহিকায় চাষবাস করলে চারণ-ভূমি সংকুচিত হয়। এযুগেও গ্রামাঞ্চলে দেখেছি, পশুপালক হিন্দু ও মুসলিম গোয়ালাদের সঙ্গে নদীর বাঁধ কাটা নিয়ে চাষীদের হাঙ্গামা চিরাচরিত। পশু-পালকরা স্বভাবত জঙ্গী। যাযাবর পশুপালক জনগোষ্ঠী আর্যদের বাঁধ ধ্বংসের কাহিনী অযৌক্তিক নয়।

'শিরী-ফরহাদ' লোক গাথার নিউক্লিয়াসে সেই যুগেরই আভাস আছে, যখন নদীতে বাঁধ বেঁধে জলাধার গড়ে কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার পত্তন হয়েছে এবং এ যেন মূলত একটি বাঁধ ধ্বংস ও সম্পদ ধ্বংসেরই ট্রাজিক অভিজ্ঞতা। নায়িকা শিরী ইঞ্জিনিয়ার নায়ক ফরহাদকে বলেছিল, ওই নদীতে বাঁধ বাঁধতে পারলে আমাকে পাবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে বাঁধ ভেঙে পড়ল এবং ফরহাদ ভেসে গেল। তখন শিরীও ঝাঁপ দিল সেই বিধ্বংসী জলস্রোতে। গাথার এই ভার্সানটিই কিন্তু প্রাচীনতম।

৫

এই গ্রন্থের পঞ্চম কাহিনী 'নিলয় না জানি' একই সুফি প্রেম-তত্ত্বের ঐতিহ্যানুগত। কিন্তু শ্যামল বাংলার মাটিতে ফলানো সোনালি আঙুর। প্রকৃতপক্ষে এটি আত্মজৈবনিক কাঠামোয় গাঁথা ডকুমেণ্টারি উপন্যাস। বলছি বটে উপন্যাস ; কিন্তু আমাকে বানাতে হয়েছে অতি সামান্যই! রাঢ়-মুর্শিদাবাদের একটি ছোট্ট নদীর তীরবর্তী সুফি পীরের মাজার কেন্দ্র করে যে-উৎসব দেখে-ছিলাম, তারই গাঢ় নির্যাসে ভরা এই কাহিনী। তিনরাত্রির রহস্যময়, আলো-অন্ধকারপরিকীর্ণ একটি অংশের চিত্রীকরণ মাত্র। সুফিতত্ত্ব এবং রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সহজিয়া এবং লোকায়ত এই সমন্বয় সময়ের প্রচণ্ড প্রহারে ক্রমে জর্জরিত হয়েছে। এ যেন বর্ণাঢ্য প্রতিমা ঝড়েবৃষ্টিতে গলে ক্রমশ খড়-বাঁশের কাঠামো বেরিয়ে পড়ার নির্মম প্রতীক। চর্যাপদের সাধককবি বলেছিলেন, 'হরিণা রে! তোর নিলয় না জানি।' নিলয় জানা হলেই হরিণার মৃত্যু। এ-ও তাই একটি অমোঘ ট্রাজেডি।

৬

ষষ্ঠ কাহিনীটি আরও বাস্তব। অথচ এ-ও এক আশ্চর্য অমর্ত্য প্রেমের কাঠামোয় গাঁথা। জাতিধর্ম সম্প্রদায়ের গণ্ডী পেরিয়ে চিরকালীন প্রেম কীভাবে মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলে, এবং শেষাবধি আত্মক্ষয়েই তার নিয়তি নিবদ্ধ থাকে, এ তারই একটি প্রতীক। বিমূর্ত প্রেম এখানে রক্তমাংসের মানবিক সত্তায় মূর্ত। কিন্তু পরিণতি একই। রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে পড়ে যায়ঃ 'হাট করতে এলেম আমি অ-ধরারই সন্ধানে / সবাই ধরে টানে আমায় এই যে গো এইখানে।' অ-ধরাকে ধরতে পেলেই সব ফুরিয়ে যায়। রঙীন প্রজাপতি হাতের মুঠোয় ধরা পড়লে সে তো নিছক কীট।…

এই লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

অলীক মানুষ	মায়ামৃদঙ্গ	তৃণভূমি
নির্জন গঙ্গা	সংশপ্তক	কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি
তখন কুয়াশা ছিল	বাসস্থান	বসন্ততৃষ্ণা
অকাল মৃগয়া	অমৃত ছিল না	একদা বর্ষার রাতে
নিষিদ্ধ প্রান্তর	স্বপ্নের নীচে দাঁড়িয়ে	অশরীরী ঝড়
নদীর মতন	আগুনের চারপাশে	ফাগুনে আগুন
বিপাশা তোমার নামে	অরূপরতন	রেড সাহেব

গল্পগ্রন্থ

রানীর ঘাটের বৃত্তান্ত	গল্পসমগ্র (১ম, ২য় খণ্ড)	দারুব্রহ্মকথা
ছবির মানুষ	কালের প্রহরী	
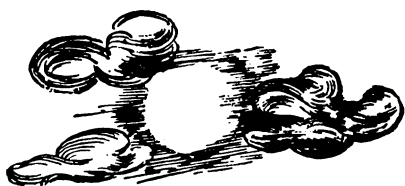
লায়লা-মজনু

'গুফ্‌তন্দ্‌, কী আয় রফীক্‌ চুনী
দর্‌ খুন্‌-ই জিগর্‌ গরীক্‌ চুনী
আখের চী শুদী কী ওয়া রমীদী
ওআজ্‌ সোহ্‌বত-ই দোস্তান্‌ পরীদী'...

'বলল তারা, বন্ধু তুমি কেমন আছ
কেমন আছ হৃদয়স্রাবী রক্তে ডুবে
পরিশেষে ঘটল কী যে উধাও হলে
দোস্ত-ইয়ার ফেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ !'...
[ফার্সি কবি আমীর খুসরো রচিত লায়লা-মজনু কাব্য]

পূর্ব আরবের মরুভূমি দাহানা। তার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের একটি মরূদ্যান 'গয়েল'। যেন পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে শক্তিমান জীবন।

কোন প্রাগৈতিহাসিক কালে খেয়ালী প্রকৃতি হৃদয় খুলে দিয়েছিল কী খুশখেয়ালে। স্নিগ্ধ প্রস্রবণ জেগে উঠেছিল কঠিন পাথর আর সোনালী বালির তলা থেকে। এ যেন এক পবিত্র 'মিরাজ'—অলৌকিক ঘটনা।

তাই এই প্রস্রবণজাত নহরের নাম মিরাজ—যা ক্রমশ দক্ষিণে এগিয়ে যেতে-যেতে দামুরূসীমাহিত বৃষ্টিঅঞ্চলের করুণায় প্রশস্ত নদী হয়ে উঠেছে। দুই তীরে জেগেছে উর্বরতা। ভূমি হয়েছে শস্যশালিনী, ফলবতী।

মরূদ্যান গয়েলে গড়ে উঠেছে ছোট্ট জনপদ।

দ্রাক্ষাকুঞ্জ খর্জুরবীথি আপেলবাগিচা তাকে বর্ণময় করেছে। ছোট-ছোট পাহাড়ের মাঝখানে অনতিবিস্তীর্ণ উপত্যকার তৃণগুল্মময় প্রান্তরে রাখালেরা 'কাসাস' গেয়ে ফেরে। কাসাস লোকসঙ্গীত।

'হিন্জা' গোত্রের সর্দার আল-মাহ্‌দী সেই প্রান্তরবর্তী টিলার ধারে একটি পাথরের ওপর নির্জনে 'আসরে'র নমাজ পড়ছিলেন। বৈকালিক প্রার্থনা।

হঠাৎ কানে ভেসে এল রাখাল বালকদের কাসাস গীত। ওরা গাইছে ঃ

'সুন্দর উজ্জ্বল বটে জিব্রিলের ডানা
ঈশ্বরের সিংহাসন সুন্দরতর
কিন্তু যেজন জানে প্রেমের ঠিকানা
সেই জানে তার চেয়ে প্রেম আরও বড় ॥'*

একজন গাওয়ার পর ওরা ধুয়া গেয়ে উঠছে ঃ

'কে বলে একথা ? আমরের পুত্র কয়েস বলে।
কবি কয়েস-বিন-আমর বলে ॥'

সর্দার আল-মাহ্‌দী অভিভূত। দ্রুত করজোড়ে প্রার্থনা শেষ করে এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। ভারি সুন্দর তো ওদের কাসাস !

* জিব্রিল—শ্রেষ্ঠ দেবদূত, যিনি পয়গম্বর হজরত মহম্মদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা আনতেন।

রাখাল ছেলেরা গান থামিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো। বিশালদেহী এই আগন্তুক তাদের অচেনা। তাঁর কোমরে ঝুলছে বর্ণাঢ্য সুদৃশ্য খাপে ঢাকা তলোয়ার। মাথায় উপজাতীয় সর্দারদের আভিজাত্যের পরিচয়জ্ঞাপক উষ্ণীষ। তাঁর নামাজের সময় তারা গান গেয়েছে—তাই কি? আতঙ্কে তারা কাঁপে।

কিন্তু সর্দার আল-মাহ্‌দীর মুখে মিষ্টি হাসি। একজনের কাঁধে হাত রেখে বলেন—কী গাইছিলে তোমরা, আবার গাও তো শুনি। না—না। কোন ভয়ের কারণ নেই। বখশিশ পাবে। গাও।

কাঁপা-কাঁপা সুরে আবার 'কাসাস' গেয়ে ওঠে তারা।

গান শেষ হলে আল-মাহ্‌দী বলে ওঠেন—মারহাবা! মারহাবা! তোমরা কোথায় শিখলে এ গান?

একজন সাহস পেয়ে বলে—কয়েসের কাছে।

অবাক আল-মাহ্‌দী বলেন—কয়েস! কে কয়েস?

—ওই তো সরাইখানায় এসেছে। আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে।

আল-মাহ্‌দী ওদের বখশিশ দিয়ে দ্রুত সরাইখানার দিকে চলতে থাকেন। সঙ্গীত ও কবিতায় তাঁর আসক্তি গভীর। ষষ্ঠ শতকের প্রখ্যাত কবি ইমরাউল কয়েসের সব কবিতা তাঁর মুখস্থ। রাখালদের কাসাসটিতেও কয়েসের নামে ভণিতা আছে। কিন্তু এ কোন্ কয়েস?

ইমরাউল কয়েস ছিলেন বানু সা'আদ রাজবংশজাত এক তরুণ কবি। সারা জীবন টোটো করে ঘুরে বেড়াতেন ভবঘুরের মতো। তাই তাঁকে লোকে বলত 'ভবঘুরের রাজা'। বাইজান্টাইন রাজকন্যার প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। সেই অপরাধে মদে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। সে ঘটনা ৫৪০ খৃষ্টাব্দে।

তখন আরবে চলছিল অন্ধকার যুগ 'আইয়ামে জাহেলিয়া।' জাহেল বা মূর্খদের যুগ। ইমরাউল কয়েসের কবিতাকে অশ্লীল বলা হত। তাঁর কবিতায় ছিল নারীর প্রতি নিঃসংকোচ প্রেম এবং প্রকৃতি।

এখন সারা আরব কাঁদে কবি ইমরাউল কয়েসের জন্য।

সেই কান্নায় বিচলিত খোদাতালা কি আবার তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দুনিয়ায়?

আরও অবাক হন আল-মাহ্‌দী। কত দেশ তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাঁর সঙ্গে আছে স্বগোত্রের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী। কোন বাদশাহের লোকবল দরকার হলে অর্থের বিনিময়ে তাঁকে তা যোগান দেন বিভিন্ন গোত্রের সর্দারেরা। এইসব গোত্র সামরিক জনগোষ্ঠী। চির-যাযাবর। এদের নারীরাও প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে পারে। হিজ্জা গোত্র তাদের সবার সেরা জঙ্গী গোত্র। আল-মাহ্‌দী এক পরাক্রান্ত সর্দার। নানা দেশ ঘুরেছেন। কিন্তু কয়েস-বিন-আমর নামে কোন কবির নাম তো কখনও শোনেন নি!

গয়েলের সরাইখানায় হাজির হলেন আল-মাহ্‌দী।

সরাইখানার মালিকের নাম আবু-তাহের-বিন-সায়েক। বয়সে অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু কর্মক্ষম। গয়েলে এসে জানোয়ারের রসদের প্রয়োজনে বৃদ্ধের সঙ্গে সদ্য আলাপ হয়েছে আল-মাহ্দীর।

এই বৃদ্ধ এক দার্শনিক। তাঁর সঙ্গে অনেক তত্ত্বালোচনাও হয়েছে। আবু-তাহের আল-মাহ্দীর কবিতা ও দর্শনে আসক্তির কথা জেনে বিস্মিত হয়েছেন। বলেছেন—মারহাবা! মারহাবা! কেতাব এবং তলোয়ার—দুটিতেই যিনি সিদ্ধকাম, অদূর ভবিষ্যতে বাদশাহ্ হওয়া তাঁর ভাগ্যে সুনিশ্চিত।

এখন আল-মাহ্দীকে হন্তদন্ত আসতে দেখে বৃদ্ধ আবু-তাহের শশব্যস্তে সম্ভাষণ জানান। আল-মাহ্দী বলেন—আপনি কি কয়েস-বিন-আমর নামে কোন কবির কথা শুনেছেন?

শোনামাত্র আবু-তাহের হোহো করে হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত আল-মাহ্দী বলেন—হাসির কারণ কী জনাব?

—মহামান্য হিজ্জাসর্দার! কয়েস একজন কিশোর। আপনি তাকে কবি বলছেন। অস্বীকার করি না, সে কবিতা রচনা করে। কিন্তু হঠাৎ তাকে নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?

—একটু আগে রাখালদের কাছে তার রচিত কাসাস শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

—হ্যাঁ। ছেলেটার ক্ষমতা আছে বটে। সবাইকে যেচে কাব্যসঙ্গীত উপহার দেওয়া ওর বিচিত্র খেয়াল। সেদিন শুনি এক উটওয়ালাকে একটি 'হিদা' রচনা করে দিয়েছে। আপনি কবে শুনবেন, আপনার বাহিনীর উটওয়ালাও তা গাইছে। এই সরাইখানায় কত কারাভাঁ (ক্যারাভান) আসে। সে যেন সবাইকে একটি করে কারাভাঁ-সঙ্গীত 'হিদা' উপহার না দিয়ে ছাড়বে না!

— কে এই কয়েস?

—সবিশেষ জানি না। কদিন আগে এক মুসাফির ভদ্রলোক স্ত্রী এবং তাঁর কিশোর পুত্র কয়েসকে নিয়ে আমার সরাইখানায় উঠেছেন। ভদ্রলোকের নাম আমর। বয়স আপনার মতো। প্রৌঢ়।

আল-মাহ্দী ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলেন—কী নাম বললেন? আমর?

—হ্যাঁ। আমর। কিন্তু তিনি যেন রহস্যময় মানুষ। নিশুতি রাতে তাঁর কাছে কারা আসে, কে জানে!

—আশ্চর্য! আশ্চর্য!

—কী আশ্চর্য বলুন তো?

দ্রুত চাঞ্চল্য গোপন করে আল-মাহ্দী বলেন—আমি ওঁদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। কোথায় আছেন ওঁরা?

—পাশের ঘরে। কিন্তু…একটু ইতস্তত করেন আবু-তাহের।

—কিন্তু কী জনাব?

—উনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না। আসার পরই বলেছেন সে কথা।

সম্ভবত উনি অসুস্থও। বাইরেও বের হন না ; তবে কয়েসের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

—গিয়ে বলুন, হিজ্জাসর্দার আল-মাহ্‌দী তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

একটু ভেবে নিয়ে বৃদ্ধ বলেন—আচ্ছা। চেষ্টা করে দেখছি।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে আল-মাহ্‌দীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ঘরে ইতিমধ্যে অন্ধকার জমেছে। ক্ষীণ বাতি জ্বলছে এক কোণে। উভয়পক্ষ প্রথানুসারে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানান।

আবু-তাহের চলে যাবার পর মুসাফির ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বলেন—বলুন হিজ্জাসর্দার!

—মহামান্য সুলতানকে এভাবে গয়েলের এক সামান্য সরাইখানায় দেখে আমি অবাক হয়েছি।

—সবই খোদাতালার ইচ্ছা। আপনি খুব দেরি করে ফেলেছেন হিজ্জাসর্দার। শয়তান কাশিম আমাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পেরেছে। আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি কোন মতে।

আল-মাহ্‌দী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। দুঃখে ক্ষোভে কাতর হয়ে বলেন—আপনার কাসেদই (দূত) পেঁছিতে দেরি করে ফেলেছিল, সুলতান। খবর পেয়েই আমি চলে এসেছি। ইচ্ছা ছিল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে রাতেই রওনা হব আল-বাহরামের পথে।

ম্লান হাসেন আল-বাহরামের রাজ্যচ্যুত সুলতান আমর-বিন-আবদুল্লা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—আর কী হবে? আমার কাছে অতি সামান্যই অর্থ আছে। আপনার পাওনা মেটাবার ক্ষমতা কোথায়?

আল-মাহ্‌দী উত্তেজিতভাবে বলেন—সেজন্য ভাববেন না সুলতান। রাজ্য ফিরে পেলে রাজভাণ্ডার থেকে আমার বাহিনীকে সন্তুষ্ট করবেন।

—থাক্ ভাই। কারণ, যদি আবার পরাজিত হই, আপনার প্রাপ্য অর্থ কীভাবে মেটাব?

আল-মাহ্‌দী দৃঢ়কণ্ঠস্বরে বলেন—খোদাতালার নামে শপথ করে বলছি, কোন অর্থের দাবি করব না। হয় আপনাকে সিংহাসনে বসাব, নয় তো শহীদ হব। হিজ্জা গোত্র শুধু অর্থের জন্যই অস্ত্র ধরে না—তারা অন্যায়ের দুশমন। তারা সর্বদা নিপীড়িতের পক্ষাবলম্বী।

অন্য কোণ থেকে বোরখা-ঢাকা সুলতান-জায়া অসুস্থ স্বরে বলেন—সুলতান যাই বলুন, আমি আমার পুত্র শাহজাদা কয়েসের পক্ষ থেকে বলছি—আপনি আমার কয়েসের ন্যায্য উত্তরাধিকার রক্ষা করুন হিজ্জাসর্দার। খোদাতালা আপনাকে জান্নাতে (স্বর্গে) স্থান দেবেন। আমি যে বাছা কয়েসের মুখের দিকে তাকাতে পারি না। বাদশাহ্ নামদারের সন্তান হয়ে সে খালিপায়ে রাখাল আর উটওয়ালাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ বড় করুণ দৃশ্য হিজ্জাসর্দার!

সুলতান বলেন—ও তার স্বভাব! আমি জানি, কয়েস রাজ্য চায় না। তাকে রাজ্য দিলেও সে নেবে না।

কয়েসজননী ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে বলেন—তোমার অমনোযোগেই সে দিওয়ানা হয়ে যাচ্ছে।

—দিওয়ানা হওয়াই তার ভাগ্য, বেগম। অনেক প্রার্থনার পর যখন তাকে আমরা পেলাম, তখন দৈবজ্ঞ তাকে দেখে কী বলেছিলেন মনে পড়ে না তোমার?

—দৈবজ্ঞরা মিথ্যুক। স্বয়ং হজরত রসুল বলেছেন—খবর্দার, কখনও দৈবজ্ঞদের কাছে যেও না। বিশ্বাস কোরো না ওদের কথা। মানুষের ভাগ্যের কথা খোদাতালা ছাড়া কেউ অবগত নয়।

আল-মাহ্‌দী কৌতূহলী হয়ে সুলতান দম্পতির কথা শুনছিলেন। এবার বলেন—মাননীয়া সুলতানা ধর্ম ও শরীয়তসঙ্গত কথাই বলেছেন, সুলতান। আপনারা অনুগ্রহ করে তৈরি থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি উটের পিঠে তাঞ্জাম পাঠাচ্ছি। প্রথম প্রহরে রওনা হতে চাই। শেষ রাত্রেই আমরা আল-বাহরাম আক্রমণ করব। বাদশাহ্‌ নামদার! বিন্দুমাত্র ভাববেন না। আমার গোত্রেই আছে সাতশো দুর্ধর্ষ সৈনিক। পথে আমার মিত্র গোত্রদেরও সঙ্গে নেব। তিন হাজার সৈনিকই যথেষ্ট। শয়তান কাশেমের মাথা আপনার পায়ে উপহার দেব—ইন্‌শা আল্লাহ্‌!

আল-মাহ্‌দী ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে এলেন।—ভুলে গিয়েছিলাম, সুলতান। আপনার পুত্র কয়েসকে একবার আমি দেখতে চাই।

—কয়েস! আর বলবেন না। সে একদণ্ড আমাদের কাছে থাকে না। আল-বাহরামে যদি বা তাকে নিয়ে সর্বদা অস্থির থাকতাম, তাকে সামলাবার লোক ছিল অনেক। এখানে আমি দীনহীন মুসাফির মাত্র। কয়েসকে সামলে রাখতে পারি না।

—কখন বেরিয়েছে সে?

—সেই আসরের নমাজের সময়। হয় তো উটওয়ালাদের দলে গিয়ে কাটাচ্ছে।

আল-মাহ্‌দী বেরিয়ে আসেন। সরাইখানার সামনে উটওয়ালাদের আড্ডায় তাকে খুঁজে পান না। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা 'মগরেবে'র নমাজের সময় হয়ে গেছে। মসজিদ একটু দূরে। উঁচু মিনারে মোয়াজ্জিন আজান হাঁকছে। আল--মাহ্‌দী দ্রুত হাঁটতে থাকেন।

সরাইখানার পিছনে প্রস্রবণজাত সুন্দর নহর। নহরের ধারে খর্জুরকুঞ্জ। সেখানেই নমাজ সেরে নিতে চান। নহরের জলে 'অজু' বা প্রক্ষালন করতে নামেন। তলোয়ার খুলে রাখেন কোমরবন্ধ থেকে। তীরে ওঠার সময় অস্তরাগের কোমল উজ্জ্বলতায় দুটি মূর্তি চোখে পড়ে তাঁর। অদূরে হিজ্জা গোত্রের তাঁবুর সারি। খর্জুরকুঞ্জে একখণ্ড প্রস্তর বেদিকায় কারা বসে আছে।

ওরা কারা, তা দেখার সময় নেই। আল-মাহ্‌দী উপাসনায় রত হলেন।

—লায়লা ? তোমার নাম লায়লা ! ভারি আশ্চর্য তো !

—আশ্চর্য কেন ? আমার নাম লায়লাই তো ! ওই দেখ, আমাদের তাঁবুর ভিস্তিওয়ালা হেলাল নহরে জল নিতে এসেছে। ওকে ডেকে জিগ্যেস করতে পারো ! ডাকব হেলালকে ?

—না, থাক্। তুমি তাহলে লায়লা…লায়লা…

—ও কী ! চোখ বুজে বিড়বিড় করছ কেন ?

—শোন। তোমার নাম থেকে একটা সুন্দর কবিতা মনে এসে গেল ! লায়লা মানে রাত্রি ! লায়লা কখনও অন্ধকার, কখনও জ্যোৎস্নার।

—হ্যাঁ। ওই দেখ না চেয়ে ! বাঁকা খেজুরগাছটার মাথায় চাঁদ উঠেছে।

'—ন্যুব্জদেহ খর্জুরশীর্ষের ওই ক্ষীণ চাঁদ
যেন বা আসন্ন রাত্রি হরিণীর বেশে দাঁড়াতেই তার
সোনালী উজ্জ্বল শিঙে বিদ্ধ হল
কয়েসের হৃৎপিণ্ডখানি…'

—ওসব কী বলছ তুমি ? বোলো না ! আমার কষ্ট হচ্ছে।

—চুপ। শোন, বলতে দাও।…

'…কিন্তু তার চেয়ে আরও সুন্দর রাত্রির
কথা শোন, কয়েস জেনেছে—সে কোন কয়েস ?
কবি সে কয়েস-বিন-আমর, আবার কে ?
কী জেনেছে ? জেনেছে রাত্রির নামে নাম তার
অপরূপ। বেণীবাঁধা কালো চুলে বন্দী কয়েস…'

—ও মা ! তুমি দেখছি একেবারে দিওয়ানা ছেলে ! তোমার নাম বুঝি কয়েস ?

—হ্যাঁ লায়লা। আমি কয়েস। কয়েস-বিন-আমর।

—কিন্তু তুমি বলছ, বেণীবাঁধা কালো চুলে তুমি বন্দী। কেন গো ? আমি তোমাকে কখন বাঁধলাম ? তোমাকে তো চিনিই না। এখানে এসে প্রথম দেখছি তোমাকে ? তুমি তখন আমাদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে…

—হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম। আর…

—আর বান্দা হাব্বা তোমাকে ধমক দিয়ে চলে যেতে বলল…

—তুমি সামনে এসে বললে, না—ও যাবে না।

—কেন তোমাকে দেখে আমার কী যেন মনে হল !

—আমারও লায়লা, আমারও।

—কোথায় থাকো তুমি, কয়েস ?

—ছিলাম আল-বাহরামে। এখন এই গয়েলে। তুমি ?

—আল-বাহরাম! আল-বাহরাম!• বাবা বলছিলেন, আমরা তো সেখানেই চলেছি।

—হায়, আমার আর সেখানে যাওয়া হবে না। বাবা বলছিলেন!

—কেন কয়েস ?

—ও কথা থাক্। আচ্ছা লায়লা!

—উঁ ?

— তুমি এত সুন্দর কেন ?

— যাঃ! আমি আবার সুন্দর কবে হলাম ? মৌলবীসায়েব বলেন—পবিত্র কোরানে আছে সেই আবু লাহাবের কাঠকুড়োনী মায়ের কথা—যার কাঁধে ঝুলত কাঠ বাঁধবার দড়ি। সেও নাকি আমার চেয়ে সুন্দর ছিল! মৌলবী বলেন—আমার চেয়ে উটগুলোরও বুদ্ধি বেশি!

—তুমি মৌলবীর কাছে যেও না। ওরা বড্ড কাঠখোট্টা। কিস্যু বোঝে না। জানো ? আল-বাহরামে আমাকেও একগণ্ডা মৌলবী পড়াতেন। আর আমি চুপিচুপি কেটে পড়তাম। সোজা চলে যেতাম পাহাড়ে জঙ্গলে। খুঁজে পেতাম না! আমি কাঠুরিয়াদের দলে মিশে যেতাম। ওদের সঙ্গে গান গাইতাম।

—বাঃ! আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু কয়েস, আমি যে মেয়ে। তাঁবু ছেড়ে একা বেশি দূরে যাওয়াই মানা! ওই দেখ না, বান্দা হাব্বা আমাকে হয়তো খুঁজতে বেরিয়েছে!

—এই পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ো, লায়লা!

—এই রে! ওই দেখ, বাবাও আসছেন! কয়েস, আমি যাই! আবার দেখা হবে!

—লায়লা! লায়লা! শোন!

—বলো!

—আর হয়তো দেখা হবে না আমাদের!

—হবে। হবে। নিশ্চয় হবে।

—কোথায় লায়লা ? কবে ?

লায়লা এক মুহূর্ত ভেবে বলে যায়—এখানেই। এই গয়েলে। এমনি সওয়াল মাসের তিন তারিখে।

আল-মাহ্‌দী এসে কয়েসের সামনে দাঁড়িয়েছেন। দিগন্তের শীর্ষে সওয়াল মাসের তৃতীয়ার একফালি চাঁদ। কিন্তু তখনও দিনান্তকালের রক্তিম আলো ফুরিয়ে যায়নি।

নহরের ধারে প্রলম্বিত খর্জুরবীথির আড়ালে তাঁর কন্যা লায়লা ছুটে চলেছে তাঁবুর দিকে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে আল-মাহ্‌দী সেদিকে একবার তাকালেন। ডান হাত নেমে এল কোমরবন্ধে তলোয়ারের বাঁটে।

কয়েস অবাক চোখে তাঁকে দেখছে। আল-মাহ্‌দী গম্ভীর স্বরে বললেন—কে তুমি?

—আমি কয়েস। কয়েস-বিন-আমর।

মুহূর্তে আল-মাহ্‌দীর মুখভাব বদলে যায়। স্মিত হাসি ফুটে ওঠে। ডান হাত প্রসারিত করে বলেন—আস্‌-সালাম্‌ আলাইকুম্‌ শাহ্‌জাদা কয়েস!

—ওয়া আলাইকুম্‌ আস্‌-সালাম্‌ জনাব।

—আমি হিন্জাসর্দার আল-মাহ্‌দী। গোস্তাকি মাফ করবেন, শাহ্‌জাদা! ভেবেছিলাম…

—আমি শাহ্‌জাদা কয়েস নই, কবি কয়েস-বিন-আমর।

আল-মাহ্‌দী হোহো করে হেসে ওঠেন।—জানি শাহ্‌জাদা! হিন্জাসর্দার আল-মাহ্‌দী তলোয়ারধারী হলেও কবিতার অনুরাগী। কিছুক্ষণ আগে রাখালদের মুখে আপনার রচিত কাসাস শুনে মুগ্ধ হয়েছি। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে।

—শুনে খুশি হলাম, জনাব। কবিতা সবাই বোঝে না।

—মেহেরবানি করে যদি আমার তাঁবুতে যান, বড় প্রীত হবো শাহ্‌জাদা!

—আঃ! আমি শাহ্‌জাদা নই। কবি। কবি বলেই সবাই ডাকে।

—বেশ। কবি! আসুন!

—কিন্তু আমি কখন বেরিয়েছি সরাইখানা থেকে। বাবা-মা হয়তো আমার জন্য অস্থির।

—কোন চিন্তা নেই। আমার লোক খবর দিয়ে আসবে এখনই। আপনি আসুন।…

যেতে-যেতে হঠাৎ কয়েস বলে—লায়লা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। আপনি কি তার বাবা? লায়লা আপনাকে আসতে দেখে পালিয়ে গেল।

—হ্যাঁ। অন্যমনস্ক আল-মাহ্দী জবাব দেন।

—লায়লা কী সুন্দর!

আল-মাহ্দী অন্যমনস্ক। কোন মন্তব্য করেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শুধু। ঘনায়মান অন্ধকারে দুজনে চলেছেন তাঁবুর দিকে। প্রতি তাঁবুর সামনে প্রোথিত ভীম লৌহশূলে সংলগ্ন একটি করে মশাল জ্বলে উঠেছে সবে। তার আলোয় ফুটে উঠছে ধনুর্বাণ ও বর্শাধারী হিন্জা রক্ষীদের মূর্তি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আরব্য উপজাতীয় পোশাকে ঢাকা।

কিশোর কবি আপনমনে গুনগুন করে ওঠে ঃ

'আলিফ্ লায়লা-ওয়া-লায়লা ··*
সেই কবে কেটে গেছে সহস্র এক রজনীর কাল
অনেক রহস্য ছিল তাদের—তা জানি,
গয়েলে যে রজনীর রূপ দেখে হৃদয় মাতাল
তার রহস্যের কাছে তারা হার মানে ॥'

হিন্জাসর্দার আল-মাহ্দী বিচলিত। কবি শাহ্জাদা কয়েস যে তাঁর কন্যা লায়লাকে দেখামাত্র তার অনুরাগী হয়ে উঠেছে, তাতে ভুল নেই। কিন্তু হিন্জাগোত্রের প্রথা বড় কঠোর। ধর্মে মুসলমান হলেও এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জীবন দিয়েও মেনে চলে। শাহ্জাদা কয়েসের জন্ম পবিত্র রাজবংশ আব্বাসী খলিফাদের মাতৃকুলের একটি শাখায়। কয়েসের সঙ্গে নিজের কন্যার শাদী দিতে পেলে আরবের সব রাজপরিবারই নিজেদের ধন্য মনে করবেন। কিন্তু যাযাবর জঙ্গী হিন্জা উপজাতির কাছে এমন প্রস্তাব অতি অপমানজনক। বিন্দুমাত্র টের পেলে হিন্জারা তাদের সর্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

গুরুতর অস্বস্তিতে বুক কাঁপল আল-মাহদীর।

একবার ভাবলেন, ঝোঁকের বশে কয়েসকে তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভুল করেছেন। আবার ভাবলেন, কবিরা খেয়ালী। আর কয়েস তো বয়সে এখনও কিশোর। কবিতার প্রেম আর বাস্তব জগতের প্রেমে কত বিরাট আসমান-জমিন ফারাক। একটি ষোল-সতের বছরের স্বপ্নবিলাসী ছেলের কাছে বাস্তব প্রেমের ব্যাপারটা এখনও অজ্ঞেয়। ওদিকে লায়লাও মাত্র চৌদ্দ বছরের কিশোরী। যাযাবর জীবন তাকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিয়েছে। তার রক্তে আছে যাযাবর মানুষের সুতীব্র স্বাধীনতাবোধ। যে মাটি ও আকাশ, প্রান্তর ও নদীকে তার এ মুহূর্তে ভাল লাগে, কিছুক্ষণ পরেই তাকে লাথি মেরে চলে যেতে হয় অন্য মাটি, অন্য আকাশ, অন্য প্রান্তর অন্য দুনিয়ায়। কোন কিছুই স্থায়ীভাবে তার প্রীত নয়, সুখী করে না তাকে।···

এসব ভেবেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন আল-মাহ্দী।

---

* 'আলিফ্ লায়লা-ওয়া-লায়লা' বিশ্বখ্যাত আরব্য কাহিনী, যার মানে 'সহস্র এক রাত্রি।' বাংলায় 'আরব্য উপন্যাস' নামে পরিচিত। লায়লা মানে রাত্রি।

তাছাড়া আল-বাহরাম দখল করে বাদশাহ্ আমরকে সিংহাসনে বসিয়েই সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবেন আল-মাহ্দী। লায়লার সঙ্গে শাহ্জাদা কয়েসের দেখা হবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।…

হিজ্জাসর্দারের তাঁবুটি প্রশস্ত।

শাহ্জাদার কথা শুনে হৈচৈ পড়ে গেছে। উপজাতীয় যোদ্ধারা এসে তসলিম জানিয়ে যাচ্ছে। হিজ্জা-নারীরা নিঃসঙ্কোচে শাহ্জাদাকে সেলাম জানায়। হিজ্জা নারীদের স্বাধীনতা প্রাক্-ইসলাম যুগের। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরও আরও সব লোকপ্রথার মতো সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

অবশ্য তখন সবে ইসলাম অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ কাল। সবে আরব সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দিগন্তে প্রসারিত হচ্ছে ইসলামের সূর্যালোক। গোষ্ঠী ও উপজাতীয় লোকাচার সমানে মেনে চলছে লোকেরা। শরীয়তী অনুশাসনের কঠোরতা তখনও দানা বাঁধেনি। আব্বাসীয় খলিফারা সবে দেশের শাসনরজ্জু হাতে নিয়েছেন। দেশব্যাপী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁরা ব্যস্ত।…

আল-মাহ্দীর তাঁবুতে কয়েস আড়ষ্টভাবে বসে আছে। কৃষ্ণাঙ্গী ক্রীতদাসীরা তার পরিচর্যা করতে চায়। কয়েস মাথা দুলিয়ে বলে—না, ধন্যবাদ। আমি কারও সেবা নিই না।

সুগন্ধি শরবতের শোরাহী তার সামনে তুলে ধরেন আল-মাহ্দী। কয়েস বলে—আমি তৃষ্ণার্ত নই। আপনি অনুগ্রহ করে লায়লাকে ডাকুন। তার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে।

বিব্রত বোধ করেন আল-মাহ্দী। বলেন—শাহ্জাদা! এবার প্রকৃত ঘটনা আপনাকে বলা দরকার। এখনই 'এশার' (রাতের প্রথম প্রহরের) নমাজ শেষ করে আমরা রওনা হব আল-বাহরামের দিকে। সবাই দ্রুত রাতের খাওয়া সেরে নিচ্ছে। আপনি আমার মেহমান। মহামান্য অতিথি। এখনই আমরাও খেতে বসব।

কয়েস বলে—মাফ করবেন। বাবা-মা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের কাছে না খেলে তাঁরা অভুক্ত থাকবেন। আমাকে যেতে দিন।

—শাহ্জাদা! ওঁরা এখনই এসে পড়বেন এখানে। আমি উটের পিঠে তাঞ্জাম পাঠিয়েছি একটু আগে।

—বাবা-মা আসবেন না, আমি বলছি।

—শাহ্জাদা! আপনাকে এখনও বলিনি, আল-বাহরামে কেন যাচ্ছি। আপনার পিতা বাদশাহ্ নামদার আমর-বিন-আবদুল্লাও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।

—সে কী! কেন?

—হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে।

—যুদ্ধ হবে তো?

—তা আর হবে না?

—যুদ্ধ আমি ঘৃণা করি। কারণ, যুদ্ধে রক্তপাত হয়।

—হ্যাঁ, কবির উপযুক্ত কথা। কবি ইমরাউল কয়েস তাই শাহ্‌জাদা হয়েও সিংহাসনে বসেন নি। ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

—আমিও কয়েস। আমিও কবি। আমিও তাই বেড়াব।…

একজন বান্দা এসে আল-মাহ্‌দীর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কিছু বলে। আল-মাহ্‌দী শোরাহী রেখে উঠে দাঁড়ান। মৃদু হেসে বলেন—সুলতান-সুলতানা এসে গেছেন। বসুন, আমি আসছি।…

কথা ছিল, সেই রাতের শেষ প্রহরে আল-বাহরাম আক্রমণ করা হবে। হিজ্জা-সর্দারের বার্তা নিয়ে কারাভাঁর আগে ঘোড়ায় চেপে কাসেদ (দূত) গিয়েছিল বিভিন্ন গোত্রের সর্দারদের কাছে। তারা যুদ্ধে যে কোন পক্ষে যোগ দিতে প্রস্তুত থাকে। তারা ভীষণ অর্থগৃধ্নু।

হিজ্জাবাহিনীর কারাভাঁ এবং অশ্বারোহীরা যখন বাহিরা পর্বতমালার এক উপত্যকায় পৌঁছেছে, তখন কাসেদরা একে-একে ফিরে এল। আগে অর্থ না পেলে সর্দাররা অস্ত্র ধরবে না। হিজ্জাসর্দারের প্রতিশ্রুতির মূল্য কী? যদি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে?

হিসাবা গোত্রপতি বলেছে—বরং লুঠপাটের অনুমতি পেলে ভেবে দেখতে পারি।

তা কী করে হয়? আল-বাহরামের সুলতান হয়ে নিজের প্রজাদের লুণ্ঠিত হতে দেবেন—এ অতি নিষ্ঠুর শর্ত।

উপত্যকায় পশুপালকদের একটি কূপ কাছে। আল-মাহ্‌দী আদেশ দিলেন—পশুপালকদের তাঁবুগুলো ঘিরে রাখো। যতক্ষণ না আমরা আল-বাহরামে ঢুকছি, ওরা যেন কেউ পালাতে না পারে। আমি চাই না, শয়তান কাশিমকে ওরা খবর দিক।…

একখানে ঢালু পাহাড়ের গায়ে বড়-বড় পাথর আর কাঁটাগুল্ম রয়েছে। আল-মাহ্‌দীর কাছে সারা আরবের মাটি সুপরিচিত। এখানে একটি প্রশস্ত গিরিখাত আছে, তাও জানেন। দুর্গের মতো জায়গা। একদিকে সংকীর্ণ একটা পথ। সেই খাতে কারাভাঁ বা উষ্ট্রবাহিনী গিয়ে আশ্রয় নিল। পাহাড়ের গায়ে তাঁবু পড়ল অশ্বারোহীদের।

সুলতান-সুলতানার তাঞ্জাম বয়ে নিয়ে বান্দারা পাহাড়ে ওঠে। আল-মাহদীর

তাঁবুর পাশে তাঁদের জন্য তাঁবু পাতা হয়েছে। ধনুর্বাণধারীরা কড়া প্রহরায় তৎপর।

কয়েস আল-মাহদীর সঙ্গে আছে। সারাপথ দুজনে একসঙ্গে এসেছেন। উটের পিঠে তাঞ্জামে কয়েস ঘুমে ঢলে পড়েছে। আল-মাহদী তাঁর মাথা উরুতে তুলে নিয়েছেন। স্নেহ বেড়ে গেছে ক্রমশ। তাঁর কোন ছেলে নেই। একটিমাত্র মেয়ে—ওই লায়লা। হিজ্জাগোত্রে সর্দার হওয়াটা বংশগত না হলেও সর্দারের ছেলে যদি যোগ্য হয়, তাকেই সবাই মেনে নেয়।

তবে তার চেয়ে বড় কথা, সারা আরবে পুরুষসন্তানের প্রতি মোহ অতি প্রবল। প্রাক-ইসলামী যুগে কন্যা জন্মানোই দুর্লক্ষণ মনে করা হত। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জঙ্গী মানসিকতা কন্যাসন্তানকে অভিশাপ ভাবত। গোপনে পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে পাথরে আছড়ে মারত। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে-যুগের অবসান ঘটেছে। নয়তো লায়লার কী হত, ভাবতেই আল-মাহ্‌দীর হৃৎকম্প হয়।…

সে রাতের মতো বিশ্রাম। সকালে মন্ত্রণাসভা বসল সুলতানের তাঁবুতে।

এখন একটা দুর্ভাবনা, যদি ওই সর্দাররা কেউ শয়তান কাশিমের কানে ব্যাপারটা তোলে! তারা অর্থলোভী। সুলতান হতাশ। যতখানি উৎসাহ ফিরে এসেছিল, সব আবার নিঃশেষ।

আল-মাহ্‌দী বললেন—হিজ্জারা জবান দিলে জান দেয়। তাদের জবান আর জান এক। বাদশাহ্‌ নামদার! আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন কিছু আছে। কিন্তু তা আছে হামদান সীমান্তের এক পাহাড়ের গুহায় লুকানো। খুব বেশি প্রয়োজনে সেই সঞ্চয়ে আমরা হাত দিই। তাই ভাববেন না। এখনই একদল কাসেদ আবার পাঠাচ্ছি সর্দারদের কাছে। আমি নিজে আরেকদল সৈনিক নিয়ে রওনা হচ্ছি হামদান অভিমুখে। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ফিরে আসব। আজ রাতেই আমরা আল্‌-বাহরাম আক্রমণ করবই।…

চিন্তিত মুখে সুলতান বললেন—আপনি নিজে না গেলে চলে না?

—না হজরত।…আল-মাহদী মৃদু হেসে জবাব দিলেন। সেই গোপন জায়গা আমি ছাড়া আর কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না। কারণ, যাদের সাহায্যে ধনরত্ন সেখানে নিয়ে যাই, সবার চোখ বেঁধে দিই। কাজ শেষ হলে অনেক দূরে এসে চোখ খুলে দিই। সে এমন পাহাড়, কারও পক্ষে সনাক্ত করা সম্ভব নয়।…

যাযাবর গোষ্ঠীর লোক হলেও ইসলামী রীতি অনুসারে হিজ্জারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। সঙ্গে থাকেন এক বৃদ্ধ শিক্ষক। তিনি অবশ্য নেহাত অর্থ এবং আদর্শের খাতিরে এদের সঙ্গে ঘোরেন। তিনি হিজ্জা নন।

মৌলবীর নাম আবু সামা। বাড়ি বুরাইদা শহরে। আজ পনের বছর ধরে হিজ্জাগোষ্ঠীর শিক্ষক। লায়লার শৈশব থেকে তাকে পড়াচ্ছেন। কোরান ও হাদিসশাস্ত্র শেষ করিয়ে কাব্য ও দর্শনে পাঠ দিচ্ছেন এখন। কিন্তু লায়লা বড় অমনোযোগী ছাত্রী। শাসন-তর্জনেও গ্রাহ্য নেই। সবসময় চঞ্চল। দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে হুট করে কখন কোথায় কেটে পড়ে। স্বয়ং সর্দারদুহিতা। তাই বাড়াবাড়ি করতে পারেন না বেচারা।

আর আল-মাহদীরও যেন কেমন নাই আছে মেয়ের প্রতি। মেয়েদের অত আদিখ্যেতা দিতে আছে? উপজাতীয় মেয়েরা আরবের অন্য মেয়েদের মতো লজ্জাশরম তত কিছু মেনে চলে না। স্বভাবে তেজী, কথায় ছুরির ধার। পুরুষকে টেক্কা দেয়। ঘোড়ায় চাপে। ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তীর ছুঁড়ে হরিণ মারতেও পটু তারা।

লায়লা একটু অন্যরকম শুধু এই একটা ব্যাপারে। অস্ত্র ভুলেও ছোঁয় না সে। পোষা জীবজন্তুর প্রতি অতিমাত্রায় তার স্নেহ। গতবার ওমানে গিয়ে একটা হিন্দুস্তানী তোতা কিনেছিল। সেটা মারা পড়ল মরুভূমির প্রখর গরমে। লায়লা আহারনিদ্রা ছেড়ে মাতমজারি (শোকবিলাপ) করেছিল।

তার একটা কুকুর আছে—নাম রেখেছে ওজ্জা। বড় বিচ্ছু কুকুর। মৌলবী সায়েবকে দেখলেই সে দাঁত বের করে ধমক দেয়। তিনি দুচোখে দেখতে পারেন না ঘৃণ্য প্রাণীটাকে। কুকুর ছুঁলে দেহ অপবিত্র হয়। বেঅকুফ্ মেয়েটাকে বুঝিয়েও পারেন না।

তার একটা হরিণ আছে। তার নাম জিন্দান। আল্-ছেরাত নামে এক পাহাড়ী জঙ্গলে থাকার সময় ওকে বাচ্চা অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিল লায়লা। হিংস্র মরুনেকড়ের দল মাকে খুন করেছিল। বাচ্চাটা গর্ত্তে পড়ে গিয়েছিল, তাই বাঁচোয়া।

এই হরিণটাও কেন যেন মৌলবীর ক্ষতি করার জন্য ওৎ পেতে থাকে। তাঁর কেতাবে কামড় দেয়। জোব্বার কোণ চিবিয়ে ছেঁড়ে। মৌলবী আবু-সামা গর্জন করেন—আরে নাদান উল্লুক! গাছের পাতা চিনিস না এখনও?

লায়লা বলে—ও মৌলবীসায়েব! ওকে উল্লুক বললেন তো? হরিণকে

উল্লুক বললেন—দেখবেন কী হয় ?

—কী হবে ? হবে কী ? ওকে আমি জবেহ্ (শ্বাসনালী কেটে ইসলামী মতে হত্যা) করে ওর কলিজা খাব।

চলে যেতে-যেতে মুখরা বালিকা বলে যায়—হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার ! কবে ন ঘাস ভেবে আপনার ঘুমন্ত মুখের দাড়িগুলো সাফ করে ফেলে জিন্দান !

জনান্তিকে আবু-সামা ফেটে পড়েন। আর একটি দিনও এই জংলীদের সঙ্গে নয়। আজই রওনা হবেন বুরাইদায়।

কিন্তু হিজ্জাসর্দার তাঁকে বাদশাহী সুখে রেখেছেন। এত বেশি বেতন, পোশাক-আশাক, উপহার সামগ্রী আর কে দেবে তাঁকে ? শুধু তাই নয়—যখন বাড়ি যেতে চান, তখনই দ্রুতগামী সেরা ঘোড়াটিতে চাপিয়ে একদল দুর্ধর্ষ হিজ্জা যোদ্ধা তাঁকে বুরাইদা পেঁছে দেয়।···

সেই সকালে বাহিরা পাহাড়ে মৌলবীর তাঁবুর সামনে যথারীতি মক্তব বসেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এসে জুটেছে। একটা দরাব গাছের তলায় প্রস্তরখণ্ডে বসে ছড়ি নেড়ে তাদের পড়াচ্ছেন আবু-সামা। এক ধারে লায়লাও কেতাব খুলে বসেছে। মিয়ানো ঘাসের ওপর দুহাঁটু মুড়ে নমাজের ভঙ্গীতে সে বসেছে। সামনে কারুকার্যময় চন্দনকাঠের সুগন্ধি রেহেল বা পুস্তকাধার।

সমসাময়িক দার্শনিক আল্-জাহিজের* 'কিতাবুল হোস্নু' অর্থাৎ সৌন্দর্যের রূপরেখা নামে নন্দনতত্ত্বের বইটি এখন লায়লার পাঠ্য।

মৌলবী ধমক দেন—কী ভাবে পড়ছ লায়লা ? মনে-মনে পড়ে ওর কী বুঝবে ? মুখস্থ করো। জোরে জোরে মুখস্থ করো।

লায়লা মুখ টিপে হেসে বলে—যুদ্ধের সময় না এখন ? এখন চেঁচিয়ে পড়া বারণ, জানেন না ?

আবু-সামা বলেন—কোথায় যুদ্ধ ? আল্-বাহরাম এখনও অনেক দূর। তুমি চেঁচিয়ে পড়ো।

তখন লায়লা দুলে দুলে পড়তে থাকে—'হে মূর্খ অহংকারী মানুষ ! কাকে অসুন্দর বলছ ? দ্রুতগামী অশ্বকে যদি সুন্দর বলতে পারো, অস্ত্রধারী যোদ্ধা যদি তোমার চোখে সুন্দর হয়, পুত্রবতী যদি তোমার মতে সুন্দরী নারী—তাহলে, ওহে দাম্ভিক, গ্রন্থধারী বিদ্বানকে কেন অসুন্দর বলো ?···'

আবু-সামা তারিফ করেন—এই তো ! মারহাবা লায়লা, মারহাবা !

লায়লা আরও চেঁচিয়ে পড়ে—'ঈদের চাঁদ সুন্দর। মরুভূমিতে প্রস্রবণ সুন্দর। মক্তবে মৌলবী সুন্দর···'

---

* আল্-জাহিজ নবম শতকের প্রখ্যাত আরব্য দার্শনিক। তিনি ছিলেন মুতাজিলা দার্শনিক। অতি কুৎসিতদর্শন ছিলেন তিনি। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল একদা তাঁকে পুত্রের গৃহশিক্ষক করার জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যাত পণ্ডিত তখন সৌন্দর্য বিষয়ে ওই বইটি লিখেছিলেন।

সংশয়ান্বিত আবু-সামা গম্ভীর মুখে শুধু বলেন—হুঁ, পড়ো।

—'লায়লার ওষ্ঠা এবং জিন্দানও সুন্দর। কিন্তু তার চেয়ে আরও সুন্দর কয়েস। কে বলেছে এ কথা ? লায়লা-উন-নাহার বলেছে। সর্দার আল-মাহদীর মেয়ে লায়লা-উন্-নাহার বলেছে... [লায়লা-উন্-নাহার মানে সৌন্দর্যময়ী রাত্রি]

—কী বললে, কী বললে ? আবু-সামা ছড়ি নেড়ে উঠে দাঁড়ান।

লায়লা পড়তে থাকে—'কয়েসের চেয়ে সুন্দর কেউ নেই। কয়েসের চেয়ে পবিত্র কিছু নেই। একবার কয়েসকে দেখলেই বেহশ্‌ত্‌ দেখা হয়। কয়েসের কথা শুনলেই মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়। কোন কয়েস ? কয়েস-বিন-আমর। গয়েলে নহরের ধারে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

আবু-সামা তার রেহেল থেকে কেতাব তুলে নিয়ে গর্জন করেন—এই বেতমিজ মেয়ে! এসব কী পড়ছ তুমি ? কোথায় লেখা আছে এসব কথা ?

লায়লা বলে ··নেই ? কিন্তু··কিন্তু আমি যেন দেখলাম স্পষ্ট হরফে লেখা আছে···

—তোমার মাথা লেখা আছে! উটওয়ালী হওয়াই তোমার নসিব।

—তাহলে আর পড়ে কী হবে, মৌলবীসায়েব ?

—ঘোড়ার আণ্ডা হবে। উটের শিং গজাবে।

—তাহলে তো খুব ভয়ের কথা। তাহলে আমি মক্তবে থাকলেই বিপদ! তাই না মৌলবীসায়েব ?

রুষ্ট আবু-সামা বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি এদের সবাইকে জাহেল (মূর্খ) করে ফেলবে!

—তাহলে এক্ষুনি আমার চলে যাওয়াই ভাল। ও মৌলবীসায়েব, আমি উঠি ? কেমন ? খামোকা এ বেচারাদের জাহেল ভেড়া বানিয়ে দোষের ভাগী হই কেন ?

আবু-সামা ক্রুদ্ধ দৃষ্টে তার দিকে তাকান। আর কথা আসে না মুখে। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা লায়লার কাণ্ড থেকে ফিকফিক করে হাসতে শুরু করেছে। আবু-সামা তাদের দিকে ছড়ি তুলে এগিয়ে যায়। সেই ফাঁকে লায়লা কেটে পড়ে।

পাহাড়ের চূড়ার দিকে নির্জনে পাথরের ওপর একা বসে আছে কয়েস। লায়লা এখানে এসেই তাকে দেখতে পেয়েছিল। গয়েলে দেখা ছেলেটি যে একজন শাহ্‌জাদা, পরে জেনেছে সে। তাদের সঙ্গে সে এখানে এসেছে, এও শুনেছে মায়ের কাছে। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে সব মনে পড়েছে এবং লায়লা তাঁবুগুলোর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছে তার খোঁজে। তারপর মৌলবী-সায়েবের ডাকে তাকে পড়তে যেতে হয়েছে।

চঞ্চল হরিণীর মতো লায়লা পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকে। ডাক দেয়—কয়েস! কয়েস!

কয়েস কবিতার ধ্যানে মগ্ন। কিন্তু আশ্চর্য, বারবার তার মনে ভেসে আসছিল শুধু একটি শব্দ—লায়লা। লায়লা…লায়লা…লায়লা…নিরবচ্ছিন্ন দরাফবীণায় ঝংকারের মতো।

লায়লার ডাকে ধ্যানভঙ্গ হয়। কয়েস ঘুরে তাকায়। লায়লাকে দেখতে পায়। সকালসূর্যের আলোয় ঝলমল করছে লায়লার মুখ। কয়েস হাত তুলে সাড়া দেয়—লায়লা! লায়লা!

লায়লা গিয়েই তার পাশে ধুপ করে বসে। তারপর হাসিতে ভেঙে পড়ে।

কয়েস বলে—'গয়েলের নহর বাহিরা পাহাড়ে এসে ঝর্ণা হয়েছে। হায়! আমি যদি বাহিরা হতে পারতাম! এই পাথরের বুকে জেগে উঠেছে ডালিম-গাছ। যদি হতাম সূর্যের আলো, তার রাঙা ডালিম-ফলে প্রতিফলিত. হতে পারতাম!'

লায়লা হাসি থামিয়ে ঈষৎ অভিমান দেখিয়ে বলে—কেন হাসছি, জিগ্যেস করছ না কয়েস!

—সে তো জানি! আমার দুর্ভাগ্য দেখেই তুমি হাসছ।

—ছাই জানো। বুড়ো পণ্ডিতকে খুব রাগিয়ে দিয়ে এসেছি! 'কিতাবুল হোসুন' নামে নতুন একটা বই পড়ছিলাম। তারপর…

—'কিতাবুল্ হোসুন'…! গয়েলের সরাইখানার জ্ঞানী আবুতাহের-বিন-শায়েকের কাছে দেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এ বই না পড়লে নাকি কবি হওয়া যায় না!

—তুমি পড়তে চাও? এখনই এনে দিচ্ছি! কোনটা সুন্দর, কী সুন্দর,—হেন তেন ছাইপাঁশ!

কয়েস তার হাত ধরে টানে। একটু হেসে বলে—বই পড়ে সুন্দরকে আমি চিনতে চাই না লায়লা। কারণ, শ্রেষ্ঠ সুন্দরকে আমি দেখেছি।

—তাই বুঝি? কে সে কয়েস?

—তুমি লায়লা, তুমি।

—না। মানি না। তুমিই সুন্দর, কয়েস। সবার শ্রেষ্ঠ তুমি।

—লায়লা, কখনও স্বচ্ছ নহরের ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছ নিজের প্রতিবিম্বকে?

—কয়েস, তুমিও কি দেখেছ নিজেকে?

কয়েস চুপ করে থাকে। তার কপালের তিনটি রেখায় বিষাদ জেগে ওঠে। দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আল-বাহরামের প্রান্তর পাহাড় বনে শৈশব থেকে ঘুরে বেড়িয়েছি। শুধু মনে হয়েছে, আরও কিছু ভালো-লাগার মতো আছে—হয়তো এখানে নয়, অন্য কোথাও। অন্য কোন দেশে। মুসাফির হয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছি তার খোঁজে। সুলতানের লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে গেছে। বারবার ব্যর্থ চেষ্টা শুধু। তারপর ভাগ্য করুণা করল। সুলতান সিংহাসনচ্যুত হলেন।…

—ছিঃ ! ও কী বলছ কয়েস ? তুমি না শাহ্‌জাদা ?

তন্ময় কয়েস বলতে থাকে—গয়েলে গিয়ে খুঁজে পেলাম তাকে। আমি ধন্য। লায়লা, গয়েলের সরাইওয়ালা আবু-তাহের-বিন-শায়েক আমাকে মহাকবি হাতেম-আত্‌-তাঈ'এর একটি আশ্চর্য কবিতা শুনিয়েছিলেন। মুখস্থ হয়ে গেছে। [illegible] :

তোমার সকল অস্থি পৃথিবীর অমর্ত প্রণয় :
অন্তিমে মৃত্যুর লীলা চিত্রার্পিত মাকড়সার জাল
নানান সৌকর্যে বোনা, অনন্ত কালের অগণন।
পূর্বপুরুষের কাছে কী পেলে নির্জনে ? চারুময়
মাকড়সার স্বর্ণজাল অথবা সে অস্থির বলয় ?
…অতঃপর বিদ্রূপে একাকী
তোমার ও প্রেম যেন বিদীর্ণ বাঁশীর আলোচনা ॥*

লায়লা এ কবিতা শুনতে শুনতে অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে ওঠে। সে বলে—এ কী কবিতা কয়েস! এতে যেন মৃত্যুর গন্ধ। আজরাইলের (মৃত্যুদূত) ডানার শব্দ শুনি। ও কয়েস! কেন তুমি মৃত্যুর কথা ভাবছ ?

—[illegible] জানো! তোমাকে দেখার পর থেকে শুধু মনে হয় 'তোমার সকল [illegible] অমর্ত প্রণয়!'

[illegible] লায়লা বলে—তোমার মন ভাল নেই। চলো, আমরা অন্য [illegible] যাই।

—কোথায় যাবে লায়লা ?

—যেখানে খুশি। বাবা তাঁবুতে নেই। শুনেছি ফিরতে সন্ধ্যা হবে। আজ আমার ছুটির দিন কয়েস!

দুজনে ওঠে। হাত ধরাধরি করে চলতে থাকে। বাহিরা পর্বতমালার গুল্মে ফুলে বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় শিহরণ। সুফীসন্তের মতো ধ্যানাসীন বিবর্ণ পুষ্প ধ্যান ভেঙে ভাবে, এই কি তাহলে শাশ্বত সত্যের দৈবত রূপ—যাকে দেখার জন্য সুদীর্ঘ তপস্যা এতকাল ?

উদাসীন ফকিরের মতো নির্জন বিশীর্ণ বৃক্ষ হাত পেতে বলে—তোমাদের অনন্ত প্রেমের এককণা দিয়ে যাও, হে সুন্দর নবীনতাদ্বয় !

পায়ের তলা থেকে নিদ্রিত হলুদ তৃণ জেগে বলে—হায়! ধরে রাখতে পারলাম না চলমান বসন্তকে এ বুকে। অথচ তার প্রতিধ্বনি রয়ে গেল।

বাহিরাপর্বতে এখন অকাল বসন্ত। বিচ্ছুরিত রৌদ্র হয়েছে প্রজাপতির ঝাঁক। এ পুষ্প-বাহারের বাজারে তারাই পসারিনী।…

*অনুবাদ। আবদুস সত্তার (বাংলাদেশ)। হাতেম-আত্‌-তাঈ পঞ্চম শতকের আরব্য কবি। ইনি ঐতিহাসিকপ্রসিদ্ধ দাতা সেই হাতেম তাঈ—যাঁকে নিয়ে অজস্র লোককাহিনী রচিত হয়েছে।

সেদিন রাতেই আল্-বাহরাম আক্রমণ করলেন হিজ্জা সর্দার আল-মাহদী। প্রতিজ্ঞা পালন করলেন। বিদ্রোহী কাশিমের মুণ্ড উপহার দিলেন সুলতান আমর-বিন-আবদুল্লার পায়ে। সুলতান হাহাকার করে ওঠেন। কাশিম তাঁর ছোট ভাই।

আরবের রাজনীতিতে নৃশংসতার পরিচয় আবহমান কাল ধরে চলেছে। অথচ এমন বিচিত্র বৈষম্য কোন জাতির চরিত্রে নেই। যোদ্ধা এবং কবি, রক্ত-পিপাসু এবং প্রেমিক, ভোগী এবং স্বপ্নবিলাসী, হঠকারী এবং শান্তিবাদী—তাদের একই দেহে পাশাপাশি বাস করে।

আল-মাহদী একজন যাযাবর সর্দার। অথচ তাঁর গৃহস্থপনা সুনিপুণ। তিনি যুদ্ধে হিংস্রতম, শান্তিতে বিনম্র দার্শনিক। কর্তব্যবোধে সদা সজাগ, কিন্তু প্রেমে ও বাৎসল্যেও সমান অভিভূত হন।

আল-বাহরাম নগরের বাইরে এক প্রান্তরে তাঁবু পড়েছে হিজ্জাগোষ্ঠীর। সর্দার আল্-মাহ্দী আর একটি দিনও এখানে থাকতে চান না। হিজ্জা যোদ্ধারাও না। তারা বৈচিত্র্যাভিলাষী। আল্-বাহরাম নগরে ঘুরে-ঘুরে এখন একঘেয়েমিতে ভুগছে। তারা সর্দারের আদেশের প্রতীক্ষা করছে। সন্ধ্যায় আগুনের সামনে বসে তারা গায় :

…'ওঠ বেদুইন। গুটাও তাঁবু,
যেতে হবে জেনো অনেক দূর!
আকাশ ডাকছে, প্রান্তর ডাকে
চঞ্চল হল ঘোড়ার খুর।'

[প্রাচীন একটি হিদা বা উষ্ট্রচালকদের গান]

কিন্তু আল-মাহদীর দৃষ্টি পড়ে কন্যা লায়লার দিকে। আশ্চর্য! হঠাৎ কী যেন গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর মধ্যে। গয়েলে যে ছিল যৌবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে, আল্-বাহরামে সে কোন জাদুমন্ত্রে যেন পূর্ণ যৌবনের প্রজ্ঞায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। সদা আনমনা, দৃষ্টি চঞ্চল, সহসা কোন অদৃশ্য স্পর্শে পলকেই যেন ব্রীড়ানম্র নতমুখী, —লাজরক্তিম তার চিকন কপোল, থরথর কেঁপে ওঠে দুর্জ্ঞেয় আবেগে। গভীর নিশীথে নিদ্রিতা লায়লার ডালিম ফুলের মতো ঠোঁটে স্বপ্নঘোরে অস্ফুট উচ্চারিত হয়—কয়েস…কয়েস…কয়েস!

স্বকর্ণে শুনেছেন আল-মাহদী। বিব্রত বোধ করেছেন। অবোধ মেয়ে! দুঃসম্ভবের জন্য নিষ্ফল তপস্যা এ তো! হিজ্জাগোত্রের কন্যার সঙ্গে দুনিয়ার

সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ্‌নন্দনেরও শাদী হতে পারে না। সকল উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ক্ষেপে যাবে।

ইতিমধ্যে লায়লা আর কয়েসকে নিয়ে তাঁবুতে-তাঁবুতে কানাকানিও শুরু হয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছে না। শুধু মৌলবী আবু-সামা বলেছেন—শিগগির লায়লার শাদীর ইন্তেজাম (আয়োজন) করুন সর্দার। আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। বলেন তো, আপনার গোত্রের শ্রেষ্ঠ যুবক আমি বাছাই করে দিই।…

পরদিনই তাঁবু গুটাবেন আল-মাহ্‌দী। সুলতানের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছেন। শাহ্‌জাদা কয়েসকে ডেকে আদর করেছেন। তার কপাল চুম্বন করেছেন স্নেহে। কিন্তু চলে যাওয়ার কথা বলতে পারেন নি। অশ্রু গোপন করে দ্রুত চলে এসেছেন।

আল-বাহরামে আসার পর শাহ্‌জাদার নিরাপত্তার জন্য কদিন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাকে প্রাসাদ থেকে বেরুতে দেওয়া হয়নি। কয়েস প্রাসাদশীর্ষে উঠে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকেছে হিজ্জা তাঁবুগুলোর দিকে। খুঁজেছে লায়লাকে।

লায়লাও তাঁবুতে বন্দিনী। যুদ্ধের সময় চিরাচরিত এই ব্যবস্থা। পূর্ণ শান্তি ফিরে এলে আবার স্বাধীনতা ফিরে পায় নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা। দিনান্তের আলোয় তাঁবুর দরজার ফাঁক দিয়ে লায়লা দেখেছে দূরে প্রাসাদ-শীর্ষে অস্পষ্ট একটি মূর্তি। প্রেমিকার সহজাত বোধে সে জেনেছে, ওই তার কয়েস। দুচোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে নীরবে। মনে মনে কথা বলেছে কয়েসের সঙ্গে। কত কথা হাসি ও দুঃখেভরা সহস্র কথা। লক্ষ কথা। রাত্রি নক্ষত্রের ভাষায় যেমন কথা বলে অন্ধকার পৃথিবীর সঙ্গে।

তারপর এল বিচ্ছেদের নিশীথ রাত্রি।

আর স্থির থাকতে পারল না কয়েস। প্রাসাদের দেয়াল বেয়ে নেমে নির্জন নগরীর পথে ছুটে চলল তাঁবুর দিকে।

ভোরে শুরু হবে যাত্রা। হিজ্জারা ঘুমিয়ে আছে তাঁবুর মধ্যে। তাদের প্রহরীরাও নিশ্চিন্তে ঢুলছে। মশালগুলো নিবু-নিবু। স্তব্ধতা থমথম করছে।

কয়েস অনুচ্চ স্বরে ডাকে—লায়লা! লায়লা!

ঘুমোন নি সর্দার আল-মাহ্‌দী। তাঁবুর মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। দ্রুত বেরিয়ে এসে বলেন—শাহ্‌জাদা! এত রাতে?

অপ্রস্তুত লজ্জিত কয়েসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম! পথে গাঢ় অন্ধকার। দেখলাম, আপনার তাঁবুতে আগুন জ্বলছে। তাই একটু আগুন নিতে এলাম।

—শাহ্‌জাদা, রাজপ্রাসাদও কি অন্ধকার হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ সর্দার। রাজপ্রাসাদেও অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার। আমার অসহ্য লাগল।

—শাহ্জাদা, এখানে যে আগুন দেখে ছুটে এসেছেন, তা আলেয়ার শিখা। আপনি ফিরে যান।

মায়ের তাঁবুতে লায়লাও নিদ্রাহারা। কয়েসের কণ্ঠস্বর শুনেই সে উঠে বসেছিল। বেরিয়ে এসে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সে ডাকে—কয়েস! তুমি ডাকছিলে আমাকে?

আল-মাহ্দী চাপা গলায় বলেন—শাহ্জাদা কি আগুন নিতে এসেছেন—নাকি আমার তাঁবুতে আগুন জ্বালাতে এসেছেন?

কয়েস হঠাৎ তাঁর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে—ঈশ্বরের দোহাই! লায়লার সঙ্গে একবার কথা বলতে দিন। আমার পথের অন্ধকার আলোকিত হবে।

আল-মাহ্দী ঘুরে-ঘুরে নিষ্প্রভ আলোয় দুটি মুখের দিকে তাকান। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—বেশ। জীবনে শেষবারের মতো কথা বলে নিন শাহ্জাদা কয়েস। আমি আপনার গুণগ্রাহী। আপনাকে স্নেহ করি। আর লায়লাও আমার একমাত্র কন্যা—তার মনে দুঃখ দেওয়া পাপ। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন আপনাদের না দেখে ফেলে। বরং আমার তাঁবুতে আসুন।

আল-মাহ্দী সে-রাতে এক বিচিত্র ভূমিকা নিলেন। কবির সম্মানে, কিংবা কন্যাস্নেহে বিচলিত হলেন হিজ্জাসর্দার। আর তাঁর তাঁবুতে মুখোমুখি দাঁড়াল কয়েস ও লায়লা। মাহ্দী বাইরে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কয়েসের ঠোঁটে শান্ত হাসি। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে—কী সুন্দর এই তাঁবু! তুমিই তাকে সুন্দর করেছ।

'ওয়া দারু লাহা বির্ রাক্‌মাতায়নে কা আন্নাহা
মারাজিয়ো ওয়ালমিন কি নাওয়াশেরে মি সামী॥'
[যেমন উল্কির চিহ্ন সমুজ্জ্বল রমণীর হাতে,
তেমনি তোমার তাঁবু সুবিস্তৃত বালুকারাশিতে।]*

—কয়েস!

—লায়লা!

—আমরা আজ শেষ রাতে চলে যাচ্ছি, জানো? আর তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না!

—হবে।

—কেমন করে হবে? আমাকে আর কোথায় খুঁজে পাবে তুমি?

—আমার মনে, লায়লা। আমার হৃদয়ে।

লায়লা নতজানু হয়ে কয়েসের দুটি করতল স্থাপন করে নিজের মুখে।

---

* প্রাচীন যুগের আরব কবি কাসিদার রচিত কবিতা। আরব-নারীরা উল্কি পরত। উল্কিহীনা নারীকে রূপবতী ভাবা হত না।

নিঃশব্দে অশ্রুপাত করে প্রেমিকা কিশোরী।

নিজের সিক্ত করতলে বারবার চুম্বন করে প্রেমিক কিশোর বলে—তোমার অশ্রুর আগুন থেকে বাতি জ্বালব অন্ধকার প্রাসাদে। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, লায়লা।

পাশে লায়লার মায়ের তাঁবুতে বাঁদী আফ্‌রার ঘুম ভেঙে গেছে। সে লায়লা ও কয়েসের কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে আসে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সর্দার আল-মাহ্‌দীর তাঁবুতে ঢুকে যায় সে। তারপর হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বাইরে আল-মাহ্‌দীও বিব্রত। আফ্‌রা বড় বাচাল মেয়ে। তার পেটে কথা থাকে না।

ওদিকে আফ্‌রা বিস্ময় কাটিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলে—লায়লা! এ কী কাণ্ড! ছিঃ!

লায়লা চোখের জল মুছে অপ্রস্তুত হেসে বলে—ও আফ্‌রামাসি! শাহ্‌জাদা কয়েসের একটু আগুন দরকার ছিল তো! তাই আগুন নিতে এসেছে।

কয়েসও সায় দিয়ে বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটু আগুন নিতে এসেছিলাম।

আফ্‌রা আর একটিও কথা না বলে লায়লাকে টানতে টানতে তার তাঁবুতে [illegible]। কয়েস একা দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরে আল-মাহ্‌দী এসে বলেন—চলুন শাহ্‌জাদা, আপনাকে প্রাসাদে [illegible] আসি। আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।*

[illegible] নাকি ক্ষণিকের মোহ। ক্ষণকালের মুকুটে একটি কোহিনূরের মায়াদীপ্তি। আর [illegible] বলেন, 'অদর্শনের মরু মুকুলিত প্রেমতরু বিশুষ্ক করে।' [—আরব দার্শনিক আল্‌-নাজের, চতুর্থ শতক।]

কিন্তু আশ্চর্য, শাহ্‌জাদা কয়েস ভুলল না লায়লাকে।

কবি কয়েস নির্জনে বসে কবিতা রচনা করে। সব কবিতা লায়লার জন্য। বাদশাহ্ আমর তাকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের নিযুক্ত করেন। কয়েস তলোয়ার দিয়ে শিক্ষাভূমিতে লায়লার নামে কবিতা লেখে। শ্রেষ্ঠ

* প্রখ্যাত আরব নাট্যকার আহমদ শাওকী 'মাজনুন' নাটকে লায়লা-মজনুর প্রেমকাহিনী লিখেছেন। লায়লার পিতা আল্‌-মাহদীর তাঁবুতে আগুন আনার ছলে রাতে কয়েসের যাওয়ার ঘটনাটি সেই নাটকের একটি দৃশ্য অবলম্বনে লেখা।

পণ্ডিত তাকে কেতাবের পাঠ দিতে আসেন। ইউনানী (গ্রীক) দার্শনিক আফ্‌লাতুনের (প্লেটো) কেতাব চন্দনকাঠের রেহেলে পড়ে থাকে। কয়েস বলে—

'আফ্‌লাতুন জ্ঞানী বটে, পিঁপড়েদের মতো পরিশ্রমে
কণা-কণা আহরণ করেছেন সৃষ্টির যত কিছু জ্ঞান
কিন্তু কখনও তিনি করেছেন প্রেমিকার ধ্যান ?
জেনেছেন প্রেমে কত অমর্ত মহিমা থাকে জমে ?
এই জ্ঞান বাদে হায়, আফ্‌লাতুন মূর্খেরও অধম॥'…

পণ্ডিতরা অপমানিত বোধ করে চলে যান। বিচক্ষণ কূটনীতিক আসেন ভবিষ্যৎ বাদশাহ্‌কে কূটনীতি শিক্ষা দিতে। কয়েস তাঁদের বলে—পররাজ্য গ্রাসের কৌশল আপনারা সম্যক অবগত। শত্রুকে হতবুদ্ধি করতে আপনারা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু হে ধুরন্ধর পুরুষ! লায়লাকে জয় করার কৌশল কি আপনাদের জানা আছে? যদি থাকে, তাহলে সেই কূটনীতি আমাকে শেখান।…

ধর্মশিক্ষক এলে কয়েস তাঁকে বলে—কোন্ আচরণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, আপনি তা জানেন। কিন্তু লায়লাকে কেমন করে পাব, দয়া করে সেই কথা বলুন। হে বিদগ্ধ আলেম! প্রত্যহ পাঁচবার প্রার্থনায় মানুষ নাকি স্বয়ং ঈশ্বরের নিকটতর হতে পারে। কিন্তু হায়, প্রত্যহ লক্ষ লক্ষবার প্রার্থনায় আমি লায়লার নিকটতর হতে পারি না কেন?

বারবার আল্-বাহরাম নগরী থেকে কয়েস চলে যায় লায়লার খোঁজে। কোথায় হিন্জাদের তাঁবু পড়েছে, সবার কাছে জিজ্ঞেস করে। কেউ বলতে পারে না। মরুভূমিতে ঘুরে ক্লান্ত কয়েস মরীচিকা দেখে। সবুজ খর্জুরকুঞ্জের প্রান্তে ওই তার লায়লা দাঁড়িয়ে আছে! ছুটে যায় দিওয়ানা তরুণ।

তারপর কোন মরুচারী বেদুইন তাকে দেখতে পেয়ে প্রাণ বাঁচায়। বাদশাহের লোকেরা খবর পেয়ে শাহ্‌জাদাকে নিয়ে যায় তাদের তাঁবু থেকে।

অজানা জনপদে গিয়ে সে লোককে জিজ্ঞেস করে—লায়লার তাঁবু কোথায়, জানো ভাই? যদি জানো, তাহলে বলো। তার বিনিময়ে তোমাকে একটা চমৎকার হিদা কিংবা কাসাস উপহার দেব!

কালক্রমে সারা আরবে রটে গেছে প্রেম-পাগল শাহ্‌জাদা কয়েসের কথা। ওরা চিনতে পারে তাকে। সসম্মানে আশ্রয় দেয় ঘরে। পরিচর্যা করে। তারপর আল্-বাহরামে খবর দেয়। বাদশাহ্ আমর লোক পাঠিয়ে দেন। ছেলের জন্য তাঁর চোখে ঘুম নেই।

তারপর প্রাসাদে প্রহরা হয় কঠোরতর। শাহ্‌জাদা কয়েস প্রায় বন্দীর মতো থাকে। বিষণ্ণ প্রেমিক দিন কাটায় আবার লায়লার নামে কবিতা রচনায়। প্রতিটি রাত্রি আসে। আর রাত্রি (লায়লা) নামে একটি মেয়ের কথা ভাবতে-

ভাবতে কয়েস আপন মনে বলে—

"আলিফ লায়লা-ওয়া-লায়লা···
সহস্র-এক রাত্রির চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই নারী
'রাত্রি' যার নাম, রহস্যাবৃতা—
অবগুণ্ঠন তার উন্মোচিত করে, সাধ্য কার
কয়েস ব্যতীত ? ওহে রাত্রি, তুমি সেই
রাত্রির সেবাদাসী হও, লায়লা যার নাম ॥"

লায়লাকে নিয়ে আল-মাহ্দী চলে গিয়েছিলেন বহু দূর অঞ্চলে, যেখানে আল-বাহরামের নাম কেউ উচ্চারণ করে না। কেউ শোনে নি সেই রাজ্যের কথা। তার এক 'মাজনুন' শাহ্জাদার কথাও কেউ জানে না।

মাজনুন মানে প্রেমোন্মাদ। ঈশ্বরের প্রেমে মাজনুন অনেক ফকিরের কথা সবাই জানে। তাঁরা সাধক পুরুষ—দিওয়ানা। আহার নিদ্রাহীন দিন কাটান। পরনে জীর্ণ ছিন্ন বেশ। ধূলিমলিন শীর্ণ দেহ। পথে পথে ঘুরে বেড়ান তাঁরা। ঠোঁটে শুধু ঈশ্বরের নাম। ভক্তি এবং করুণায় লোকে তাঁদের খাইয়ে দেয়। কূপে জল আনতে এসেছে যে স্ত্রীলোক, অদূরে মাজনুন সন্তকে দেখলেই জলপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে ছুটে যায় তাঁর কাছে। কারণ সে জানে, তৃষ্ণায় মৃত্যু হলেও তাঁর জলের কথা মনে থাকে না। তাঁদের অপ্রার্থিত জল ও খাদ্যদানে অশেষ পুণ্য।

আল্-বাহরামে অন্য এক মাজনুনের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে, আল-মাহ্দী জানতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, 'অদর্শনে মুকুলিত প্রেমতরু বিশুষ্ক হয়।'

কিশোরী লায়লার সেই চিত্তচাপল্য কিছুদিন পরে প্রশমিতও দেখেছিলেন। আশ্বস্ত হয়েছিলেন আল-মাহ্দী। লায়লার কিশোরী সুলভ চাপল্য আল-বাহরামে থাকার সময়েই কিছুটা সংযত হতে দেখেছিলেন। তারপর দূরে গিয়ে ক্রমশ তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল স্মিত গাম্ভীর্য।

মাঝে মাঝে লায়লার অন্যমনস্কতা প্রকাশ পেয়েছে। সে পাথরের ওপর একা দাঁড়িয়ে কী ভাবছে, লক্ষ্য করেছেন আল-মাহ্দী। জিগ্যেস করলে লায়লা বলেছে—ওস্তা আর জিন্দানের খেলা দেখছি, বাবা! দেখছ? ওরা কেমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে?

কুকুর আর হরিণ নিয়ে দিন কাটায় মেয়ে। কয়েসের কথা আর বলে না।

কিন্তু লায়লার মনের তলায় কী আছে, জানত শুধু বাঁদী আফ্‌রা। লায়লার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল আল-বাহরাম থেকে চলে যাওয়ার পর। তারপর থেকে আফ্‌রা লায়লাকে মায়ের স্নেহ যোগায়।

নির্জন পাহাড়তলিতে লায়লা যখন ওজ্জা আর জিন্দানকে নিয়ে ঘুরতে গেছে, আফ্‌রা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়েছে তার খোঁজে।

গিয়ে একটু দূরে থেকে শুনেছে, লায়লা বলছে—ওজ্জা! ওরে বোকা কুকুর! গয়েলে প্রথম কয়েসকে দেখে তুই ধমক দিয়েছিলি—সেই পাপে তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আর খুলল না। তাই বলছি, আবার যদি কয়েসের দেখা পাস, তার সুন্দর পা-দুটো শুঁকে বলিস—আমাকে মাফ করো ভাই!

আর হরিণটার গলা ধরে সে বলছে—জিন্দান! আমার সোনার জিন্দান! তুই কয়েসের দিকে তাকিয়েছিলি—তাই তোর চোখদুটো এত সুন্দর! আর জিন্দান! তুই জানিস না—তোর চোখের তারায় সেই থেকে কয়েসের ছবি আঁকা হয়ে গেছে!...

আফ্‌রা কী বলবে ভেবে পায় নি। শুধু ভেবেছে, শাদী হয়ে গেলেই সর্দারকন্যা কয়েসকে ভুলে যাবে। সর্দারকে সে বারবার লায়লার শাদীর কথা বলেছে।

আল-মাহ্‌দীর এই এক বিচিত্র দুর্বলতা যেন। হিজ্জাগোষ্ঠীর কোন যুবকই তাঁর অসামান্যা রূপবতী কন্যার যোগ্য নয় বলে মনে করেন।

এদিকে দিনে দিনে লায়লার বয়স বেড়েছে। মরুভূমির নির্মেঘ আকাশে পূর্ণ চাঁদের লাবণ্য নিয়ে লায়লা উজ্জ্বলতর হয়েছে। তাকে কার হাতে তুলে দেবেন, আল-মাহ্‌দী মন স্থির করতে পারেন নি। সারা আরবের অনেক রাজ্যে বাদশাহ্‌-আমীরের ঘরে রূপবতী কন্যা আছে, দেখেছেন হিজ্জা সর্দার। কিন্তু লায়লার মতো কি কোন কন্যা আছে কারও? দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্রাটের সম্পদকে যে নিমেষে ম্লান করতে পারে, তাকে নিয়ে বিব্রত আল-মাহ্‌দী!

মৌলবী আবু-সামা বোঝান—এ আপনার নেহাত পিতৃহৃদয়ের আতিশয্য সর্দার। লায়লা তাই আপনার চোখে বেহেশ্‌তের হুরী। এ-ধারণা খুবই স্বাভাবিক প্রতি পিতার আছে। কিন্তু লায়লার শাদী দেওয়া শরীয়ত অনুসারে এবার জরুরী হয়ে উঠেছে। ভেবে দেখুন।

হিজ্জাগোষ্ঠীর যুবকরা ক্রমশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের অভিভাবকরাও দিনে দিনে ক্রুদ্ধ হতে থাকে সর্দারের প্রতি। এ কী অদ্ভুত আচরণ আল-মাহ্‌দীর! গোষ্ঠীর কোন যুবকই তাঁর কন্যার যোগ্য পাত্র নয়? গোষ্ঠীর প্রতি এ তো দারুণ অবমাননার শামিল!

প্রথমে আড়ালে, পরে প্রকাশ্যে তাদের ক্ষোভ ফেটে পড়ে। তাদের রক্তে আছে গণতান্ত্রিক বোধ। কৌমভিত্তিক জীবন তাদের। মতামত প্রকাশের অধিকার আছে প্রতি বয়স্কের। তারা মজলিস ডাকে একদিন।

বাগ্দাদ রাজ্যের সীমান্তে তখন হিব্জারা তাঁবু পেতে আছে। একদিকে মরু অঞ্চল, অন্যদিকে পাহাড়। বাগ্দাদের বাদশার আমন্ত্রণে তারা এসেছে বাহিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধের কয়েকদিন আগে এই বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

হিব্জারা যুদ্ধের আগে স্বভাবত উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সেই উত্তেজনার ঘোরে তারা মজলিস ডাকল। কৌমের বৃদ্ধেরা কথাটা তুলল। যুবকরা সমর্থন করল।—মহামান্য সর্দার আল-মাহ্দী! নিজের কৌমকে অপমান করছেন আপনি। চিরাচরিত প্রথাও লঙ্ঘন করেছেন। এর সঙ্গত কৈফিয়ত আমরা চাই।

বিব্রত আল মাহ্দী বলেন—লায়লা শাদিতে নারাজ। আপনারা তো জানেন, নারাজ ঔরত যদি শাদিতে 'এজিন' (স্বীকৃতি) না দেয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে সে সাদী 'জায়েজ' (আইনসিদ্ধ) হয় না।

—লায়লা এজিন দেবে কি না, আমরা তার মুখেই শুনতে চাই।

মেয়েদের ভিড় থেকে সামনে এসে দাঁড়ায় যথার্থ হিব্জানারীর দৃপ্ত ভঙ্গীতে লায়লা। মজলিশের সবাই ওর দিকে তাকায় নিষ্পলক চোখে। তার ঠোঁটের কোনায় দৃঢ়তা, ভ্রূ কুঞ্চিত, দৃষ্টি তীব্র। তার ঘন কালো চুলের একাংশ উন্মোচিত—আবরণ স্খলিত। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। কোমরবন্ধে ছুরিকা রক্তবর্ণ খাপে ঢাকা - যেন তার বিদ্রূপের প্রতীক। আশ্চর্য! সর্দার-দুহিতার কোমর-বন্ধে কোন দিন কেউ ছুরিকা দেখে নি।

আল-মাহ্দীও অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। মজলিস রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে লায়লার জবাব শোনার।

তারপর লায়লা তীব্র স্বরে বলে ওঠে—যে মেয়ের স্বামী বর্তমান, সে আবার কাকে এজিন দিতে পারে, বলুন তো কৌমপিতৃগণ! যার স্বামী জীবিত, তাকে দ্বিতীয়বার এজিন দেওয়ার অধিকার কি ইসলাম দিয়েছে—নাকি হিব্জা কুলপতিদের এটা নতুন বিধান?

মজলিস আলোড়িত হয়। —কার স্বামী বর্তমান? কে সেই স্ত্রীলোক?

—সর্দার আল-মাহ্দীর কন্যা লায়লুন্-নাহার।

কৌমপিতারা অবাক। অবাক স্বয়ং সর্দার আল-মাহ্দী। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় এক বৃদ্ধ। তাঁর নাম আল-ফাত্তাহ্। একদা হিব্জাগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা ছিলেন। এখন স্থবির। যষ্টিতে দেহভার রেখে ফাত্তাহ্ বলেন—তা যদি হয়, তাহলে দুর্ভাগ্য আল-মাহ্দীর। সে তার কৌমের অজ্ঞাতে মেয়ের শাদি দিয়েছে। এ অপরাধ আশাতীত। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, সর্দার মাহ্দী, তুমি কার সঙ্গে মেয়ের শাদি দিয়েছ? কী তার নাম? তার কুলপরিচয়ই বা কী?

আল-মাহ্দী হতবাক। লায়লা বলে—আমার শাদি হয়েছে কয়েসের সঙ্গে। কয়েসের কুলপরিচয় কে না জানে! সে মহান আব্বাসীয় খলিফাদের মাতৃকুলের

সন্তান। আল-বাহরামের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সে বাদশাহ আমর-বিন্-আবদুল্লার পুত্র।

মজলিসে বিস্ফোরণ ঘটে যায় এবার। যুবকরা কোষ থেকে বিশাল খঞ্জর খুলে আস্ফালন করে। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা ঘিরে ধরে আল-মাহ্‌দীকে। তাঁর মুখের সামনে আঙুল তুলে তারা সমস্বরে বলে—ধিক্ তোমাকে সর্দার! শতধিক্! বাদশাহী ইজ্জতের লোভে কুলে কালি দিলে তুমি! কৌমের অজ্ঞাতে বেটির শাদি দিলে ধনসম্পদের লোভে? ওহে মূর্খের শিরোমণি! পবিত্র হিজ্জাকুলের সন্তান হয়ে বেজাতের হাতে তুলে দিলে স্বজাতির ইজ্জত! বিশ্বাস-ঘাতক তুমি!

আল-মাহ্‌দী অতি কষ্টে বলেন—না, না। মিথ্যা সব মিথ্যা। লায়লার শাদি আমি দিই নি!

—চুপ করো প্রবঞ্চক! তোমার মেয়ে বলছে!

—মিথ্যা বলছে। ওর মাথার ঠিক নেই। আপনারা শান্ত হোন দয়া করে!

আল-ফাত্তাহ্ কাঁপতে-কাঁপতে স্খলিত কণ্ঠস্বরে বলেন—তাহলে মিথ্যা-বাদিনীর শাস্তি তুমি নিজের হাতে দাও মাহ্‌দী। ওকে একশো দোর্‌রা (চাবুক) মারো আমাদের সামনে। গুণে গুণে একশোবার দোর্‌রা মারো। ওঠ, এখনই মারো। তা না হলে জানব তুমিই প্রবঞ্চক।

লায়লা চিৎকার করে বলে—একশো কেন, হাজার দোর্‌রা মারলেও আমি বলব, কয়েস-বিন-আমর আমার স্বামী। গয়েলের নহরের ধারে খর্জুর-কুঞ্জে শওয়াল মাসের তিন তারিখে আমার সঙ্গে তার শাদি হয়েছে পাঁচ বছর আগে।

আল-মাহ্‌দী উঠে দাঁড়ান। ছুটে গিয়ে তাঁবুতে ঢোকেন। তারপর বেরিয়ে আসেন বিশাল দোর্‌রা নিয়ে। বাঁদী আফ্‌রা আর্তনাদ করে তাঁর দুই পা জড়িয়ে ধরে। তাকে লাথি মেরে একপাশে সরিয়ে লায়লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল হিজ্জাসর্দার।

দোর্‌রা ঊর্ধ্বে ওঠে। তীব্র বেগে নেমে আসে। দুহাতে মুখ ঢাকে হিজ্জাযুবতী এবং বালক-বালিকারা। বৃদ্ধেরা গর্জে ওঠে—মারহাবা সর্দার! শাবাশ! যুবকরা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। তীক্ষ্ণধার খরশানের ডগা মাটি স্পর্শ করে। ঠোঁট কামড়ে ধরে তারা।

সর্দার আল-মাহ্‌দীর দোর্‌রা আকাশে বিদ্যুতের মতো সঞ্চালিত হয়। বজ্রের মতো নেমে আসে।

লায়লার বিস্ফারিত ওষ্ঠাধর থেকে উচ্চারিত হতে থাকে—কয়েস, কয়েস—কয়েস···

মাহ্‌দীর রক্তে ঘুম ভেঙে গেছে হিংস্র হিজ্জাপুরুষের। দোর্‌রার প্রচণ্ড আঘাতে নিজের কন্যার পিরহান ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেন। কোমল অঙ্গে ফুটে ওঠে রক্তরেখা। গর্জন করেন মাহ্‌দী—খবরদার শয়তানী! একবার কয়েসের

নাম দশবার দোর্‌রার ঘা!

লায়লী বলে—কয়েস···কয়েস···প্রিয়তম কয়েস···

যুবতী ও বালক-বালিকারা ফুঁপিয়ে কাঁদে। আফ্‌রা মূর্ছিত। কেউ বাধা দেয় না সর্দারকে। কৌমপিতারা বলে—শাবাশ, শাবাশ! যুবকরা স্থির। নিষ্পলক দৃষ্টি। ওষ্ঠ দংশিত।

লায়লা বলে—এ তোমারই ভালবাসার উপহার, কয়েস। প্রিয়তম কয়েস, আমার রক্ত দিয়ে তুমি এবার ভালবাসার কবিতা লিখবে না?···

তখন আল-বাহরামের নিভৃত কক্ষে শাহজাদা কয়েস যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পরিচারিকা ছুটে এসেছে।—কী হল শাহজাদা? কী হল আপনার?

কয়েস বলে—আঃ! আঃ!

বান্দারা এসে জানতে চায়—কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে শাহজাদা?

কয়েস শরীরের এখানে ওখানে হাত রেখে বলে—আঃ! আঃ!

খবর যায় হেকিমের কাছে। কয়েসের মা ছুটে আসেন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—কী হয়েছে বাছা? কোথায় ব্যথা করছে?

—এখানে, মা। কয়েস পাঁজর দেখায়। পিঠে হাত রেখে বলে—এখানে। আঃ, কে আমাকে দোর্‌রার আঘাত করছে মা!

বাদশাহ্ আমর দরবার থেকে অন্তঃপুরে ছুটে এলেন। পুত্রের যন্ত্রণাকাতর চেহারা দেখে বলেন—কয়েস! কয়েস! কী হয়েছে বাবা?

—আমাকে নিষ্ঠুরভাবে দোর্‌রা মারছে, বাবা! আঃ অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে!

হেকিম এসে তাকে পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়েন। তারপর বাদশাহকে জনান্তিকে বলে—বাদশাহ নামদার! মাননীয় শাহজাদার প্রতি কোন পরীর দৃষ্টি পড়েছে। সেই আক্রোশে জিনেরা ওকে দোর্‌রা মারছে। এ আমার ওষুধে নিরাময় হবার নয়। আপনি কোন তন্ত্রবিদ্ ফকিরকে তলব করুন।

কয়েস বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। বারবার বলে—আঃ আঃ···

মধ্যরাতে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে সিনাই পাহাড়ের শীর্ষে।

বাগ্দাদ সীমান্তে হিজ্জাদের তাঁবু স্তব্ধ। প্রহরারত হিজ্জা যোদ্ধারা ঘুমে ঢুলছে। সর্দারের তাঁবুর দরজার সামনে পাশাপাশি দুটো মশাল জ্বলছিল। হঠাৎ একে-একে নিভে গেল।

একটু দূরে বালির ঢিবির আড়ালে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বস্ত বান্দা হাব্বা। তার হাতে উটের রজ্জু। একটা তাঞ্জামবাহী উট পা গুটিয়ে বসে আছে।

একটু পরে সর্দার আল-মাহ্দী আর বাঁদী আফ্রা লায়লার ক্ষতবিক্ষত দেহ বয়ে নিয়ে এলেন। তাঁদের পিছু পিছু এল কুকুর ওজ্জা এবং হরিণ জিন্দান। তাঞ্জামে ঢুকলেন মাহ্দী। আফ্রা এবং হাব্বা জ্বরগ্রস্তা অর্ধচেতন লায়লাকে তাঞ্জামে তুলে দিল। তারপর উঠল আফ্রা। লায়লার পা দুটো ঊরুর ওপর তুলে নিল—লায়লার মাথা রইল মাহ্দীর বুকের তলায়।

হাব্বা রজ্জু আকর্ষণ করল। তাঞ্জামবাহী উট উঠে দাঁড়াল। হাব্বার একহাতে বর্শা, অন্য হাতে রজ্জু। পিঠে শরপূর্ণ তূণীর এবং ধনুক। সে উটের আগে পা বাড়াল। উট চলতে থাকল নিঃশব্দে। রাত্রির হিম মরুভূমির পথে যাত্রা হল শুরু। ওজ্জা ও জিন্দান চলল সঙ্গে।

কৌম ত্যাগ করলেন সর্দার আল-মাহ্দী। অনুশোচনায়, পরিতাপে তিনি জর্জরিত। স্নেহের লায়লার গায়ে কখনও হাত তোলেন নি। তাঁর লক্ষ্য আপাতত বুরিয়ান। বুরিয়ানের এক নামজাদা হেকিম আছেন। দূরাত্রির পথ দুস্তর মরুভূমিতে। দিনে বিশ্রাম নিতে হবে দামিনা মরূদ্যানে। সন্ধ্যায় সেখান থেকে রওনা হয়ে বুরিয়ান পৌঁছবেন শেষ রাতে।…

এখন আল-মাহ্দী আর হিজ্জাসর্দার নন। একজন সাধারণ আরব মাত্র। কৌমী উষ্ণীষ ত্যাগ করে এসেছেন। তবু ক্রুদ্ধ হিজ্জাদের মনে এই জাতিপাতে প্রতিহিংসা জাগতে পারে ভেবে দারিনায় পৌঁছেই সওদাগরের পোশাক পরে নিলেন। মুখের অনেকখানি ঢেকে রাখলেন বস্ত্রখণ্ডে।

বুরিদানে রটে যায়, কে এক সওদাগর এসেছেন পথে তাঁর কাফেলা লুঠ করেছে বদ্দু বা বেদুইন ডাকাতেরা। তাঁর কন্যা সাংঘাতিক আহত। সর্বস্বান্ত সওদাগর কোনক্রমে আহত কন্যা, বান্দা, বাঁদী এবং একটি উট নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন।

হ্যাঁ, তাজ্জব ব্যাপার—একটা কুকুর আর একটা হরিণও আছে সেই সওদাগরের। তারাও পালিয়ে আসতে পেরেছে। কুকুর এমনটা করে, সেটা

স্বাভাবিক। কিন্তু হরিণ? বুরিদানবাসীরা দলে দলে সওদাগরের তাঁবুর কাছে এসে ভিড় করে। হরিণটাকে দেখে। বনের প্রাণী এভাবে মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তারা কস্মিন্‌কালে শোনে নি। সওদাগর কি জাদু-মন্ত্র জানেন?

কয়েক দিন পরে রটতে থাকে—না, সওদাগর নন, তাঁর সেই আহত কন্যাই হরিণটাকে জাদু করে রেখেছে। হরিণটা আসলে এক শাহজাদা। জাদুকরী কন্যা তাকে মন্ত্রবলে হরিণ করে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে।

এবং কুকুরটারও কুকুরত্ব যেতে দেরি হয় না। অতএব সেও এক মানুষ শাহজাদা। বেচারার বরাত! সওদাগর কন্যার ঘৃণা তাকে দিয়েছে কুকুরের শরীর।

বুরিদান নগরীতে নিরন্তর গুজব আর জল্পনা চলে। এদিকে হেকিম ইউসুফ লায়লার চিকিৎসা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে। তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। অমনি বুরিদানে সাড়া পড়ে যায়। দিনদুপুরে যেন নিশীথ রাত্রি নামে—কারণ এই উজ্জ্বল সোনালী চাঁদের বাহার। বেহেশ্‌তের অপ্সরা কিসের টানে এ মর্তলোকে অমর্তের ছন্দ নিয়ে নেমে এসেছে! অন্ধকারবর্ণ গুল্‌ফ (চুল) স্বর্গ ও মর্তের মাঝামাঝি সেই রহস্যময় লায়লার (রাত্রি) কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

[illegible] বাদশাহের নাম নওফেল। যৌবনের মধ্য আকাশে জ্বলছেন [illegible] শিকারী। নিপুণ তীরন্দাজ।

[illegible] সন্ধ্যার আলো। শিকারে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছেন। সূর্য অস্ত [illegible] পাহাড়ের আড়ালে। নগরীর প্রান্তে এক সবুজ তৃণভূমি। হঠাৎ দেখতে পান একটা হরিণ চরছে। অবাক হন নওফেল, এখানে হরিণ এল কীভাবে! চোখের ভুল নয় তো!

জীবনে একদিনও শূন্য হাতে শিকার থেকে ফেরেন নি। প্রখ্যাত শিকারী নওফেল শিকারশূন্য ফিরলে সবাই ভাববে, তাদের বাদশাহ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা হারিয়েছেন। এই রটনা শত্রুদের সাহস বাড়াবে।

তাই শিকারে যাবার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, অন্তত একটি বন্য প্রাণী যেন তিনি তীরবিদ্ধ করতে পারেন। আজ বিষণ্ণ মনে ভাবছিলেন, তাহলে কি ঈশ্বর এতদিনে বিমুখ হলেন?

দিনাবসানে নগরীর প্রান্তে ওই হরিণটিকে দেখে নওফেল চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাহলে বুঝি ঈশ্বরই ওকে তাঁর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অসীম করুণা তাঁর প্রতি।

'বিস্‌মিল্লাহ্‌' (ঈশ্বর তোমার নামে) বলে তীর ছোঁড়েন নওফেল। হরিণ তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে ঘাসে। ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকে এগিয়ে যান নওফেল।

তারপর শোনেন এক তীব্র আর্ত চিৎকার। লাগাম টেনে ধরেন। ঘোড়া সামনের দুই পা শূন্যে তুলে হ্রেষাধ্বনি করে। নওফেল দেখেন, গুল্ম আর

পাথরের আড়াল থেকে এক যুবতী দৌড়ে আসছে। তার আগে ছুটে আসছে একটা কুকুর। কুকুরটা তীরবিদ্ধ হরিণের কাছে এসে তার গা শুঁকে মুখ তুলে যেন একবার আর্তনাদ করল।

তারপর যুবতীটি গিয়ে হরিণটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হতবাক নওফেল ঘোড়ার পিঠে স্থিরভাবে বসে শুনতে থাকেন তার করুণ বিলাপ।

...হায় জিন্দান! তোর নিথর চোখে আর তো প্রিয়তম কয়েসকে দেখতে পাচ্ছি না। জিন্দান! ওরে জিন্দান! তোর রক্তে আমার কয়েসকে ঢেকে দিল!

...জ্যোৎস্নারাতে পাথরে বসে তোর সঙ্গে আর কয়েসের গল্প বলা যাবে না।

—গয়েলের নহরের ধারে তার জামার কোনা শুঁকে এসে তুই বলেছিলি, এই তোমার প্রিয়তম! জহুরী যেমন রত্ন চেনে, তুই চিনেছিলি কয়েসকে। সাধক যেমন ঈশ্বরের ঘ্রাণে আবিষ্ট হন, তুই আমার কয়েসের প্রাণে আবিষ্ট হয়েছিলি। তোর মৃগহৃদয়ের ভালবাসা থেকে এককণা কুড়িয়ে নিয়েই আমি কয়েসকে ভালবেসেছি। তুই শিখিয়েছিলি জিন্দান, ভালবাসা কাকে বলে।

...উৎস থেকে প্রবাহিত হয় নহরধারা। উৎস শুকিয়ে গেলে পড়ে থাকে পাথর। তুই এখন মৃত। আমার উৎস গেল শুকিয়ে। হায়, আমি এখন এক তুচ্ছ শিলাখণ্ড। এই নীরস কঠিন শিলাখণ্ড কি আর কয়েসের ভালবাসা পাবে?...

বাদশাহ নওফেল বিচলিত।

ঘোড়া থেকে নেমে আস্তে-আস্তে যুবতীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। কুকুরটা ঘৃণায় গর্জন করে। যুবতী তাকে ধরে রাখে। নওফেল বলেন—কে তুমি?

যুবতী উঠে দাঁড়ায়।

জীবনে এই প্রথম নওফেল দেখলেন কীভাবে অশ্রু বহ্নিময় হতে পারে। আর এই প্রথম জানলেন, বুরিদানের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা বস্তুত কত কুৎসিত।

নওফেল বলেন—ক্ষমা করো আমাকে। জানতাম না এটা একটা পোষা হরিণ।

লায়লা তীব্র কণ্ঠস্বরে বলে—ক্ষমার মালিক স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি শিকারী। যে হাতে তুমি তীর ছুঁড়ে আমার জিন্দাকে মৃত্যু উপহার দিয়েছ, সেই হাতেই একদিন নিজেকেই তুমি মৃত্যু উপহার দেবে।

উত্তেজনা দমন করে নওফেল বলেন—কিন্তু কে তুমি?

লায়লা আর কোন জবাব দেয় না। হাঁটু মুড়ে রক্তাক্ত জিন্দানকে বুকে তুলে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়ায়। ওজ্জা তাকে অনুসরণ করে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর বিষণ্ণ বাদশাহ নওফেল ঘোড়ায় চাপেন। একটু তফাতে অনুসরণ করেন। তারপর দেখেন, নগরীর প্রধান তোরণের পাশে

বিদেশী সওদাগরদের তাঁবু রয়েছে অনেকগুলো। শেষদিকের একটা তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় যুবতীটি। তাঁবুটা ভালভাবে দেখে নিয়ে শিকারীবেশী নওফেল নগরীতে প্রবেশ করেন।···

আল-মাহ্‌দী আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কৌম ত্যাগ করেছেন। লায়লাকে কয়েসের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম নেই। লায়লা তাঁর একমাত্র সন্তান। হিন্জাকুলপতিদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে তাকে দোর্‌রার আঘাতে জর্জরিত করেছেন! এর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত কয়েসের হাতে তাকে সমর্পণ।

কিন্তু ঈষৎ দ্বিধা ছিল মনে।

বাদশাহ আমর যদি হিন্জাকন্যাকে পুত্রবধূ করতে রাজী না হন?

এবং এখন তো আল-মাহ্‌দী গোষ্ঠীচ্যুত সাধারণ মানুষ মাত্র। আর কোন পরিচয় আছে তাঁর?

দ্বিধা নিয়েই আল-বাহরাম যাত্রা করেন মাহ্‌দী। বান্দা হাব্বা আর বাঁদী আফ্‌রা রইল লায়লার রক্ষণাবেক্ষণে। ঈশ্বরের করুণায় তাঁর এই শাদির পয়গামী (দৌত্য) সফল হলে ফিরে এসে মেয়েকে নিয়ে যাবেন, মনে এই ইচ্ছা রইল।

বাদশাহ আমর সাদরে মাহ্‌দীকে গ্রহণ করলেন দরবারে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুললেন না। তারপর নিভৃতে আলাপের সময় মাহ্‌দী তাঁকে জানালেন নিজের কৌম ত্যাগের কাহিনী। শাহজাদা কয়েসের প্রতি লায়লার অনুরাগের কথা। আল-বাহরামে তাঁর আসার উদ্দেশ্য।

বাদশাহ আমর নীরবে শুনছিলেন সব। হঠাৎ মাহ্‌দী দেখেন, বাদশাহের চোখে অশ্রু। বিস্মিত মাহ্‌দী বলেন—আমি কি হজরতকে কোন দুঃখ দিলাম?

—ভাই মাহ্‌দী! যে-কয়েসের প্রতি তোমার কন্যা অনুরাগিণী এবং কন্যার প্রতি মমতায় তুমি পিতৃপুরুষের কৌম পরিত্যাগ করেছ, সে-কয়েসকে কোথায় পাবে?

চমকে ওঠেন মাহ্‌দী।—সে কী সুলতান! কয়েস কি অকালে জান্নাতবাসী (স্বর্গবাসী) হয়েছে? হা খোদা! তাহলে আমার লায়লীর কী হবে?

বাদশাহ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন—মৃত কয়েস জীবিত কিংবা জীবন্মৃত

কয়েসের চেয়ে আমার দুঃখভার লঘু করতে পারত। সে 'মাজনুন' হয়ে গেছে!

—মাজনুন হয়ে গেছে? মাহ্‌দী স্তম্ভিত।

—হ্যাঁ ভাই। সে এখন বদ্ধ উন্মাদ।

—কোথায় আছে সে?

—জানি না। তাকে বারবার আটকে রাখার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আর আটকে রেখে কী লাভ হত? সে দেয়ালে মাথা ভেঙে দেয়াল রক্তে লাল করে। আর্তনাদ করে সারাক্ষণ—আমাকে ছেড়ে দাও লায়লার কাছে যাব! তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর সে নিরুদ্দেশ।

মাহ্‌দী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আমাকে কেন খবর দেননি সুলতান?

বাদশাহ আমর গম্ভীর ও সংযত হয়ে বলেন—তুমি তো জানো, আমরা মহান আব্বাসীয় খলিফাদের মাতৃকুলের বংশধর। লায়লার সঙ্গে কয়েসের শাদি আল-বাহরামবাসীরা মেনে নিত না। আত্মীয়স্বজন উজিরওমরাহ এর বিরুদ্ধতা করত।

ক্ষুব্ধ আল-মাহ্‌দী বলেন—কিন্তু আমি আমার কন্যার জন্য কৌম ত্যাগ করতে পেরেছি! আর পুত্র কয়েসের জন্য আপনি সিংহাসন ত্যাগ করতে পারেন নি সুলতান?

একথায় বাদশাহ আমরের মধ্যে সহসা বিস্ফোরণ ঘটে যায়।—মাহ্‌দী! সামান্য সর্দারী পরিত্যাগ আর বাদশাহী পরিত্যাগ এক নয়। তাছাড়া তোমরা অসভ্য আদিম যাযাবর। তোমাদের মেয়েরা এখনও প্রাক্-ইসলাম যুগের তুক-তাক জাদুমন্ত্রের চর্চা করে। তোমার মেয়ে এক জাদুকরী। গয়েলে থাকার সময় সে আমার কয়েসকে জাদু করেছিল। তাই আমার প্রতিভাবান দার্শনিক কবি পুত্র আজ মাজনুন হয়ে গেল! লোকে পরিহাস করে তাকে মজনু বলে ডাকে।

··· মাহ্‌দী, আমি এতদিনে বুঝেছি তোমরা বাপমেয়ে মিলে ষড়যন্ত্র করে-ছিলে! আল-বাহরামের শাহজাদাকে,—পবিত্র আব্বাসীয় বংশধরকে নীচকুলোদ্ভব হিজ্জাদের জামাই করতে চেয়েছিলে। ধিক তোমাকে! তোমাদের বাপ-মেয়ের চক্রান্তেই আমার বৃদ্ধবয়সে এই নিদারুণ আঘাত সইতে হচ্ছে!···মাহ্‌দী, আমাকে আল-বাহারামের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেদিন কেন তুমি অত উৎসাহী হয়ে উঠেছিলে– নিজের সঞ্চিত গুপ্তধন অকাতরে ব্যয় করেছিলে, এখন তা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি!

পুত্রশোকাতুর বাদশাহ আমর আল-মাহ্‌দীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টে চেয়ে আবার বলেন—যদি কৃতজ্ঞতাবোধ বলে কোন বস্তু আমার মধ্যে না থাকত, তোমাকে আমি কোতল করার হুকুম দিতাম মাহ্‌দী!

আল-মাহ্‌দী আস্তে বলেন—এসব কী বলছেন সুলতান!

—যা সত্য, তাই বলছি। অস্বীকার করতে পারো, গয়েলে তোমার তাঁবুতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার কয়েসকে তুমি মন্ত্রপূত শরবত খাইয়েছিলে! সেই থেকেই না সে লায়লা লায়লা করে দিওয়ানা হয়ে গেল?

আল-মাহ্‌দীর হিন্দ্‌জারক্তের হিংসা উত্তাপ সৃষ্টি করেছে শরীরে। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে তিনি বলেন—যদি তাই ভেবে থাকেন, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু এর জন্য একদিন আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। আপনি মূর্খ। তা নাহলে বুঝতেন, মুহব্বত আল্লাতালারই সৃষ্টি। সেই মুহব্বতই এক জাদু। যে আব্বাসীয় গৌরবের দাবিদার! আপনার পুত্র আপনার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ সে কৈশোরেই মানুষের জন্য আল্লার শ্রেষ্ঠ উপহার মুহব্বত লাভ করেছিল। মূর্খতাই আপনার পুত্রশোকের কারণ।···

বুরিদানে ফিরে আল-মাহ্‌দী শোনেন, বাদশাহ নওফেল তাঁকে ডেকেছেন।

নওফেল লায়লাকে দেখার পর অস্থির হয়ে উঠেছেন। এই অসামান্যা সুন্দরী যুবতী নাকি এক সওদাগরকন্যা। তাকে শাদি না করলে নওফেলের জীবন বৃথা।

ক্ষুব্ধ অব্দুধ মাহ্‌দী। অভিমানাহত।

বুরিদানের বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তারপর যেমনই শাদির প্রস্তাব পেলেন, তেদের বশে রাজী হয়ে গেলেন।

লায়লা কয়েসের প্রেমে গভীরভাবে আসক্ত। কিন্তু কয়েস এখন মাজনুন! লোকে তাকে উপহাস করে মজনু নামে ডাকে। বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে লায়লীর শাদি দেওয়ার কথা আর ভাবাও যায় না! তাছাড়া, সে এখন নিরুদ্দেশ।

লায়লার জীবনটাকে বাবা হয়ে আর নষ্ট হতে দেবেন কোন মুখে মাহ্‌দী? কয়েস বস্তুত এখন মৃতই। মাজনুন এবং মৃতে কোন ফারাক থাকতে পারে না।

অতএব মাহ্‌দী রাজী হলেন।

শাদির নহবত বেজে উঠল বুরিদানে। মাহ্‌দী তাঁবু থেকে উঠে গেলেন প্রাসাদের সংলগ্ন একটি ভবনে। লায়লা প্রথমে কিছু বুঝতে পারে নি। পরে যখন জানল, দুঃখে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠল। মাহ্‌দী যেন পাথরের মূর্তি। নিরুত্তর বসে আছেন। লায়লা তাঁর পায়ে মাথা ভাঙল। কবে তার শাদি হয়ে গেছে। স্বামী জীবিত থাকতে আবার কীভাবে তার শাদি হতে পারে!

আফ্‌রা বোঝায় তাকে।—বেটি, তোর তাজা জীবন। কয়েস এখন মজনু হয়ে গেছে। কেন তার জন্য নিজের তাজা জীবনটা নষ্ট করবি? আর বেটি

লায়লা, শরীয়তেই আছে। উন্মাদ মাজনুন স্বামীর সঙ্গে আপনা-আপনি তালাক হয়ে যায়। জিগ্যেস করে দেখ কোন আলেমকে!

লায়লার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। সে বলে—আমার মুহব্বতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আলেম কে?…বিশেষ করে, যখনই জেনেছি, আমার প্রিয় জিন্দানকে কে খুন করেছিল, তখন থেকে বুরিদানের সুলতানকে আমি ঘৃণা করেছি।

বাদশাহের নিযুক্ত পরিচারক-পরিচারিকারা এসব কথা তুলে দেয় বাদশাহের কানে।

নওফেল চিন্তিত হন। ধূর্ত ইয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তারপর একদিন সোজা চলে যান লায়লার কাছে। গিয়ে বলেন—আমি শাদির প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে এসেছি, লায়লা।

তারপর বলেন—তোমার জিন্দানকে না জেনে মেরে ফেলার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তুমি যদি চাও, তোমার কয়েসকে খুঁজে এনে তোমার সঙ্গে শাদি দিয়ে সেই প্রায়শ্চিত্ত করব। বলো, তুমি রাজী? চাও কয়েসকে?

মুহূর্তে লায়লা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতা তার দুচোখে টলটল করতে থাকে। নতমুখে বলে—জীবনে কয়েস ছাড়া আর কী চাইব, বাদশাহ নামদার? কয়েস ছাড়া আমি নিষ্ফল প্রান্তরের পাথরের টুকরো। শিখা যাতে জ্বলে না, আমি সেই শূন্য বাতিদান। মহানুভব সুলতান! কয়েসের জন্যই দুনিয়ায় আমার জন্ম!

ঠোঁটের কোণায় হেসে নওফেল বলেন—কিন্তু শুনেছি, সে তো এখন মাজনুন! মাজনুন স্বামীকে নিয়ে তুমি কি সুখী হতে পারবে লায়লা?

—হায় সুলতান! কেমন করে বোঝাব, কয়েসের যা কিছু—সবই আমার প্রিয়?…লায়লা আবেগবিহ্বল হয়ে বলে। যে পথের ধুলোয় কয়েসের পায়ের চিহ্ন পড়েছে, সেই ধুলো আমার তীর্থের পুণ্য। যে প্রান্তর তার ছোঁওয়া পেয়েছে, সে আমার গুলিস্তান। যে বাতাসে সে নিঃশ্বাস ফেলেছে, সেই বাতাসের চেয়ে বসরাই আতর নিকৃষ্টতর

নওফেল বলেন—বেশ। তৈরি থেকো। আমি কয়েসের খোঁজে চললাম।

নওফেল সসৈন্যে বের হলেন বুরিদান থেকে।…

দিকে-দিকে একদল করে সৈন্য পাঠান নওফেল। নিজেও একদল সৈন্য নিয়ে ঘুরে বেড়ান। যাকে সামনে পান, জিগ্যেস করেন কোন মাজনুন বা মজনুকে দেখেছে কি না। কতবার কত ভুল মজনুর দেখা পান।

একদিন এক অরণ্যসীমান্তে দেখলেন একদল কাঠুরিয়া আসছে। গাধার পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরছে তারা। নওফেল জিগ্যেস করেন—তোমরা কি কোন মজনুকে দেখেছ?

সর্দার কাঠুরিয়া বলে—হ্যাঁ হুজুর। দেখেছি বটে। ব্যাটা আস্ত ভূত! কিছুতেই গাছ কাটতে দেবে না। যে-গাছের গায়ে কুড়ুল মারতে যাই, সেই

গাছ জড়িয়ে ধরে ব্যাটা বলে—খবর্দার! দেখছ না গাছের বাকলে আমার লায়লার নাম লেখা আছে?

উত্তেজিত নওফেল বললেন—তারপর, তারপর?

হুজুর, ঠাহর করে দেখি—বনের সব গাছে সে লায়লা লিখে রেখেছে। তখন আমরা জিগ্যেস করলাম, লায়লা কে? সে বলে—তা তো জানি না! আমরা বললাম—ওই দেখ তোমার লায়লা। শুনলে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, একটা কাঁটাগাছের দিকে দেখিয়ে দিতেই সেই মজনু তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে লায়লা-লায়লা বলে চ্যাঁচাতে লাগল। সারা গা রক্তারক্তি। তখন আমাদের মমতা হল। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনলাম। বুঝলাম, হতভাগা বেঘোরে মারা পড়বে। তাকে বললাম—লায়লাকে খুঁজছ? শিগগির এই পথ ধরে চলে যাও—লায়লা একটু আগে এই পথ দিয়ে গেছে। তখন সে পথের ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে চলল হুজুর! মুখে শুধু লায়লা—লায়লা রব!···

নওফেল অশ্বকে কশাঘাত করেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পান সেই বিচিত্র দৃশ্য। শতচ্ছিন্ন বেশ, এক শীর্ণ কংকাল, চুলে জটা বেঁধে গেছে, একরাশ গোঁফ দাড়ি—ধুলোয় ধূসর। রাস্তায় গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে আর বিড়বিড় করে বলছে—লায়লা···লায়লা··· লায়লা··

···নির্জন পথ, তুমি তো ধন্য
পেলে লায়লার পায়ের চিহ্ন ॥
তোমার ধুলোও হল মাজনুন
হায়, মাজনুন হল না ধুলো!
কী দিয়ে শুধবে এমন নুন ॥
শুষে নাও ক্ষত চিহ্নগুলো ॥
আমরের ছেলে কয়েস ভিন্ন
আর কে জেনেছে প্রেমই পুণ্য?
নির্জন পথ, তুমি তো ধন্য ॥

নওফেল ঘোড়া থেকে নামেন। অনুচরেরাও নামে। নওফেল বলেন—কয়েস! কয়েস! তোমাকে লায়লার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা। ওঠ ভাই, আজ যে লায়লার সঙ্গে তোমার শাদি!

মজনু কয়েস শুধু বলে—লায়লা! লায়লা! লায়লা!···

লায়লার রূপমুগ্ধ নওফেল ভেবেছিলেন, প্রেমিকের এই দশা দেখলে লায়লার প্রেম মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে যাবে।

কিন্তু মাজনুন কয়েসকে দেখামাত্র লায়লা এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।— কয়েস! আমার কয়েস!

বিভ্রান্ত উন্মাদ কবি তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

লায়লা বলে—আমাকে কি চিনতে পারছ না কয়েস? আমি লায়লা! তোমার লায়লা!

অভিমানী কবি কয়েস অর্ধস্ফুট স্বরে বলে—কে তুমি? কে তুমি লায়লা বলছ নিজেকে?

…'গয়েলের ঝর্ণাধারা যার নামে ছুটে গিয়েছিল
দুকূলে শ্যামল শস্য রেখে সমুদ্রের দিকে
সে কি ফিরে এসেছিল উৎসে পুনর্বার
তারই খোঁজে? হায় নারী! খর্জুর পাতার
শীর্ষে শওয়ালের চাঁদ হরিণের শিঙে বিদ্ধ
হৃৎপিন্ডের যন্ত্রণায় অস্ত-গোরস্তানে শুয়ে।
এখন ডাকছ কাকে? অন্ধকার, বড় অন্ধকার!'…

সহসা লায়লা আবিষ্কার করে, কয়েস অন্ধ। দুচোখ ক্ষতবিক্ষত। সে আর্তস্বরে বলে—কয়েস! কয়েস! কে তোমাকে অন্ধ করেছে?

পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন নওফেল। এসে বলেন—কাঁটাভরা গাছকে লায়লা বলে জড়িয়ে ধরেছিল শুনেছি। তখনই এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। কিন্তু লায়লা, একবার বলো, এই অন্ধ এবং উন্মাদ—যে তোমাকে চিনতে পারল না, যে বলল, গয়েলের ঝর্ণা আর উৎসে ফিরে যায়নি—এমন কি এও বলল, শওয়ালের সেই চাঁদ অস্ত গেছে—এখন তার চারদিকে বিস্মৃতির অন্ধকার—তাকেই কি তুমি শাদি করতে চাও?

লায়লা কয়েসের দুকাঁধে হাত রেখে বলে—চিনতে পারছ না কয়েস? আমি তোমার সেই লায়লা!

মাজনুন কবি কাতর স্বরে বলে—

…'এখানে কোথায় লায়লা! লায়লা গয়েলের
খর্জুরবীথিকা থেকে আল-বাহরামের
পথে চলে গেছে, পথ তাকে নিয়েছে ভুলিয়ে
পাহাড়ে প্রান্তরে নিরুদ্দেশে—হায়!
কয়েসের দুনিয়ায় তার ছায়া অনন্ত গোধূলি!'

বাবাকে বলে কয়ে বুরিদানের সেই হেকিমের কাছে কয়েসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে লায়লা। হেকিম বলেন—ক্রমশ বিস্মৃতির উপসর্গ দেখা দিয়েছে রোগীর মধ্যে! অন্ধত্ব দূর করা যদি বা সম্ভব, বিস্মৃতি মারাত্মক দুঃসাধ্য ব্যাধি। চেষ্টা করে দেখি বেটি!

লায়লা বলে—কিন্তু আমার নাম তো ভোলেনি! ওই শুনুন, লায়লা-লায়লা বলছে সারাক্ষণ!

হেকিম একটু হেসে বলেন—মাজনুনের পক্ষে এই তো স্বাভাবিক, মা। লায়লা এখন ওর কাছে একটা শব্দ মাত্র। একটা অবলম্বন। তার বেশি কিছু নয়।...

এক গোপন গুহায় ধনরত্ন সঞ্চিত থাকত হিজ্জা গোষ্ঠীর। তার সন্ধান জানতেন শুধু কৌমের সর্দার। দলত্যাগের সময় আল-মাহ্‌দী সেকথা কাকেও জানিয়ে আসেন নি। হিজ্জারা মাহ্‌দীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এদিকে মাহ্‌দী গোপনে বান্দা হাম্বাকে নিয়ে গিয়ে সঞ্চিত ধনের একটা অংশ নিজের ন্যায্য প্রাপ্য হিসেবে এনেছেন।

তাই দিয়ে প্রকৃত সওদাগরের মতো বিপণি খুলেছেন বুরিদানের বাজারে।

তারপর বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে হাম্বাকে পাঠান হিজ্জাদের সন্ধানে। হাম্বা ছদ্মবেশে যায়। হামদান রাজ্যের হিজ্জারা তখন তাঁবু ফেলেছে। গুপ্তধনের নকশাআঁকা প্রাক্তন সর্দারের চিঠিটা সে এক হিজ্জা বালকের হাতে গুঁজে দিয়ে ফিরে আসে বুরিদান।

হিজ্জারা সন্তুষ্ট। আল-মাহ্‌দী নিরাপদ।

তারপর মাহ্‌দী মাজনুন কয়েসকে দেখে বিচলিত হয়েছেন। চিকিৎসার অর্থ দিতে কার্পণ্য করছেন না।

কিন্তু হেকিম ভীষণ অর্থগৃধ্নু। বাদশাহের লোক তাঁকে গোপনে অর্থের লোভ দেখিয়ে বলেছে—বাদশাহ নামদারের ইচ্ছা নয় যে মজনু আরোগ্যলাভ করে!

ক্রূর হেসে হেকিম বলেছেন—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে! বাদশাহকে বলবেন, যদি ইচ্ছা করেন—তাহলে মজনু বাছাধনকে মাটির তলায় পাঠিয়ে দিতেও পারি!

—না। সুলতান এতখানি চান না। দেখবেন, যেন প্রাণে বেঁচে থাকে।

নয়তো আপনারই গর্দান যাবে। কারণ, মজনু যুবকটিকে সুলতানের প্রয়োজন আছে। সাবধান!

আঁতকে উঠে হেকিম বলেছেন--তওবা, তওবা! ও একটা কথার কথা বলছিলাম জনাব!

কিছুদিন পরে বাদশাহের লোক আবার হেকিমের কাছে আসে। বলে—বাদশাহ নামদারের ইচ্ছা, আপনি মজনুকে সুস্থ ঘোষণা করুন!

হেকিম বলেন—আরে ভাই! রুগী বিনাচিকিৎসাতেই ভাল হয়ে যাচ্ছে! আমি তাজ্জব হয়েছি। রুগী লায়লা-লায়লা করেই যেন চোখ ফিরে পাচ্ছে। এখন বেশ দেখতে-টেখতে পায়! তার ওপর বিপদ, মুখেমুখে অনর্গল কবিতা আওড়ায়।

—সে কী! আপনি ভাল ওষুধ খাওয়াচ্ছেন না তো হেকিমসাহেব?

আল্লার কসম। তা পারি? গর্দান যাবার ভয় নেই? ওই শুনুন না—কবিতা কিংবা কীসব মন্ত্র পড়ছে যেন! মন্ত্রের জোর ছাড়া কী বলব? এ মজনু নির্ঘাত জাদুকরের চেলা ছিল!

ঘরে কয়েস আপন মনে বলছে—

...'দোহাই নয়ন, অন্ধ থেকো না, দরজা খোলা
বুঝি লায়লার আসার এবার সময় হোলো।
লায়লা আসবে, লায়লা ॥
বুকের পাঁজর কমজোর কেন? কঠিন হও
ফুসফুস তুমি শ্বাসপ্রশ্বাসে ঝঞ্ঝা বও।
লায়লা আসবে, লায়লা ॥
হে যুগল বাহু হও ঈগলের ডানা যেমন,
লায়লা নামের আকাশ করবে আলিঙ্গন ॥...
লায়লা আসবে, লায়লা ॥'

নাঃ! মাজনুনীর ঘোর এখনও কাটেনি। বাদশাহের লোকেরা হাসতে-হাসতে চলে যায়। পরদিন আল-মাহ্‌দী এলে হেকিম বলেন—সওদাগর! আপনার রুগী সুস্থ। দু-একদিনের মধ্যে একে নিয়ে যেতে পারেন।

খবর পেয়ে লায়লা খুশি। তার কয়েস সুস্থ। সে অধীর হয়ে পথ তাকায়।

বাদশাহ নওফেল সওদাগর মাহ্‌দীকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন—তাহলে এবার মেয়ের সঙ্গে কয়েসের শাদির ব্যবস্থা করুন। দেরি করা উচিত নয়।

আল-মাহ্‌দী ইতস্তত করেন। সব মনে পড়ে যায়। আল-বাহরামের বাদশাহের বিনা অনুমতিতে তাঁর পুত্রের সঙ্গে শাদি দেবেন কী ভাবে? অগত্যা কয়েসের পরিচয় এবং নিজের পূর্ব বৃত্তান্ত সবই খুলে বলেন। নওফেল আরও খুশি হন মনে-মনে। চক্রান্তের আরও একটি ব্যূহ গড়ে তোলেন।

নওফেল বলেন—সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দিন। লায়লার পরিচয় হবে আমার বোন। বাদশাহ আমর আমার বোনের সঙ্গে তাঁর ছেলের শাদিতে হাতে

বেহেশত্ পাবেন। অতএব আমি এখনই কয়েসকে নিয়ে আল-বাহরাম রওনা হচ্ছি। আগে যাচ্ছে আমার কাসেদ (দূত) আমার যাওয়ার সংবাদ নিয়ে। আপনি প্রস্তুত থাকুন।...

ধূর্ত নওফেল তখনই হেকিমের বাড়ি থেকে কয়েসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। উঠের পিঠে তাঞ্জামে কয়েস এবং বুরিদানের বাদশা। সঙ্গে ঘোড়া এবং উটের পিঠে চলেছে সশস্ত্র সেনাদল। রীতিমতো রাজকীয় সফর। আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই।

নিরুদ্দিষ্ট মাজনুন শাহজাদা সুস্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে আসছেন—কাসেদের মুখে খবর পেয়ে আল-বাহরামে সাড়া পড়ে যায়। নগরবাসীরা মসজিদে-মসজিদে 'শোকর্-গুজারি'—কৃতজ্ঞতার নমাজ পড়ে। পুত্রশোকাতুর বাদশাহ আমর নগরীর প্রান্তে অপেক্ষা করেন। আমীর-উজির-শ্রেষ্ঠী-পাত্র-মিত্র সবাই যায়। নগরী শাহজাদাকে অভিনন্দন জানাতে প্রস্তুত হয়।

শোকে ব্যাধিগ্রস্তা কয়েসজননীও তাঞ্জামে শুয়ে নগরতোরণে প্রতীক্ষা করেন।...

নওফেল কয়েসকে নিয়ে আসছেন। আল-বাহরাম জয়ধ্বনি করে—শাহজাদা কয়েস-বিন-আমর জিন্দাবাদ!

উট অবনত হয়। তাঞ্জামের পর্দা তুলে বাদশাহ নওফেল কয়েসের হাত ধরে বলেন—শাহজাদা! আপনার বাবা বাদশাহ আমর-বিন-আবদুল্লা আপনাকে নিতে এসেছেন।

বিষণ্ণ কয়েস বলে—লায়লা আসে নি? লায়লা না এল যদি, ঈশ্বর এলেই বা কী!

তার কানে কানে নওফেল বলে—আসবে। সবুর, সবুর শাহজাদা! সে আসবে।

বাদশাহ আমর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

কয়েসজননীর কাছে নিয়ে যান। সারা আল-বাহরাম সুখেদুঃখে অশ্রুপাত করে। মিছিল এগিয়ে যায় প্রাসাদের দিকে। গবাক্ষে অলিন্দে রাজপথে অজস্র মানুষ জয়ধ্বনি করে শাহজাদা কয়েসের।

উৎসবের ঘোরে আচ্ছন্ন নগরী। বাদশাহ নওফেল সুযোগমতো বাদশাহ আমরের কাছে তাঁর বোনের শাদির প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর বোনের নামও লায়লা। অসামান্যা রূপবতী। শাহজাদা যেটুকু বা অসুস্থ আছেন এখনও, শাহজাদী লায়লার সেবায় তা সেরে যাবে।

বাদশাহ আমর সঙ্গে সঙ্গে রাজী। শাদির বাদ্য বাজে নগরীতে।

শাদির দিন ঠিক করে ধূর্ত নওফেল ফিরে এলেন বুরিদানে।

সওদাগর আল-মাহ্দী একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন—পরে ভাবলেন, যেভাবেই হোক কয়েলের সঙ্গে শাদি হলেই তো তাঁর মেয়ে সুখী হবে!

লায়লা চঞ্চল। পরিচারিকারা তাকে দুলহিন (কনে) বলে ভাবে। কৌতুকে অস্থির করে। লায়লার শীর্ণ শরীরে দ্রুত স্বাস্থ্যের লালিত্য ফিরে আসে। গোপনে বারবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সে।

শাদির দিন এল অবশেষে। লায়লা দুলহিন সাজল। নাচেগানে সওদাগরপুরী মুখর হয়ে উঠল। বসরা থেকে এল গোলাপনির্যাস। ইরানের শিরাজ থেকে এল উৎকৃষ্ট শরাবী শিরাজী। হিন্দুস্তান থেকে আনা হল কনের বেশভূষা। রেশমী মেখরাব, মসলিনের ওড়না, স্বর্ণালংকার।

বুরিদানের সীমান্তে শাদিয়ানা বাদ্য বাজিয়ে বরের প্রতীক্ষা করে বুরিদানবাসী।

দিগন্তে আল-বাহরামের নিশান দেখা গেল। উটের পিঠে নকীব ভূকিনি করছে।

বাদশাহ নওফেল প্রতীক্ষা করছেন তোরণে। তার ঠোঁটে ক্রুর হাসি।

বাদশাহ আমর নিজে আসছেন বরবেশী পুত্রের সঙ্গে।

নগরতোরণে দুই পক্ষের কাড়া-নাকাড়া-নহবত বাজল। তারপর শাহী প্রাসাদে বরের মিছিল গিয়ে থামল। অভ্যর্থনা চলতে থাকল। বসরাই গোলাপনির্যাসের গন্ধ। বদখকশানী আতরের গন্ধ। মউ মউ করছে চারদিক। বিশাল দরবারকক্ষে শাদির মহফিল বসেছে। পুষ্পময় সিংহাসনে বরবেশে শাহজাদা কয়েস বসে আছে। তার দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য। ঠোঁট কাঁপছে। কিছু বলছে হয়তো।

শাদির মুহূর্ত সমাগত। হঠাৎ সেই অভিজাত মহফিলে কোত্থেকে একটা কুকুর এসে ঢুকল। হুলস্থুল উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মহফিল অপবিত্র করে দিল যে! তাড়াও, তাড়াও!

বান্দারা তাকে তাড়াতে চেষ্টা করে। চারদিক থেকে রব ওঠে—তাড়াও! দূর করো!

শাহজাদা কয়েসের দিকে ছুটে যায় কুকুরটা। অমনি কয়েস চিৎকার করে ওঠে—ওজ্জা! ওজ্জা! আমার লায়লা কোথায় রে ওজ্জা?

তারপর সে কুকুরটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল—ওরে ওজ্জা! তুই আমার লায়লাকে ছুঁয়েছিস, তাই তুই এত পবিত্র!

তারপর কয়েস তার মুখচুম্বন করে বলে—ওজ্জা, এই মুখে তুই লায়লার পদচুম্বন করেছিস! তুই ধন্য!

সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা মতো এক গণ্যমান্য আমীর চিৎকার করে বলেন—মহামান্য সুলতান! এ যে একটা বদ্ধ পাগল! এর সঙ্গে আপনার বোনের শাদি দেবেন! ছি, ছি! এ বড় লজ্জা! বুরিদানীরা কি তাদের সেরা সৌন্দর্যটিকে এক নাদান মাজনুনের জন্যই লালন করেছে এতকাল?

মহফিলের আরও কিছু অভিজাত ব্যক্তিও একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান।—বাদশাহ

নামদার! আমরা জানতাম না—এক মজনুর সঙ্গে বোনের শাদি দিয়ে কুলে কালি দিচ্ছেন! ছি, ছি! ও ঘৃণ্য না-পাক কুকুরের মুখে চুমু খাচ্ছে! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

বাদশাহ আমর নতমুখে বসে আছেন। স্তম্ভিত। অপমানবোধে জর্জরিত। মহফিলের চারদিক থেকে বুরিদানবাসীরা বলছে—কী লজ্জা! কী লজ্জা! বুরিদানের মাথা হেঁট হয়ে গেছে!

আমরের উজির উঠে দাঁড়ান। গর্জন করে বলেন—আল-বাহরামী ভ্রাতৃবৃন্দ! এই অপমান অসহ্য। মহামান্য সুলতান আমর! আপনি কি এখনও আমাদের এখানে বসে থাকতে বলবেন?

বাদশাহ আমর অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন—না।

ক্রুদ্ধ আল-বাহরামীরা বরকে তুলে নিয়ে মহফিল থেকে বেরিয়ে যায়। পিছনে বুরিদানী অভিজাতরা হোহো করে হাসতে থাকে। তাদের বাচ্চারা হাসে। শাদির নহবত যায় থেমে।

বাইরে কোথায় অসির ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষা, ক্রুদ্ধ মানুষের গর্জন। রাজপথে জনতা সন্ত্রস্ত। আল-বাহরামী বরযাত্রীরা ফিরে চলেছে। তাদের হাতের মুক্ত তলোয়ার উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলসে ওঠে। বাদশাহ নওফেলের গোপন আদেশ ছিল, বুরিদানীরা যেন রক্তপাত এড়িয়ে চলে। তবু কিছু রক্ত ঝরল।

আল-মাহ্‌দী আড়ালে থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন।

কিন্তু নওফেল এবং বুরিদানী আমীরদের ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পারেন নি তিনি। ঘটনাটি এত স্বাভাবিকভাবে ঘটে গেল! তাঁর চোখ ফেটে জল আসে। তাহলে কি লায়লার সঙ্গে কয়েসের শাদি খোদাতালার অভিপ্রেত নয়?

নওফেল ওত পেতে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। এবার আল-মাহ্‌দীর সামনে গিয়ে বলেন—নসীব সওদাগরসাহেব! বুরিদানী আমীররা আমাকেই প্রকারান্তরে অপমান করে বসবেন, আমি ভাবিনি! হারামজাদাদের কয়েদ করবার হুকুম দেব,—ওদের শূলে চড়াব! তবে কী জানেন, বুরিদানীরা বরাবর বড্ড খুঁতখুঁতে প্রকৃতির লোক। যাই হোক, এখন কী করা কর্তব্য, বলুন আপনি। দুলহিন-বেশে আপনার কন্যা লায়লা আর কতক্ষণ বসে থাকবে? আপনি তার পিতা। যদি বলেন, তার দুলহিন-বেশ খুলে ফেলার নির্দেশ দিই!

দুলহিন-বেশিনী লায়লার মুখ ভেসে ওঠে মাহ্‌দীর চোখের সামনে! হত-ভাগিনী লায়লার বিশীর্ণ মুখে হঠাৎ স্বর্গীয় লালিত্য ফিরে এসেছিল। তারপর হঠাৎ যেন সাইমুমের ধুলোবালি এসে সেই লালিত্যকে ধূসর করে ফেলল। আল-মাহ্‌দী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

নওফেল বলেন—বলুন সওদাগর, কী করবেন?

আল-মাহ্‌দী ভগ্নস্বরে বলেন—শাদিয়ানা বাজুক। মহফিল বসুক।

—কিন্তু এখন বর কোথায় পাওয়া যাবে ?

আল-মাহ্দী অশ্রুসজল চোখে বলেন—আপনি মহানুভব। আমার কন্যার ইচ্ছাপূরণের জন্য অশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন, আমার কন্যা এবং আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মাননীয় সুলতান ! একদিন আপনি নিজের মুখে আমাকে শাদির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমিও রাজী হয়েছিলাম। আশা করি, তা আপনার স্মরণ আছে !

—অবশ্যই আছে। নওফেল মনে-মনে উদ্বেলিত, কিন্তু মুখে বলেন—কিন্তু সওদাগর, আপনার কন্যা অন্যের প্রতি অনুরাগিণী, তখন তা জানা ছিল না ! এখন সব জেনেশুনে কীভাবে তাকে গ্রহণ করি ?

আল-মাহ্দী তাঁর দুহাত ধরে কাকুতিমিনতি করে বলেন—সুলতান ! আমার কন্যার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছিল। আমাদের আরব্য প্রবচনে আছে—'স্ত্রীজাতি দুরন্ত ঘোড়া, তার মুখে এঁটে দিও লাগাম, পিঠে চড়াও জিন এবং হাতে নাও ধারালো চাবুক।' বাদশাহ নামদার ! আপনি এই বুরিদান রাজ্যকে যখন শাসনে পালনে করায়ত্ত রাখতে সমর্থ হয়েছেন, তখন একজন নাদান স্ত্রীলোককে বশীভূত রাখা কি আপনার পক্ষে আদৌ অসম্ভব ?

নওফেল উত্তেজনা দমন করে বলেন—বেশ। আপনি যখন অনুরোধ করছেন ··

দ্বিগুণ জোরে শাদিয়ানা বেজে ওঠে। রাজপথে নকীব আবার শাদির মহফিল ঘোষণা করে। বুরিদানী স্ত্রীলোকেরা এবং শাহী প্রাসাদবাসিনীরা আবার উলুধ্বনি করতে থাকে।*

বাদশাহ নওফেলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। অলোকসামান্যা নারী লায়লা এখন ধর্মত তাঁর স্ত্রী। শিরাজীর পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন আর প্রতীক্ষা করছেন, কখন পুরনারীদের বাসরসজ্জা শেষ হবে।

বাঁদী আফ্‌রা সান্ত্বনা দিচ্ছে নববধূবেশিনী লায়লাকে। ফুলশয্যার বর্ণময় উজ্জ্বলতাকে লায়লার বিষাদের কুয়াশা ম্লান করে। গোলাপের পাপড়িতে

* বিস্ময়কর ব্যাপার, আরবনারীরা উলুধ্বনি করে। যুদ্ধের সময় পুরুষদের উত্তেজিত করতে, কিংবা কোন সামাজিক খুশির কারণ ঘটলে তারা একসঙ্গে মুখে যে আওয়াজ তোলে, তা উলুধ্বনি। সমবেতভাবে ক্রোধ প্রকাশ, প্রতিবাদ কিংবা পরিহাস প্রকাশেও উলুধ্বনি শোনা যায়। এখনও এটা প্রচলিত। যাঁরা আরব্য পটভূমিকায় কোন বিদেশী চলচ্চিত্র দেখেছেন, তাঁরা এটা লক্ষ্য করেও থাকবেন।

অশ্রুর ফোঁটা টলমল করে। কোথা থেকে ভেসে আসে বিষণ্ণ দরাকবীণার মৃদু ঝংকার।

কিছুক্ষণ পরে বাসর থেকে পুরনারীরা চলে যায়। বাঁদী আফ্‌রা বলে যায়—আসি বেটি। এ তোমার নতুন জীবন। তৈরী হও। খোদা তোমাকে রক্ষা করুন।

বরবেশী নওফেল চঞ্চল পায়ে বাসরে প্রবেশ করেন। চক্ষু দুটি ঘোর রক্তিম। শরাবের নেশায় আচ্ছন্ন। কম্পিত স্বরে বলেন—লায়লা!

লায়লা ঠোঁট কামড়ে ধরে। অস্ফুট স্বরে এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে—ছিঃ সুলতান! আমি পরস্ত্রী।

—তুমি এজিন (স্বীকৃতি) দিয়েছ, লায়লা!

—না।

—দাওনি?

—না। আমি চুপ করে ছিলাম।

নওফেল হাসেন।—শাদির দুলহিনরা লজ্জাবতী। তাই তারা চুপ করে থাকে। আমার আর সব ধর্মপত্নীদের জিগ্যেস করো, তারাও বলবে, চুপ করে ছিলাম। স্ত্রীলোকের এই-ই স্বভাব, লায়লা! এ আর নতুন কথা কী?

লায়লা নতমুখে পালঙ্কের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। থরথর করে কাঁপছে। তারপর সে অশ্রুপূর্ণ চোখে নওফেলের দিকে মুখ তোলে। বলে—সুলতান। দয়া করুন আমাকে! আমি পরস্ত্রী, আল্লার দোয়ায়, দয়া করে আমাকে ছোঁবেন না। এ দেহমন কয়েসের কাছে সমর্পিত। বাদশাহ নামদার! অন্যের ধন অধিকার করা পাপ। জেনেশুনেও কি আপনি তা অধিকার করতে চান?

অধীর নওফেল বলেন—বেশ তো! মনে করে নাও না, আমিই সেই কয়েস!

—হায় সুলতান! দুনিয়ায় আর কে কয়েস হতে পারে!… লায়লা ক্ষুব্ধ স্বরে বলতে থাকে। আর কাকে আমি কয়েস ভাবতে পারি? মুহব্বত যার চোখ খুলে দিয়েছে, আশিক্ (প্রেমাসক্তি) যাকে পাকা জহুরী করেছে, সে কেমন করে বালুকণাকে ভাববে স্বর্ণচূর্ণ—সূর্যাস্তকে ভাববে সূর্যোদয়? মূর্খ সুলতান! রক্তাক্ত স্ফোটক দেখে কে ভাববে শরীরে ফুটেছে সুরক্তিম ৰসরাই গোলাপ? আমার কয়েস নীলকান্তমণির দ্যুতিবিচ্ছুরণ—ওই বাতিদানের দীপশিখা দেখে লায়লা ভুলবে কেমন করে?

সুলতান নওফেল চাপা গর্জন করেন।—যাক্। স্ত্রীলোকের মুখে তত্ত্বকথা শোভা পায় না। ধর্মপত্নীর প্রতি স্বামীর পরিপূর্ণ অধিকার ইসলাম দিয়েছে। সেই অধিকার পবিত্র কোরানে স্বীকৃত।

লায়লা নতজানু হয়ে মিনতি করে—দয়া করুন সুলতান, দয়া করুন! আমি পরস্ত্রী!

বাসরকক্ষের কেন্দ্রে একটি অনুচ্চ বেদী। বেদীটি রত্নখচিত দস্তরখানে ঢাকা।

তার ওপর কারুকার্যময় একটি পেয়ালায় সুগন্ধি শরবত রয়েছে। স্বর্ণরেকাবিতে সাজানো আছে দ্রাক্ষাগুচ্ছ, আপেল, পাকা খেজুর।

আরব্য প্রথা, নববর নববধূ বাসরে একসঙ্গে আহার্য গ্রহণ করবে, তারপর শয্যায় যাবে। প্রথমে বর চুমুক দেবে শরবতে। সেই উচ্ছিষ্ট শরবত পান করতে হবে বধূকে। তারপর বর দ্রাক্ষাগুচ্ছ দাঁতে কামড়ে বধূকে ইশারা করবে, বধূ তার ঠোঁট থেকে দ্রাক্ষা কামড়ে নেবে। প্রতিটি ফলের স্বাদ এভাবে নিতে হবে উভয়কে।

ব্যস্ত নওফেল বলেন—ওসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এস লায়লা, আমরা ফুলশয্যায় 'মাতেহাপর্ব" (স্বারোদঘাটন) সেরে নিই। আর দেরি কোরো না। রাত বাড়ছে। আমি ক্লান্ত।

নওফেল শরবতের পেয়ালা তুলে নিলেন। চুমুক দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে পড়ে গেলেন বেদীর ওপর।

ঝন্‌ঝন্‌ করে পেয়ালা ভেঙে গেল। রেকাবির ফল গড়িয়ে পড়ল।

নওফেল বুকে দুহাত রেখে কয়েক মুহূর্ত ছটফট করলেন। তারপর তাঁর শরীর ধনুকের মতো বেঁকে আবার সোজা হল। লাল চোখ দুটি ভয়ংকরভাবে ঠেলে বেরিয়ে এল।

লায়লা স্তম্ভিত। হক্‌চকিত। নিস্পন্দ। বাক্‌শূন্য। জিন্দানের মৃত্যুতে অভিশাপ দিয়েছিল সে। মনে পড়ে গেছে।···

হঠাৎ বাসরঘরের অন্য প্রান্তের পর্দা তুলে বেরিয়ে এল বাঁদী আফ্‌রা। সে লায়লার হাত ধরে টেনে ওঠায়। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় বলে— চুপ্‌।

লায়লা দুঃস্বপ্নের ঘোরে পা ফেলতে থাকে। তাকে অন্য দরজা দিয়ে টেনে নিয়ে যায় আফ্‌রা। উৎসব-ক্লান্ত প্রাসাদ ঝিমোচ্ছে। প্রহরীরা স্তম্ভে ও দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছে।

শাহী উদ্যানে পেঁছিয় ওরা। মর্মরফোয়ারার আড়াল থেকে বান্দা হাব্বা সামনে আসে। তার সঙ্গে আছে লায়লার কুকুর ওল্জা। ওল্জা বধূবেশিনী লায়লার পা ছোঁয় নিঃশব্দে।

উদ্যানের গোপন দরজার দুধারে দুই প্রহরী চিত হয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। তাদের বুকে একটা করে তীর বিঁধে আছে।

লায়লা লক্ষ্য করে, হাব্বা সশস্ত্র। তার পিঠে তূণীর, কাঁধে ধনুক, হাতে বিশাল খঞ্জর।

নির্জন পথের সমান্তরালে ছোট-ছোট টিলার পাদদেশ জুড়ে অজস্র পাথর। মাঝে মাঝে একটা করে খেজুর গাছ। কাঁটাগুল্ম।

একখানে অন্ধকারে হাঁটু মুড়ে বসে ছিল একটা উট। উটের পিঠে তাঞ্জাম। আফ্‌রা বলে—ওঠ বেটি।

অস্ফুট স্বরে লায়লা বলে—কোথায় যাব আমরা মাসি ?

—আল-বাহরামে। যেমন করে হোক, কয়েসের সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দেব।

লায়লা আর আফ্‌রা তাঞ্জামে ওঠে! উট উঠে দাঁড়ায়। তার দড়ি ধরে পা বাড়ায় হাব্বা। ওজ্জা তাদের আগে আগে হাঁটতে থাকে। অন্ধকার রাতের প্রান্তরে দ্রুত এগিয়ে চলে এই ছোট্ট কারাভাঁ। আল-বাহরাম প্রায় দেড় দিনের পথ।

অপমানিত আল-বাহরামীরা এবং তাদের বাদশাহ আমর ফিরে চলেছেন স্বরাজ্যে।

উত্তরমুখে প্রচণ্ড রোদ পিঠে নিয়ে সারা বিকেল চলেছে তাঁদের কারাভাঁ এবং অশ্বারোহীরা। গয়েল পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেতে হবে। বাদশাহের ইচ্ছা হল, পথে কোথাও বিশ্রাম করেন। কিন্তু গয়েলে পেঁাছতেই সূর্য ডুবল। সান্ধ্য প্রার্থনা মগরেবের সময় তখন।

নহরের জলে অজু (প্রক্ষালন) করে প্রার্থনায় সমবেত হল সবাই। প্রার্থনার পর দেখা গেল, শাহজাদা কয়েস নেই।

খোঁজাখুঁজি শুরু হল চারদিকে। কোথাও কয়েস নেই। অদূরে দাহানা মরুভূমি। হতভাগ্য শাহজাদা যদি ওদিকে গিয়ে পড়ে, তাহলে সর্বনাশ! আর পথ খুঁজে পাবে না। সারা রাত মরুভূমিতে ঘুরতে হবে তাকে। তারপর সূর্য উঠলে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত প্রাণে মারা পড়বে।

উট এবং ঘোড়া নিয়ে মশাল জেলে বেরিয়ে পড়ে ওরা।

কিন্তু কোথায় শাহজাদা কয়েস ?

সারারাত খুঁজে ভোরবেলায় একে একে চারদিক থেকে ফিরে আসে আল-বাহরামীরা।

শোকাহত বৃদ্ধ বাদশাহ প্রার্থনা করেন—হে ঈশ্বর! কয়েসকে তোমারই করুণায় পেয়েছিলাম। তুমি তাকে দেখো।…

সারাদিন গয়েলে কাটিয়ে সূর্যাস্তের সময় আল-বাহরামী কারাভাঁ বিষণ্ণভাবে যাত্রা শুরু করে। দিন শেষের ম্লান আলোয় দূরে বালিয়াড়ির ওপর ফুটে ওঠে এক মিছিল—যেন কালো শোকবস্ত্র সবার গায়ে। উট এবং ঘোড়াগুলোকেও সেই শোকের রঙে কালো দেখায়। বড় ধীরগামী ওই মিছিল। পূর্বে দাহানা মরুভূমি জুড়ে আসন্ন রাত্রির হিম ছায়া ঘনিয়ে আসছে।

আর সেই ধীরগামী শোকার্ত মিছিলের শেষদিকে কারাভাঁর উষ্ট্রচালকরা

গম্ভীর স্বরে গাইতে থাকে 'হিদা'-সঙ্গীত। নৈশ মরুবায়ু বয়ে নিয়ে যায় দিগন্তে-দিগন্তে সেই শোকের বার্তা।

পরদিন সন্ধ্যায় গয়েলে দক্ষিণ থেকে এল আরেকটি ছোট্ট কাফেলা। কাফেলায় দুজন স্ত্রীলোক, একজন পুরুষ। নহরের ধরে নির্জন খর্জুরকুঞ্জের পাশে তাঁবু পড়ল তাদের।

লায়লার পরনে তখনও বধূবেশ। কিছুতেই সে এ বেশ খুলবে না। চঞ্চল পায়ে অন্ধকার খর্জুরকুঞ্জের ধারে একটা পাথর খুঁজে ফেরে সে। হাব্বা গেছে সরাইখানায় জ্বালানি আনতে। আফ্‌রা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত।

ওন্‌জা ইতস্তত ঘোরে। তারপর অস্ফুট শব্দ করে। লায়লা বলে—কী হল ওন্‌জা?

ওন্‌জা সেই পাথরটা শুঁকছে।

লায়লা বলে—ওরে ওন্‌জা! সোনা আমার! মানিক আমার!

পাথরে চুমু খায় লায়লা। তারপর হঠাৎ ঘুরে দেখে বাঁকা খেজুর গাছটির মাথায় চাদ উঠেছে। এ কি সেই শওয়ালের তৃতীয় তিথির চাঁদ? মরুভূমি থেকে হিম হাওয়া এসে খর্জুরকুঞ্জ মর্মরিত করে। লায়লা শোনে খর্জুর শাখায় উচ্চারিত হচ্ছেঃ

> 'ন্যুব্জদেহ খর্জুরশীর্ষের ওই ক্ষীণ চাঁদ
> যেন বা আসন্ন রাত্রি হরিণীর বেশে দাঁড়াতেই তার
> সোনালী উজ্জ্বল শিঙে বিদ্ধ হল
> কয়েসের হৃৎপিণ্ডখানি।
> কিন্তু তার চেয়ে আরও সুন্দর রাত্রির
> কথা শোন, কয়েস জেনেছে…'

লায়লা অর্ধস্ফুট স্বরে ভাববিহ্বলতায় বলে ওঠে—কয়েস! আমার কয়েস! আজই কি সেই তেসরা শওয়াল নির্জন খর্জুর বীথিতে আবার চুপি চুপি হাওয়া আসে মরুপ্রান্তর থেকে। শিহরিত নহরের জলে ঝিকমিক করে চন্দ্রকণা। পুষ্পোদ্যানের সৌরভ ওঠে চারপাশের অলীক গুলিস্তানে।

সহসা দূরে কোথায় প্রতিধ্বনির মতো অন্তর্বর্তী এবং গভীরতর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—লায়লা-আ! আয়লা—আ—আ!

চকিতা হরিণীর মতো উঠে দাঁড়ায় লায়লা। কে ডাকে তাকে নির্জন রাত্রির প্রান্তর থেকে?

আবার ডাক ভেসে আসে—লায়লা—আ—আ! লায়লা—আ—আ!

লায়লা চঞ্চল হয়ে পা বাড়ায়। আবার ডাক শোনে সে। দ্রুত হয় তার গতি। ওজ্জা তার নাগাল পায় না।

লায়লা সাড়া দিয়ে বলে—কয়েস! কয়েস!

মরুপ্রান্তরের দিগন্তে রাত্রির নক্ষত্র থেকে কি কয়েস তাকে ডাকে—লায়লা! লায়লা!

বধূবেশিনী লায়লা ছুটে চলে। তার কয়েস তাকে ডাকছে! আজ শওয়ালের তৃতীয় তিথিতে তার বাসরের ডাক এসেছে। লায়লা—আ—আ! লায়লা—আ—আ!

প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে যায় লায়লা। দেখে, দূরে বালিয়াড়ির শীর্ষে কয়েস দীপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কিছুতেই কয়েসের কাছে পৌঁছতে পারে না। ক্লান্ত লায়লা বলে—কয়েস! আমার কয়েস! এখনও তোমার কাছে পৌঁছোতে পারিনে কেন? আর কতদূর যেতে হবে কয়েস?

সারারাত লায়লা ছুটে বেড়ায় এদিক থেকে ওদিকে। কয়েসের মূর্তি ফুটে ওঠে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে—হাতে দীপশিখা। মুখে আহ্বান।

দাহানা মরুভূমিতে সূর্য উঠল।

লায়লা দেখল, কয়েস দাঁড়িয়ে আছে দূরে। ঝলমল করছে তার দ্যুতিময় শুভ্র দুলহানবেশ। লায়লা আবার পা বাড়াল।

দাহানা মরুভূমির সূর্য প্রখর হল। প্রখরতর হল।

তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যায়। লায়লা বলে—ও কয়েস! আর কত দূর!

কয়েস দূরে দাঁড়িয়ে শুধু ডাকে। লায়লা ছুটে চলে।

দাহানা মরুভূমির সূর্য মধ্য আকাশে প্রখরতম হয়। দুরন্ত লু হাওয়া ক্রমশ উন্মত্ত সাইমুমের রূপ নেয়। বালি ওড়ে। সেই ঝঞ্ঝার মধ্যে কয়েসের ডাক ভেসে আসে—লায়লা! লায়লা!

লায়লা সাড়া দিয়ে বলে—কয়েস! কয়েস!···

সারারাত ধরে দাহানা মরুভূমি পেরিয়ে মরূদ্যান গয়েলের দিকে আসছিল সওদাগরদের কাফেলা উটের কারাভাঁ নিয়ে। উটের দড়ি ধরে পায়ে হেঁটে আসছিল চালকরা। সমবেত কণ্ঠে 'হিদা' গাইছিল তারা।

শেষ রাতের আকাশে তখন ফুটে উঠেছে ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক এক উজ্জ্বল নক্ষত্র 'সোবেহ্-সাদেক।' শুকতারা।

হঠাৎ কারাভাঁর সামনের উট থমকে দাঁড়ায়। হিদার মুল গায়ক গান থামায়।

সঙ্গে সঙ্গে সারিবন্ধ উটগুলোও দাঁড়িয়ে যায়। নিশ্চল কারাভাঁর পিছন থেকে এক সওদাগর চিৎকার করে জানতে চায়, কী হয়েছে।

প্রথম উটের চালক জানায়, বোঝা যাচ্ছে না মালিক! মনে হচ্ছে, মানুষ কিংবা জানোয়ায়ের গন্ধ পেয়েছে কারাভাঁ।

এর কারণ হতে পারে, দ্বিতীয় কোন কাফেলা কাছাকাছি আছে অথবা বালির ঢিবির আড়ালে ওত পেতে রয়েছে বেদুইন ডাকাতরা।

উটের পিঠ থেকে সওদাগরদের সর্দার প্রচন্ড হাঁক মেরে সাংকেতিক আওয়াজ দেয়। উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে তিনবার। কাফেলা হলে সাড়া আসবে অন্য একটি সাংকেতিক আওয়াজে। সাড়া না এলে ভয়ের কথা। কাফেলারক্ষায় ঝটপট তৈরি হয়ে দাঁড়াতে হবে। সশস্ত্র রক্ষীদল ও বান্দারা সঙ্গে আছে।

কোন প্রত্যুত্তর এল না। তখন দ্রুত কারাভাঁকে অর্ধবৃত্তাকারে ব্যূহে সাজানো হল। বালির ওপর উটগুলো হাঁটু মুড়ে বসল। তাদের আড়ালে বসে পড়ল সবাই। হাতে-হাতে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই এবার বন্দুরা আওয়াজ দিতে দিতে ছুটে আসবে ঘোড়ার পিঠে।

কিন্তু মুহূর্তের পর মুহূর্ত চলে যায়। সোবেহ্-সাদেক উজ্জ্বলতর হতে থাকে। হিম মরুভূমিতে নিস্পন্দতা ঘন হয়। কিছুই ঘটে না।

শুধু উটগুলো বারবার নড়ে ওঠে। ছটফট করে।

কতক্ষণ কেটে যায় উত্তেজনায়। পিছনে পূর্বের দিগন্তে প্রত্যূষের রক্তিম আভা ফুটে ওঠে। ধূসর আলো ছড়িয়ে আসে ধীরে। সেই আলোয় ওরা এতক্ষণে দেখতে পায়, সামনে একটা অনুচ্চ বালির ঢিবি থেকে সাদা কিছু বেরিয়ে আছে।

একজন বান্দা ছুটে গিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করে। তারপর বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে। ভিড় করে ছুটে যায় অনেকে। জিনিসটা কোন ছোট্ট জানোয়ারের লেজ। লেজ ধরে টানতেই বেরিয়ে আসে একটা সাদা কুকুর। কুকুরের দাঁতে আটকা আছে একটুকরো কাপড়। কাপড়টা ঝকমক করছে।

কাল দুপুরের সাইমুমে কুকুর এবং তার হতভাগ্য প্রভু বালিতে চাপা পড়েছিল তাহলে। এক সওদাগর কাপড়ের টুকরোটা দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বলে—তাজ্জব! এ তো দেখছি শাদির দুলহিনের মেখরাব! বহুমূল্য হিন্দুস্তানী রেশমী কাপড়!

বান্দারা বালির ঢিবি সরাতে থাকে।

দুটি লাশ বেরিয়ে পড়ে। একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। দুজনেরই পরনে শাদির রত্নখচিত পোশাক। শাহজাদা-শাহজাদী ছাড়া এ দুলহান-দুলহিনের বহুমূল্য বসন-ভূষণ আর কার পরার ক্ষমতা আছে? এবং বিবর্ণ লাশেও এত

রূপের আভাস ! এই রূপবান ও রূপবতীর পরিচয় কী ? হঠাৎ শাদির মহফিল থেকে এমন করে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছিল এরা ?

ভোরের নমাজের পর সসম্মানে লাশ দুটিকে তারা উটের পিঠে তুলে নেয়। কালো কাপড়ে ঢেকে রাখে। কুকুরটিকেও এক বান্দা করুণা করে পিঠের ঝুড়িতে রাখে। গয়েলের দিকে আবার চলতে থাকে দীর্ঘ কারাভাঁ।…

কারাভাঁর উটের চালকরা আবার শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে হিদা গেয়ে উঠেছে। মূলগায়ক গাইছে, বাকি সবাই বুকে তিনবার করাঘাতে তাল দিয়ে ধুয়া ধরছে।…

'…পথের পাশে তাঁবু যেমন
তোমার পাশে আমি
তাঁবুর গায়ে টান লাগত
পথ তাকে টানত ।।
[ধুয়া ।। গুটাও তাঁবু, তাঁবু গুটাও, দেরি কিসের ?]

…আমি পাথর, নহর তুমি
ঝিরঝিরিয়ে বইতে
স্থির থাকাই আমার সুখ
টানলে কেন সখে
[ধুয়া ।। তাঁবু গুটাও, গুটাও তাঁবু, দেরি কিসের ?]

…অনেক দুঃখে কবর হলাম
জানি লাশ তো হবেই
মানবজন্মে এবার দেখ
আমি তোমায় টেনেছি ।।
[ধুয়া ।। তাঁবু গুটাও, তাঁবু গুটাও, দেরি কিসের ?]

…কয়েস বলে মৃত্যু নয় এ
প্রেমের অন্য নাম
অমরতা এ কবরেই
তোমার পরিত্রাণ ।।'
[ধুয়া ।। তাঁবু গুটাও, গুটাও, তাঁবু, দেরি কিসের ?]

প্রথম সূর্যের আলোর সামনে দীর্ঘ, দীর্ঘতর ছায়া ফেলে শবযাত্রায় রূপান্তরিত কারাভাঁ চলেছে গয়েল মরূদ্যানের দিকে।…

ইউসুফ ও জুলেখা

…'Behold, I have dreamed a dream more ;
And behold, the sun and the moon
And the eleven stars
Made obeisace to me.'
[The old Testament—Genesis : 37 : 9]

…'হে আমার পিতা ! একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে
দেখলাম আমার প্রতি প্রণামরত ।…'
[কোরআন শরীফ—সূরা ইউসুফ (১২) প্রথম অধ্যায় : চতুর্থ শ্লোক]

খ্রীস্টপূর্ব পাঁচহাজার অব্দের এক শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল ।

কেনান দেশের বেথেল তৃণভূমিতে যাযাবর পশুপালক জনগোষ্ঠীর কয়েকটি তাঁবু । তাঁবুগুলো ভেড়ার চামড়া জুড়ে তৈরি । তাঁবুর পাশে বিশাল খোঁয়াড় কাঠের বেড়ায় ঘেরা । ভেড়া, দুম্বা আর ছাগলের পাল শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে । একদল কুকুর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে । রাতে খুব শীত পড়েছিল । তাই গা গরম করার চেষ্টা । কয়েকটি গাধা বিষাদের প্রতীক হয়ে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে এদিক-ওদিকে ।

তাঁবুর সামনে কিছুটা তফাতে পাথর বাঁধানো একটি কূপে জল তুলছে স্ত্রীলোকেরা । তাদের কোমর থেকে হাঁটু অব্দি একটুকরো চামড়ার ঘাগরা এবং পিঠ ঘিরে আরেক টুকরো চামড়া কাঁধ থেকে নেমে এসে পুরো বুক ঢেকে রেখেছে । তাদের হাতে, গলায়, কানে, পায়ে বিচিত্র গয়না । মসৃণ করে ঘষা হাড়ের এবং শুকনো ঘাসের তৈরী । ঘাসের গয়নাগুলো নানা রঙে রাঙা ।

শুধু একজন স্ত্রীলোকের চেহারা ও বেশভূষা অন্যরকম ।

তার পরনে রঙীন তুলোর কাপড় । তার চেহারা চোখে না পড়ে পারে না । অন্য স্ত্রীলোকদের মতো দীর্ঘাঙ্গী নয় সে । গায়ের রং অমন রোদপোড়া বা তামাটে নয় । উজ্জ্বল সুপক্ক ফলের মতো ঈষৎ পীতাভ, ঈষৎ রক্তিম । নাকও অন্যদের মতো উদ্ধত বা তীক্ষ্ম নয়, কিছুটা টোলখাওয়া ডগা এবং হাল্কা মিঠে দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট । তার চোখ দুটি টানা-টানা, এবং চোখের তারা চলাফেরায় ওদের মতো রূঢ়তা নেই—বরং কোমলতা আছে এবং তা ছন্দময় । বয়সে সে যুবতী ।

এই যুবতীর নাম আদাহ ।

তার গায়ের গয়নাও লক্ষ্য করার মতো । গয়নাগুলো সোনা, ব্রোঞ্জ, তামা এবং লোহারও । এই যাযাবর পশুপালকগোষ্ঠীতে অবশ্য ওগুলোর আলাদা কোন মূল্যই নেই । বিস্ময় সৃষ্টি করে মাত্র ।

—আদাহ ! আদাহ । কোথায় তুমি ?

খোঁয়াড়ের একটি পাথর-বাঁধানো নালায় জল ঢেলে দিচ্ছিল এক প্রৌঢ়া । সে

ঘ্নরে তাঁব্নর দিকে তাকিয়ে একবার ভ্রূকুণ্ঠিত করে। তারপর আপন কাজে মন দেয়।

—আদাহ! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?

একটি তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর এক হাতে দীর্ঘ সিডারকাঠের লাঠি। অন্যহাত একটি বালকের কাঁধে। তাঁর শরীরটি সুবিশাল। তাঁবুর দরজার দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে গেছে।

আদাহ জলের শব্দে ডাক শুনতে পাচ্ছে না। তখন বালকটি দৌড়ে কূপের দিকে আসে। বলে—মা! ও মা! বাবা তোমাকে ডাকছেন!

আদাহ ঘুরে দেখে নিয়ে আস্তে বলে—যাচ্ছি। ইউসুফ! তুমি বাছা এই পাত্রগুলো ততক্ষণ পাহারা দাও। দেখো, যেন কেউ ভেঙে ফেলে না।

—মা, এগুলো তুমি তৈরি করেছ?

—হ্যাঁ, বাছা।

—কী দিয়ে, মা?

—মাটি দিয়ে।

—ভেঙে যাবে যে, মা! এ তো খুব নরম।

আদাহ পুত্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে—আগুনে পুড়িয়ে নিলে ভাঙবে না।

—মা, মা! বলে যাও না, এসব তুমি কোথায় শিখলে?

আদাহ যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ায়। ঘুরে সস্নেহে বলে—আমার বাবার দেশে। তোমাকে রোজ কত গল্প বলি না সে-দেশের?

—হ্যাঁ, যেখানে পাথরের ঘর আছে। ঘাসের শীষ থেকে রুটি নামে খাবার হয়।

বৃদ্ধ অধৈর্যভাবে প্রায় গর্জন করে উঠেছেন—আদাহ! তুমি এত অবাধ্য স্ত্রীলোক!

আদাহ তাঁর সামনে গিয়ে বলে—আপনার ছেলের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম। সব সময় ওর শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন! জবাব না দিলে সে-বেলা না খেয়েই থেকে যাবে!

একথায় বৃদ্ধ শান্ত হন। মুখে হাসি ফোটে। বলেন—হ্যাঁ, ইউসুফকে মাননীয় এব্রাহিমের ঈশ্বর অনুগ্রহ করেছেন। তুমি তো জানো, ওর জন্মের রাতে দেবদূত জিব্রিল আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, পয়গম্বর এব্রাহিমের মহান প্রভু সৃষ্টির ছ'ভাগ সৌন্দর্যের চারভাগ তুলে নিয়ে এই জাতককে দান করেছেন এবং বাকি দু'ভাগ আর সব জিনিসে রেখে দিয়েছেন।

আদাহ নতমুখে শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং পুত্রগর্বে আবেগাপ্লুত হয়ে বলে—মহাত্মা এব্রাহিমের ঈশ্বরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

বৃদ্ধ গোষ্ঠীপতি হঠাৎ চাপা গলায় বলেন—ভেতরে এস। তোমার সঙ্গে

গুরুতর গোপন কথা আছে, আদাহ।

দুজনে তাঁবুর মধ্যে ঢোকে। কোণার দিকে একখণ্ড পাথর। সেখানে বসে বৃদ্ধ ফিসফিস করে বলেন—ইউসুফ আবার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে! আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি, আদাহ। ওকে নিষেধ করেছি, যেন কারুর কাছে আর এ স্বপ্নের কথা প্রকাশ না করে।

শঙ্কিত দৃষ্টে আদাহ বলে—কী স্বপ্ন প্রভু?

—যেন সূর্য, চাঁদ আর একাদশ নক্ষত্র তার হুকুম তামিল করছে।

—এর অর্থ?

বৃদ্ধ একটু হাসেন।—ইউসুফ তো এরই মধ্যে 'স্বপ্নব্যাখ্যাকারী ইউসুফ' আখ্যা পেয়েছে! এখন যে-ই স্বপ্ন দেখে, ছুটে আসে ওর কাছে সে-স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিতে। ইউসুফ নিজের এই দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিজেই করেছে। আমার ভয় হচ্ছে, ওর দাদারা ওর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে ওঠে!

আদাহ বিষণ্ণভাবে বলে—রুবেন বাদে আপনার আর কোন ছেলেই আমার ইউসুফকে যেন পছন্দ করে না প্রভু!

—জানি আদাহ। তাই ওকে সব সময় চোখে-চোখে রাখি। ওদের সঙ্গে পশুচারণে যেতে দিই না। আর ইউসুফ আমার চোখের মণি আদাহ! ও সামনে না থাকলে আমার কাছে দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে যায়।

আদাহ নতমুখে সসংকোচে বলে—রুবেনের মা সে নিয়ে আমাকে কত পরিহাস করেন!

—করুক। তবু তুমি তাঁকে সহোদরা দিদির মতো দেখবে, আদাহ।··· বৃদ্ধ যষ্টিটি কোলে রেখে কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে বলেন—ইউসুফ বলছে, এ দ্বিতীয় স্বপ্নের মানে, রাজা, রাণী এবং তার এই এগারো ভাই তার অনুগত হয়ে গোলামী করবে।

আদাহ সবিস্ময়ে বলে—রাজা রাণী? কোন দেশের রাজা রাণী, প্রভু?

—জানি না আদাহ। ইউসুফ আর কিছু বলতে পারছে না।

—কিন্তু ওর প্রথম স্বপ্নে শুধু এগারো ভাইয়ের কথা ছিল!

—হ্যাঁ, এগারোটা আঁটি মাটিতে পড়ে ছিল এবং আর একটা আঁটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলোর মধ্যে।

—তা শুনে রুবেনরা খুব রাগ করেছিল!

—এবার শুনলে আরও বেশি রাগ করবে। তাই ওকে নিষেধ করেছি বলতে। তুমিও নিষেধ করে দাও।

—তাই দিচ্ছি, প্রভু!

—আর শোন আদাহ! তোমার বাবা মাননীয় এল্লন তাঁর নাতিকে এবার দেখতে চান। উর শহরে চর্বি বেচতে গিয়েছিল আমাদের জোয়াব। তাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন। ভাবছি, আজই ইউসুফকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। তুমি

কি যেতে চাও, আদাহ ?

আদাহ একটু চুপ করে থেকে মাথা দোলায়। অস্ফুটস্বরে বলে—না। আবার একটু পরে বলে—না প্রভু !

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—হুঁ। তোমাকে যেতে বলার ভরসা পাননি এল্লন। শুনেছি, তোমার ব্যাপার নিয়ে হিটাইটরা ওঁকে এখনও পরিহাস করে। ওরা নাকি বলে—সেমাইট অসভ্য যাযাবর গোত্রে মেয়ে দিয়ে এল্লন জাত খুইয়েছেন। অথচ পয়গম্বর এব্রাহিমের ঈশ্বর বলেছেন—সবাই আদমপুত্র। তোমার বাবা এল্লন এব্রাহিমের ধর্মে দীক্ষিত বলে ওঁকে শয়তানরা একঘরে করে রেখেছে।

আদাহ মিনতিপূর্ণ স্বরে বলে—একটা অনুরোধ প্রভু ! উরে গিয়ে আপনি দয়া করে এব্রাহিমের ধর্ম প্রচার করতে চেষ্টা করবেন না। আপনার প্রাণসংশয় হতে পারে। আপনি তো জানেন, আপনার বড়ভাই মাননীয় প্রভু এসাউকে তারা হত্যা করেছিল !

এইসময় তাঁবুর বাইরে থেকে কারা উত্তেজিতভাবে ডাকে—প্রভু ইয়াকুব ! মাননীয় ইয়াকুব ! শিগগির একবার বাইরে আসুন !

বৃদ্ধ যষ্টিটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আদাদ এল।

কয়েকজন পশুপালক এসেছে তৃণভূমির অন্যপ্রান্ত থেকে। আর সব তাঁবু থেকেও লোকেরা বেরিয়ে এল। একটু দূরে ক্ষয়াখবুটে ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একদল তরুণ গল্প করছিল। তারাও দৌড়ে আসে। তাদের বড়-বড় চুলে ঘাসের দড়ি জড়ানো এবং পাখির রঙীন পালক গোঁজা।

গোষ্ঠীপতি ইয়াকুব বলেন—কী হয়েছে বাল্‌কাদ্‌ ?

বাল্‌কাদ্‌ নামে প্রৌঢ় পশুপালক বলে—প্রভু ! জোর্দান নদী পেরিয়ে একদল নেকড়ে এসেছে। পাহাড়ে লুকিয়ে আছে। আমার ভাই জিল্‌কাদ্‌ দেখেছে। আমাদের কিছু লোক দরকার। নেকড়েগুলোকে খেদিয়ে জোর্দানের ওপারে রেখে আসতে হবে।

ইয়াকুব কিছু বলার আগে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত রুবেন বলে—এ জন্যে এত ভয় পাবার কী আছে ? পাহাড়ে নেকড়েরা বরাবর আসে।

ইয়াকুব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—চিন্তার কারণ নেই। আমরা মহান পুরুষ এব্রাহিমের অনুগৃহীত সম্প্রদায়। বাল্‌কাদ্‌ একটু অপেক্ষা করো। জোহানুস কোথায় ? জোহানুস ?

দৈত্যাকৃতি এক যুবক সাড়া দিয়ে বলে—বলুন প্রভু !

—শিঙায় ফুঁ দাও। বেথেলের চারদিকে চারবার ফুঁ দিয়ে সংকেত করো।

একটু দূরে একটা টিলার শীর্ষে সমতল পাথরের চত্বর দেখা যাচ্ছে। এক-প্রান্তে একটা উঁচু পাথর বেদীর মতো রয়েছে। ওখানে এরা এব্রাহিমের ঈশ্বরের

উদ্দেশে প্রার্থনা করে। জোহান্‌স একটা ভেড়ার শিঙে তৈরি প্রকাণ্ড শিঙা নিয়ে দৌড়ে যায় টিলাটার দিকে।

একটু পরে শিঙা বেজে ওঠে। বেথেল তৃণভূমির এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত সচকিত হতে থাকে।

'…ইউসুফকে হত্যা করো, কিংবা নির্বাসিত
তাহলে পিতার দৃষ্টি তোমাদের প্রতি
নিবন্ধ থাকবে, আর অতঃপর
তোমরাই হবে তাঁর সুসন্তান, জেনো॥'

[কোরআন শরীফ—সুরা ১২, অধ্যায় ২ শ্লোক ৯]

'…Behold, the dreamer cometh.
Come now therefore, and let us
Slay him…'

[The old Testament—Genesis : 37 : 19-20]

বালক ইউসুফের চোখে মায়ের কাছে শোনা উর শহরের ছবি ভারি অস্পষ্ট। এই বিশাল তৃণভূমিতে তার জন্ম। মাথার ওপর অসীম নীলাভ আকাশ। সে দেখেছে সবুজ তৃণে টিড্ডি ফড়িঙের অবাধ নাচ। শান্ত পালিত পশুপাল মেঘের মতো শব্দহীন ছড়িয়ে পড়ে দূরে এবং কাছে। দেখেছে রাত্রির নক্ষত্রপুঞ্জে ফেরেশতাদের রহস্যময় সঞ্চরণ। জ্যোৎস্নায় পরিব্যাপ্ত প্রান্তরে কোন রাখাল সিডার কাঠের বাঁশী বাজায় আপন মনে। কোথায় দূরে আগুনের সামনে বসে কারা চাপা স্বরে কথা বলে। তার পৃথিবী এই সব জিনিস দিয়ে গড়া।

তিন দিন তিন রাতের পথ উর শহরে গিয়ে সে অবাক হয়েছে। পাথরের ঘর, ভেড়ার পালের মতো মানুষের ভিড়, অদ্ভুত পোশাক-আশাক, রথ নামে চাকা লাগানো গাড়ি এবং তা ঘোড়া নামে জানোয়ার টেনে নিয়ে যায়—বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

আর ইয়াকুব ভেবেছিলেন, হিটাইটরা* তাঁকে অপমান করবে। কিন্তু ইউসুফকে দেখে কী যে ঘটে গেল ওদের মধ্যে! পিতাপুত্রের আদরের সীমা

* হিটাইটরা আর্যদেরই একটি গোষ্ঠী। [ডঃ ডি ডি কোশাম্বীর ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি দ্রষ্টব্য] ওল্ড টেস্টামেণ্টে অবশ্য বলা হয়েছে, ইয়াকুবের যমজভাই এসাউ হিটাইট এলনের কন্যা আদাহ্‌কে বিয়ে করেছিলেন। [জেনেসিস পর্ব ঃ অধ্যায় ৩৬ ঃ শ্লোক ২]

নেই। মহামতি এল্লনও খুশি হলেন। নাতিকে নিয়ে গেলেন গোষ্ঠীপতির কাছে। গিয়ে বললেন—হে আর্যপতি! বলুন তো এই বালককে সেমাইট মনে হচ্ছে নাকি?

—এল্লন! এ বালক তোমার কন্যা আদাহ্-এর বাল্যের প্রতিমূর্তি। এর কপালে আশ্চর্য সুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি! তোমার নাতি সেমাইটদের রাজা হবে দেখে নিও।...

মুগ্ধ আর্যপতি ইউসুফকে একটি বর্ণাঢ্য জামা উপহার দিলেন। ইয়াকুবকে দিলেন একটি লোহার ভল্ল।—হে সেমাইট নায়ক! তোমার পিতামহ মাননীয় এব্রাহিমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই লোহার ভল্ল তোমাকে উপহার দিলাম। আশা করি, তুমি এ দিয়ে তোমার পশুপালকে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবে।...

তারপর দুদিন ধরে আদর-আপ্যায়নে কাটিয়ে ইয়াকুব ছেলেকে নিয়ে বেথেলে ফিরে আসছেন। প্রচুর উপহার সামগ্রীর চাপে গাধা দুটির অবস্থা করুণ। দুজনে হেঁটে আসছেন এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তাঁরা এখন চলেছেন দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কেনান অভিমুখে।*

দুদিন পরে তাঁরা একটি পাহাড়ের গুহায় রাত্রিবাস করছেন। ক্লান্ত ইউসুফ ঘুমিয়ে পড়েছে। আগুনের কাছে বসে লকড়ি গুঁজে দিচ্ছেন ইয়াকুব। তাঁর ঢুলুনি চেপেছে। গাধা দুটো গুহার মুখে বাঁধা রয়েছে। আগুন নিভে এসেছে, হঠাৎ ইয়াকুব দেখলেন গুহা আলোয় ভরে গেল। গাধা দুটো কান খাড়া করেছে। বাইরে থেকে উজ্জ্বল আলোর ছটা এসে গুহায় ঢুকছে।

ইয়াকুব বেরিয়ে গেলেন।

তারপর দেখলেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াকুব দ্বিধা ও সংশয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকেন।

পিতা ইস্‌হাকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি সফল হতে চলেছে কি?

জ্যোতির্ময় মূর্তি গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলেন—হে মাননীয় পয়গম্বর এব্রাহিমের পৌত্র ইয়াকুব! তোমার জন্য স্বর্গলোক থেকে সুসমাচার এনেছি। আমি ফেরেশ্‌তা জিব্রিল!

ইয়াকুব কোনমতে উচ্চারণ করেন—বলুন মাননীয় জিব্রিল!

—পরম প্রতিপালক, নিখিলের বিচারকর্তা, মহামহিমময় ঈশ্বরের আদেশ শোন ইয়াকুব! আদেশ শোন সেই নিরাকার সৃজনকর্তার—যিনি এব্রাহিমকে বলেছিলেন, তোমার বংশধরগণের মধ্যে বারংবার আমি মনোনীত করব আমার সংবাদবাহক (পয়গম্বর)।

---

* এখন যেখানে ইজরায়েল বা ঈস্রায়েল রাষ্ট্র, সেখানেই ছিল কেনান। আদি বাইবেলে ইয়াকুবের অপর নামও ইস্রায়েল। উর অবস্থিত ছিল বর্তমান ইরাকে টাইগ্রিস নদীর ধারে। পরে সেমিটিক জাতি হিটাইটদের কাছ থেকে উর দখল করে নেয় এবং সুমের সভ্যতা পত্তন করে।

এই শুনে ইয়াকুব নতজানু হন এবং নতমস্তকে অবস্থান করেন।

—অতঃপর তোমার প্রতি এই সুসমাচার ইয়াকুব, তুমি এই বেথেলে প্রতিষ্ঠা করবে এক সুন্দর নগরী। কারণ, এখানেই ঈশ্বর পাঠাবেন এক গৌরবান্বিত পয়গম্বরকে, তোমারই উত্তরপুরুষ তিনি এবং কুমারী মাতার গর্ভজাত সন্তান, এবং কোন আদম পুত্রই তাঁর জনক নয়। তাঁর নাম হবে পয়গম্বর ইসা মসীহ (যীশু খ্রীষ্ট) এবং বেথেল নগরী পরিচিত হবে বেথেলহেম নামে।

—আদেশ পালিত হবে, মহাত্মা জিব্রিল!

—আর শোন ইয়াকুব! তোমার কনিষ্ঠ সন্তান ইউসুফকে ঈশ্বরের কাজে প্রয়োজন হবে। সে যদি স্বেচ্ছায় পশ্চিমে গমন করতে চায়, কদাচ বাধা দিও না। কারণ ঈশ্বরের কাছে এই বালক বন্ধকপ্রাপ্ত।

বিচলিত বিস্মিত ইয়াকুব বলেন—এর অর্থ কী সম্মানিত দেবদূত?

—আত্ম-বিস্মৃত গোষ্ঠীপতি! আদাহ নামক নারীকে লাভ করার জন্য তুমি কি প্রার্থনা কর নি করুণাময় ঈশ্বরের কাছে? যে বয়সে আদমপুত্ররা (মানুষ) জন্মদানের ক্ষমতারহিত, সেই বয়সে আদাহকে পেয়ে তুমি তার গর্ভে সন্তান কামনা কর নি ইয়াকুব! তখন ঈশ্বর বলেছিলেন—তাই হোক। তবে এ জাতক আমার কাছে থাকবে বন্ধকস্বরূপ।

হজরত ইয়াকুব শিহরিত হয়ে বলেন—হা ঈশ্বর! তাহলে কেন এ বয়সে ওর প্রতি এত স্নেহের উদ্রেক করেছ?

ফেরেশতা জিব্রিল গর্জন করে বলেন—সাবধান ইয়াকুব! পরম প্রতিপালকের কাছে কৈফিয়ত দাবি কোরো না। তিনি নিজের কাজের কোন কৈফিয়ত দেন না। বস্তুত তাঁর সব কাজই অনন্ত রহস্যে আবৃত।…

তারপর খরতর বইতে থাকে নিশীথ রাতের এক হঠকারী ঝঞ্ঝা। দেবদূতের অগ্নিবর্ণ ডানার সঞ্চালনে বিদ্যুৎ ঝলসায় এবং মুহুর্মুহু বজ্রপাত হয়। আতঙ্কে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়েন ইয়াকুব। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ শোনেন।

কিছুক্ষণ পরে ঝড় থেমে যায়। বৃষ্টিও থামে।

আস্তে-আস্তে মুখ তোলেন ইয়াকুব। তারপর উঠে বসেন। ঘন অন্ধকার মনে হয় কিছুক্ষণ। তারপর লক্ষ্য করেন গুহার মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের পাশেই তিনি বসে আছেন।

তাহলে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন? ইয়াকুব হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখে চলে যান। নিচে বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে দীর্ঘ এক সিডার গাছের শীর্ষে। জিব্রিলের তির্যক্ ডানার মতো চাঁদ। গাছের পাতা থেকে তখনও বৃষ্টির সঞ্চিত জল ঝরছে।

অঞ্জলি প্রসারিত করে হজরত ইয়াকুব প্রার্থনা করতে থাকেন কতক্ষণ। তারপর প্রার্থনা শেষ হলে ঘুমন্ত ইউসুফকে জাগিয়ে তখনই গাধাদুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

পরদিন যখন তাঁরা বেথেলে পৌঁছলেন, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কূপের ধারে পৌঁছতেই সবাই দৌড়ে আসে। আদাহ এবং তার সতীন জিল্পাহ তাঁদের পায়ে জল ঢেলে দেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। সবার দৃষ্টি ইউসুফের জামার দিকে। ওরা অস্ফুট স্বরে প্রশংসা করতে থাকে। তরুণরা দূরের চারণভূমি থেকে ফিরে আসে কিছুক্ষণ পরে। তাঁবুর সামনে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়। ইয়াকুব উর শহরের গল্প শোনান। তারপর গম্ভীর মুখে ঘোষণা করেন ঈশ্বরের আদেশের কথা। বয়স্করা তা নিয়ে আলোচনা শুরু করলে তরুণরা চলে আসে সেখান থেকে।

ওদের প্রিয় আড্ডার জায়গা সেই ডুমুর গাছের তলা।

সেখানে ওরা নিজেদের জন্যে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে। গোল হয়ে বসে। রুবেন বলে—হুজ! ইউসুফকে নিয়ে আয় না! ওর কাছে আমরা আসল ব্যাপারটা জেনে নিই।

মেজ হুজ বাঁকা মুখে বলে—মায়ের আদরের ছেলে মায়ের কোলে দুধু খাচ্ছে। আসবেই না!

তার অন্য ভায়েরা হাসে। আবরাহ বলে—সেরা ভেড়াটার দুধে ইউসুফের পোষায় না। তাই ছোট মা···

বড় ভাই রুবেন ধমক দিয়ে বলে—ছিঃ আবরাহ! বলে না!

হুজ গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে। সে বলে—দাদা, ইউসুফ আমাদের সর্বনাশ করবে দেখবি! বাবা তো আমাদের দেখতেই পান না···ইউসুফ ছাড়া আর যেন কোন ছেলেপুলেই নেই বাবার!

—কেন ওকথা বলছিস, হুজ?

একটি ছেলে হাসতে হাসতে বলে—ইউসুফের জামা দেখে হুজের চোখ জ্বলে গেছে রে!

হুজ গর্জে ওঠে—আলবাৎ গেছে! কেন যাবে না! ওর জন্যে জামা—আর আমাদের জন্যে কী? আমি বলেছিলাম মাছের হাড়ের কয়েকটা তীর আনতে! এনেছেন বাবা?

তার আরেক ভাই বলে—আমি বলেছিলাম সিংহের হাড়ের বর্শা আনতে।

অন্য একজন বলে—কই এনেছেন আমার রঙীন পাথরের মালা?

—নেকড়ের হাড়ের ছুরি কোথায়?

—অজগরের চামড়ার কোমরবন্ধ?

হল্লা থামিয়ে রুবেন বলে—থাম্, থাম্ তো তোরা! দুটো গাধার পিঠে অনেক কিছু চাপিয়ে এনেছেন। তাঁবুর মধ্যে সব রাখা হয়েছে। সকালে বাবা সবাইকে বিলি করবেন। ভাবিস না। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ। হোন্নাজ! যা তো ভাই, ইউসুফকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে। গল্প শোনা যাক।

হোন্নাজ উঠে যায়। হুজ গজগজ করে—দাদা রুবেন! বলছি, ইউসুফ

আমাদের সর্বনাশ করবে ! পালের সব সেরা জানোয়ারগুলো সে পাবে, আমরা পাব রোগা হাড়জিরজিরেগুলো। এবার বাবা ঠিক যা করেছিল, এই বুড়ো ঠিক তাই করবে !

আবরাহ ওকে সায় দিয়ে বলে—ওর বয়সের কত আগে আমাদের পাল চরাতে পাঠিয়েছিলেন বাবা। আর দেখ, ও এত বড়টি হল—ওকে পাঠান না। দিব্যি গায়ে হাওয়া দিয়ে ঘুরছে। মায়ের কোলে বসে দুধ খাচ্ছে। বাবার কোলে বসে দুম্বার কাবাব খাচ্ছে ! বাঃ ! আছে ভাল।

আহাব নামে চতুর্থ ভাই বলে ওঠে—আর স্বপ্ন ! স্বপ্নওয়ালার সেই স্বপ্নটার কথা ভুলে গেলি তোরা ? ঘাসের আঁটির কথা ?

হুজ ফুঁসে ওঠে।—বল্ দাদা, এবার বল্ ? আমাদের এগারোটা ঘাসের আঁটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, আর ইউসুফেরটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রুবেন হাসবার চেষ্টা করে বলে—সে তো স্বপ্ন ! ইউসুফ ভারি মজার-মজার স্বপ্ন দেখে।

এই সময় হোন্নাজ ইউসুফকে নিয়ে এসেছে। ইউসুফের কানে কথাটা যেতে সে রুবেনের পাশে ধুপ করে বসে বলে—দাদা ! ও দাদা রুবেন ! আমি আরও একটা স্বপ্ন দেখেছি। বাবা বারণ করেছেন, নয়তো বলতাম।

রুবেন বলে যাক, তাহলে বোলো না।

আবরাহ ইউসুফকে খোঁচায়।—বুড়োরা কত কী বলেই থাকে ! বল না ইউসুফ, কি স্বপ্ন দেখেছিস ? আহা, বল্ই না ! বাবাকে তো আমরা কেউ বলতে যাচ্ছিনে !

রুবেন সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর মুখে বলে—এখানে আমরা বারো ভাই ছাড়া আরও ছেলে আছে। আমাদের ছোট ভাইয়ের স্বপ্নের কথা তাদের শোনানো উচিত নয়। সারা বেথেলের মাঠে-মাঠে রটে যাবে। বাবার কানে যাবে।

হুজ আদেশের সুরে বলে—আমরা বনি-ইব্রাহিম (ইব্রাহিম বংশ) ছাড়া বাইরের যারা আছ, চলে যাও।

তাদের মা জিল্পাহ-এর বোন বিল্লাহ-এর ছেলেরা করুণ মুখে বলে—আমরাও যাব ?

—হ্যাঁ।…হুজের কড়া হুকুম।

ক্ষুব্ধ মুখে চলে যায় একদল তরুণ। গোষ্ঠীনেতার ছেলেদের হুকুম। কিছু করার নেই।*

---

* এরা সবাই পরস্পর রক্তের সম্পর্কে জড়িত। হজরত এব্রাহিম ছিলেন কেনানের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর নেতা। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইস্হাক—ইয়াকুবের পিতা যিনি, এই কেনান অঞ্চলে গোষ্ঠীপতি হন। আর কনিষ্ঠপুত্র ইসমাইল—যাঁকে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি দিতে গিয়েছিলেন এব্রাহিম, তিনি চলে যান দক্ষিণে আরব অঞ্চলে।

রুবেন আসলে কৌতূহলী হয়েছিল। আবার কী স্বপ্ন দেখেছে ইউসুফ?

ইউসুফ সরলমনা ছেলে। সে অকপটে স্বপ্নটা শুনিয়ে দেয় এবং স্বভাবমতো ব্যাখ্যাও করে ফেলে।

এগারোজন তরুণ চুপচাপ বসে থাকে। আগুন নিভে যেতে থাকে। তৃণভূমি থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। কতক্ষণ পরে রুবেন বলে আবরাহ! লকড়ি গুঁজে দে। শীত করছে।

দশটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ইউসুফের মুখের ওপর পড়েছে—অঙ্গারের লাল ছটায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে মুখগুলোকে। ইউসুফের দৃষ্টি নক্ষত্রের দিকে। ঠোঁটের কোণায় শান্ত হাসি। স্তব্ধতা লক্ষ্য করে সে এবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে—দাদা! রুবেনদাদা! আমি রথ দেখেছি। ঘোড়া দেখেছি।

কেউ জানতে চায় না রথ কী, ঘোড়া কী। শুধু রুবেন অন্যমনস্কভাবে বলে—হুঁ!

—আমি আপেলের বাগান দেখেছি, দাদা রুবেন।

কেউ কোন কথা বলে না। এই সময় আদাহ-এর ডাক শোনা যায়—ইউসুফ! ইউসুফ!

ইউসুফ বলে—আমি এখন যাব না মা। দাদাদের সঙ্গে কথা বলছি।

আদাহ এগিয়ে আসে। হাতে চর্বির পিদিম।—অনেক পথ হেঁটেছ। এখানকার মতো গল্প থাক বাছা। কাল করবে। এস, শুয়ে পড়বে।

—এখন আমার ঘুম আসবে না মা! তুমি যাও!

তাঁবুর পেছন দিকে জিল্‌পাহ পাথরের উনুন আস্ত ভেড়ার কাবাব

সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচহাজার বছর পরে জ্যেষ্ঠ ইস্‌হাকের বংশে কেনানের এই বেথেলহেমে আবির্ভূত হন পয়গম্বর ইসা বা যীশু ন্যাজারেথে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন।

তার আরও প্রায় পাঁচশো বছর পরে আরবে কনিষ্ঠ ইসমাইলের বংশে আবির্ভাব ঘটে পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের।...

হজরত ইয়াকুবের সময় তখন দক্ষিণ ইরাকে টাইগ্রিস নদীর ধারে সুমের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কৃষিকেন্দ্রিক নগরসভ্যতার পত্তন করেছে হজরত এব্রাহিমেরই জ্ঞাতিরা। পূর্বপুরুষ পয়গম্বর নুহ্‌ নোয়ার তিন পুত্রের অন্যতম ছিলেন সেম। সেমের বংশধররা ছড়িয়ে পড়েন কেনান থেকে দক্ষিণে আয়ব পর্যন্ত। এঁরাই সেমাইট। এই সেমাইটদের কয়েকটি গোষ্ঠী গড়ে তোলেন সুমের সভ্যতা—আসিরিয়া, ব্যাবলনিয়া। তাঁদের কিছু কিছু শাখা পশুপালক হিসেবেই থেকে যায় উত্তর ও পূর্বের তৃণাঞ্চলগুলিতে। এঁদের নেতৃত্ব করেছেন নিরাকার একেশ্বরবাদী এব্রাহিম। সুমেরে তাঁর জ্ঞাতিরা কিছু পৌত্তলিক হয়ে ওঠে। এব্রাহিম বহুবার জ্ঞাতিদের ওপর হামলা করে তাঁদের দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দেন। তাঁর পৌত্র ইয়াকুবের সময় পশুপালক একেশ্বরবাদীদের আর সে জোর ছিল না। তাঁরা কোণঠাসা হয়ে তৃণাঞ্চলে জীবন কাটাচ্ছিলেন। আদিকাণ্ড বাইবেল এবং কোরানের এইসব কাহিনীকে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ইতিহাসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ওদিকে হজরত ইয়াকুবের যুগেই মিশরসভ্যতা তখন উন্নতির শেষ পর্যায়ে পেঁছিছে। এই কাহিনীর সঙ্গে তা জড়িত। দুর্ভিক্ষের বছর তাঁরা মিশরে যান। পরে নতুন নেতা মোজেস ইস্রাইলীদের দিয়ে কেনানে পালিয়ে আসেন।

বানাচ্ছে। সে ডাক দেয়—ওগো এল্লনের বেটি! এদিকে একবার আসবে? কুকুরগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে!

প্রৌঢ়া সতীনের উদ্দেশে যুবতী আদাহ পরিহাস করে—দেখো দিদি! তোমাকেই না খেয়ে ফেলে!

—এগারোটা সিংহের মা আমি!…জিল্পাহ পাল্টা কৌতুকে বলে।

আদাহ হাসতে হাসতে এগিয়ে যায় তার কাছে। তাঁবুর সামনে বয়স্করা এখনও কথা বলছে। ইয়াকুব গম্ভীর মুখে বসে আছেন। ক্ষুব্ধ। এরা বেথেল নগরী গড়ার কথা শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। উর থেকে লোক আসবে, তারাই সব করবে। ভাল কথা। কিন্তু তাদের মজুরী দিতে জানোয়ারের পাল যে বিকিয়ে যাবে! আর যবঘাসের শীষের কথা বলছেন ইয়াকুব? দূর, দূর! আমরা কি ভেড়া, না দুম্বা, না ছাগল যে ঘাসের শীষ খাব? তবে ফলের গাছটাছ লাগানো যায়। কিন্তু এত সব জানোয়ার যাদের, তাদের গাছপালা বাঁচিয়ে রাখা এক কঠিন সমস্যা নয় কি? সব মুড়িয়ে খেয়ে নেবে। কাঠের বেড়া দিতে হলে কাঠ আনতে ছোটো সেই জোর্দান নদীর ওপারে। বড্ড খাটুনির ব্যাপার। তাছাড়া বেথেলের সব ঘাস একদিন ফুরিয়ে যাবে, তখন পশুগুলো খাবে কী? পাথরের ঘর ফেলে অন্য কোথাও চলে যেতেই হবে।

তৃণভূমি থেকে কনকনে হাওয়াটা বাড়ছে। একে-একে সবাই ওঠে। যে-যার তাঁবুতে গিয়ে ঢোকে। জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে গেছে। সকালে মেয়েরা যাবে ঝাউবনে গুল্ম কাটতে।

এ-রাতে ইয়াকুবের তাঁবুগুলো কেমন স্তব্ধ।

ইয়াকুব গম্ভীর। ছেলেদের নিয়ে খেতে বসলেন। ছেলেরাও গম্ভীর। শুধু ইউসুফ তার মায়ের কাছে উর শহরের গল্প বলছে। আদাহ তাকে থামিয়ে দিচ্ছে—জানি বাবা, জানি। আমাকে তুই আমার বাপের দেশের কথা শোনাচ্ছিস? চুপ করে ঘুমিয়ে পড় তো।

অনেক রাতে শোনা যায় আদাহ গুনগুন করে গান গেয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

হজরত ইয়াকুবের প্রার্থনা শেষ হয়নি তখনও।

বাইরে ঘন কুয়াশা। প্রচণ্ড হিম। খোঁয়াড়ের রক্ষী কুকুরগুলো ভেড়ার লোমের আরাম নিচ্ছে। হঠাৎ কর্কশ চিৎকার করে ওঠে গাধাগুলো। স্তব্ধতা চিড় খায় কয়েক মুহূর্ত।…

কখন ইয়াকুব প্রার্থনার আসনেই শুয়ে পড়েছেন।

তারপর একসময় ভোর হল।…

আবার বেথেল তৃণভূমিতে একটি দিন এল। জানোয়ারের ক্ষুরের দাপটে টিড্ডি ফড়িং-এর ঝাঁক উড়তে থাকল। এসব ফড়িং মানুষের খাদ্য। ইয়াকুবের পাল নিয়ে তাঁর এগারো ছেলে চলেছে দূর চারণভূমিতে।

টিলার ওপর সমবেত প্রার্থনার বেদীতে বসে হজরত ইয়াকুব ভাবছিলেন, পালের শ্রেষ্ঠ দুম্বাটি বলি দিতে হবে ঈশ্বরের উদ্দেশে। মনোবল হারিয়ে ফেলেছেন। আজকালের মধ্যেই সারা কেনান ঘুরে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে বেরুবেন।

ভাবতে-ভাবতে ধ্যানস্থ হলেন ইয়াকুব।

কতক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙল ইউসুফের ডাকে। দেখলেন, ইউসুফ হিটাইট গোষ্ঠীপতির দেওয়া জামাটা গায়ে দিয়ে প্রার্থনার চত্বরে এসে পড়েছে।

—ইউসুফ! ইউসুফ! বাছা, এ এব্রাহিমের ঈশ্বরের স্থান। তুমি ওই জামাটা পরে এখানে ঢুকো না। ওটা বিধর্মীর জিনিস!

ইউসুফ ভড়কে যায়। পিছু হটে। তারপর বলে—এব্রাহিমের ঈশ্বর কি এখানেই থাকেন, বাবা? তুমিই তো বলো, তিনি আকাশে আছেন!

হেসে ফেলেন ইয়াকুব। তাকে নিয়ে চত্বর থেকে পাহাড় বেয়ে নেমে আসেন। তারপর বলেন—আমরা যেখানে তাঁকে ডাকি, তিনি সেখানে আসেন।

অন্যমনস্ক বালক বলে—আমি তোমাকে খুঁজছিলাম!

—কেন বাছা?

—আমার দাদাদের সঙ্গে মাঠে যাব। মাকে বললাম—মা বলল, বাবার হুকুম নিয়ে এস।

—কিন্তু তোমার দাদারা তো চলে গেছে কখন!

—দাদা আবরাহ বলে গেছে পশ্চিমের মাঠে যাচ্ছে। আমি পশ্চিমের মাঠে গেলেই ওদের দেখতে পাব।

চমকে উঠলেন ইয়াকুব। দেবদূত জিব্রিলের কথা মনে পড়ল। কম্পিত স্বরে বললেন—ইউসুফ! তোমার দাদারা রোদে-হাওয়ায় ঘুরে অভ্যস্ত। তোমার কষ্ট হবে, বাছা!

—না বাবা, আমি পশ্চিমের মাঠে যাব।

ইয়াকুব দ্বিধান্বিত। জিব্রিলের হুঁশিয়ারি মনে পড়ছে। ইউসুফকে জড়িয়ে ধরে আছেন। কাঁপছেন। ভাবছেন, ঈশ্বরের কোন কাজ সাধিত হতে চলেছে কি? কী সেই কাজ?

—আমি যাই। আমাকে একটা সিডার কাঠের লাঠি দাও, বাবা।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ইয়াকুব বলেন—দাঁড়াও এখানে। তোমার মা জানলে যেতে বারণ করবে। আমি পরে ওকে বুঝিয়ে বলব'খন।

বৃদ্ধ গোষ্ঠীপতি চঞ্চল পায়ে তাঁবুর দিকে যান এবং দ্রুত একটি লাঠি আর একটি জলপূর্ণ চামড়ার পাত্র এনে ইউসুফের হাতে দেন। ইউসুফ ছুটে যায় তৃণভূমির দিকে। ইয়াকুব সজল চোখে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকেন। তারপর চোখ বুজে বলেন—হে ঈশ্বর! মহামান্য এব্রাহিমের ইশ্বর! যে বস্তু তোমাতে আগেই সমর্পিত, তার ভালমন্দের দায়িত্ব তোমারই। আমেন···আমেন!···আমেন!···

ওদিকে বিশাল তৃণভূমির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত বালক তার দাদাদের খুঁজে বেড়ায়। পশ্চিমে এগিয়ে যায় ক্রমশ। কোথাও অনুর্বর রুক্ষ মাটি আর ছোট ছোট টিলা—কোথাও হলুদ ঘাসের জমি। দুপুর হয়ে গেছে। বিষণ্নমনে ইউসুফ দাঁড়িয়ে আছে একটা শীর্ণ গাছের তলায়। হঠাৎ চোখে পড়ল একজন লোক আসছে তার দিকে। লোকটা তার অচেনা। ইউসুফকে দেখে সে জিগ্যেস করল—কে তুমি? এখানে কী করছ?

ইউসুফ বলল—আমি হজরত ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফ। তুমি আমার দাদাদের দেখেছ?

লোকটা হাসল।—হ্যাঁ, দেখেছি। ওরা আছে দোথানে। এখান থেকে সামান্য দূর। সোজা পশ্চিমে চলে যাও। তাদের পাল দেখতে পাবে।

সে চলে গেল নিজের পথে। ইউসুফ ছুটে চলল পশ্চিমে। টিলার পর টিলা পেরিয়ে কিছুদূর থেকেই তার চোখে পড়ল ভেড়া, দুম্বা ও ছাগলের পাল চরছে একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। সে চিৎকার করে ডাকল—দাদা রুবেন! দাদা হুজ! দাদা আবরাহ!

ওরা দেখতে পেল ইউসুফকে। রুবেন সাড়া দিয়ে বলল—চলে আয় ইউসুফ। এখানে চলে আয়!

একটা প্রস্রবণের ধারে গাছের তলায় ওরা বসে আছে। ইউসুফ ক্লান্ত। টিলা থেকে নেমেছে প্রান্তরে। হঠাৎ হুজ চাপা গলায় বলে ওঠে—দাদা রুবেন! তুই চোখে কাপড় বেঁধে থাক। এ সুযোগ আমরা ছাড়ব না। ইউসুফকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।

রুবেন বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু ভীতু স্বভাবের যুবক। সে থরথর করে কেঁপে ওঠে। বলে—কী বলছিস হুজ?

হুজ দাঁত কিড়মিড় করে বলে—তুই বাধা দিলে তোকেও জবাই করে রেখে যাব।

—হুজ! হুজ! তুই কি ইউসুফকে খুন করবি?

হুজ হাড়ের ছোরা বের করে বলে—এমন সুযোগ আর পাব না। এব্রাহিমের ঈশ্বরের কাছে ওকে বলি দেব। ছোটদাদু ইসমাইলকে যেমন উনি বলি দিয়েছিলেন!

—হুজ! ইসমাইল বলি হয়নি। তাঁর বদলে একটা দুম্বা বলি হয়েছিল। তুই তো পয়গম্বর নোস হুজ!

—আমি পয়গম্বরের ছেলে।

হুজের চোখে হিংসা জ্বলজ্বল করছে। রুবেন ওর হাত ধরে বলে—শোন্ হুজ! ভাই হুজ, আমার একটা কথা রাখ। আমি তোদের দাদা! বরং ওর হাত পা বেঁধে ওই শুকনো কুয়োয় ফেলে দে। ওকে কোন প্রাণে খুন করবি, হুজ? এতে পাপ হবে—মহাপাপ!

আপসপন্থী আবরাহ এ প্রস্তাবে সায় দেয়। বলে—ঠিক কথা। খুনোখুনি করে কী হবে?

কথাটা হিংস্র হুজের ভাল লাগে। বলে—তা মন্দ বলিস্ নি। কুয়োর তলায় কষ্ট পেয়ে মরবে। বাঃ! তোর বুদ্ধি আছে দাদা। যন্ত্রণায় ছটফট করে মরবে শয়তানটা!

ধুরন্ধর আহাব বলে—কিন্তু বাবা যখন জিগ্যেস করবেন ওর কথা, কী জবাব দিবি?

বুদ্ধিমান হোনজা বলে—বরং একটা ভেড়া কেটে তার রক্ত ওর জামায় মাখিয়ে নিয়ে বাবাকে দেখাব। বলব, জোর্দান পেরিয়ে আসা সেই নেকড়ের হাতে ইউসুফ মারা পড়েছে।

হুজ বলে—বেড়ে বলেছিস তো! হুঁ—ভেড়াটা ঈগলে খেয়ে ফেলবে।

রুবেন প্রস্রবণে গিয়ে নামে। মুখ ফিরিয়ে গলা পর্যন্ত ডুবে বসে থাকে। আর ইউসুফ দৌড়ে এসে খুশিতে চঞ্চল হয়ে বলে—আমি এসে গেছি! আজ থেকে আমিও তোমাদের সঙ্গে পাল চরাব। বাবা বলেছেন…

আর কথা বলার সুযোগ পায় না হতভাগ্য বালক। হুজ হুংকার দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবরাহ তার জামাটা খুলে নেয়। সবাই মাথা থেকে ঘাসের দড়িগুলো পটাপট খুলে নিয়ে গিঁট দেয়। দড়িটা লম্বা হলে তারা ইউসুফকে মাটিতে ফেলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। ইউসুফ প্রথমে স্তম্ভিত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পরে হাসে। এ বুঝি একরকম খেলা।

তারপর হুজ তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়তে থাকে পশ্চিমদিকে।

এখানে একটা শুকনো প্রাচীন কূপ আছে পাহাড়ের পাদদেশে। তার একটু নীচে অন্য একটি ছোট উপত্যকায় একটি পথ। সেই পথে গাধা উট খচ্চর নিয়ে বিদেশীরা যাতায়াত করে।

কূপের মধ্যে ইউসুফকে ফেলে দিতেই এতক্ষণে সে কেঁদে ওঠে।–দাদা! এমন খেলা আমার ভাল লাগে না!

সেই কান্না সহ্য করতে না পেরে তার সৎভাইরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। হুজ পালে ঢুকে একটা বাচ্চা ভেড়া ধরে ফেলে। তারপর তার গলায় হাড়ের ছুরি চালিয়ে জবাই করে। আবরাহ ইউসুফের জামাটায় রক্ত মাখিয়ে নেয়।

রুবেন গাছের নীচে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে।

হুজ গিয়ে বলে, ন্যাকামি রাখ দাদা! এখনই পাল ডাকিয়ে নিয়ে এখান থেকে সরতে হবে। আর সেখান থেকে আবরাহ ফিরে যাবে বাবার কাছে। জামাটা দেখিয়ে বলবে, এই রক্তমাখা জামাটা কুড়িয়ে পেলাম মাঠে। তারপর জিগ্যেস করবে—দেখুন তো এটা কার জামা?

আবরাহ বলে—বাঃ! বুদ্ধি খুলেছে তোর! বাবা যদি বলেন, এটা ইউসুফের জামা—আমি বলব—সে কী! ইউসুফ বেচারা মাঠে গিয়েছিল বুঝি?

একা গেল কেন ? জোর্দান পেরিয়ে নেকড়ে এসেছে—আর জেনেশুনে তাকে একা ছেড়ে দিলেন ?

হোনজা হোহো করে হাসে।—হুঁ, উল্টে বাবাই দোষী হয়ে যাবেন !

হুজ শিঙায় ফুঁ দিয়ে পশু পালকে সচকিত করে। অন্যেরা লাঠি হাতে ছুটে যায় খেদিয়ে দিতে। দোথান উপত্যকা পেরিয়ে ওরা এগিয়ে যায় পূর্বে বেথেলের সমতলভূমির দিকে।

'...And it came to pass after
These things, That his master's wife
Cast her eyes upon Joseph ;
And she said,
Lie with me.'

[Old Testament—Genesis : 39 : 7]

'এবং দরজাগুলি বন্ধ করে দিল
সেই নারী, বলল—এসো !'

[কোরআন শরীফ : ১২ : ৩ : ২৩]

উত্তর-সুমেরের শুরুপ্পাক নগরী থেকে একদল শস্যব্যবসায়ী যাচ্ছিল মিশরে শস্য কিনতে। সোজা পশ্চিমে গেলে তাদের মরুভূমি পেরোতে হয়, তাছাড়া লোহিত সাগর ওদিকে গভীর—তাই তারা দোথান উপত্যকার সীমান্ত দিয়ে ঘুরে যাতায়াত করে। ভূমধ্যসাগর এবং লোহিতসাগরের সঙ্গমে মরাকোটালের সময় বিস্তীর্ণ চড়া জেগে ওঠে। পরবর্তীকালে পয়গম্বর মুসা বা মোজেস ওই পথেই মিশর থেকে ইস্রায়েলগোষ্ঠীকে নিয়ে কেনানে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের অনুসরণ করে এসে মিশরের ফ্যারাও বা ফেরাউনের বাহিনী বালির চড়ায় নামে এবং তখন আবার জোয়ারের সময় এসে গেছে। চড়ার মাঝপথে তারা ডুবে মরে সমুদ্রের জলে। ওদিকে মুসা নিরাপদে কেনানে পেঁৗছে যান।

সুমেরের সওদাগররা ওই পথেই মিশরে যায়। মরাকোটালের তিথি আসন্ন। তারা দোথানের কাছে এসে চামড়ার পিপেয় জল ভরে নেবে ভেবেছিল। আগের শীতে এপথে যাবার সময় তারা একটা কূপ দেখেছিল। সেই কূপ থেকে জল আনতে যায় তাদের লোক।

একদিন একরাত্রি ইউসুফ সেই কূপের তলায় কাটিয়েছে। পরদিন এসেছে সওদাগরের লোকেরা জল নিতে। জলের 'ডোল' নামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ডোল টেনে তোলার সময় খুব ভারি মনে হয়েছে। অবাক হয়ে তারা মুখ তাকাতাকি করেছে। কূপের তলায় অন্ধকার। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

দুজন লোক মিলে ডোল টেনে তুলেই তারা অবাক হয়ে বলে—এ কী! এ যে দেখছি এক বালক!

অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন বালক ইউসুফ দাঁতে ডোলের দড়ি কামড়ে ধরে আছে। তার হাত-পা বাঁধা। ওরা তার বাঁধনগুলো খুলে দেয়। জিগ্যেস করে—কে তুমি? এমন করে তোমাকে কূপে ফেলল কে?

আর বড় রূপবান এই বালক! খবর পেয়ে সওদাগররা ছুটে আসে। তারা কেউ কেনান বা বেথেলের গোষ্ঠীপতি ইয়াকুবের নাম শোনেনি।

তারা সবাই ওকে পেতে চায়। মায়ামমতা বা বাৎসল্য নিয়ে মাথাব্যথা করার লোক তারা নয়—তারা স্রেফ সওদাগর এবং প্রত্যেকেই এই সুন্দর ছেলেটিকে দেখে প্রলুব্ধ। একে বিক্রি করলে প্রচুর মুদ্রা হস্তগত হবে।

যে সওদাগরের লোকেরা তাকে কূপ থেকে তুলেছে, সেই তার ন্যায্য মালিক। সেই সওদাগর ইউসুফকে অধিকার করে শেষ পর্যন্ত। ইউসুফ কাঁদে। বলে—আমাকে বেথেলে ফিরে যেতে দাও! আমার বাবা আমার মা আমাকে না দেখে কষ্ট পাচ্ছেন!

কিন্তু একজন রূপবান বালক বান্দার দামে কত শস্য কেনা যায়, ওরা জানে। সুমের থেকে মিশর পর্যন্ত তখন দাসপ্রথার রবরবা। দাসপ্রথা কৃষির জন্য জরুরী। পর্যাপ্ত ভূমি—তুলনায় প্রতিটি নগরে লোক কম। তাই দাসদের ভূমিতে খাটাতেই হয়। আর বয়স্ক গোলামের চেয়ে বালক গোলামের চাহিদা বেশি। মনোমতো গড়ে নেওয়া যায়। বিশ্বাস করা যায়। কালক্রমে সে পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। পরিবারের লোকের মতোই পারিবারিক স্বার্থ দেখে।

সওদাগরের নাম এন্নাস্। ইউসুফের কান্না তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারে না। কিন্তু সে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাওয়ায়। বাবা-মায়ের কাছে শিগগির পৌঁছে দেবে বলে কপট সান্ত্বনা দেয়। তখন ইউসুফ শান্ত হয়। উটের পিঠে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কাফেলা চলতে থাকে পশ্চিমে লোহিতসাগরের সঙ্গমের দিকে।...

সওদাগর এন্নাস ইউসুফকে বেচে দিল মিশরে আরেক শস্য ব্যবসায়ীর কাছে। তার নাম আজ্হার। আজ্হারের শস্যবিপণিতে গোলাম বালক ইউসুফের নতুন জীবন শুরু হয়। আরও ক্রীতদাসদের সঙ্গে তার দিন কাটে। মাঝে মাঝে পূর্ব আকাশের একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে কিশোর ইউসুফের মনে পড়ে যায় প্রসারিত বিশাল তৃণপ্রান্তরের কথা। টিড্ডি ফড়িং-এর ওড়াউড়ি। মেঘপুঞ্জের মতো পশুপালের স্তবকে স্তবকে ধূসর সঞ্চার। নির্জন থেকে ভেসে আসা

রাখালের সিডার বাঁশির সুর। তার মা কূপের ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে তাকিয়ে আছে। ও মা, তুমি কী ভাবছ?

মা ভাবছে, ফেলে আসা নগরজীবনের কথা। পাথরের ঘর, আপেল বাগিচা, সবুজ যবের শীষ, রথ আর বেগবান ঘোড়ার কথা। উজ্জ্বল পোশাকপরা মানুষজনের কথা।

এই তো সেই সব পাথরের ঘর, আপেল বাগিচা, সবুজ যবক্ষেত, রথ, ঘোড়া, উজ্জ্বল পোশাকপরা মানুষজন। ইউসুফ যদি তার মাকে আনতে পারত এখানে!

—ও ইউসুফ! তুই অমন করে কী দেখিস রে?

ইউসুফ চোখের জল লুকিয়ে মোছে। ম্লান হেসে বলে—কিছু না, ও কিছু না দারেশ ভাই!

যুবক দারেশ তার মতোই ছেলেবেলা থেকে বান্দা হয়েছে। তার দেশ ছিল আরবে। সে শুধু মরুভূমির গল্প করে। বলে, কী ভাবে তাকে তাদের তাঁবু লুঠ করে ধরে এনেছিল ডাকাতরা। দারেশ বলে, সব ভুলে যা ইউসুফ! কী হবে ওসব ভেবে? শুধু মন খারাপ বৈ তো নয়! এদিকে আয়—আহুদা আঙুরের রস থেকে শরাব বানাচ্ছে। মালিক বলে গেছেন, শরাব মেপে পিপেয় ভরতে হবে। রাজবাড়িতে পরব আছে নাকি। সব পিপে চালান যাবে সেখানে।…

এমনি করে দশ বছর কেটে যায় ইউসুফের এ বাড়িতে। গোলামের জীবন কাটায়।

নীল নদের দুধারে উর্বর শস্যের মাঠ দশবার সোনালী শস্য উপহার দেয়। সূর্যদেবতা 'রা' দশবার পূজা গ্রহণ করেন। হংসবাহিনী বীণাবাদিকা এবং গ্রন্থের দেবী শেসিতার স্তুতিতে দশবার সমবেত সঙ্গীত গায় নগরের শ্রেষ্ঠ গায়ক আর গ্রন্থবিদ্গণ। নিরাকার একেশ্বরবাদীর সন্তানের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সারাবছর দেবদেবীদের আরাধনার এইসব উৎসব চলে। গোমাতা হেথর, বেবুন-রূপী থথ বা দুজেহুতি, সুন্দরশ্রেষ্ঠা ওসিরিস, শ্যেনপক্ষীমুখবিশিষ্ট হোরাস, প্রাণবৈচিত্র্যের দেবী খেপেরা, সর্পদেবী মারৎসেজার, যুদ্ধ-দেবতা আনহুর…

মিশর সম্রাট 'ফ্যারাও' প্রতি বছর শোভাযাত্রা করে বিশাল মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান। প্রধান পুরোহিত পত্তিফেরাহ্ গম্ভীর স্বরে স্তোত্রপাঠ করেন। দেবদাসীরা নগ্নদেহে নাচে।

ইউসুফের এসব জাঁকজমক ভাল লাগে না। সে শুধু আকাশে খোঁজে প্রপিতামহ এব্রাহিমের ঈশ্বরকে। রাত্রির নক্ষত্রে দেখতে পায় ফেরেশতাদের উজ্জ্বল অগ্নিময় পক্ষবিস্তার। তার মনে হয় কোন একদিন হঠাৎ কোন ফেরেশতা এসে ডাকবেন—শোন ইউসুফ, আমি তোমার জন্য সুসমাচার এনেছি অনন্ত নভোলোক থেকে।…

যুবক ইউসুফ একদিন গেছে মালিক আজহারের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে।

ফ্যারাও-এর প্রাসাদে ভোজনশালার জন্য শস্যভাণ্ডার সব সময় পূর্ণ থাকে। সেই ভাণ্ডারের অধিকর্তার নাম আজিজ। আজহার অন্যতম শস্যসরবরাহকারী।

আজহার এখন বৃদ্ধ। তাই ইউসুফকে নিয়ে গিয়ে বলেন—বার্ধক্যের জন্য চলাফেরা করতে আমি অশক্ত। হে মহামান্য শস্যঅধিকর্তা! এর পর আমার প্রতিনিধি হিসাবে এই বান্দা ইউসুফ শস্য দিয়ে দাম নিয়ে যাবে। সে বিশ্বাসী। অনুগ্রহ করে আমাকে এবার অব্যাহতি দিন।

আজিজ বলেন—বেশ তো, তাই হবে।

তারপর থেকে ইউসুফ প্রাসাদে যাতায়াত করে। তার রূপ এবং অমায়িক স্বভাব অধিকর্তা আজিজকে প্রীত করেছে। তিনি তাকে প্রতিবারই বখশিশ দেন। কখনও একটি দেরহেম বা স্বর্ণমুদ্রা, কখনও সুদৃশ্য পোশাক। স্বর্ণমুদ্রাটি নির্দ্বিধায় ইউসুফ অন্ধ বিকলাঙ্গ ভিখারীকে দান করে। পোশাকটিও দেয় কোন শীতার্ত অনাথকে। আজিজ অবাক হয়ে বলেন—তোমাকে যে পোশাকটা দিলাম, তোমার কি পছন্দ হয় নি ইউসুফ?

ইউসুফ সবিনয়ে বলে—অতি উৎকৃষ্ট পোশাক প্রভু!

—তা'হলে পরে আস নি কেন?

তার সঙ্গী বান্দারা বলে দেয়—মাননীয় প্রভু! ইউসুফ ওটা এক ভিখারীকে দান করেছে।

আজিজ উদারচেতা এবং মহানুভব ব্যক্তি। একজন বান্দার এই পরোপকারবৃত্তি দেখে চমৎকৃত হন। নিজের মহলে ফিরে গিয়ে ইউসুফের গল্প করেন।- বান্দাদের মধ্যে এমন আশ্চর্য আচরণ তো ভাবা যায় না! আজিজ স্ত্রীকে বলেন—জানো? আমার কেমন যেন ধারণা, এই গোলাম নিশ্চয় কোন অভিজাতবংশের ছেলে। শয়তান দাসব্যবসায়ীরা ওকে বাল্যে সম্ভবত অপহরণ করে এনেছিল। কারণ, ওর গায়ের রঙ, শারীরিক গঠন আর অপূর্ব মুখশ্রী গোলামদের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। বিশেষ করে ওর চোখের তারা নীলচে রঙের। উত্তর সমুদ্রের (ভূমধ্য সাগর) ওপারে আছে ইউনানদেশ। আমি ইউনানে (গ্রিস) গিয়েছিলাম একবার। আশ্চর্য, আজহারের এ বান্দা ঠিক তাদের মতো দেখতে। তেমনি সোনালী কোঁকড়ানো চুল, নীলচে চোখের তারা, আপেলের মতো গায়ের রঙ! হলফ করে বলতে পারি—ও সেমাইট নয়। অথচ আজহার বলেন—সেমাইটদের দেশ থেকে এক সওদাগর ওকে নাকি মাত্র বিশ দেরহেমে কিনে এনেছিল!

আজিজের স্ত্রীকে সস্নেহে স্বয়ং ফ্যারাও উপাধি দিয়েছেন—'মিশরসুন্দরী'। তার নাম জুলেখা। রূপবতী জুলেখার সঙ্গে আজিজের বয়সের প্রচুর ফারাক। জুলেখা পূর্ণ যুবতী, আজিজ প্রৌঢ়। প্রতিদিন ইউসুফের কথা শুনে কৌতূহলী জুলেখা একদিন দেখতে চায় ইউসুফকে।

আজিজ স্বভাবত স্ত্রৈণমানুষ। ইউসুফ প্রাসাদে শস্য নিয়ে এলে আজিজ

তাকে তাঁর মহলে যাবার আমন্ত্রণ জানান। বিস্মিত ইউসুফ বলে—কেন প্রভু? আমি সামান্য গোলাম। আপনি মাননীয় ব্যক্তি।

আজিজ হাসতে-হাসতে বলেন—তোমার বরাত খুলে যাবে, ইউসুফ! আমার স্ত্রী তোমাকে দেখতে চান। সুতরাং প্রচুর বখশিশের আশা করতে পারো। এবং পরিণামে তুমি দুহাত ভরে দান করে প্রচুর পুণ্য কুড়িয়ে নেবে।

দ্বিধাগ্রস্ত এবং ঈষৎ শঙ্কিত ইউসুফ আজিজের সঙ্গে তাঁর মহলে গেল।

সুসজ্জিত এমন কক্ষে আর কখনও প্রবেশ করে নি ইউসুফ। সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গোলাম সে। কোন আসনে বসার অধিকার তার নেই। এমন কি মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসতে হলেও অনুমতি থাকা চাই।

একটু পরে বিশাল কারুকার্যখচিত রক্তবর্ণ পর্দা দুধারে সরিয়ে দিল দুজন ক্রীতদাসী। ইউসুফ তাকাল। নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

এক অলোক-সামান্যা ভুবনমোহিনী নারী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লঘু ছন্দে হেঁটে এসে গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি কয়েকমুহূর্ত—তারপর চোখের তারা চঞ্চল হয়েছে। ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটেছে।

ইউসুফ সহ্য করতে পারে না ওই তীব্র দৃষ্টি। তীক্ষ্ম ছুরির মতো মর্মভেদী। সে মুখ নামিয়ে গালিচায় দৃষ্টি রাখে। তার উরু অবশ হয়ে যায়। পিঠের দিকে কাঁধ থেকে প্রলম্বিত ডোরাকাটা এবং গোলামির প্রতীক বস্ত্রখণ্ডটি মৃদু কম্পিত হয়।

আজিজ হাসিমুখে স্ত্রীকে বলেন—ঠিক বলেছিলাম না জুলেখা?

জুলেখা বাঁকা ঠোঁটে হেসে এবং ভ্রুকুটি করে এবং নাসিকা ইষৎ কুঞ্চিত করে শুধু বলে - হুঁঃ!

—কী? মিলছে না? আজিজ অবাক হয়ে বলেন।

—হয়তো মিলছে কিংবা মিলছে না।…সুন্দরী নারী জবাব দেয়। কিন্তু আমি ভাবছি, শস্যের গোলায় এমন ননীর গতরওয়ালা গোলাম কোন কাজে লাগে? বরং বাগানের ফুলগাছে জলসেচনের যোগ্যতা এর থাকতে পারে।

সকৌতুকে আজিজ বলেন—একে তোমার ফুলবাগানের মালী করতে চাও বুঝি? বেশ তো—বলো তাহলে। আজহারের কাছে একটা প্রস্তাব দিয়ে দেখি। যদিও জানি, আজহার ওকে বেচতে রাজী হবে না!

জুলেখা নিজের আগোচরে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে বলে—এই গোলাম আমার চাই। আজই। যেভাবে হোক।

তারপর দ্রুত ঘুরে ভেতরে চলে যায়। পর্দার দুই প্রান্ত মিলে যায়। ইউসুফ মুখ তুলে দেখে, আগের মতোই উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বিশাল পর্দা ঝুলছে—কেউ নেই সেখানে। চিন্তিত এবং কাঁচুমাচু মুখে শস্যঅধিকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে। এই মিশরে আশ্চর্য ক্ষমতাধর আছে—তাদের অদ্ভুত-অদ্ভুত কীর্তি দেখেছে

ইউসুফ। আজিজও কি আসলে এক জাদুকর?

আজিজ মৃদু হেসে বলেন—শুনলে তো ইউসুফ? আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ হয়ে গেছে তোমাকে। ওর ফুলবাগিচার নেশা আছে প্রচণ্ড। মালী হতে পারবে তো?

ইউসুফ আস্তে বলে—প্রভু! আমার একজন মালিক আছেন।

আজিজ বলেন—চলো। তোমার সেই মালিকের কাছেই যাই। আমার স্ত্রী বড় জেদী মহিলা। বুঝেছ? এই যে গোঁ ধরেছে তো ধরেছে! এরপর হুলুস্থুল বাধিয়ে ছাড়বে···

লক্ষ দেরহেমের বিনিময়ে অবশেষে আজহার রাজী হলেন। তবে নিছক অর্থলোভ নয়, ফ্যারাও-এর শস্যভাণ্ডারের অধিকর্তাকে চটালে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা আছে।

আর আজিজের কাছে স্ত্রীর বায়না মেটাতে লক্ষ দেরহেম নগণ্য অর্থ। শস্য-অধিকর্তার দফতরে উৎকোচের রাজত্ব। আজিজকেও ওই দশচক্রে ভূত হয়ে উৎকোচ গ্রহণ করতে হয়। কম ওজনে শস্য দিয়ে পুরো দাম পায় শস্য সরবরাহকারীরা।

আর, স্ত্রী যার সুন্দরী তরুণী এবং বিলাসিনী, অপ্রমেয় শৌখিনতায় জীবনযাপন করে—সে যদি প্রৌঢ় এবং স্বভাবে স্ত্রৈণ হয়, তাহলে তার পক্ষে নির্দিষ্ট বেতনের ওপর নির্ভর করে চলা অসম্ভব। আজিজকে তাই বাড়তি মুদ্রা সংগ্রহের জন্য অবৈধ পথে পা বাড়াতেই হয়েছে।

লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গুণে দিয়ে ইউসুফকে কিনে আনলেন আজিজ। স্ত্রীর কাছে অর্পণ করলেন নতুন গোলামকে।

তারপর ইউসুফ নির্জন প্রমোদ উদ্যানে জলসিঞ্চন করে।

জুলেখা সারাক্ষণ সেখানে; নিজে তদারক করে সে। কেন? না—তার বান্দা মালীটি একেবারেই আনাড়ী। একটু চোখ না রাখলে সাজানো বাগান শেষ করে ফেলবে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে—ও জুলেখা! তুমি আনাড়ী মালী রাখলে কেন তাহলে?

জুলেখা বাঁকা হেসে বলবে—বা রে! বাগানে গাছ সুন্দর, ফুল সুন্দর—সেখানে মালীও সুন্দর হওয়া উচিত নয়?

—হুঁ। বিশেষত যখন বাগানের অধিকর্ত্রীও এমন সুন্দর!

জুলেখা আপন মনে হাসে।

কখনও হঠাৎ বলে—এই বান্দা! এখানে কিসের সুগন্ধ ছুটেছে রে? এ ফুলগুলো তো নির্গন্ধ।

ইউসুফ পরীক্ষা করে বলে—হয়তো আপনারই আতরের খুশবো কর্ত্রী ঠাকুরানী!

—সে কী রে! আমি তো আতর মাখিনি।···বলে জুলেখা নিজের বাহু আর পিরহান শোঁকে। বেণীবাঁধা চুলে নাক রাখে কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা নাড়ে।—না রে!

ইউসুফ খুরপি-হাতে মাটির দিকে ঝুঁকে বলে—তাহলে ভুল সুগন্ধ!

তার পিঠের গোলামির প্রতীক ডোরাকাটা কাপড়টা হঠাৎ খামচে ধরে জুলেখা। বলে—কী বললি? ভুল সুগন্ধ? আমি মিথ্যাবাদিনী? বান্দা! হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলবি—কোতল করব তোকে।

ইউসুফ কাঁচুমাচু মুখে তাকায়।

—এই, ওঠ্ তো দেখি। তুই নিশ্চয় লুকিয়ে আতর মাখিস! বলে জুলেখা ওকে দাঁড় করিয়ে ওর বাহুতে নাক রাখে। তারপর মুখ তুলতেই ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ এসে শিহরিত করে জুলেখাকে। সে থরথর করে কেঁপে ওঠে আশ্লেষে।

তারপর মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে বলে—বান্দা, আমারও ভুল হতে পারে। কারণ সারাক্ষণ সুগন্ধের মধ্যে যে থাকে, তার বড্ড মুশকিল। তুই দেখ তো শুঁকে। দেখ্—দেখ্ না হতভাগা! ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তোকে হুকুম দিচ্ছি!

শ্বাসক্লিষ্ট চাপা স্বরে আদেশ দেয়। চোখে বিলোল কটাক্ষ তার, একটি বাহু তুলে ধরে প্রথমে—নিটোল, কোমল, উজ্জ্বল গোলাপী বাহু, এবং ইউসুফ ঈষৎ ঝুঁকে যায়—তারপর জুলেখা তার গলার নীচে, পীনোন্নত বুকের ঊর্ধ্ব নগ্ন অংশে ইউসুফের কেশ আকর্ষণ করে গন্ধ শুঁকতে বলে।—পাচ্ছিস সুগন্ধ? বেওকুফ্ বান্দা! জবাব দিচ্ছিসনে কেন?

কাতর ইউসুফ বলে—পাচ্ছি কর্ত্রীঠাকুরানী! পাচ্ছি।

—এমন সুগন্ধ কখনও শুঁকেছিস উল্লুক?

—না হুজুরাইন!

—না হুজুরাইন! ভেংচি কেটে জুলেখা বলে। ওরে নির্বোধ হতভাগা! তবু তুই মূর্ছা গেলিনে যে বড়? ভিরমি খেয়ে পড়লি নে যে?

তখন ইউসুফ একটু হাসে শুধু।

—হুঁ, বুঝেছি। তোর বুঝি স্ত্রীলোকের অঙ্গ শোঁকার অভ্যেস আছে!

জোরে মাথা দোলায় ইউসুফ।—না হুজুরাইন, না।

—থাম! বান্দারা কী আমি জানিনে? সব বান্দার একজন করে প্রেমিকা বাঁদী আছে। তোর বুঝি জোটেনি?

ইউসুফ বিনীতভাবে প্রতিবাদ করে—কর্ত্রীঠাকুরানী, আমি ওসব চাইনি!

—চাস নি! তবে কী চেয়েছিস তুই?

—কিছু না।

—কিছু না! তুই তো তাহলে সেমাইটদের পয়গম্বর রে!

—হুজুরাইন, আমি মহামান্য পয়গম্বর এব্রাহিমের প্রপৌত্র।···বলেই ইউসুফ চমকে ওঠে। সর্বনাশ! এতকাল নিজের যে-পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিল—হঠাৎ কেন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল?

খিলখিল করে হেসে উঠল সুন্দরী নারী। -তোর মাথায় ছিট আছে, বান্দা। বরং যদি বলতিস, আমি আসিরিস দেবীর বরপুত্তুর, চমৎকার মানিয়ে যেত। এদেশে সেমাইট পয়গম্বরদের কোন খাতির নেই। কল্কে পাবি নে। বুঝলি তো?

ইউসুফ মাথা নাড়ে। বুঝেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহময়ী জুলেখা কিছুক্ষণ পদচারণা করে শষ্পাস্তৃত উদ্যানে। গোলাপ তুলে শুঁকে ফেলে দেয় এবং জুতোর তলায় দলতে থাকে। হঠাৎ তার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। কিছু ভাবে। চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আবার ইউসুফের কাছে যায়।—বান্দা!

—হুজুরাইন!

—আমার দিকে চেয়ে থাক তো কিছুক্ষণ!

কম্পিত স্বরে ইউসুফ, বলে—কেন?

—আমার আদেশ, বান্দা!

ইউসুফ চঞ্চল দৃষ্টে অগত্যা তাকায়।

—কোথায় তোর দেশ ছিল রে?

—কেনান।

—সে তো পশুপালকদের দেশ!

—হ্যাঁ, হুজুরাইন।

—তুই বলতো বান্দা, তোদের কেনানে আমার মতো সুন্দর মেয়ে দেখেছিস?

—দেখেছি।

—দেখেছিস? কে সে?

—আমার মা!

—তোর মা আমার চেয়ে সুন্দর ছিল?

—হ্যাঁ।

—ও কী রে! তুই কেঁদে ফেললি যে?

—মাফ্ করবেন হুজুরাইন।·· ইউসুফ জামায় চোখ মোছে।

—হুঁ, তোর মা আমার চেয়ে সুন্দর ছিল।···জুলেখা আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের বলে—কিন্তু তোর মা এখন বুড়ি হয়ে গেছে। তুই যুবক হয়েছিস। তোর চোখে কি আমি সুন্দর নই, বান্দা?

—আপনার মতো সুন্দরী মিশরে নেই, কর্ত্রীঠাকুরানী।

জুলেখা আবেগে আপ্লুত হয়ে নৃত্যছন্দে দেহ রেখে বলে—বান্দা, তোর সব কসুর মাফ করে দিলাম। আবার বল তো শুনি।

—আপনি মিশরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

—ইউসুফ! ইউসুফ! আমি তোকে এই রত্নহার বখশিশ দিলাম! বলে সুলেখা তার কণ্ঠ থেকে একটি রত্নহার খুলে ইউসুফের সামনে ধরে। ইউসুফ ইতস্তত করে। জুলেখা ফের বলে—নে ইউসুফ! বখশিশ নে!

ইউসুফ অগত্যা হারটা নিয়ে জামার মধ্যে গুঁজে রাখে।

জুলেখা চোখে ঝিলিক তুলে বলে—এমন সুন্দরী সবসময় দেখতে পাচ্ছিস বলে তুই কি কৃতজ্ঞ নোস ইউসুফ? সৌন্দর্য দেখা বড় ভাগ্যের কথা, নয়?

—ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ কর্ত্রীঠাকুরানী। আপনি ঠিকই বলেছেন। মহাত্মা এব্রাহিম বলতেন, ঈশ্বর নিজের হাতে যা গড়েছেন, তাই সৌন্দর্য। আর তাঁর হুকুমে ফেরেশতারা যা গড়ে দিয়েছে, তা তার ছায়া। আর বলতেন—অসুন্দর যা কিছু, তা গড়েছে শয়তান।

—তুই দার্শনিক রে ইউসুফ। খুশি হলাম। জুলেখা নির্মল হাসে। ফের বলে—কিন্তু তোর ঈশ্বরের হাতেগড়া এই সৌন্দর্য দেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নজির হিসেবে কিছু উপহার দিবিনে?

ইউসুফ বিব্রতভাবে খোঁজে। সত্যি তো, কী দেবে? কর্ত্রীর উপযুক্ত উপহার কোথায় পাবে সে?

—তুই বরং আমাকে রক্তপুষ্প দে, ইউসুফ।...

ইউসুফ চারদিকে তাকায়। আর কী বিস্ময়কর ঘটনা? মিশরসুন্দরীর পুষ্পোদ্যানে কোথাও একটিও রক্তপুষ্প দেখতে পায় না? শুধু শুভ্রপুষ্প থরে বিথরে প্রস্ফুটিত - যে দিকে তাকায়, শুভ্রতার দ্যুতি বিকিরিত। তার কর্ত্রী কি জাদুমন্ত্র জানে? নাকি আকাশে এসে দাঁড়িয়েছে কোন ফেরেশতো—যার সাদা ডানা, সাদা উষ্ণীষ এবং সাদা উত্তরীয় থেকে বিচ্ছুরিত শ্বেতজ্যোতিঃপুঞ্জ অলীক বৃষ্টিধারার মতো ঝরে সব ফুলের নিজস্ব রঙ ধুয়ে দিচ্ছে? সে আকাশ দেখে।

এবং জুলেখা পরিহাস করে বলে—ও ইউসুফ! তুমি কি আকাশের রক্তবর্ণ নক্ষত্রটি ছিঁড়ে আনার কথা ভাবছ? তাহলে অপেক্ষা করো—এখনও দিনের আলো মিলিয়ে যায় নি।

ইউসুফ কাতরস্বরে বলে—কর্ত্রীঠাকুরানী! প্রহেলিকা বুঝতে পারি না আমি—নির্বোধ দাস মাত্র। যেন মনে হয়, আপনারই শুভ্র বসনভূষণের উজ্জ্বলতায় এ পুষ্পোদ্যান ধুধু জ্বলছে!

জুলেখার দৃষ্টিতে ওই শুভ্রতার প্রতিফলন—যেন নীলনদের বন্যাধারা রূপান্তরিত হল শুভ্র পুষ্পস্রোতে। জুলেখা অভিমানে, নাকি ছলনায়, ছলছল চোখে আস্তে বলে—দেবে না ইউসুফ একটি রক্তপুষ্প?

অসহায় ইউসুফ হাতের কাছে একটি সাদা ফুল ছিঁড়ে নেয় দ্রুত। তারপর পায়ের কাছ থেকে কুড়িয়ে নেয় ঘাস ছাঁটবার ধারাল হাতিয়ার। নতজানু হয়ে বসে কর্ত্রীর সামনে। মনে মনে বলে—ঈশ্বর! এব্রাহিমের ঈশ্বর!

অপরাধ নিও না। তোমারই সৃষ্ট সৌন্দর্যের প্রশস্তিস্বরূপ এ দেহে প্রবাহিত পয়গম্বরের পবিত্র রক্তধারা থেকে একবিন্দু আমি উৎসর্গ করতে চাই।·· এবং সে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল চিরে ফুলটি সেখানে চেপে ধরে। নিমেষে একটি রক্তপুষ্প সৃষ্টি হয়। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সেই পুষ্প স্নেহময়ী নারীর পায়ের তলায় রেখে সে বলে—গ্রহণ করুন হুজুরাইন!

ফুলটি তুলে নিয়ে জুলেখা ঠোঁটে স্পর্শ করে। তারপর বুকের ওপর গুঁজে রাখে। আবিষ্টা যুবতী জুলেখার ঠোঁট ইউসুফের রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। যেন এক অমর্ত্য প্রসাধনে সে ভূষিতা ভাবে নিজেকে। গর্বে, সুখে, গভীরগোপন অনুরাগে আশ্লিষ্টা নারী মৃদু-মৃদু হাসে।

আর এদিকে এব্রাহিমের ঈশ্বরের মনে কী ছিল, ইউসুফের আঙুলের রক্ত বন্ধ হয় না। সে কর্ত্রীকে গোপন করে রক্ত বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়। কিন্তু বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরতেই থাকে মুহূর্তে মুহূর্তে।

হঠাৎ জুলেখার দৃষ্টি পড়ে সেদিকে। চমকে ওঠে।—ও ইউসুফ! অত রক্ত কেন?

—রক্ত বন্ধ হচ্ছে না হুজুরাইন!

প্রস্তরবেদিকার দিকে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় জুলেখা। বেদিকায় জোর করে বসিয়ে দেয়। নিজে পাশে বসে। তারপর ইউসুফের রক্তাক্ত হাতটি তুলে আহত কড়ে আঙুলটি চুষতে থাকে সে। ইউসুফ বাধা দিতে সাহস পায় না। তার বুক কাঁপে দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কায়। বেথেল তৃণভূমির কথা মনে পড়ে যায়—মনে পড়ে যায়, দাদা রুবেনের কাছে শোনা রক্তপিপাসু বাঘিনীর গল্প—সে নাকি ছিল ছদ্মবেশী ডাইনী এবং এক পশুপালকের খোঁয়াড় শূন্য করে দিয়েছিল এবং অবশেষে দোজ্জা নামে এক বীর তাকে হত্যা করে। পালে বাঘ পড়লে এখনও সারা কেনানের রাখালরা চেঁচিয়ে ওঠে—দোজ্জা! দোজ্জা!

দোজ্জা! দোজ্জা! ইউসুফের ঠোঁট কাঁপছে, জুলেখা আড়চোখে দেখে বলে—কী হল ইউসুফ? ব্যথা পাচ্ছ কি?

—হ্যাঁ, হুজুরাইন।

—চেয়ে দেখ, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

—আপনার মেহেরবানি।

এই সময় উদ্যানের প্রান্তে মহলের দরজায় সংকেতবার্তাসূচক ঘন্টা বাজল। জুলেখা উঠে দাঁড়াল।—ফ্যারাও এর শস্যাধিকর্তা বাড়ি ফিরলেন। আমি যাই ইউসুফ।

দ্রুত চলে গেল জুলেখা। ইউসুফ একটা সংকীর্ণ প্রণালীর ধারে ঘাসের ওপর বসল। তাকিয়ে রইল কড়ে আঙুলটার দিকে। কতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকল। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং খুরপি তুলে নিয়ে অসমাপ্ত কাজে রত হয়েই সবিস্ময়ে দেখল, যে গাছের গোড়ার মাটি সে আলগা করে দিচ্ছিল,

সেই গাছেই থরেবিথরে লাল ফুল ফুটে রয়েছে! শিহরিত হয়ে চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখল। দিনান্তের রক্তিম আলোয় সারা উদ্যান জুড়ে এখন শুধু রক্তপুষ্পের মেলা বসেছে!

হাঁটু মুড়ে বসে দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে ইউসুফ বলে—ঈশ্বর! এব্রাহিমের ঈশ্বর! আমাকে এতদিনে এ কোন্ পরীক্ষায় ফেললে তুমি?…

আর, এমনি করে আসে একেকটি দিন এই পুষ্পোদ্যানে। ছলনায়-ছলনায় মিশর-সুন্দরী জুলেখা তার রূপবান বান্দাকে বারবার বিভ্রান্ত করে। কখনও হাসে, কখনও ক্রুদ্ধ হয়। কখনও শাসায়। কোতল করার হুমকি দেয়। কারণে-অকারণে।

ইচ্ছে করেই খালি পায়ে বাগানের ঘাসে হাঁটে জুলেখা। ইচ্ছে করেই কাঁটা ফুটিয়ে দেয় কোমল পায়ের তলায়। করুণ স্বরে ডাকে—ইউসুফ! ও ইউসুফ! আমার পায়ে কাঁটা ফুটেছে!

ইউসুফ গিয়ে দেখে, কর্ত্রীর পায়ের তলায় প্রকাণ্ড কাঁটা বিঁধেছে। টেনে বের করতেই যন্ত্রণায় জুলেখা ইউসুফকে জড়িয়ে ধরে বলে—আঃ! আস্তে, ইউসুফ! আস্তে! অত ব্যথা দিও না লক্ষ্মী ছেলে!

জুলেখার রক্তে সবুজ ঘাস লাল হতে থাকে। ইউসুফ বিপন্নমুখে বলে—হেকিমকে খবর দিই কর্ত্রী!

—ইউসুফ! অকৃতজ্ঞ! আমি তোর আঙুল চুষে রক্ত বন্ধ করেছিলাম না একদিন?…বলে সে তার ডালিমফুলের মতো কোমল রক্তিম পদতল তুলে ধরে।

হতচকিত ইউসুফ ঠোঁট রাখে তার ক্ষতস্থানে। ধীরে চুষতে থাকে।

যন্ত্রণায় কিংবা গভীর তৃপ্তিতে আবিষ্টা যুবতী চোখ বুজে থাকে এবং অস্ফুটস্বরে বলে—আঃ! আঃ!…

ফ্যারাও-এর শস্যভাণ্ডারের অধিকর্তা কর্মব্যস্ত মানুষ। সম্রাটের ভোজনশালায় কখনও আসে বিচিত্র সব বিদেশী খাদ্যের ফরমাস। তাঁকে তা সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে হয়। একবার ফরমাস হল, ইউনানী (গ্রিক) শুঁড়িরা একরকম সুগন্ধি লতার নির্যাস দেওয়া দ্রাক্ষা রোদে শুকিয়ে উৎকৃষ্ট মদ্য তৈরি করে—সেই মদ্যে একদল বিদেশী রাজঅতিথিকে তুষ্ট করা হবে। ভোজনশালার অধিকর্তা খবর পাঠালেন শস্য অধিকর্তার কাছে। আজিজ বিস্মিত হয়ে জানালেন—আমি তো রাজকীয় মদ্যভাণ্ডারের অধ্যক্ষ নই। আমার দায়িত্ব শস্যসংক্রান্ত বিষয়ে। মাননীয় ভোজন-অধিকর্তা পাকশালার অধ্যক্ষকে জানান।

দস্তুরমতো লালফিতের কাণ্ড। এবার এল ফ্যারাও-এর স্বাক্ষরিত নির্দেশ। ফ্যারাও চান, তাঁর শস্যভাণ্ডারে সেই সুগন্ধি শুকনো দ্রাক্ষা মজুত থাক। কারণ, দ্রাক্ষাও শস্যের অন্তর্গত।

বিরক্ত আজিজ পারতপক্ষে বাইরে যেতে চান না ইদানীং। কিন্তু দ্রাক্ষা তো ফল। তা কীভাবে শস্য হয়, বুঝতে পারলেন না। আসলে ভোজনশালার

অধিকর্তার সঙ্গে তাঁর রেষারেষি ছিল। আজিজের প্রচুর বাড়তি আয়ের সুযোগ আছে, তাঁর ততটা নেই। 'আজিজ ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠালে ভদ্রলোক লিখলেন—যবকে শস্য বলা হয়। কিন্তু যব কি একজাতীয় কোমল উদ্ভিদের ফল নয়? যববৃক্ষের ফল যদি শস্য হয়, তাহলে দ্রাক্ষা-নামক অতি কোমল উদ্ভিদের ফলই বা শস্য হবে না কেন?'

অতএব আজিজকে শেষ পর্যন্ত ইউনান যাত্রা করতেই হল। যুবতী স্ত্রী—অসামান্যা সুন্দরী এবং খেয়ালী প্রকৃতির নারী। আর ওই রূপবান গোলাম—সারাক্ষণ পায়ে পায়ে নিয়ে ঘোরে। আজিজ অস্বস্তি নিয়েই বেরোলেন। পথে ভাবলেন—ইউসুফ অতি সচ্চরিত্র এবং নিষ্পাপ। তার সুনাম সবার মুখে-মুখে। আজ দশ বছর সে মিশরে আছে। আজ পর্যন্ত নাকি একবারও মনিবের প্রহার দূরের কথা, মৃদু ভর্ৎসনাও পায়নি। বিশেষ করে তাঁর বাড়ি আসার পর তার নামে অন্য বান্দা ও বাঁদীরা একটিও অভিযোগ তোলেনি—আজিজ তাদের ইউসুফের দিকে নজর রাখতে বলেছিলেন স্ত্রীর অজান্তে।

দুর্ভাগা আজিজ জানতেন না, তাঁর মহলের বান্দা ও বাঁদীরা কর্ত্রীরই অনুগত। কারণ তারা জানে, স্ত্রৈণ স্বামীর অনুগত থাকা বিপজ্জনক। এবং তারা আরও জানে, জুলেখার প্রভাব রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বয়ং ফ্যারাও তাকে কন্যার মতো স্নেহ করেন। জুলেখা কোতলের হুকুম দিলে তাদের গর্দান বাঁচাবার ক্ষমতা কারও নেই।...

আজিজ বিদেশে গেলে জুলেখা অবাধে ডানা মেলতে চাইল। নিরন্তর গোপনদহন জ্বালায় জর্জরিত মিশরসুন্দরী ইউসুফের সৌন্দর্যশিখায় আত্মহননের জন্য প্রস্তুত হল।

ইউসুফের দুহাত ধুলোয় ধূসর, ডিমালো জঙ্ঘা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঘাসের কুটো, কুঞ্চিত সোনালী চুলে শুকনো পাতা—আর উজ্জ্বল রৌদ্রের তাপে তার নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু—জুলেখা দূর থেকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, এ কোন্ দেবতাকে তার পুষ্পোদ্যানে দাসরূপে কষ্ট দিচ্ছে সে! তার মন কেমন করে ওঠে। চঞ্চল পায়ে দ্রুত গবাক্ষ থেকে সরে আসে! সোপান বেয়ে নামতে থাকে। ছুটে আসে উদ্যানে।

—ইউসুফ! ও ইউসুফ! খুব হয়েছে। ছায়ায় এসে বিশ্রাম নাও এবার। তুমি ক্লান্ত।

—ধন্যবাদ কর্ত্রী। আমি ক্লান্ত নই।

—কর্ত্রীর আদেশ, বান্দা!

দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে ইউসুফ বীথিকার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায়।

মিশরকন্যা হাসে।—তোমায় আর বান্দা বলতে ভাল লাগে না ইউসুফ। কেন তুমি বান্দা হলে বলো তো?

—মাননীয় এব্রাহিমের ঈশ্বরের ইচ্ছায় হুজুরাইন!

—তুমি ফ্যারাও পুত্রদের চেয়ে সুন্দর! অনেক, অনেক বেশি সুন্দর।

—ধন্যবাদ, কর্ত্রী।

—আচ্ছা ইউসুফ, কোন নারীকে তোমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে না?

—এ কী প্রশ্ন, মাননীয়া! এর জবাব আমি নিজেই জানি না।

বলিব্যাকুলা মোহিনী পলকে ক্রুদ্ধ হয়ে সাপিনীর মতো ফণা তোলে।—জবাব দাও!

—হয়তো করে, হয়তো করে না। কিন্তু আমি…আমি যে সামান্য গোলাম! গোলামের ভালবাসার অধিকার তো নেই। প্রভু যাকে ভালবাসতে বলেন, সে তাকে…

ইউসুফের এ সরল এবং প্রচলিত প্রথাসম্মত উক্তিকে মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জুলেখা বলে—সে তাকে ভালবাসতে বাধ্য। এবং ইউসুফ, আমি যদি বলি… একমুহূর্ত ইতস্তত করে সে শ্বাসপ্রশ্বাসপিষ্ট স্বরে বলে ওঠে—আমি যদি বলি, তুমি আমাকেই ভালবাসো!

তার দিকে তাকিয়েই মুখ নামায় ইউসুফ।—এ কী বলছেন হুজুরাইন! আপনি আমার জানের মালিক। আমি আপনার ক্রীতদাস মাত্র।

—তবু যদি এই আদেশ দিই?

—আপনি পরস্ত্রী।

জুলেখা তীব্র কণ্ঠস্বরে বলে—চুপ করো বেতমিজ!

উদ্যানে ঘোর স্তব্ধতা কিছুক্ষণ। তারপর আর্তস্বরে ডেকে ওঠে কোন পাখি। প্রজাপতি ছটফট করে ওঠে। মেঘখণ্ড সরে যায়। রৌদ্রের উজ্জ্বলতা এসে ধূসরতার পর্দা সরিয়ে দেয়। জুলেখা কম্পিত স্বরে বলে—আজ আমি নীলনদে নৌকোবিহারে যাব। জ্যোৎস্নার রাত এলে এই আমার অভ্যাস। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। প্রস্তুত থেকো।

বলেই জুলেখা দ্রুত চলে যায় মহলের দিকে। ইউসুফ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে।—ঈশ্বর! এব্রাহিমের ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছায় আমি এখন গোলামের জীবন কাটাচ্ছি। আবার কোন্ জীবনে নিয়ে যেতে চাও প্রভু?

সে-রাতে নীলনদে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শস্যঅধিকর্তার স্ত্রী নৌকাবিহারে বেরিয়েছে। একটু তফাতে আরও দুটি নৌকায় সশস্ত্র রক্ষীরা অনুসরণ করছে।

জুলেখা না চাইলেও এই নিয়ম প্রচলিত। ফ্যারাও-এর কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের লোকেরা এটাকে বিশেষ সম্মান মনে করে।

জুলেখার নৌকায় বিশ্বস্ত পরিচারিকারাও এসেছে। তারা জানে জুলেখা ইউসুফের অনুরাগিণী। আর ইউসুফকে পরতে হয়েছে অভিজাতদের বেশভূষা। গোলামির প্রতীক ডোরাকাটা উত্তরীয় খুলে রেখে আসতে হয়েছে কর্ত্রীর আদেশে। নৌকায় দাঁড় এবং হাল শক্তিমতী কাফ্রি বাঁদীদের হাতে। তারা বোবা ও কালা।

অভিজাতদের অন্তঃপুরে কিছু বোবা ও কালা বান্দা-বাঁদী রাখার প্রথা প্রচলিত। অন্তঃপুরের গোপন কথা যাতে বাইরে না ছড়ায়, তাই শৈশবেই তাদের বোবা-কালা করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বোবা ও কালাদের চেয়ে ধূর্ত আর কে আছে? খবর তারা ঠিকই পাচার করতে পটু।

মৃদু প্রদীপ জ্বলছে নৌকায়। স্তব্ধ নির্জন জললোকে জ্যোৎস্নায় 'লায়ার' বীণা বাজাচ্ছে জুলেখা। ইউসুফ মুগ্ধভাবে শুনছে। কর্ত্রী এত সুন্দর বীণা বাজায় সে জানত না। বীণাধ্বনিতে ও কি নারীর হৃদস্পন্দন—গোপন নির্জন দুঃখের প্রতিধ্বনি? রাত্রির নীলনদকে মনে হয় যুগ-যুগান্তকালের প্রেমিকা নারীর বহতা হৃদয়স্রাব।

সেই বিষণ্ণ আচ্ছন্নতা ভেঙে হঠাৎ কোথায় দূর থেকে ফ্যারাও-এর নৌবাহিনীর প্রহরীর চিৎকার ভেসে আসে—তাসা রাব্বাকা—আ—আ! [কে যাও, শত্রু না মিত্র—সংকেত দেখাও!]

শস্য-অধিকর্তার রক্ষীরা আলোর সংকেত দেখিয়ে জবাব দেয়—শশাঙ্ক* রাব্বা—আ—আ! [আমরা শশাঙ্ক উপাধিধারী অর্থাৎ ফ্যারাওয়ের লোক। মিত্র।]

মধ্যরাতে নৌকাবিহার শেষ করে প্রাসাদে ফেরে জুলেখা। গভীরতর অতৃপ্তি নিয়েই ফিরে আসে। প্রাসাদের অভ্যন্তর অবধি নীলনদ থেকে খাল কেটে আনা হয়েছে। বর্ষায় বাঁধের ফটক বন্ধ থাকে। অন্য ঋতুতে খুলে রাখা হয়। শস্য-অধিকর্তার পুষ্পোদ্যানের প্রান্তে নৌকা ভেড়ে। বান্দারা প্রস্তুত ছিল। দরজা খুলে দেয়।

আজ কর্ত্রীর সঙ্গে ভোজনে বসবে ইউসুফ। এক পরিচারিকা চুপি চুপি এসে এই আদেশ জানিয়ে যায় ইউসুফের ঘরে। বিচলিত চিত্তে ইউসুফ তাকে অনুসরণ করে।

থরেবিথরে সাজানো খাদ্যের সামনে বসে জুলেখা প্রতীক্ষা করছিল ইউসুফের। ইউসুফ ইতস্তত করছে দেখে সে মৃদু হেসে বলে—তোমার গায়ে এখন বান্দার পোশাক নেই। তোমাকে আমি মুক্তি উপহার দিতে চাই ইউসুফ। আজ রাত্রিশেষে তুমি স্বাধীনতা পাবে।

—সে কী! আমায় আপনি মুক্তি দেবেন? কেন হুজুরাইন?

—চুপ নির্বোধ! এখন এই বেশে তোমার মুখে ওই সম্বোধন হাস্যকর। দোহাই ইউসুফ, আর নিজেকে হাস্যকর প্রতিপন্ন কোরো না। বসো, আমরা এখন একসঙ্গে খাব। এবং আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বান্দাসুলভ একটি কথা বললে তোমার গর্দান যাবে।

—চেষ্টা করব।···ইউসুফ একটু হাসে এবার। মন চঞ্চল। সত্যি কি

---

* ফ্যারাওদের উপাধি ছিল শশাঙ্ক। ভারতীয় শব্দ শশাঙ্কের অনুরূপ। অনেকে পুরাতাত্ত্বিক মতে ভারতের সঙ্গে প্রাচীনযুগে মিশরের যোগাযোগ থাকার কথা বিশ্বাস করেন।

তাকে মুক্তি দেবেন জুলেখা ? ঈশ্বর ! এব্রাহিমের ঈশ্বর ! তোমার এত করুণা ! ইউসুফ ভাবে, মুক্তি পেলেই সে চলে যাবে কেনানে। আঃ ! কতকাল মা আর বাবাকে দেখে নি সে ? দাদা রুবেনকে দেখে নি ! ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছে কবে—বরং তাদের সবার জন্যে নিয়ে যাবে পোশাক-আশাক, ফল, কত রকম উৎকৃষ্ট খাদ্য। আবার ভাবে—বাবা কি এতদিনে আর বেঁচে আছেন ? ঈশ্বর ! এব্রাহিমের ঈশ্বর ! আমার মুখ চেয়ে বাবাকে অন্তত কয়েকটা দিন বাঁচিয়ে দিও।

—কী ভাবছ, ইউসুফ ?

—কিছু না, ও কিছু না ! সংযত স্বরে বলে ইউসুফ। পাছে বান্দাসুলভ কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে, সতর্ক হয়ে ওঠে। এই একটা রাত কর্ত্রীকে খুশি রাখতেই হবে।

—তোমার চোখে জল দেখছি কেন ?

—না তো !

—লুকিও না ইউসুফ ! তোমার চোখে জল দেখলে আমার কষ্ট হয়।

—এ আমার সুখের কান্না, মাননীয়া জুলেখা !

—আবার বলো ! না—শেষ কথাটা।

—মাননীয়া জুলেখা।

—না, শুধু জুলেখা।

—জুলেখা !

জুলেখা চাপাস্বরে আবেগে বলে—আবার বলো। বারবার বলো !

ইউসুফ অগত্যা বলে—জুলেখা !…

—ইউসুফ ! প্রাণের ইউসুফ ! বারবার বলো—সম্মোহিতা মিশরসুন্দরী অধীর হয়ে ওঠে।

ইউসুফ আবার সংযত হয়ে বলে—এবার আহার শুরু করা যাক্ শ্রীমতী জুলেখা !

—আমি তোমায় খাইয়ে দেব, তুমি দেবে আমাকে। বলো রাজী ?

মুক্তির আশায় অস্থির ইউসুফ বলে—রাজী।…

আর পরমপুরুষ এব্রাহিমের ঈশ্বরের মনে কী ছিল, আবার আরেক মায়া বিস্তৃত হল নিশীথ রাত্রির এই নিভৃত কক্ষে।

জুলেখার হাতে সঞ্চারিত হল অমল অমর্ত সেই মায়া—ইউসুফের মুখে খাদ্য তুলে দিতেই দূরের স্মৃতি তাকে মুহূর্তে নিয়ে গেল অতীত সময়ে, এবং সহসা সে এই নারীকে আবিষ্কার করল অন্য রূপে। আর তার চোখে আবার জল ছলছল করে উঠল। জুলেখা বলল—আবার কী হল ইউসুফ ?

—জুলেখা ! এই মুহূর্তে যেন এব্রাহিমের ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করলেন।

জুলেখা হাসে।—তুমি বড় অদ্ভুত ছেলে ইউসুফ !

—হ্যাঁ জুলেখা ! আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। আমার মা আদাহ্ ঠিক এমনি করে খাইয়ে দিত। আর সে কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদিন পরে আমি যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে নারীর স্বরূপ জানলাম। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ শ্রীমতী জুলেখা—এ বড় আশ্চর্য ! তোমার মধ্যে মা এসে আমাকে খাইয়ে দিলেন ! এমন কি অবিকল তার আঙুলের সেই গন্ধ ! আঃ, আমি কতকাল নারীর স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত ছিলাম !

—ইউসুফ ! আমি তোমার প্রেমিকা !

—ঈশ্বর আমাকে বললেন, যে নারী কারও মা, সেই নারী অপর কারও প্রেমিকা হতেও পারে। সৃষ্টির এই যেন নিয়ম। আমার মা আমার বাবার প্রেমিকা ছিল না কি ?

—দুষ্টু ছেলে ! তুমি তোমাদের পয়গম্বরের মতো কথা বলছ !

—মহাত্মা এব্রাহিম পয়গম্বরের বংশধর আমি।

জুলেখা কপট ভর্ৎসনা করে—খুব হয়েছে ! এবার আমাকে খাইয়ে দাও !

আর ঈশ্বরের মায়া আরও বিস্তৃত হতে থাকে। ইউসুফের মধ্যে স্নেহ জাগে। সে সস্নেহে জুলেখাকে খাইয়ে দেয়। জুলেখা বালিকার মতো অধরোষ্ঠ সংকুচিত করে। আবার বিস্ফারিত করে। দুষ্টুমি করে ইউসুফের সঙ্গে।

এক জটিল এবং কুয়াশাপরিকীর্ণ অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ইউসুফকে। ভাবে, এতকাল পরে এই এক নারী স্নেহ-যত্ন-ভালবাসা-আপ্যায়ন ঢেলে দিচ্ছে মুহুর্মুহু তার ওপর। দীর্ঘ এক যুগের দাস-জীবনে কোথায় পেয়েছিল এমন কিছু ? এমন কি এই রাত্রিশেষে মুক্তির প্রতিশ্রুতি !

আর এব্রাহিমের ঈশ্বরের মনে আবার কী ছিল, ধীরে সন্তর্পণে অনুগ্রহবৎ বিস্তৃততর মায়া গুটিয়ে নিতে থাকেন।

আর অভিশপ্ত ফেরেশ্তা ইবলিশ্—যে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশ্তা এবং তাপস, যে আদমকে অকিঞ্চিৎকর বস্তু নশ্বর মাটি দিয়ে গড়া বলে ঈশ্বরের আদেশেও প্রণাম করে নি, এবং তাই যে কিনা ঈশ্বরের অভিশাপে শয়তান নামে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্তে এল, সে দ্রুত প্রবেশ করল এই কক্ষে। তাই, যা হতে পারত স্বাভাবিক বিকাশমুখী এবং ধীরগতি প্রস্ফুটন—হঠকারিতায় তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আর প্রপৌত্রের আত্মায় সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলেন নিদ্রিত পরমপুরুষ এব্রাহিম। যেন বললেন—ইউসুফ ! হুঁশিয়ার—এ বড় সংকট মুহূর্ত।…

ইউসুফ তাকায়।

ভোজন শেষ হয়ে গেছে। জুলেখা একটা সোরাহি থেকে রঙীন পানীয় ঢালছে দুটি পেয়ালায়।

লাস্যময়ী নারী একটি পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বলে—পান করো ইউসুফ !

—কী জুলেখা ?

—ইউনানের উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রাক্ষারস।

—জুলেখা, আমি জানি এ হচ্ছে শরাব।

—হুঁ, শরাব। তুমি বুঝি শরাবী নও?

—না জুলেখা। এব্রাহিমের ধর্মে শরাব নিষিদ্ধ।

—এক পেয়ালা শরাবে তত কিছু পাপ হবে না।

—মাফ করো জুলেখা।

জুলেখা ভ্রূকুটি করে তাকায়। তারপর নিজের পেয়ালা শেষ করে। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থাকে। তারপর চোখ খুলে একটু হেসে বলে—ইউসুফ! এতে আমার অপমান হয়।

—ঈশ্বরের দোহাই জুলেখা, বোলো না!

—বেশ। তাহলে তুমি শুধু ঠোঁট স্পর্শ করে দাও, আমি পান করি।

ইউসুফ দুহাতে মুখ ঢাকে। নত হয়ে থাকে।

জুলেখা আসন থেকে উঠে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকে—প্রিয়তম ইউসুফ! দেরি কোরো না। রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে। কাল থেকে তুমি তো আমার দাস নও—মুক্ত পুরুষ। হয়তো চলে যাবে অন্য কোথাও। শুধু এই একটা অনুরোধ রাখো পিয়তম! এই রাতটুকুর জন্যে আমাকে ভালবাসা দিয়ে সুখী করো।

ইউসুফ শরাবের পেয়ালায় ওষ্ঠ স্পর্শ করে মুখ তুলে নেয়। বাইরে যেন গাধার গলায় শয়তান বিকট হেসে ওঠে। ইউসুফ চমকায়।

জুলেখা পেয়ালা নিয়ে চুমুক দেয়। তারপর খিলখিল করে হেসে ওঠে। তার হাত ধরে টানে।—আজ মুক্তির রাতে তোমার শয়নকক্ষ আমি নিজের হাতে সাজিয়েছি! এস দেখবে এস। আজ রাতে তুমি সারা দুনিয়ার ফ্যারাও, প্রিয়তম।

ইউসুফ আড়ষ্ট পায়ে তার সঙ্গে চলতে থাকে।

শয়নকক্ষ পুষ্পসজ্জিত। বাতিদানে শিখা ঘিরে নীলবর্ণ কাচের* টোপর। রহস্যময় নীলাভ আলো। সুগন্ধি ধূপ পুড়ছে লোহিতবর্ণ অঙ্গারে এবং কুয়াশার মতো হাল্কা ধোঁয়া সঞ্চারিত। নীলসমুদ্রের ফেনপুঞ্জের মতো কোমল শয্যা, পুঞ্জ-পুঞ্জ পুষ্পস্তবকের মতো উপাধান।

ইউসুফ অবাক হয়ে বলে—এঘরে আমি শোব?

—শুধু তুমি না, আমিও।

বলে মোহময়ী মিশরসুন্দরী দরজা বন্ধ করে দেয়। মদিরাচ্ছন্ন চোখে লাস্য রেখে অপাঙ্গে হাসে, এবং ইউসুফের হাত ধরে ডাকে—এস!

ইউসুফ কেঁপে ওঠে। কথা বলতে পারে না।

---

*মিশরে খ্রীঃপূঃ সাত হাজার বছরের আগে কোন এক সময়ে কাচ আবিষ্কৃত হয়। ফ্যারাওদের কবরে কাচ পাওয়া গেছে। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। ইরাকে বারো হাজার বছর আগের কাচের মতো জিনিস পাওয়া গেছে।

আর জুলেখা সহসা নিজের অঙ্গাবরণ উন্মোচন করতে থাকে। ঝরা পাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে গালিচায় সুদৃশ্য পরিধেয়খণ্ড। তার সুডৌল স্তনযুগে হাহাকার করে বুঝি কেঁদে ওঠে সাহারা মরুভূমির বিশাল তৃষ্ণা। সে ইউসুফকে আকর্ষণ করে। অর্ধস্ফুট স্বরে বলে—এস! আমার বুকে ওষ্ঠস্পর্শ করো প্রিয়তম!

আর তার বলিব্যাকুল নগ্নদেহের চাপে ও তীব্র আশ্লেষে থরথর করে কাঁপে বেথেল তৃণভূমির এক সরল বালক।

—ইউসুফ! প্রিয়তম ইউসুফ!…আসঙ্গলিপ্সু প্রেমিকা নারীও ছটফট করে এক গভীরতর জ্বরভাবে। সে ইউসুফের গ্রীবা আকর্ষণ করে ঠোঁটে ঠোঁটের স্পর্শ পেতে চায়। তারপর তার জামা খামচে ধরে হিংস্রহাতে। নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলে। ইউসুফের বুক ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। কম্পিত ঠোঁটে বলে—তুমি কি জীবিত মানুষ, না প্রতিমূর্তি ইউসুফ?

সহসা ইউসুফ তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। আছাড় খেয়ে পড়ে জুলেখা। ইউসুফ দরজা খুলে পালাতে চায়।

অপমানিতা জুলেখা অমনি আর্তনাদ করে ওঠে। চিৎকার করে ডাকে প্রতিহারিণীদের। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায় মহলে। বাঁদী-বান্দা পরিচারক-পরিচারিকা আর কাফ্রি প্রতিহারিণীরা এসে দরজার সামনে ভিড় করে দাড়ায়। ইউসুফ দরজা খুলে পালাবার চেষ্টা করতেই ওরা তাকে ধরে ফেলে।

জুলেখা দ্রুত একখণ্ড বস্ত্রে নগ্নদেহ ঢেকে হিংস্র দৃষ্টিতে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে চাপাগর্জনে বলে—তোরা সাক্ষী থাক্। ওই শয়তান গোলাম আমার বেইজ্জতী করতে ঢুকেছিল আমারই শয়নকক্ষে। এখনই ওকে প্রাসাদের রক্ষীদের হাতে তুলে দে।

ওরা তাকে প্রহার করতে-করতে নিয়ে যায়। তখন দরজা বন্ধ করে অতৃপ্তা অভিমানিনী জুলেখা নির্জন শয্যায় আছাড় খেয়ে পড়ে এবং ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।…

'…And behold, there came up out of the river
Seven kine, flat-fieshed and well-favored ;
…And behold, seven other kine came after them,
poor and very ill-favored and lean-fleshed…
…And the lean and ill-favored kine did eat up
The first seven kine…but they were still
Ill-favored, as at the begining.
So I awoke.'

[The old Testament : Genesis : 41 : 18-19-20-21]

'রাজা বললেন, স্বপ্নে দেখলাম সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভীকে
আরও সাতটি শীর্ণকায় গাভী এসে খেয়ে ফেলল।'

[কোরআন শরীফ : ১২ : ৬ : ৪৩]

ফ্যারাও-এর স্নেহধন্যা জুলেখার সতীত্বহানির চেষ্টা করেছে যে গোলাম, তার শাস্তি শূলদণ্ড। ক্রুদ্ধ ফ্যারাও আদেশ ঘোষণা করলে সৈনিকেরা ইউসুফকে নগরের বাইরে শূলভূমিতে নিয়ে যায়।

আর সেই খবর পেয়ে আলুথালু চুলে ছুটে আসে জুলেখা ফ্যারাও-এর কাছে।—মহিমান্বিত শশাঙ্ক! অপরাধীর শাস্তি লঘু হয়েছে, পুনর্বিচার প্রার্থনা করি।

সস্নেহে ফ্যারাও বলেন—শূলদণ্ড নৃশংসতম দণ্ড, জুলেখা!

—নৃশংসতম শূলেও অপরাধীর আয়ু মাত্র এক পক্ষকাল, সম্রাট। তার অনুতাপের জন্য তার সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালের যন্ত্রণা প্রার্থনা করি।

—কী চাও, জুলেখা?

—তার আজীবন কারাদণ্ড, এবং…

—এবং? ফ্যারাও সকৌতুকে জুলেখার দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

—সেই কারাগারে আমার যখন খুশি প্রবেশের অধিকার চাই।

—কেন, জুলেখা?

—প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যা তাকে দুবার করে চাবুক মারার জন্য।

—বেশ, তাই হবে।…

বধ্যভূমিতে শূলদণ্ড মসৃণ করার জন্য যখন ভালভাবে তেল মাখানো হচ্ছে,

ফ্যারাও-এর নতুন আদেশ যায় এবং ইউসুফকে ওরা জেলখানায় নিয়ে আসে।

নির্জন কারাকক্ষে ইউসুফকে সকাল-সন্ধ্যা এক ঘা করে চাবুক মেরে আসে জুলেখা। এবং নিজের ঘরে ফিরে বোবা ও কালা এক বাঁদীকে ডাকে। তার সামনে নগ্ন হয়ে জুলেখা ইশারায় তাকে চাবুক মারতে বলে। বাঁদী ইতস্তত করে জুলেখা চাবুক তোলে। তখন স্তম্ভিত বাঁদী তাকে সাবধানে কশাঘাত করে।

ইউনান থেকে ফিরে এসে আজিজ সব জেনে বিস্মিত হলেন। ইউসুফের এমন আচরণ তাঁর পক্ষে কল্পনার অতীত।

আর স্ত্রীর পাণ্ডুর বিষণ্ণ চেহারা, সতত অন্যমনস্কতা, আহারে অরুচি, প্রসাধনে বীতস্পৃহা, অনিদ্রা···আজিজকে সংশয়ান্বিত করে। তারপর আবিষ্কার করেন, স্ত্রীর অম্লান দেহে কয়েকটি দীর্ঘ কৃষ্ণাভ রেখা। প্রশ্ন করলে জুলেখা বলে—ও কিছু না।

ক্রমশ সংশয় বাড়তে থাকে শস্য-অধিকর্তার। একদিন আড়ি পেতে আবিষ্কার করেন, বস্তুত কী ঘটেছে। কিন্তু দুর্বলস্বভাব এবং স্ত্রৈণ মানুষটি মুখোমুখি স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত দাবি করতে পারেন না। কারাধ্যক্ষকে উৎকোচে বশীভূত করেন। কারাধ্যক্ষ ইউসুফকে অন্যান্য বন্দীর ঘরে এক সঙ্গে থাকার আদেশ দেন।

বুদ্ধিমতী জুলেখা বুঝতে পারে, তার স্বামীর কাছে আর কিছু গোপন নেই।

আর সে এবার শঙ্কিত হয়। ফ্যারাও-এর কাছে স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে শস্য-অধিকর্তা যদি নালিশ তোলেন, ফ্যারাও-এর স্নেহ নিমেষে উবে যাবে। মিশরীয় সমাজে নারীর সতীত্ব নিয়ে কড়াকড়ি প্রচণ্ড। বর্তমান ফ্যারাও-এর মা হিটাইট-সম্রাট নেভেস্তার প্রেমাসক্ত ছিলেন বলে প্রধান পুরোহিতের আদেশে তাঁকে অর্ধাঙ্গ প্রোথিত অবস্থায় পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছিল।

জুলেখা স্বামীকে সেবাযত্ন করতে তৎপর হয়। ভালবাসতেও চেষ্টা করে—ইউসুফকে ভুলতে চায় বলেই। কিন্তু আজিজের ভাঙা মন জোড়া লাগে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রাচীর গড়ে ওঠে দিনে-দিনে। পৃথক কক্ষে শয়ন করেন আজিজ। আর হতভাগিনী জুলেখার নিদ্রাহারা রাত কাটে, দিনগুলি দীর্ঘতর হয়। উদ্যানে ইউসুফের হাতে লাগানো পুষ্পবৃক্ষে জলসিঞ্চন করে। বীথিকার ছায়ায় নির্জনে বসে অশ্রুপাত করে নীরবে।···

এদিকে কারাগারে রূপবান বন্দী ইউসুফ অন্য বন্দীদের স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধায় দিন কাটায়। সে তাদের 'আকাশের বার্তা' শোনায়। বিশাল তৃণভূমির আকাশে একদা কেমন করে এব্রাহিমের কাছে দেবদূতেরা নেমে আসতেন এবং সুসমাচার জানিয়ে যেতেন, কেমন করে তুর পাহাড়ের গুহায় তার বাবার কাছেও এক দেবদূত এসেছিলেন·· এইসব অদ্ভুত কাহিনী।

আর ইউসুফ জানায়, কেন তাকে ছেলেবেলায় লোকেরা স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারী বলে ডাকত।

এই শুনে এক বন্দী একদিন বলল—ওহে ইউসুফ! গত রাতে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। আমি যেন মাথায় রুটি বহন করছি এবং একটি পাখি

তা খাচ্ছে।* এর মানে কী ভাই ?

ইউসুফ গম্ভীর মুখে বলে—তুমি এব্রাহিমের ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও ভাই। তোমার বিপদ আসন্ন।

—কী বিপদ শুনি ?

—তুমি শূলবিদ্ধ হবে এবং তোমার মাথায় চঞ্চু বিদ্ধ করে পাখি তোমার মগজ তুলে খাবে।

বন্দীরা সবাই হোহো করে হাসে। এই বন্দীর নাম জাফর। তার মুক্তির দিন আসন্ন। তারা ইউসুফকে বিদ্রূপ করে।

কিছুদিন পরে জাফর মুক্তি পায়। আর কী আশ্চর্য ঘটনা, বাইরে গিয়ে মুক্তির আনন্দে সে শুঁড়িখানায় প্রচুর মদ্যপান করে এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শুঁড়ির মাথায় সোরাহি ভাঙে। শুঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে এবং শুঁড়ির লোকেরা তাকে কোতোয়ালের হাতে তুলে দেয়। বিচারে দুর্ভাগা জাফরের শূলদণ্ড হয়। সত্যিসত্যি তার মাথায় এসে বসে এক শ্বেত গৃধিনী। তীক্ষ্ন ঠোঁটের আঘাতে খুলি চিরে হিংস্র গৃধিনী তার মগজ খেতে থাকে।

কারাগারে সেই খবর পেঁছায়। ইউসুফের প্রতি বন্দী এবং রক্ষীরাও সসম্ভ্রমে তাকিয়ে বলে—নিশ্চয় এই বন্দী সূর্যদেব 'রা'-এর অনুগৃহীত। ইউসুফের স্বপ্নব্যাখ্যার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে বাইরে।

আর তার কিছুদিন পরে ফ্যারাও দেখলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

তিনি নীলনদের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় উজান থেকে স্রোতে ভেসে এল সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী। তারা তীরে উঠে ঘাস খেতে লাগল।

একটু পরে ভাটির দিকে স্রোত উজিয়ে ভেসে এল সাতটি শীর্ণকায় কংকালসার গাভী। তারাও তীরে উঠল এবং আর ঘাস না পেয়ে হৃষ্টপুষ্ট গাভী সাতটিকে খেয়ে ফেলল।

কিন্তু তবু তাদের খিদে মিটল না। তারা বিশীর্ণ কঙ্কাল হয়েই রইল এবং আর কিছু না পেয়ে ফ্যারাওকেই খেতে এল। ফ্যারাও আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন।

ঘুম ভেঙে ফ্যারাও দেখেন, শয্যায় শুয়ে আছেন। বাকি রাত আর ঘুম হল না।

সকালে প্রধান পুরোহিতকে ডেকে এক স্বপ্নের কথা জানালেন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত এর ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। তখন দৈবজ্ঞ ও জাদুকরদের ডাকা হল। তারাও ব্যর্থ হয়ে বলল—স্বয়ং দেবদেবীরা যদি জানেন এর অর্থ!

ফ্যারাও ঘোষণা করেন—যদি কেউ এই স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারে, সে যা চাইবে তাই দেব।

---

* কোরআন শরীফ : ১২ : ৫ : ৩৬ শ্লোক। The Old Testament Genesis : 40 : 19-20.

মুখে-মুখে সেখবর পেঁছায় বন্দীশালায়। তখন বন্দীরা বলে—ইউসুফের চেয়ে আর কে স্বপ্নব্যাখ্যাকারী আছে পৃথিবীতে? ওহে ইউসুফ! বলতো ফ্যারাও-এর এই স্বপ্নের কী মানে?

ইউসুফ বলে—স্বয়ং ফ্যারাও ছাড়া এর অর্থ কাকেও বলব না। স্বপ্ন অতি গুরুতর।

কারাধ্যক্ষের কানে যায় একথা। তারপর তিনি ফ্যারাও-এর কাছে যান। স্বপ্নব্যাখ্যাকারী এক বন্দীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় তিনি জানেন।

তা শুনে ফ্যারাও বলেন—নিয়ে এস সেই বন্দীকে।···

নিভৃত কক্ষে ইউসুফ ফ্যারাও-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে—মাননীয় মিশরাধিপতি! আপনি উজান থেকে ভেসে আসা যে প্রথম সাতটি গাভীকে দেখেছেন, তারা সাতটি সুফলা বছর। এই সাত বছর বাতাস বইবে শস্যের অনুকূল গতিতে। আর যে দ্বিতীয় সাতটি গাভী দেখেছেন, তারা নিষ্ফলা সাতটি বছর। তখন বাতাস বইবে শস্যের প্রতিকূল গতিতে। অতএব হে সম্মানিত ফ্যারাও! আসন্ন সুফলা সাতটি বছর ধরে শস্যভাণ্ডারে প্রচুর উদ্বৃত্ত শস্য মজুত রাখুন। পরবর্তী সাত বছর পৃথিবীব্যাপী ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।*

এই ব্যাখ্যা মনঃপূত হয় ফ্যারাও-এর।

কিন্তু নিঃসংশয় হবার জন্য জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠান ফ্যারাও। জ্যোতিষীরা আকাশের গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সংস্থান বিচার করে জানান, শস্যানুকূল আবহাওয়া আসন্ন। প্রচুর বৃষ্টিপাত, কিন্তু বন্যা হবে না নীলনদে। মিত্র গ্রহগণ সুপ্রসন্ন রয়েছেন। শত্রু গ্রহগণ নিদ্রিত। তাঁদের নিদ্রাভঙ্গের হেতুস্বরূপ কোন ধূমকেতুর আসার সম্ভাবনা এ সাত বছরে নেই। কিন্তু···

ফ্যারাও বলেন—কিন্তু কী?

—সূর্যদেবের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেবী আইসিস হাই তুলেছিলেন। একটি ধূমকেতু নির্গত হয়েছে। মিশরের আকাশে পেঁছতে তার সাত বছর লেগে যাবে। তখন শত্রু গ্রহগণের নিদ্রাভঙ্গ হতে পারে। আর সেই ধূমকেতুর তীব্র জ্যোতিঃপুঞ্জে মিত্র গ্রহগণের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। ফলে প্রচণ্ড সঙ্কট সৃষ্টি হবে।···

ফ্যারাও ইউসুফের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—এর বিনিময়ে তুমি কী চাও বন্দী?

—বন্দী যে, সে কারামুক্তি ছাড়া আর কী চাইতে পারে সম্রাট?

—তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি আরও কিছু চেয়ে নাও।

---

* সেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ সব ছবি এবং পোড়ামাটির ফলকে লেখা বর্ণনা আবিষ্কার করেছেন পুরাতাত্ত্বিকরা। [রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার মুখপত্র Courier, Sept. 1966 সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য।]

—আর কিছু আমার চাইবার নেই, সম্মানিত ফ্যারাও!

বিস্মিত ফ্যারাও বলেন—তুমি কে? তোমার পূর্বপরিচয় কী?

—আমি ছিলাম শস্যব্যবসায়ী আজহারের এক গোলাম।...ইউসুফ তাঁকে তার মিশরজীবনের সব কথা জানায়।

শুনে ফ্যারাও বলেন—কী অদ্ভুত! আমিই তোমাকে জুলেখার অভিযোগে শূলদণ্ড দিয়েছিলাম! বুঝতে পারছি, শয়তানী জুলেখা মিথ্যাবাদিনী। আমি তাকে শাস্তি দিতে চাই।

ইউসুফ অনুনয় করে বলে—মাননীয় ফ্যারাও, আমি তাকে ক্ষমা করেছি। তার ওপর আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। আপনি অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করুন।

ক্রুদ্ধ ফ্যারাও বলেন—মিশরে আইন খুব কঠোর, ইউসুফ! জুলেখার শাস্তি অনিবার্য। তবে তোমার কথায় শাস্তি কিছু লঘু করতে রাজী আছি। আমি তাকে নির্বাসনদণ্ড দেব।

—জুলেখার স্বামী আছেন, সম্রাট। তিনি তাঁর স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসেন, আমি জানি।

ফ্যারাও গর্জন করেন—উচ্ছন্নে যাক্ আজিজ! তার নামেও উৎকোচগ্রহণের অসংখ্য অভিযোগ আছে। এতদিন শুধু জুলেখার মুখ চেয়ে তাকে ক্ষমা করে এসেছি। আর নয়।

ইউসুফ সাহস পায় না কিছু বলার। সে ভাবে, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ফ্যারাও-এর কাছে জুলেখা ও তার স্বামীর ক্ষমা দাবি করবে। কিন্তু ফ্যারাও ভীষণ উত্তেজিত। তখনই প্রশাসনাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠান। আদেশ ঘোষণা করেন।

তারপর ইউসুফকে বলেন—তুমি আপাতত আমার অতিথি, ইউসুফ। এবং আমি ভাবছি, শস্যসংক্রান্ত প্রচুর অভিজ্ঞতা তোমার আছে—তোমাকেই আমি রাজপ্রাসাদের সদ্য শূন্য হওয়া শস্য-অধিকর্তার পদটি দেব। আর তোমাকে দেখামাত্র বুঝেছি, ইউসুফ, তুমি কোন অভিজাত বংশের সন্তান। এতদিন কোন বৈরী দেবতার কোপে পড়ে তুমি দুর্গতি ভুগেছ!

ফ্যারাও পুনরপি বলেন—আর ইউসুফ! আমার ইচ্ছা প্রধান পুরোহিত পত্তিফেরাহ্-এর কন্যা সুন্দরী আসেন্নাতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।*

ইউসুফের মনে হয়, তার কানের কাছে এব্রাহিমের ঈশ্বরের বার্তাবাহী ফেরেশ্তা জিব্রিল ফিসফিস করে বলছে—হে অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের সন্তান! তোমার জীবনের আবার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করা হল।...

আর তখন শস্য-অধিকর্তার মহলে সৈনিকেরা হতভাগিনী জুলেখাকে মিশরের বাইরে নির্বাসনে পৌঁছে দেবার জন্য গ্রেফতার করতে এসেছে। শস্য-অধিকর্তা আজিজ সদ্য শুনেছেন নিজের চাকরি যাওয়ার আদেশ। ক্ষুণ্ণমনে ফিরে

* The Old Testament : Genesis : 41 : 45.

আসছেন মহলে। হঠাৎ দেখতে পান, সৈনিকেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাঁর স্ত্রীকে। ক্রুদ্ধ আজিজ খরসান হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্ত্রীকে রক্ষা করতে চান। কিন্তু রণে অনভ্যস্ত সাদাসিদে মানুষটির বুকে তখনই এক সৈনিকের ভল্ল এসে বেঁধে। আজিজ রক্তাক্তদেহে পড়ে যান। জুলেখা একবার ঘুরে দেখে মাত্র। ওষ্ঠ দংশন করে নিজের অজ্ঞাতে। তারপর আস্তে বলে—বলপ্রয়োগে কী লাভ, সৈনিক? চলো—কোথায় নিয়ে যাবে। এবং দ্বারপ্রান্তে প্রস্তুত রথে গিয়ে সে ওঠে।…

…যখন শস্য হল দুষ্প্রাপ্য, খাদ্য গেল কমে।
কাঁদতে থাকল শিশুরা, আর যুবকরা হল স্থবির
বৃদ্ধের মতো অবসন্ন, পা টেনে কষ্টে হাঁটে,
ভগ্ন মনোবল। হায়, সবকিছুর ধ্বংস এবার!

*[চতুর্দশ ফ্যারাও-এর কবরে পাওয়া ফলক : খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচহাজার অব্দে]

'Lament like the vergin girded with
Sack-cloth for the husband of her youth.
Alas for the dey…the seed
Is rotten under their clods,
The garners are laid desolate
And the barns are broken down…
How do the beast groan! Oh Lord,
To thee will I cry…'

[The old Testament]

মিশরের পুরোহিতকন্যা আসেন্নাতের স্বামী নতুন শস্য-অধিকর্তা ইউসুফ নীলনদের দু'তীরে সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখতে গেছেন। শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছে দেখেছেন আরও কর্ষণযোগ্য সুবিস্তৃত ভূমি নিষ্ফলা পড়ে আছে। সুফলা সাতটি বছরের কাছে আরও শস্যের উপহার গ্রহণ করা যেতে পারে, এবং এভাবেই উদ্বৃত্ত শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

রথের অশ্বকে কশাঘাত করলেন ইউসুফ। অপরাহ্ণের রক্তিম রোদে উর্বর কুমারী মাটিকে মনে হল প্রেমিকা নারী। অন্যমনস্ক হলেন তরুণ শস্য-অধিকর্তা।

* রাষ্ট্রপুঞ্জের FAO শাখার মুখপত্র 'Courier' এ প্রকাশিত (Sept. 1966).

একখানে রথ দাঁড় করিয়ে নেমে একমুঠো মাটি পরীক্ষা করেন ইউসুফ। আবার রথে ওঠেন। এগিয়ে যান দূর থেকে দূরে। চঞ্চল দৃষ্টে অবলোকন করেন শস্যসম্ভবা অববাহিকা। আবার অন্যমনস্ক হন। হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। যেন মাটির মধ্যে প্রেমিকা নারীর আশ্লেষ অনুভব করেন। কিছু মনে পড়ে যায়—নিষিদ্ধ, গোপন কোন স্মৃতি।

আর যেন কোমল মাটির জরায়ু থেকে বীজের জন্য করুণ প্রার্থনা শুনতে পান।

আর যেন বলিব্যাকুলা নারীর চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসক্লিষ্ট প্ররোচনা জেগে ওঠে—আমায় কর্ষণ করো, বিক্ষত করো হে রূপবান পুরুষ! ওই দেখ, আকাশে ঘনিয়ে এল কাজলজলদপুঞ্জ, বায়ু হল উদ্দাম। বিদ্যুতে অন্ধ কামনার মুহুর্মুহু চীৎকার হল ধ্বনিত। আমাকে প্রধর্ষণে এবং বীর্যপ্রহারে করো জর্জরিত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েকমুহূর্ত দিগন্তে দৃষ্টিপাত করেন তরুণ শস্য-অধিকর্তা।

তারপর সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠেন। রথে উঠে নগরের দিকে অশ্বচালনা করেন।

পরদিন থেকে ফ্যারাও-এর আদেশে সুবিস্তীর্ণ অববাহিকায় হাজার-হাজার দাস ভূমিকর্ষণে নামে। নতুন খাল কাটা শুরু হয়। ইউসুফ প্রতিদিন অপরাহ্নে এসে তদারক করে যান। পরামর্শ দেন। বীজ বোনার দিন আসে। প্রধান পুরোহিত এসে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। গাভীর মুখবিশিষ্টা দেবী 'হেথর' (অন্য নাম 'আথির')-এর পুজো হয় মহাসমারোহে। রাষ্ট্রীয় কৃষির সূচনা ঘটে ইউসুফের হাতে। শস্যক্ষেত্রের কেন্দ্রে দেবীর মন্দিরের দেয়ালে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছবি আঁকে। দেবী হেথরের স্তন্যপানরত ফ্যারাও-এর সেই বিশাল ছবি দূর থেকে দেখা যায়।

নিরাকার একেশ্বরবাদী পয়গম্বর এব্রাহিমের প্রপৌত্র ইউসুফ তখন নতুন কৃষিক্ষেত্রের শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

পাশে তাঁর রথ এবং অশ্ব। দূর থেকে ভেসে আসছে উৎসবের আওয়াজ। হঠাৎ ইউসুফের খুব বিরক্তি জাগল। রথে উঠে দক্ষিণে চলতে থাকলেন।

তাঁর পৌত্তলিকতাবিরোধী বাল্যসংস্কারে আঘাত লেগেছিল। উৎসবের শব্দের বাইরে যেতে চাইছিলেন। বনি-ইস্রায়েল (ইস্রায়েল বংশ)-দের আকাশ-বাণীতে সেই বিরাটের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। আর এব্রাহিমের ঈশ্বরের মনে কী ছিল,—যতদূর যান ইউসুফ, ওই শব্দ শোনেন। তখন অশ্বকে জোরে কশাঘাত করেন। আরও দূরে এগিয়ে যায়। বেলা শেষ হয়ে আসছে, সে-খেয়াল নেই।

কখন মিশর সীমান্ত পেরিয়ে গেছেন, তাও জানতে পারেননি। পাহাড়ী উপত্যকা এবং অরণ্য চোখে পড়ল। উৎসবের শব্দ আর কানে আসছে না।

ক্লান্তভাবে রথ থামালেন। তৃষ্ণা পেয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে ঝর্ণা কিংবা নদী খুঁজছেন। তেমন কিছু দেখতে পেলেন না।

হঠাৎ ইউসুফ দেখেন, সামনে পাহাড়ের গায়ে একখানে ধোঁয়া উঠছে। সেদিকে রথ চালিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে। পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে রথ থেকে নামেন এবং দ্রুত ধোঁয়া লক্ষ্য করে পাহাড়ে উঠতে শুরু করেন।

পাহাড়ের গায়ে সমতল কিছু জমি। তার একপ্রান্তে একটি কুটির রয়েছে। এবং কুটির নয়, কুটিরের সামনে বিচিত্রবর্ণের ফুলে-ফুলে সুদৃশ্য একটি বাগানই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর চোখে পড়ে, বিবিধ ফলের গাছ। প্রতিটি গাছ ফলবতী। পাখিরা কূজন করছে। প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছে। কুটিরের বারান্দায় একটি দুগ্ধবতী ছাগী তিনটি বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে। বিস্মিত ইউসুফ আরও কয়েক পা এগিয়ে কুটিরের পিছনের ছোট্ট ক্ষেতে যবের চারা দেখতে পান। আরও কয়েক পা অগ্রসর হন। এবার কানে আসে ওপাশে কোথায় ঝর্ণার ঝরঝর শব্দ হচ্ছে।

ছেলেবেলায় বাবার কাছে শোনা প্রপিতামহ এব্রাহিমের স্বর্গের বর্ণনা মনে পড়ে যায় ইউসুফের। ঈশ্বর কি তাহলে তাঁকে সশরীরে সেই স্বর্গে টেনে এনেছেন?

এইসময় তাঁর দৃষ্টি যায় সেই ছোট বাগানের কোণের দিকে। একটুকরো মসৃণ পাথরের বেদীতে কেউ হাঁটু মুড়ে বসে আছে।

সে এক নারী। শুভ্রবসনা। তার হাতদুটি অঞ্জলিবদ্ধ। একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। তার চোখদুটি বন্ধ বলেই মনে হল। দিনের আলো দ্রুত কমে যাচ্ছে। ইউসুফ শোনেন, নারী প্রার্থনা করছে—ঈশ্বর! এব্রাহিমের ঈশ্বর! আর কতদিন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে আমাকে? বলো প্রভু, আর কতদিন?···

কে এই নিরাকারবাদী তপস্বিনী? ইউসুফের বিস্ময় বাড়ে। এ কি কোন বনি-ইস্রায়েল হিব্রু নারী? তার প্রার্থনা চলে যেন অনন্তকাল। পাহাড়ে আসন্ন সন্ধ্যার কুয়াশা ঘনিয়ে আসে ধীরে।

ইউসুফ অস্থির হয়ে প্রতীক্ষা করেন।

কতক্ষণ পরে তপস্বিনীর প্রার্থনা শেষ হয় এবং বেদী থেকে নামে। তারপর আবছা আঁধারে ইউসুফকে দেখে সে চমকে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বলে—কে?

ইউসুফ বলেন—আমি মিশরের শস্য-অধিকর্তা।

—বেচবার মতো শস্য কোথায় আমার? সামান্য জমি মাত্র। নিজের বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু পারি, যব চাষ করি। আপনি বরং জনপদে গিয়ে চেষ্টা করুন।

—শস্য কিনতে আসি নি। আমার তৃষ্ণা পেয়েছিল।

—মাননীয় মিশরীয় শস্য-অধিকর্তার তৃষ্ণা কি নীলনদের জলে মেটেনি?

ফ্যারাও-এর প্রাসাদেও তো মিঠে জলের ফোয়ারা আছে অসংখ্য।

—পরিহাস করবেন না দয়া করে। আমি সত্যি তৃষ্ণার্ত। জল খুঁজতে-খুঁজতে আপনার এখানে চলে এসেছি।

—তাই বুঝি!—বলে সে কুটিরে গিয়ে ঢোকে। কুটিরের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রদীপ জ্বালে। তারপর প্রদীপ হাতে নিয়ে মৃন্ময় পাত্রে জল এনে ডাকে—জল নিন।

তার একহাতে প্রদীপ, অন্য হাতে জলপাত্র। প্রদীপের আলো তার গ্রীবা পেরিয়ে মুখের অনেকখানি স্পষ্ট করেছে। ইউসুফ চিৎকার করে ওঠেন—জুলেখা! জুলেখা! তুমি!

সঙ্গে সঙ্গে ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিবিয়ে দেয় জুলেখা। মৃৎপাত্রের জল মাটিতে ঢেলে ফেলে। তারপর ছুটে গিয়ে কুটিরে ঢোকে। সশব্দে কপাট বন্ধ করে দেয়।

ইউসুফ ছুটে যান। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন—জুলেখা! জুলেখা! এ নিশ্চয় এব্রাহিমের ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে! দয়া করে দরজা খোলো, জুলেখা!

ভেতর থেকে জুলেখা শ্বাসক্লিষ্ট স্বরে বলে—তুমি চলে যাও, ইউসুফ! এখনই চলে যাও!

ইউসুফ মিনতি করে বলে—কথা শোন জুলেখা! তোমাকে বলার কথা আছে। অনেক, অনেক কথা এতদিনে আমার মধ্যে জেগে উঠেছে, তোমায় শোনাতে চাই। আমার আত্মবিস্মৃতি কবে দূর হয়ে গেছে, কেমন করে বোঝাব তোমাকে? হায় জুলেখা! যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকে যে গোলাম হয়ে সারাক্ষণ শুধু অন্যের আদেশ পালন করতেই ব্যস্ত থেকেছে, সে কেমন করে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখার সময় পাবে? তার যৌবন, তার বাসনা-কামনা—সব কিছুই তো ছিল তার প্রভুর অধীনে বন্ধকী বস্তুর মতো নিজের আয়ত্তাতীত। যখন সে মুক্তি পেল, তার চোখ মেলে তাকাবার সুযোগ এল। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে।

ইউসুফ বালকের মতো ক্রন্দন করে বলে—তুমি জানো না জুলেখা, ফ্যারাও-এর সৈনিকদের কাছে তোমার সন্ধান চেয়েছি গোপনে। তারা বলেছে, ফ্যারাও-এর আদেশে কোন নির্বাসিতের ঠিকানা জানাতে তারা অক্ষম। শুধু এটুকু বলেছিল তারা, মিশরের দক্ষিণ সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিল তাদের রথ। তাই কতবার আমি এদিকে শস্য-ক্ষেত্রের উপযুক্ত জমি সন্ধানের অজুহাতে এসেছি এবং সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে খুঁজেছি কোন জনপদ—সেখানে যদি কেউ তোমার সন্ধান দিতে পারে! কিন্তু শুধু পাহাড় আর অরণ্য দেখে ফিরে গেছি। আজ নিজের অগোচরে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় এতদূরে এসে হঠাৎ তৃষ্ণা পেল এবং তোমার কুটিরে ধোঁয়া দেখতে পেলাম। বিশ্বাস করো জুলেখা, আমার পবিত্র রক্তের শপথ, প্রতিটি বাক্য সত্য। আর জুলেখা, তুমি তো জানো—আমার নাম সত্যবাদী ইউসুফ!...

জুলেখার বিদ্রূপভরা বাক্যে ভেসে আসে কুটির থেকে—সত্যবাদী ইউসুফ

কি জানে না মিথ্যাবাদিনী জুলেখার মুখদর্শন পাপ ?

—পাপ-পুণ্যের বিচারের কর্তা এব্রাহিমের ঈশ্বর, জুলেখা।…ইউসুফ বুকে করাঘাত করে বিলাপ করেন।…তিনিই তো মানুষের হৃদয়ে দিয়েছেন প্রেম, যা থেকে প্রজ্বলিত হয় ইশ্‌কের (আসক্তির) আগুন! তিনিই তো মানুষকে দিয়েছেন যৌবন এবং সৌন্দর্য—আর পুষ্পকে উজ্জ্বল বর্ণ দিয়েছেন তিনি, প্রজাপতিকে করেছেন প্রেমিক, ভূমিকে দিয়েছেন বীজের আকাঙ্ক্ষা, আকাশকে দিয়েছেন মেঘপুঞ্জে আকর্ষণের শক্তি! জুলেখা, নিখিল বিশ্বের এই বিশাল নিয়ম-পারম্পর্য যে বোঝেনি, সে মূর্খ ছাড়া আর কী ?

—এতদিনে বুঝেছ কি ইউসুফ ?

—বুঝেছি জুলেখা; প্রেমেই নিহিত থাকে সৃজনের বীজকণিকা। ঈশ্বরের প্রেমেই এই বিশ্বসৃষ্টি হয়েছে। নরনারীর প্রেমে তার পরিপূর্ণতার আয়োজন। আমি তোমার কাছে ক্ষমাভিখারী। আমার জন্যই তুমি নির্বাসিতা। দয়া করে দরজা খোলো এবং বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়াও। সেই সুন্দর পাদুখানি স্থাপন করো আমার বুকে—আমি হই ভূমি, তুমি হও পুষ্পবতী তরু। আমার হৃৎপিণ্ডে বিস্তৃত হোক তোমার রেশমী শিকড়গুচ্ছ।

কুটিরের মধ্যে স্তব্ধতা। জুলেখা কি নিঃশব্দে কাঁদে ?

ইউসুফ আবার ডাকে—জুলেখা !

কতক্ষণ পরে জবাব আসে—ফিরে যাও ইউসুফ! আসেন্নাত্‌ তোমার প্রতীক্ষায় প্রাসাদশীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে। আমার শৈশব-সঙ্গিনী আসেন্নাতের হৃদয় বড় কোমল, আমি জানি। একজনকে সারাজীবনের জন্যে দুঃখ উপহার দিয়েছ, আরেকজনকে দিও না।

—আসেন্নাতকে আমি ত্যাগ করলে তাকে গ্রহণের মতো পুরুষ মিশরে অনেক আছে, জুলেখা। আমি তোমাকে চাই।

জুলেখার হাসি শোনা যায়।—আসেন্নাতকে ত্যাগ করলে তোমার চাকরি যাবে। সে প্রধান পুরোহিতের কন্যা।

—তবু আমি তোমাকে চাই, জুলেখা।

—নির্বাসিতা মেয়েকে নিলে মিশরে তোমার স্থান হবে না।

—আমি কেনানে ফিরে যাব।

—তাহলে অপেক্ষা করো।

—কতদিন, জুলেখা ? কতদিন ?

—চৌদ্দ বছর।

—চৌদ্দ বছর! কেন—কেন জুলেখা ?

—মূর্খ ইউসুফ! একদিন জুলেখা বিনামূল্যে নিজেকে দিতে চেয়েছিল। তুমি নাও নি। এবার তাকে চাইছ। কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়ে সে এবার মূল্য দাবি করছে। চৌদ্দটা বছরের মূল্যে তাকে পাবে। কিন্তু একটা কথা এই

চৌদ্দবছরের মধ্যে যদি দৈবাৎ আমাদের পরস্পর দেখা হয়ে যায়, আবার চৌদ্দ-বছর তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।…

ইউসুফ কুটিরের দরজা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললে—বেশ, তাই হবে।

বিদায় সম্ভাষণ শোনার প্রত্যাশা করলেন। কিন্তু আর জুলেখার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্ধকারে পাহাড় থেকে নেমে এলেন। ধীরে অশ্বচালনা করে অন্ধকারে অনুমানে রথ নিয়ে গেলেন উত্তরে মিশর সীমান্তের দিকে। ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন ইউসুফ।…

তারপর দিন কেটে যায়। দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। সারা মিশরে এতটুকু ভূমি অকর্ষিত থাকে না।

ধরিত্রী নিজেকে উজাড় করে শস্য দেন। বিশাল শস্যাগার ভরে ওঠে প্রতিবছর।

এভাবে সাতটি সুফলা বছর কেটে যায়। মিশর শস্যশ্রীতে উজ্জ্বলতম হয়ে থাকে।

তারপর হঠাৎ একদা রাতের আকাশে উল্কার ঝাঁক স্খলিত হতে দেখে মিশর-বাসীরা। তারপর দেখা দেয় দেবী আইসিসের উদ্বায়ুজাত সেই ভয়ঙ্কর ধূমকেতু। মিশরপ্রদক্ষিণ করে সে চলে যায় উত্তর-পূর্ব দিগন্তের দিকে। শিহরিত হয় আতঙ্কে ইউসুফ। ওদিকেই কেনানদেশ!

শুরু হয় প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহ। সূর্যদেব রা অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিপাত করেন। নীলনদের জল শুকোতে থাকে। কৃষিতে জলাভাব দেখা দেয় এবং সবুজ শস্য শুকিয়ে খড় হয়ে যায়। কূপগুলিও যায় শুকিয়ে। প্রস্রবণের ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে।

ইউসুফ এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। পানযোগ্য জল সঞ্চয় করে রেখেছিলেন গোপনে ভূগর্ভের কক্ষে। মিশরবাসীরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে সেই জল পায়। শস্যভাণ্ডার থেকে তেমনি নির্দিষ্ট পরিমাণে শস্যও পায় তারা। ইউসুফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সবাই।

ওদিকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—চারদিকে দেশে-দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে অজন্মার তৃতীয় বছর থেকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মানুষ আর পশুর কঙ্কাল পাহাড়ে জমছে।

কীভাবে খবর রটে যায় দেশে-দেশে—মিশরে উদ্বৃত্ত শস্য রয়েছে। শস্য কিনতে আসে বিদেশীরা। প্রথমে অর্থ দিতে চায় চতুর্গুণ। তারপর অনুনয়-বিনয় করে। শস্য-অধিকর্তার পায়ে মাথা ভাঙে। মিশরের পথে পথে ঘোরে শস্যক্রেতারা করুণ মুখে।

ইউসুফ বিচলিত হন। ফ্যারাওকে বলেন—সম্রাট! হিসেব করে দেখেছি, আমাদের শস্যাগারে যা সঞ্চিত আছে—তার দুই তৃতীয়াংশ বেচে দিলেও কোন

আশঙ্কার কারণ নেই। আর চারটি বছর অজন্মার কাল। একতৃতীয়াংশ শস্যে মিশরবাসীর এখনও সাতটি বছর হেসে খেলে চলে যাবে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বিদেশে শস্য বিক্রির অনুমতি দিন।

ফ্যারাও একটু ভেবে নিয়ে বলেন—সত্যবাদী ইউসুফ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তাই সব তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। শুধু মনে রেখো, মিশরবাসীর প্রাণ তোমার বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে।

ইউসুফ শস্যাগারের দ্বার বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন।

সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশে-দেশে।

আর ততদিনে কেনানের রূপ গেছে বদলে। পশুপালকগোষ্ঠী কৃষিনির্ভর জীবন শুরু করেছে। বেথেলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নগর গড়ে তুলেছে হজরত ইয়াকুবের জ্যেষ্ঠপুত্র রুবেন। বিস্তৃত চারণভূমি পরিণত হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে।

আর ইউসুফের শোকে কেঁদে-কেঁদে অশীতিপর বৃদ্ধ গোষ্ঠীপতি ইয়াকুব অন্ধ হয়ে গেছেন। ইউসুফের মা আদাহ অকালে বৃদ্ধা এবং উন্মাদিনীর মতো কখনও আপনমনে কাঁদেন, কখনও হাসেন। তাঁর সতীন জিলপাহ্ মৃতা। জিলপাহ্-সন্তানরা সবাই বিবাহিত এবং পুত্রকন্যার জনক হয়েছে।

অন্ধ হজরত ইয়াকুবকে পুত্রেরা ধরে নিয়ে যায় প্রার্থনা চত্বরে। সেখানে বসে ধর্মোপদেশ দেন। আর সমবেত প্রার্থনার পর ইস্রায়েলী সম্প্রদায় চলে গেলে একা চুপচাপ বসে থাকেন। ফেরেশ্তা জিব্রিলের প্রতীক্ষা করেন। অন্তর্বর্তী দৃষ্টিতে দেখতে পান তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি।

জিব্রিল বলেন—পরম প্রতিপালকের কাছে বন্ধকদত্ত পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করে স্বর্গের পথে আর কাঁটা দিও না ইয়াকুব! যথেষ্ট হয়েছে। এবার শুধু ঈশ্বরে মন সমর্পণ করো।

ইয়াকুব নিজেকে দমন করতে পারে না। হাহাকার করে ওঠেন—আমার মন মানে না! হায় মহিমান্বিত ফেরেশ্তো! আপনি তো জনক নন! কেমন করে বুঝবেন পুত্রবিয়োগের বেদনা! আপনার ঈশ্বর জানেন, এ কী বিষম বস্তু! কারণ তিনিই আদম-পুত্রদের হৃদয়ে বাৎসল্য দান করেছেন।···

অজন্মায় শস্যহানি এবং প্রচণ্ড খরায় অজস্র পশু মারা পড়ল জল ও ঘাসের অভাবে। মানুষও মরতে শুরু করল। সারা কেনানে দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমে এল। ক্ষুধা! ক্ষুধা! আর্তনাদ করে শিশুরা। যুবকরা বিশীর্ণ কঙ্কাল হয়ে ঘোরে। যুবতীরা প্রেতিনীর মতো প্রেমহীনা-সৌন্দর্যহারা। সিডার বাঁশি বাজে না নির্জন প্রান্তরে।

সেই সময় একদিন রুবেন খবর আনে, মিশরের রাজার শস্যাগার থেকে শস্য বিক্রি করা হচ্ছে।

এগারো ভাই মিলে প্রত্যেকে দুটি করে গাধা নিয়ে মিশরে রওনা হয়। সঙ্গে নেয় সঙ্গতিমতো অর্থ। অনেক কষ্টে সাতদিনে তারা মিশরে পোঁছায়।

শস্যাগারের দরজায় ভিড়ের মধ্যে তাদের দেখামাত্র ইউসুফ চিনতে পারেন। বিচলিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু মনোভাব গোপন করে রূঢ় ভঙ্গীতে বলেন—কোন দেশের লোক আপনারা ?

ওরা ইউসুফকে চিনতে পারে না। বিনীতভাবে রুবেন বলে—আমরা আসছি কেনান দেশ থেকে। দয়া করে আমাদের কিছু শস্য দিন। আমরা একসঙ্গে দাম দেব।

—আপনারা কি পরস্পর আত্মীয় যে একসঙ্গে শস্য কিনতে এসেছেন ?

—আমরা এগারোটি ভাই।

—বাবার নাম কী ?

—হজরত ইয়াকুব।

—আপনাদের আর কোন ভাই আছে ?

—কেন এ প্রশ্ন করছেন, মাননীয় অধিকর্তা ?

—বিজোড়সংখ্যক দলকে শস্য বিক্রির নিয়ম নেই।

একথা শুনে রুবেন কেঁদে ফেলে—হায়, আজ যদি আমাদের ছোটভাই বেঁচে থাকত!

—কী হয়েছিল আপনাদের ছোটভায়ের ?

রুবেন নতমুখে বলে—দৈবাৎ কূপে পড়ে গিয়েছিল।

—তাকে উদ্ধার করেন নি কেন ?

রুবেন অন্য ভাইদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ভাঙা গলায় বলে—তিন দিন পরে আমি ওকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আর দেখতে পাইনি! আমার বাবা তাকে বেশি ভাল বাসতেন। তিনি তার জন্য কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছেন! আর তার মা এখন প্রায় উন্মাদিনী!

ইউসুফ অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করেন। তারপর বলেন—আপনাদের মৃত ভাইকে হিসেবে ধরে নিয়ে শস্যবিক্রির অনুমতি দিলাম।

কৃতজ্ঞতায় এগারো ভাই অমনি তার পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে দেয়।

আর ইউসুফের মনে পড়ে যায় সেই শৈশবের স্বপ্নের কথা—একাদশ নক্ষত্র পদাবনত হবে! দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যান। নির্জনকক্ষে কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করেন। তারপর ডাকেন ওজনকারীকে। সে এলে বলেন—শোন। কেনানের যে এগারোজন লোক শস্য কিনতে এসেছে, তাদের শস্যের থলেয় দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা কৌশলে ভরে দেবে। কারণ জানতে চেয়ো না। আদেশ পালন করো।

ওজনকারী আদেশ পালন করে। ইয়াকুবপুত্ররা গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে কেনান রওনা হয়।

কিছুদূর চলার পর হঠাৎ পিছনে রথের শব্দ শুনে তারা থমকে দাঁড়ায়। রথে চেপে একদল সৈনিক এসে তাদের ঘিরে ধরে। সৈনিকরা বলে—তোমাদের

শস্যের থলে পরীক্ষা করা হবে।

তারা বলে—এ কী অন্যায় কথা। এ তো বড় অদ্ভুত আচরণ মিশরে!

—অত কথায় কাজ কী হিব্রুভূতেরা? থলেগুলো নামাও। হিব্রুদের শঠতা কে না জানে।*

—আমরা কি চোর? কেন এভাবে হয়রানি করা হচ্ছে অকারণে?

—চোর না সাধু, থলে পরীক্ষা করলেই মালুম হবে।...বলে সৈনিকরা গাধার পিঠ থেকে থলেগুলো নামায় এবং মাটিতে শস্য ঢালতে থাকে।

বাইশটি থলে থেকে দশটি করে ফ্যারাও-এর নাম ও প্রতীক খচিত স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে পড়ে। তারা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এগারোজনকেই বন্দী করে ইউসুফের সামনে আনা হয়। তখন ইউসুফ ধমক দিয়ে রূঢ়স্বরে বলেন—তোমরা চুরি করেছ কেন? তোমাদের শাস্তি কারাদণ্ড।

তারা কান্নাকাটি করে। পায়ে ধরতে যায়। বলে—আমাদের বাবা-মা এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানরা অনাহারে এতক্ষণ হয়তো মারা পড়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা চুরি করিনি। থলেয় কীভাবে দেহ্‌রেম আসতে পারে, আমরা বুঝতে পারছি না। দয়া করুন আমাদের, দয়া করুন!

ইউসুফ বলেন—বেশ। তোমাদের বড় ভাই কিছু শস্য নিয়ে যাক। বাকি সবাই এখানে জিম্মা থাকবে। তোমাদের বাবা-মা যদি এসে বলেন, এরা জীবনে কখনও চুরি করেনি—তাহলে দশজনই মুক্তি পাবে। কারণ বৃদ্ধেরাই সত্যবাদী। কিন্তু যদি তাঁদের না আনতে পারো, তাহলে এ দশজনকে শূলে চড়িয়ে মারা হবে। দুই সপ্তাহ সময় দিলাম।

রুবেন একটু ভেবে বলে—কিন্তু ওঁরা অশক্ত মানুষ। আসার পথে যদি দৈবাৎ মারা যান, তাহলে কী হবে মাননীয় অধিকর্তা?

ইউসুফ বলেন—দৈবের ওপর কারও হাত নেই। তবে আপনি যাতে দ্রুত ফিরে আসতে পারেন, সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দ্রুতগামী চারটি সেরা ঘোড়ার রথ, একজন চিকিৎসক এবং একদল রক্ষী দিচ্ছি আপনার সঙ্গে। মনে রাখবেন এসবই আপনাদের বৃদ্ধ বাবা-মার সম্মানে। কারণ বৃদ্ধদের সম্মান করাই আমার স্বভাব। কারণ তাঁরাই সত্যদ্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক।

রুবেন অশ্রুসজল চোখে বলে—আপনি মহানুভব পুরুষ!...

চিকিৎসক, রক্ষীদল ও রুবেন রথে চড়ে কেনান যাত্রা করে। এদিকে হুজ আবরাহ হোন্নাজ প্রমুখ দশভাই অবাক হয়ে দেখে, তাদের বন্দীশালার বদলে অতিথিশালায় আপ্যায়িত করা হচ্ছে। তারা ভাবে, শূলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে এই বুঝি মিশরীয় প্রথা। আতঙ্কে তারা কাঠ হয়ে থাকে। খাদ্য রোচে না মুখে। তারা নতমুখে রোদন করে।

---

* হিব্রু—হজরত এব্রাহিমের সম্প্রদায়ের নাম। তাদের ভাষার নামও হিব্রু। তাঁদেরই পরবর্তী-যুগে ইহুদী বলা হয়েছে।

তিনদিনেই বেথেলহেম থেকে ফিরে এল দ্রুতগামী রথ।

হজরত ইয়াকুব এবং আদাহ এসেছেন।

শস্য-অধিকর্তার প্রাসাদের সামনে তাঁদের রথ থেকে নামতে সাহায্য করে রুবেন এবং সৈনিকরা।

পরিচারকরা এসে তিনজনকে ভিতরে নিয়ে যায়। সুসজ্জিত কক্ষে তাঁদের বসানো হয়। আর পাশের কক্ষ থেকে গোপন গবাক্ষপথে ইউসুফ বাবা ও মাকে দেখে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করেন।

কিছুক্ষণ পরে ইউসুফ পর্দা তুলে আত্মপ্রকাশ করেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ হজরত ইয়াকুব অস্ফুটস্বরে বলে ওঠেন—কী আশ্চর্য। আমি যেন আমার ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি! আদাহ! আদাহ! এতকাল পরে আমার প্রিয়তম পুত্রের ঘ্রাণ কেন পাচ্ছি? ও রুবেন! রুবেন! কেন এখানে ইউসুফের সুগন্ধ ভেসে আসছে?

আর উন্মাদিনী আদাহ তীব্র দৃষ্টে ইউসুফের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠেন—তুমি কে? কে তুমি? তুমিই কি আমার জঠরের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নও?

ইউসুফ এসে নতজানু হয়ে মায়ের উরুদেশে মুখ রাখেন। আদাহ তার পিঠে হাত রেখে বলেন—আমি জানতাম! স্বপ্ন দেখতাম! আমি বিশ্বাস করতাম, আমার ইউসুফ বেঁচে আছে।

হজরত ইয়াকুব হাত বাড়িয়ে তাকে খোঁজেন। কাঁপতে-কাঁপতে বলেন—ইউসুফ! কোথায় ইউসুফ! আমার কাছে আসছে না কেন?

তখন ইউসুফ তাঁর পদচুম্বন করেন।

আর এব্রাহিমের ঈশ্বরের করুণায় ইয়াকুবের দৃষ্টি স্বচ্ছতর হতে থাকে। স্পষ্টতর হয়ে ওঠে হারানো ইউসুফের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। ইয়াকুব চিৎকার করে ওঠেন—আমি ওকে দেখতে পেয়েছি! আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি!

'...And Israel said unto Joseph,
Now let me die, since I have
Seen thy face. because thout art
Yet alive.'

[The old Testament : Genesis : 46 : 30]

'...ইলাহী, গুন্‌চা-ই উম্মিদ বচুকায়
গুলে অজ্‌ রওজা-ই জাবিদ্‌ বনুমায়
বখন্দান্‌ অজ্‌ লব্‌-ই আন্‌ গুন্‌চা বাগম্‌
ওয়াজ্‌ আন্‌ গুল্‌ এতর-পরওয়ার কুন্‌ দিমাগম্‌ ।।'

ঈশ্বর ! হে ঈশ্বর ! পূর্ণ করো কামনা—
এ কবর যেন প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে ওঠে,
তার ঠোঁটে যেন এ উদ্যানেরই হাসি দেখতে পাই,
আর তার মধুর সৌরভে আপ্লুত হয় হৃদয়মন ।।
[ফার্সি কবি জামী রচিত 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্যের একটি রুবাই ।]

নীলনদের ওপারে সূর্য উঠেছে ।

চৌদ্দ বছরের শেষ রাত্রিটি প্রভাত হল । এবং ইউসুফ বেরিয়ে পড়লেন দ্রুতগামী রথে ।

মিশর-সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণে চলল তাঁর রথ । রুক্ষ পাহাড় এবং দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে শ্রীহীন বিশীর্ণ শুকনো অরণ্য সচকিত করে তুলল চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি । ধুলো উড়ল । তার দুরন্ত গতিপথে হরিণ হরিণী হল ছত্রভঙ্গ । সিংহ-সিংহী লুকিয়ে পড়ল পাহাড়ের গুহায় । তারা ক্ষুধার্ত এবং অভিমানে গর্জন করল তিনবার ।

ইউসুফ তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে রথচালনা করেন । সাতবছরের অনাবৃষ্টিতে প্রকৃতির রূপ জরাগ্রস্ত হয়েছে । মনে সংশয়—চিনতে পারবেন তো ? ঈশ্বর ! এব্রাহিমের ঈশ্বর ! যেন পথ ভুল না করি ! আর প্রেমিকের জন্য সকল পথই তোমার করুণায় নিয়ে যায় না কি প্রেমতীর্থাভিমুখে ? হজরত ইউসুফ মনে-মনে প্রার্থনা করেন । উজ্জ্বল রোদ্রে শরীর ঘামে ভেজা । পথের ধুলোয় ধূসর । আকণ্ঠ তৃষ্ণায় তিনি অধীর । যেন এই যাত্রা দীর্ঘ চৌদ্দবছর ধরে জুলেখার অমৃত-ঝর্ণার দিকে ।

একটি উপত্যকায় পৌঁছে মনে হয়, বুঝি এখানেই । পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করে কুটিরে ধোঁয়া দেখেছিলেন সেদিন । আজ কুটির বা ধোঁয়া কিছুই চোখে পড়ল না ।

কিন্তু রোদ্রে পাহাড়ের গায়ে ক্ষীণ একফালি ঝর্ণার শুভ্র বিচ্ছুরণ দেখতে পেলেন যেন ।

তারপর যেন দেখলেন বর্ণময় ওড়নার মতো একখণ্ড পুষ্পবন এবং প্রজাপতির ঝাঁক। শুনতে পেলেন যেন পাখিদের কলকাকলি।

সঙ্গে সঙ্গে রথ থামিয়ে এক লাফে মাটিতে পা দিলেন। চিৎকার করে ডাকলেন—জুলেখা! জুলেখা! চারদিকের পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ল—জুলেখা! জুলেখা!

পাহাড়ের ধারে সেই সমতল জমিতে পেঁছে ইউসুফ অবাক হন।

পুঞ্জ পুঞ্জ শুকনো লতাপাতার ধূসর স্তূপে দাঁড়িয়ে আছে শীর্ণ কয়েকটি গাছের কঙ্কাল। কোথায় পুষ্পবন এবং প্রজাপতির ঝাঁক? কোথায় পাখির ডাক? পাথরে একটি ক্ষুধার্ত ঈগল বসে আছে এবং তার ঘননীল চোখে চকচক করছে লোভ। ইতস্তত পড়ে আছে অজস্র পাখির পালক। ইউসুফ অস্ফুটস্বরে ডাকেন—জুলেখা!

কোন সাড়া নেই। ওই পাথরেই কি ছিল তার কুটির? ঢিল ছুঁড়ে ঈগলটাকে তাড়িয়ে দেন ইউসুফ। কয়েক পা এগিয়েই বুঝতে পারেন কুটিরের ধ্বংসস্তূপের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁদিকে প্রার্থনার বেদী দেখেছিলেন মনে পড়ে। ঘুরে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন। আবার ডাক দিয়ে বলেন—জুলেখা! আমি এসেছি!

জুলেখা পিছন থেকে সাড়া দিয়ে ফিসফিস করে বলে—এসো।

চমকে ওঠেন ইউসুফ। তারপর বুঝতে পারেন বিশুষ্ক বৃক্ষশাখা ও লতাস্তূপে বাতাসের মর্মরধ্বনি।

বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

বেদীতে পড়ে আছে একটি মনুষ্যকঙ্কাল।

আর খোদিত রয়েছে কিছু বাক্য। কাঁপতে কাঁপতে বেদীর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়েন ইউসুফ।

'…অনুসন্ধানী পথিক! এই বেদিকায় যদি কয়েকটুকরো হাড় দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য তোমার হয়, জেনো—নির্বাসিতা হতভাগিনী মিশরসুন্দরী এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, তাকে কবর দিয়ে পুণ্যার্জনের লোভ সংবরণ কোরো। কারণ, এই অস্থিখণ্ডগুলি তার প্রিয়তম ইউসুফেরই প্রাপ্য।'…

'…এবং হে পথিক! প্রকৃত প্রেম বিবেক-বিবেচনাহীন, জেনো। কারণ সেই প্রেমের অপর নাম স্বাধীনতা। যদি কোনদিন পয়গম্বর এব্রাহিমের মাননীয় প্রপৌত্রের সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তাকে বোলো, স্বাধীনতাহীন বিবেকপীড়িত প্রেমের অনুসরণকারী যে—তার পক্ষে প্রেমিকার অস্থিখণ্ড ছাড়া আর কী প্রাপ্য থাকতে পারে?'…

হজরত ইউসুফ বেদিকার ওপর দুহাত প্রসারিত করে অস্থিখণ্ডগুলি বুকের তলায় গ্রহণ করেন।
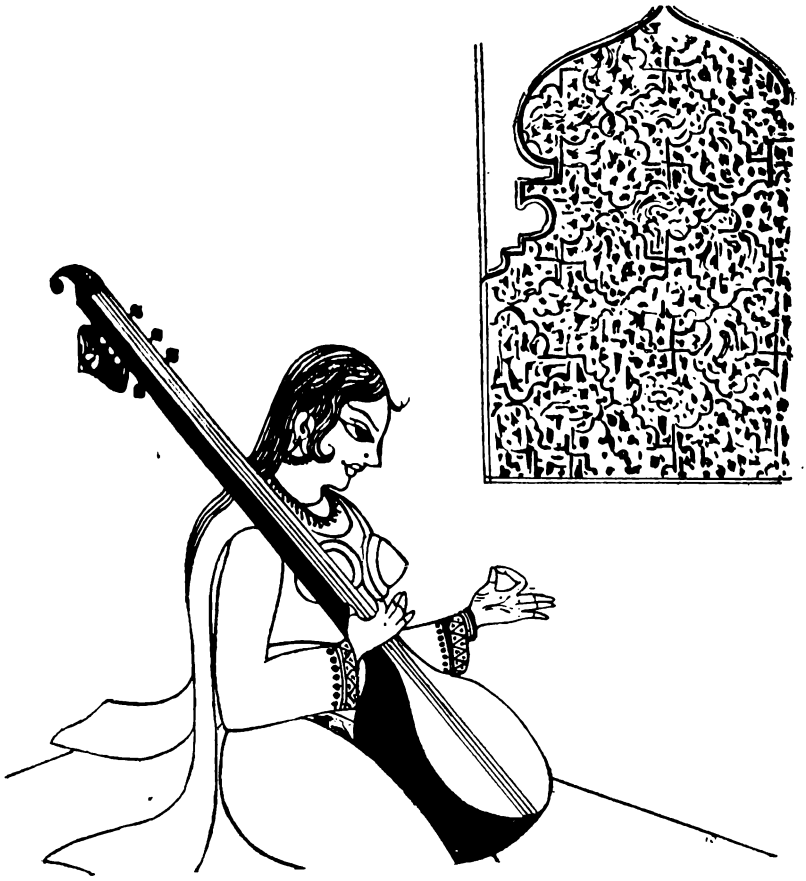
শিরীঁ-ফরহাদ

সপ্তম শতাব্দীর এক ধূসর সন্ধ্যা।...

কোহে-আরমান রাজ্যের রাজধানী কোহিস্তানের বাইরে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় তাঁবু ফেলেছে বিশাল এক কাফেলা।

ওরা সওদাগর। এসেছে দূর-দূরান্তের নানা দেশ থেকে। সকালের অপেক্ষায় বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা। কারণ, তার আগে নগরীতে প্রবেশের আশা নেই। প্রধান ফটক খোলা হবে সেই প্রত্যূষে।

ওরা এসেছে নওরোজের মেলায়। এই রাত্রি শেষ হলেই বসন্তোৎসব নওরোজ। সারা ইরানে নতুন বছরের প্রথম দিন। হাজার-হাজার বছর ধরে পূর্বপুরুষ আর্যদের এই প্রথা ইরান মেনে আসছে। খণ্ডরাজ্য কোহে-আরমানও সেই গৌরবময় মহান উত্তরাধিকারকে উৎসব দিয়ে অভিনন্দিত করে। তার রাজধানী কোহিস্তানে নওরোজের উৎসব সবার সেরা।

নওরোজে কোহিস্তানের একটি বড় আকর্ষণ সুন্দরী রমণীরা। তাদের সৌন্দর্যের কথা ইরান-তুরান-আরব থেকে চীন আর হিন্দুস্তান পর্যন্ত কিংবদন্তী খ্যাত।

কিন্তু বিদেশী সওদাগররা শুধু নারীর রূপের বিনিময়ে সওদা বিকিয়ে দেবার জন্য নিশ্চয় এত ক্লেশ স্বীকার করতে রাজী নয়। তারা চেনে শুধু টাকাকড়ি। ব্রোঞ্জ আর সোনার সিংহখচিত মুদ্রা।

তারা জানে, কোহে-আরমানী নারীরা স্বাধীন। এ রাজ্যের একচ্ছত্র শাসনভারও নারীর হাতে। আর, নারীর চেয়ে উদার ক্রেতা কে হতে পারে? বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল পণ্যসম্ভারে নারীকে প্রলুব্ধ করা কত সহজ, তাও তারা জানে।

হিন্দুকুশ পর্বতমালা পেরিয়ে এসেছে যে বদখশানী এবং কান্দাহারী সওদাগর, সে এনেছে পশমী আঙরাখা, পিরহান, মেখরাব, রূপালী বাজুবন্ধ, কোমরবন্ধ, দস্তানা। তুরানী সওদাগর এনেছে কিংখাব আর জাজিমের রত্নখচিত জোব্বা। দামেস্ক, বাগদাদের সওদাগর এনেছে সুদৃশ্য খাপে ঢাকা ছুরিকা, খঞ্জর, ধনুর্বাণ আর ভল্ল। আরব্য সওদাগর এনেছে সুপক্ক খর্জুর আর খোর্মা। সমরখন্দ ও বোখারার সওদাগর সওদা সাজিয়েছে শুকনো আঙুর, নাসপাতি, আপেলগুচ্ছে। বসরা থেকে এসেছে উৎকৃষ্ট গোলাপ নির্যাস আর রকমারি শরাব। চীনের সুচিক্কণ বর্ণসুষমামণ্ডিত কারুকার্যখচিত সোরাহি ও পেয়ালা না পেলে কোহিস্তানী যুবতী কলজে ছিঁড়ে খাবে। ইউনান (গ্রিস) এবং রুমের (রোম) ধাতুনির্মিত মূর্তি দিয়ে ওরা ঘর সাজাবে। হিন্দুস্তানের কাশ্মীরী গালিচা,

রেশমী পিরহান, পশমী শাল, অলঙ্কার, কুমকুম, আর হরেক প্রসাধনসামগ্রী না এলে ওরা হতভাগ্য কোহিস্তানী পুরুষদের মাথা মুড়িয়ে দিতে দেরি করবে না। একখানি হিন্দুস্তানী কাঁচুলির দাম একজন কোহিস্তানী যুবতীর হৃদয়।

কোহিস্তান যেন এক দুর্গনগরী। কোহ্ মানে পর্বত। এ রাজ্য পর্বতসঙ্কুল। রাজধানী এই নগরীর চারদিক দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা। ওই উপত্যকার দিকে তার প্রধান ফটক। ফটকের প্রাকারশীর্ষে মশাল জ্বলছে ইতস্তত। নিপুণ তীরন্দাজ প্রহরীদের সঞ্চরমান ছায়ামূর্তি চোখে পড়ছে।

এই রাত্রি শেষ হলেই ওই ফটকশীর্ষের নহবতে ঘোষিত হবে নওরোজ। নকিব তূর্যধ্বনির সংকেতে ডাক দেবে—হে বিদেশী সওদাগরবৃন্দ! কোহিস্তান পবিত্র নওরোজে তার হৃদয় খুলে দিয়েছে তোমাদের জন্য। তোমরা এবার এস।···

উপত্যকার প্রান্তরে খর্জুরবীথি। তার এক প্রান্তে একটা পাথরের ছোট চত্বর। সেখানে একা সন্ধ্যার নমাজ পড়ছেন খোরাসানের সওদাগর তিরুমত্ বেন্দা। খেজুর পাতার বিশীর্ণ শীর্ষে বিদ্ধ রয়েছে ক্ষীণ একফালি চাঁদ। বসন্ত ঋতুর সোনালী পতাকা।

বেন্দার নমাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন আরেক সওদাগরই বা! ক্ষীণ চাঁদের ছটায় তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল দেখাচ্ছে। বারবার এদিকে-ওদিকে ঘুরে কী যেন দেখছেন।

বেন্দার নমাজ শেষ হল। প্রার্থনার পর দুহাত মুখে ঘষে পিছনে ঘুরলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। অমনি আগন্তুক দ্বিতীয় সওদাগর তাঁর করমর্দন করে বললেন—আস্সালাম্ আলাইকুম্ সওদাগর বেন্দা!

—ওয়া আলাইকুম্ সালাম্ সওদাগর উমিদ খান!

—বান্দার নাম স্মরণ রাখার জন্য কৃতজ্ঞ।

—এ অধমকে লজ্জা দেবেন না মহামান্য সপ্রু। আমিই আপনার দাসানুদাস।

—চুপ্। পাথরেরও কান আছে।

—কিছু কি গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে? হঠাৎ আবার···

—না। তেমন কিছু ঘটেনি ভাই বেন্দা। তবে পরিকল্পনাটা বদলাবার দরকার হয়েছে। ওদিকে চলুন। বলছি।···

দুজনে খর্জুরকুঞ্জের পিছনে নির্জন জায়গায় গিয়ে বসলেন।

—বেন্দা, এখানে পেঁৗছে এক তসবিরওয়ালাকে আবিষ্কার করেছি। চমৎকার তসবির আঁকতে পারে সে। তার নাম মোবারক। বাড়ি তুরানে।

—তসবিরওয়ালা মোবারক? তাকে তো আমি চিনি। তোখরান সরাইখানায় তার সঙ্গে গতবার আলাপ হয়েছিল। ছোকরা সত্যি এলেমদার।

উমিদখান বা সপ্রু বেন্দার একটা হাত চেপে ধরে চাপা স্বরে বলেন—সম্রাজ্ঞী মুহিবানু একমাত্র আপনাকেই হারেম-ইস্-সতুনে ঢুকতে দেন।

—হ্যাঁ। আমার কাছেই তিনি সওদা করেন।

—আপনি মোবারক তসবিরওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

—কেন বলুন তো?

—সে যেভাবেই হোক, শাহজাদী শিরীঁর একটা তসবির এঁকে আনবে।

তিরমত্ বেন্দা চমকে ওঠেন—অসম্ভব। শাহাজাদী-মহলে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। শাহজাদী যতদিন না সম্রাজ্ঞী হচ্ছেন, ততদিন ওঁকে পুরুষের মুখ দেখতে দেওয়া হবে না—তা তো জানেন মাননীয় সপ্রু!

—জানি। কিন্তু ওদিকে আমার শাহজাদা খুসরুর হুকুম, কোহিস্তানের শাহজাদীর একটা তসবির চাই। আপনি তো জানেন, মদ-ই-অনের শাহজাদা পারভেজ খুসরু কেমন দুর্দান্ত প্রকৃতির যুবক।

—কিন্তু এ যে দুঃসম্ভব, জনাব সপ্রু। আপনি শাহজাদাকে বুঝিয়ে বলবেন…

—দশহাজার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পাবেন, বেন্দা!

—পাব। কিন্তু গর্দান যাবে।

—যাবে না। যা বলছি, শুনুন।

—বলুন।

—মোবারকের যা চেহারা, ওকে স্ত্রীলোক সাজালে কেউ কিছু টের পাবে না। তসবিরওয়ালী সেজে শাহজাদীমহলে ঢুকবে এবং শাহজাদী শিরীঁর তসবির আঁকবে। দুটো তসবির আঁকবে কিন্তু। একটা তসবির লুকিয়ে নিয়ে আসবে। ব্যস, কেল্লা ফতে!

—কিন্তু বেচারা যদি দৈবাৎ ধরা পড়ে যায়! শাহজাদীমহলে ধূর্ত স্ত্রীলোকরা সবসময় সজাগ রয়েছে। আছে ভয়ংকরী হাবসী প্রতিহারিণীরা। মোবারক রাজী হবে তো?

—সে রাজী না হলে আপনাকে বলছি কেন? মোবারকও যে শিরীঁকে দেখার জন্যে পাগল।

চাপা হাসেন তিরমত্ বেন্দা।—কিন্তু শাহজাদা খুসরুর মন কি শুধু তসবিরেই ভরবে জনাব সপ্রু?

হতাশভাবে সপ্রু বলেন—ওঁকে বোঝানো বৃথা। আপনি তো জানেন—আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন কিনা, যেভাবে হোক শাহজাদীমহলে ঢুকে শিরীঁকে একবার দেখে আসতে হবে এবং তার রূপের বর্ণনা আমাকে দিতে হবে। ওতেই নাকি ওঁর কৌতূহল মিটে যাবে! কী অদ্ভুত খেয়াল!

বেন্দা বলেন—তাহলে মোবারককে পেয়ে আপনার মাথাটি গর্দানে বহাল থেকে গেল!

সপ্রু হাসেন। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বলেন—এভাবে আর দুজনে নির্জনে বসে থাকা ঠিক নয়। কে কী ভাববে। চলুন, তাঁবুতে যাই।…

দুজনে সতর্কভাবে কাফেলার ভিড়ের দিকে এগিয়ে যান। উট ঘোড়া গাধা খচ্চরগুলো এখন মহানন্দে ভোজনে রত। তাঁবুর বাইরে মানুষেরও ভোজনের আয়োজন চলেছে। প্রোথিত লৌহদণ্ডে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় ছায়া-ছায়া মূর্তি চলাফেরা করছে। ক্রীতদাস বান্দারা রাতের ছুটি পেয়ে ইতস্তত নাচগানের মজলিশ বসিয়েছে। মাথার ওপর বিশাল নক্ষত্রভরা আকাশ। কাফ্রি বান্দাদের হাতে রুমাল উড়ছে। তুরানী নর্তকীদের মতো কোমর দুলিয়ে ওরা নাচছে। কেউ দফ্ বাজিয়ে কাহারবার বোল তুলেছে।

সওদাগরদের পণ্যসম্ভার রক্ষা করছে সশস্ত্র রক্ষীদল। তারা অভ্যাসবশে হঠাৎ-হঠাৎ চিৎকার করছে—কোই হো! হোঁশিয়ার।

শৌখিন সওদাগরের তাঁবুতে এখনই রাতের জলসা শুরু হয়েছে।

পুরু সুদৃশ্য গালিচায় কিংখাব-জাজিমের তাকিয়া। মেহ্মান সওদাগররা আরামে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কারও ঠোঁটে আলবোলার নল। সুগন্ধি তামাকের নীল ধোঁয়া তাঁবুর দুনিয়াকে ঘুমঘুম নেশায় আবিষ্ট করেছে। কারও হাতে শরাবের পেয়ালা। নিমীলিত চোখ। প্রায়-নগ্ন নর্তকীর নাচের তারিফ করে জড়িত কণ্ঠস্বরে বলে উঠছে—মারহাবা! মারহাবা!

লাস্যময়ী নর্তকী দাঁতে আঙুরগুচ্ছ নিয়ে প্রভুর মুখের সামনে ধরলে প্রভু কুট করে কেটে নিচ্ছেন দু'একটি রসালো আঙুর। কোনও তাঁবুতে নাচের মুদ্রায় শরীর রেখে নর্তকী সোরাহি থেকে ঢেলে দিচ্ছে গোলাপগন্ধী শিরাজী। শিরাজ শহরে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ সুরা। মত্তমাতাল তরুণ সওদাগরের পায়ের আঘাতে স্খলিত সোরাহি ভিজিয়ে দিচ্ছে বহুমূল্য গালিচা।

রাত গভীর হলে ওই সব গালিচায় বিস্রস্ত কেশে অসংবৃত বেশে অবলুণ্ঠিতা সুন্দরীদের বুকে পা রেখে ঘুমিয়ে থাকবে সওদাগর। দলিত বসরাই গোলাপের গন্ধ তখনও ফুরিয়ে যাবে না। বাতিদানে ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলবে।

আর বাইরে প্রচণ্ড হিম রাত্রির নির্জনতা চিরে রক্ষীর চিৎকার শোনা যাবে—কোই হো! হোঁশিয়ার!

শেষ প্রহরে কোহিস্তানের শিয়রে ককেশাস পর্বতের চূড়া রক্তিম হয়ে উঠলে মোয়াজ্জিন আজান হাঁকবে। কাফেলার তাঁবুতে ঘুম ভেঙে যাবে সওদাগরদের। তখন ঈশ্বরের কথা মনে পড়বে আবার।...

আজ নওরোজের দিন।

শাহজাদীমহলের নিভৃত উপবনে আজ প্রথম বসন্ত এসে দাঁড়িয়েছে। গুল-বাগিচায় বুলবুল গাইছে গান। তরুণ কিশলয়ে, মঞ্জরীতে, সদ্যবিকশিত কুসুমে

সোহাগস্পর্শ দিয়েছে স্নিগ্ধ বসন্ত বায়ু। মৌমাছিরা কিন্নরকিন্নরীর মতো নূপুরনিক্বণে শিঞ্জিত করছে গুলিস্তান। শুভ্র মর্মর-ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত হচ্ছে স্ফটিকচূর্ণের মতো হিমশীতল জলকণা। সরোবর হিল্লোলিত করে একদল যুবতী জলকেলিতে মগ্ন। মাঝে মাঝে অকারণ তারা খিলখিল করে হেসে উঠছে। পরস্পরের দিকে জল ছুঁড়ছে। মর্মরতটসংলগ্ন প্রধান সোপানে তাদের বর্ণাঢ্য রেশমী অঙ্গাবরণ পড়ে আছে। তারা নগ্ন। নগ্ন, কিন্তু কোন লজ্জাসংকোচ নেই। বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। কারণ এ মহলে কোন পুরুষ নেই। পুরুষের ছায়া পড়লেই কোতল করা হবে।

ওরা যুবরাজ্ঞী শিরীঁর সহচরী। দুনিয়া ঢুঁড়ে সেই শৈশবে ওদের আনা হয়েছে কোহিস্তানে। ওরা শিরীঁর বাল্যের খেলার সঙ্গিনী, কৈশোরে বন্ধু, এবং এ যৌবনে প্রিয়তমা সহচরী।

কোহে-আরমানের শাহজাদীর সুখদুঃখের শরিক ওরা।

আজ নওরোজের প্রত্যুষকাল থেকে নাচগান করে শাহজাদীমহল মাতিয়ে রেখেছিল ওরা। এখন অপরাহ্ণে ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, বেপথু। তাই অবগাহনে নেমেছে।

সোপানের শীর্ষে দুপাশে দুটি প্রস্তর নির্মিত সিংহ। বলিষ্ঠ গ্রীবা বাঁকা করে তারা তাকিয়ে আছে পিছনের দিকে। তাদের ওপর বসে আছে দুই বীণা-বাদিকা। মৃদু বীণাধ্বনিতে বসন্তঋতুর বার্তা হচ্ছে স্পন্দিত।

কিন্তু শাহজাদী কোথায়?

কেলিমগ্না যুবতীদের সেদিকে খেয়াল নেই। এক নগ্নতনু সুন্দরী জল থেকে মৎস্যকন্যার মতো সরোবরের মর্মরতটে উঠে বসেছে। জলের দিকে ঝুঁকে নিজের রূপ দেখছে। কিন্তু বড় বেতমিজ ওই শেষবেলার আরক্তিম সূর্য। তার রশ্মিজালে আকীর্ণ সরোবর। চোখে বর্ণচ্ছটার প্রতিফলন। সে কপালে হাত রেখে সূর্যকে আড়াল করে গাল দেয়—বেতমিজ কাঁহেকা!

জলের তলায় তলায় এসে এক যুবতী তার পায়ে সুড়সুড়ি দেয়। সে লাফিয়ে ওঠে। পা তুলে নেয়। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খিলখিল করে হাসে।

—নার্গিস! নিজের রূপ দেখে কী পাস বল্ তো?

—তুই যে অত সেজেগুজে থাকিস সবসময়, কী পাস বল্‌তো দিল্-আফরোজ?

—যাঃ! ইচ্ছে করে কি সাজি? শাহজাদীর হুকুম যে!

—কিন্তু ভাই, শাহজাদী তো নিজে সাজে না আগের মতো?

দিল্-আফরোজ চাপা স্বরে বলে—হঠাৎ কিছুদিন থেকে কী যেন হয়েছে শাহজাদীর। কেমন মনমরা ভাব। আগের মতো হাসিখুশি দেখতে পাস?

—ঠিক বলেছিস!

—আজ নওরোজের দিনেও ওর হাবভাব লক্ষ্য করেছিস? অত করে সবাই

বললাম, স্নানে নামল না। গত নওরোজে কিন্তু সন্ধ্যা অব্দি সাঁতার কেটেছিল! কী বলেছিল মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ। ওই হাঁসদুটো যতক্ষণ জলে থাকবে, ততক্ষণ উঠব না।

—তাই শেষঅব্দি গুলশন চালাকি করে হাঁস দুটোকে জল থেকে ওঠাল!

নার্গিস হঠাৎ ফিসফিস করে বলে—হ্যাঁ রে, শাহজাদী কোন পুরুষমানুষের প্রেমে পড়েনি তো?

দিল্‌-আফরোজ এত জোরে মাথা দোলায় যে ভিজে চুল থেকে বৃষ্টির মতো জলকণা ছড়িয়ে পড়ে। সে বলে—অসম্ভব।

—কেন, অসম্ভব কেন?

—মায়মুনা বুড়ি বলে, যে মেয়ে কখনও পুরুষমানুষ দেখেনি ছেলেবেলা থেকে, সে যত জওয়ানীই হোক, পুরুষমানুষের জন্যে তার কোন লোভ হবে না।

—যাঃ, যাঃ! ওই কুচুটে বুড়ির কথা তুই শুনে বসে আছিস! ও তো রাজ্যের মিথ্যে কথার ঝুলি নিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ নার্গিস বলে ওঠে—কী মুশকিল! শাহজাদীকে কি জিনপরীতে পেল? দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌!

দুজনে দেখল, শাহজাদী শিরীঁ উপবনের অন্যপ্রান্তে দ্রাক্ষাকুঞ্জের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ নগ্ন। একটুকরো গোল পাথরের ওপর একটা পা রেখেছে, একটা হাত কোমরে। অন্য হাতে একটা গোলাপ। গোলাপটার দিকেই যেন তাকিয়ে আছে সে।

তার পায়ের কাছে উদ্যানে জলসেচের জন্য একটা চাওড়া নহর বা নালা রয়েছে। নিঃস্রোত নহরটি স্বচ্ছ কাজল জলে পূর্ণ। শাহজাদী শিরীঁ কি নিজের রূপে আত্মহারা?

এক মুহূর্ত দেখেই দিল্‌-আফরোজ বলে ওঠে—ও নার্গিস! শাহজাদীকে তোর রোগেই ধরেছে!

—তার মানে?

—তুই সেদিন ওখানে ঠিক ওইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলি না?

—হ্যাঁ, ছিলুম। শাহজাদী আমাকে জিগ্যেস করছিল, কেন ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকি মাঝে মাঝে।

—তুই কী বললি?

—বললাম, শাহজাদী! খুব ছেলেবেলার কিছু কিছু কথা আমার আবছা মনে পড়ে। কোথায় যেন দেখেছিলাম, একটা বাগানে নহরের ধারে পাথরে এক পা রেখে ঠিক এমনি ভঙ্গীতে একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। মূর্তি সাদা পাথরের। কেন সেখানে গিয়েছিলাম, কী করছিলাম, কিছু মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, মূর্তিটা আমার ভারি ভাল লেগেছিল। তাই ওভাবে দাঁড়াতে ইচ্ছে করত।

—নার্গিস! মায়মুনা বুড়ি বলে, তোকে এনেছিল হিন্দুস্তান থেকে।

—আর তোকে নাকি রুম শহর (রোম) থেকে এনেছিল?

—ওই বুড়ির কথা বিশ্বাস করি না।

অন্য যুবতীরা ততক্ষণে দুজনকে কথা বলতে দেখে এগিয়ে এসেছে। টেনে নামায় মর্মরতট থেকে। সিক্ত কেশ আকর্ষণ করে বলে—বল্, চুপি চুপি কী কথা হচ্ছিল?

দুজনে নহরের দিকে আঙুল তুলে শাহজাদীকে দেখায়। শাহজাদী শিরীঁ যেন এই গুলবাগিচার এক অপরূপ মর্মরীভূত সৌন্দর্য।

নওরোজের সকল আবেগ যদি হঠাৎ কোন মন্ত্রবলে স্থিরতায় প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে, তাহলে তা ওই শাহজাদী শিরীঁর আত্মমগ্ন নগ্নদেহ।

যদি শত বসন্তের শত গুলিস্তান একটি মাত্র রূপে প্রকাশ করা যায়, তাহলে তা এখন শাহজাদী শিরীঁ।

তার বুকে দুটি মদিরাপূর্ণ স্বর্ণভৃঙ্গার, নাকি বিকচ দুটি সুগন্ধি বসরাই গোলাপ! সুডৌল স্তনচূড়ায় থরথর করে কাঁপছে তামাম পশ্চিম এশিয়ার দামাল দুরন্ত লু-হাওয়া। কী এক প্রতীক্ষিত স্তব্ধতায় বসন্তের গুলিস্তান উন্মুখ।

আর কী দুর্জ্ঞেয় আবেগে তার নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফুরিত। অপাপবিদ্ধ উজ্জ্বল চাহনিতে সে সদ্য বিকশিত গোলাপের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পেলব বাহুর বঙ্কিমতায় নির্জন স্রোতস্বিনীর স্বাধীনতার ছন্দ। তার নিভাঁজ উদ্ধত নাভিদেশ সুপ্ত আগ্নেগিরির গর্বে ও শক্তিতে অচঞ্চল, অথচ কী গভীর কোমলতা। ধীরে নেমেছে কুসুমিত উপত্যকা যেন রহস্যময় গোপন আনন্দ-খনির অভিমুখে। দুই উরুতে বসন্তের উজ্জ্বল দুঃসাহসী আমন্ত্রণ। এ নারী যেন বা নারী নয়—নারীত্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তারই সমাহার। রমণীয় সৌন্দর্য এবং যৌবন একাকার হয়ে গেলে যা গড়ে ওঠে, তাই শিরীঁ।

বসন্তের দোয়েল শিরীঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

প্রজাপতির ঝাঁক তাকে ছুঁয়ে চুপি চুপি বলে যাচ্ছে—ক্ষমা করো। তোমাতে পুষ্পের রূপ এবং সুঘ্রাণ আমাদেরও বিভ্রান্ত করে।

বসন্তের গুলিস্তান ধীর গম্ভীর প্রাকৃতিক ঐকতানে বন্দনা করে বলছে, শিরীঁ আছে বলেই কোহিস্তানে বসন্ত আসে।

সহসা আবিষ্টা শাহজাদীর চমক জাগে।

দুটি পারাবতের পক্ষবিধুননে উপবনে সাড়া পড়ে যায়। পুষ্পিত তরু-শাখায় মুখোমুখি বসে তারা কূজন করতে থাকে। পরস্পরকে স্পর্শ করে রক্তিম ঠোঁটে।

শাহজাদী এ দৃশ্য কতবার দেখেছে। অথচ সহসা এ মুহূর্তে তার মনে শিহরণ জেগে ওঠে। চঞ্চল নয়নে সে তাদের নিরীক্ষণ করে!

তারপর সেই পক্ষিযুগল মিথুনলিপ্ত হওয়ামাত্র শাহজাদী শিরীঁ অস্ফুট-

স্বরে চিৎকার করে ওঠে—না!

—না, না, না! শিরী বারবার বলে। তারপর নুড়িপাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে থাকে। কী এক দুর্জ্ঞেয় ক্রোধে, নাকি অভিমানে বিচলিত যুবতী উন্মাদিনীর মতো তাদের তাড়া করে।

পক্ষিমিথুন এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে উড়ে গিয়ে বসে। শিরী উদ্যানময় তাদের পিছনে ছোটাছুটি করে। বারবার ঢিল ছোঁড়ে। একটু পরে তারা ঘনপত্র-পল্লবের অন্তরালে কোথায় লুকিয়ে যায়।

তারপর শিরী ক্লান্ত। কী এক অব্যক্ত আবেগে তার চিত্ত বিচলিত। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপে মুখমণ্ডল সুরঞ্জিত। কুচযুগ কম্পিত—যেন সেই প্রতীক্ষিত উষ্ণ লু-হাওয়া ঝড়ের আলোড়নে আত্মপ্রকাশ করেছে এতক্ষণে। কোমল বুকের স্পন্দনে ব্যথিত বসন্ত ছটফট করে শরাহত মৃগবৎ।

আর তার আয়ত নয়নের কৃষ্ণপল্লব ধুয়ে অশ্রুধারা নেমেছে। চিকন গোলাপী গণ্ডদেশ কাজলের কালিমা বিস্তৃত হয়েছে—যেন রক্তিম অপরাহ্নে মরুভূমির আকাশে অলৌকিক মেঘপুঞ্জের আবির্ভাব। অকালবৃষ্টি নীরবে নেমেছে আতপ্ত সোনালী বালুকাপুঞ্জে। আপেলের বাগানে সাইমুমের উপদ্রব।

শিরী তরুমূলে হেলান দিয়ে অশ্রুপাত করে। এ গুলিস্থানে বসন্তের কোয়েল দোয়েল তার দুঃখেই যেন কিছুক্ষণ মৌন। প্রজাপতির ঝাঁক চুপ করে বসে আছে পুষ্পবনে। মাতাল বসন্তবায়ুও এখন বিষাদকে সাবধানে ছুঁয়ে বলে—কী হয়েছে?

সারা প্রকৃতির অন্তরালে জেগে উঠেছে একটি প্রশ্ন—শিরী কাঁদে কেন? আমাদের শিরী! তুমি কাঁদো কেন?

ততক্ষণে সহচরীরা কৌতূহলী হয়ে স্নান অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়েছে। দ্রুত পোশাক পরে নিয়েছে। কৃত্রিম নহরের কাছে গিয়ে শিরীর পোশাক কুড়িয়ে নিয়েছে। খুঁজেছে তাকে। তারপর তাকে আবিষ্কার করেছে দিনান্তের ছায়াসমাবৃত তরুতলে।

সকলেই হতবাক। বিমূঢ়। শাহজাদী কাঁদে কেন?

কতক্ষণ পরে প্রধান সহচরী গুলশন মৃদুস্বরে ডাকে—শাহজাদী!

শিরী চমকে ওঠে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ব্যস্তভাবে চোখদুটিতে করতল ঘষে। একটু হাসে। তাই তো! সে কাঁদল কেন? কী ঘটেছিল সহসা? সে নিজেই আর বুঝতে পারে না।

সহচরীদের কাছ থেকে পোশাক নিয়ে পরে সে। তারপরে বলে—তোমাদের স্নান হয়ে গেল?

গুলশন জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নার্গিস অস্ফুট চিৎকার করে তাকে

জড়িয়ে ধরে। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলে—জিন! বাগানে জিন এসেছে!

প্রথমে সবাই চমকে উঠেছিল। তারপরে হাসিতে ভেঙে পড়ে। শাহজাদীও খিলখিল করে হাসে। নার্গিস মেয়েটা বরাবর বড্ড ভীতু। সেবার জ্যোৎস্নার রাতে প্রাসাদশীর্ষে নাকি পরী নামতে দেখেছিল। সারা মহল তা নিয়ে তোলপাড়। বেঅকুফ প্রহরীরা অনেকগুলো তীর খরচ করেছিল বোকার মতো।

কিন্তু না—এবার দিল্-আফরোজও উঁচু পাঁচিলের কাছে একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে ওঠে—বাঁদর! বাঁদর!

সবার চকিত দৃষ্টি—সেদিকে ঘুরে যায়। শেষবেলার ধূসরতা ঘন হয়েছে উপবনে। গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে বাঁদরের মতো কোন প্রাণীকে তারা দেখতে পায়। একটা অস্পষ্ট মূর্তি মাত্র! দ্রুত মূর্তিটা পাঁচিলের শীর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেখানে গোধূলির আলো পড়েছে। মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অমনি সহচরীরা এক সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে—মানুষ! মানুষ!

বুদ্ধিমতী গুলশন দৌড়ে গিয়ে নহরপ্রান্তে একটা অনুচ্চ স্তম্ভে সংলগ্ন ঘণ্টায় ঘা দিতে থাকে। তারপরই শাহজাদীমহলে সাড়া পড়ে যায়। ইতস্তত আরও কয়েকটি ঘণ্টা বেজে ওঠে। তারপর প্রাকারশীর্ষে হাবসী প্রতিহারিণীদের দেখা যায়। তাদের হাতে ধনুর্বাণ।

উদ্যানে নারী রক্ষীবাহিনী ছুটে আসে। কারুর হাতে সুতীক্ষ্ম খঞ্জর, কারুর হাতে শূল, কেউ ধনুতে বিষাক্ত শর সংযোজিত করে বসন্তের গুলিস্তান মথিত করে ফেলে।

ততক্ষণে মানুষটা পাঁচিলের ওপাশে অদৃশ্য। এত উঁচু থেকে লাফ দিয়ে নির্ঘাত সে গভীর পরিখায় পড়েছে। পরিখার জলে অজস্র শূল প্রোথিত আছে। আর আছে বিষাক্ত সাপ, কুমীর, রক্তপিপাসু হিংস্র হাঙর।

একটু পরে মানুষটার লাশের চিহ্নই পাওয়া যাবে না, এটা সুনিশ্চিত।

শাহজাদী বিস্মিত, হতবাক।

তারপর ফিসফিস করে ওঠে জনান্তিকে গুলশন—মানুষটা পুরুষমানুষ!

আরও কিছু কণ্ঠ ফিসফিসিয়ে বলে—পুরুষমানুষ!

কিন্তু এল কীভাবে সে?

—নিশ্চয় পাঁচিল ডিঙিয়ে নয়! তা অসম্ভব। তবে বেচারা বড্ড আহম্মক।

—হ্যাঁ। হতভাগা আকেলমন্দের লাশ এখন শয়তানগুলো মজাসে খাচ্ছে। উল্লুক কাঁহেকা!

চাপা হাসি ধূসর বনতলে হাওয়ার মতো ছড়িয়ে যায়। শাহজাদীকে দেখার নজরানা মৃত্যু। তারপর নার্গিস বলে—দ্যাখ্ ভাই, আমার সন্দেহ—আজ সকালে সওদাগর বেন্দার সঙ্গে যে তসবিরওয়ালী এসেছিল, তাকে দেখে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল! কেমন যেন পুরুষালী হাবভাব।

গুলশন বলে—ভাগ্, ভাগ্! সে তো সুলতানার তসবির আঁকার জন্যে হারেম-ই-সতুনের ঘরে আছে। আসার আগেও উঁকি মেরে দেখে এসেছি। সুলতানা মুহিবানু তাকে কত খাতির করছেন জানিস!

দিল্-আফরোজ বলে—সে এখন আছে কিনা দেখলেই তো হয়।

গুলশন দৌড়ে চলে যায়। অন্যেরা শাহজাদীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলে—ঘরে চলুন শাহজাদী!

শিরীঁ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—চলো!

নহরের রক্তপ্রবালখচিত মর্মরসেতু পেরিয়ে ওরা দেখে সামনে এগিয়ে আসছেন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী সুলতানা মুহিবানু। এরা ত্বরিতে নতজানু হয়ে কপাল স্পর্শ করে কুর্নিশ করে। মুহিবানু চঞ্চল পায়ে এসে শিরীঁকে জড়িয়ে ধরেন বুকে। তাঁর দুটি চোখ অশ্রুসিক্ত। শিরীঁ বলে—কী হয়েছে মা?

মুহিবানু তাকে বাহুসংলগ্ন করে প্রাসাদসোপানের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে চাপা উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলেন—বেটি শিরীঁ! গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তসবিরওয়ালীর ছদ্মবেশে নিশ্চয় কোন পুরুষ এসে স্থান পেয়েছিল আমার হারেম-ই-সতুনে। বিকেল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমি ভাবিই নি যে সে তোর এই নিষিদ্ধ মহলে কখন ঢুকে পড়বে। যাই হোক, ব্যাপারটা গোপন রাখা হবে। এবং...

সম্রাজ্ঞীকে চুপ করতে দেখে শিরীঁ বলে—বলো মা।

—এবং ভাবছি, আগামীকালই তোকে সিংহাসনে বসিয়ে দেব। তুই হবি কোহে-আরমানের সুলতানা।

—মা! চমকে ওঠে শিরীঁ। ফের বলে—রাজ্যশাসনের কতটুকু বুঝি আমি? এখনও তো কতকিছু শেখা বাকি!

সুলতানা একটু হাসেন।—সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি আড়ালে থেকে তোকে পরামর্শ দেব। আজ রাতেই উজির-আমীর-সিপাহসালারদের ডেকে পাঠাব।

—কিন্তু কেন মা? আরও কিছুদিন যাক না।

—না বেটি। জানতে পেরেছি, মদ-ই-অনের শয়তান শাহজাদা পারভেজ খুসরু তোকে লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র করেছে। খোরাসানী সওদাগর তিরুমত্ বেন্দা কোতল হবার সময় সব কবুল করেছে। এইমাত্র সব জানতে পেরেছি।

—সওদাগর বেন্দা! যে আমার জন্য আজ মুক্তোর মালা ভেট দিয়েছে? কেন তাকে কোতল করলে মা?

—সে অনেক কথা। পরে বলব'খন। সম্রাজ্ঞী মুহিবানু শিরীঁর হাত ধরে মহলের এক গোপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন।...

এই প্রকোষ্ঠেই কোহে-আরমানের সব সম্রাজ্ঞীকে অভিষেকের আগের রাতটি একা কাটাতে হয়। মহিবানুকেও কাটাতে হয়েছিল। একটি রাতের সে এক

নির্জনতার সুদীর্ঘ যন্ত্রণা। বিশ্বস্ততমা সহচরীও এঘরে আজ রাতে প্রবেশের অধিকার পাবে না। শুধু স্বয়ং বিদায়ী সুলতানাই আজ রাতে ইচ্ছেমতো প্রবেশের ক্ষমতা রাখেন।

মুহিবানু বলেন—কাল সকালে তুমি এরাজ্যের সুলতানা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত, তুমি নিশ্চিন্ত। যত খুশি পুরুষের মুখ দেখ, শয়তান খুসরুও যত খুশি ষড়যন্ত্র করুক—কোন বিপদের ঝুঁকি নেই। কোহে-আরমানের বীর যোদ্ধারা সবসময় তোমাকে রক্ষার জন্য জান কবুল করে আছে। আর তোমাকেও তো যুদ্ধবিদ্যায় পটু করা হয়েছে বেটি শিরীঁ! তোমার ধনুর্বাণের লক্ষ্যভেদ ক্ষমতার পরিচয় কতবার পেয়েছি। হাবসী প্রতিহারিণী হামজাকেও তুমি অসিযুদ্ধে হারিয়ে দিতে পেরেছ!

শিরীঁ ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবার।—মা! তাহলে এবার থেকে আমি তোমার মতো শিকারে যেতে পারব?

—পারবে বেটি।

—কোহে-আরমানের পাহাড়ে ছুটোছুটি করতে পারব?

—পারবে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে। মহামান্য সম্রাজ্ঞীর পক্ষে সেটাই শোভন!

কোহে-আরমানের বাইরে কোথাও যেতে পারব?

পারবে। কারণ, আগামীকাল সকাল থেকে স্বাধীনতা উপহার পাচ্ছ তুমি।...

শিরীঁ খুশি। কক্ষের রত্নখচিত ধাতুনির্মিত বাতিদানে অচঞ্চল স্বর্ণালী শিখার দিকে তাকিয়ে সে তার অজ্ঞাত দুনিয়াকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। কী রহস্য ওই দুনিয়ায়! এমুহূর্তে তার ইচ্ছে করছে, সারা দুনিয়াকে দলিত মথিত কম্পিত করে ছুটে বেড়াবে তার প্রিয় তুরগীপৃষ্ঠে।

কোহে-আরমানের বাইরে কোথাও যেতে পারব?

পারবে। কারণ, আগামীকাল সকাল থেকে স্বাধীনতা উপহার পাচ্ছ তুমি।...

শিরীঁ খুখি। কক্ষের রত্নখচিত ধাতুনির্মিত বাতিদানে অচঞ্চল স্বর্ণালী শিখার দিকে তাকিয়ে সে তার অজ্ঞাত দুনিয়াকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। কী রহস্য ওই দুনিয়ায়! এমুহূর্তে তার ইচ্ছে করছে, সারা দুনিয়াকে দলিত মথিত কম্পিত করে ছুটে বেড়াবে তার প্রিয় তুরগীপৃষ্ঠে।

নাম তুরানী—ঘোড়াটা মাদী। শ্যামবর্ণ তুর্কি ঘোড়া। তার হ্রেষাধ্বনি এই দুর্ভেদ্য গোপন নিরন্ধ্র প্রাসাদকক্ষে দূরের অশ্বশালা থেকে ভেসে আসে যেন। শিরীঁর রক্তে উত্তাল বন্যা জেগে ওঠে। তুরানীর অলীক পদশব্দে প্রাসাদ কাঁপতে থাকে।

স্বাধীনতা! না জানি কী মর্তদুর্লভ স্বাদ তার! শিরীঁ স্বাধীনতার

প্রতীক্ষায় আজ সারা রাত জেগে থাকবে।...

পশ্চিম চীন সীমান্তের একটি ছোট জনপদ কারেয়াঁ।

তুচ্ছ নগণ্য একটি গ্রাম ছিল এতকাল। কিন্তু গত কয়েক বছরে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা চীন থেকে রোম ইরান তুরান বাগদাদ, সেখান থেকে আরব এবং মিশর পর্যন্তও।

সওদাগরদের কাফেলা এখন যাতায়াতের পথে কারেয়াঁকে না ছুঁয়ে যায় না। নানান দেশের বাদশাহ-আমীর-উজির-শাহজাদীর দূত আসে ঘোড়া এবং উঠের পিঠে। কারেয়াঁর ছোট্ট হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। সরাইওয়ালাদের থলিতে মোহরের মিঠে আওয়াজ দিনরাত সারাক্ষণ।

কারেয়াঁর এই খ্যাতির কারণ একজন আশ্চর্য মানুষ।

সে এক প্রতিভাধর শিল্পী।

পাথর খোদাই করে অপরূপ মূর্তি নির্মাণ করে সে। সে ভাস্কর। তার হাতের অপরূপ ভাস্কর্য শোভা পায় চীনসম্রাটের দরবারে, রোমবাদশাহ কয়জরের প্রমোদকাননে। বদখশানের অকালমৃত শাহজাদার যে মূর্তি দেখে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে যায়, সেটিও তার হাতে তৈরি। তুর্কিস্তানের শাহজাদীর গুলিস্তানে তরুমূলের সিঞ্চনরতা নগ্ন পরীও তার সৃষ্টি। সেই পরীর নাভিদেশ ও নিতম্ব ঘিরে চিরকাল বসন্ত হাওয়া বয়।

কিন্তু সে বড় খেয়ালী শিল্পী। দুনিয়ার তাবৎ রত্নের বিনিময়েও সে তার ভাস্কর্যগৃহ ছেড়ে কোথাও যাবে না। শাহী সম্মান ও আমন্ত্রণের সে থোড়াই পরোয়া করে। সোনাদানা মণিমুক্তা হীরা জহরত তার কাছে প্রাণহীন বস্তু মাত্র—যদি না তা ভাস্কর্যে সন্নিবেশিত করা যায়!

সে জেদী, উদ্ধত, বেপরোয়া। অথচ বিন্দুমাত্র বিলাসব্যসনের পরিচয় তার কাছে মেনে না। অতি সাধারণ জীবনযাত্রা তার। পোশাকে সে অন্যমনস্ক, দীন-হীন প্রায়। বিশৃঙ্খল রুক্ষ কেশ। উজ্জ্বল জ্বলন্ত তাম্রবর্ণ শরীর অমনো-যোগে ঈষৎ শীর্ণ। কিন্তু তার উন্নত দীর্ঘ নাক, প্রশস্ত উদাসীন দুই চোখ, নীলাভ গোঁফ আর সামান্য দাড়ি তার চেহারাকে দেবদূতের সৌন্দর্য দান করেছে। কিন্তু তার ঠোঁটের কোণায় একটি বাঁকা রেখায় এবং কপালের তিনটি ভাঁজে দুর্জ্ঞেয় বিষাদ পরিস্ফুট।

এই অসামান্য ভাস্করের নাম ফরহাদ। বয়সে সে নবীন।

ফরহাদের রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গের মতো ছুটে এসেছে কত নারী—কত ধনবতী, কুবেরকন্যা, এমন কী শাহজাদীরাও। কিন্তু ফিরে গেছে অতৃপ্ত হয়ে দহনজ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে। ফরহাদ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের।

ফরহাদের সাধনা নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। নারীশরীর তার কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক মাত্র। এই প্রতীকের সীমা ভেঙে রক্তমাংসে গড়া বাস্তবকে ছুঁতে তার বড় অনিচ্ছা। পাথর কেটে সে রূপ সৃষ্টি করে। রূপকেই ভালবাসে। তার ভালবাসা পায় প্রস্তরায়িত নারী। রক্তমাংসময়ী মানুষীর জন্য তা দিতে সে রাজী নয়। লোকে দেখেছে, জ্যোৎস্নারাতে আত্মবিহ্বল যুবক ভাস্কর তার হাতে গড়া প্রস্তরময়ী নারীর মুখচুম্বন করে অস্ফুটস্বরে বলছে—ভালবাসি! ভালবাসি! কখনও বা ভাবাবিষ্ট শিল্পী ফরহাদ তাকে আলিঙ্গন করে ঠিক তারই মতো যেন এক প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত।

সেদিন কারেয়াঁর ভাস্কর্যভবন সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ফরহাদ আপন কাজে মগ্ন। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দে সে ঘুরে দাঁড়ায়। প্রাঙ্গণের ফটকে ঘোড়া বেঁধে রেখে এক অপরিচিত আগন্তুক তার দিকে এগিয়ে আসে। ফরহাদ ভাবে, কোন ক্রেতা এল হয়তো। অসময়ে জ্বালাতন! সে বিরক্ত হয়।

আগন্তুক অভিবাদন জানিয়ে বলে—আমি প্রখ্যাত ভাস্কর ফরহাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বলুন। আমিই ফরহাদ!

আগন্তুক বিস্ময় প্রকাশ করে—আপনি! কিন্তু...

ঈষৎ বিরক্ত ফরহাদ বলে,—যা বলবেন, ঝটপট বলুন। আমি ব্যস্ত।

আগন্তুক একটু হাসে। তারপর বলে—আমার নাম মালিক সপ্রু।

—নামে কী হবে? কী চান, তাই বলুন জনাব।

ধুরন্ধর সপ্রু ফরহাদের মেজাজ ও চরিত্রের সব খবর নিয়েই এসেছেন। তাই সপ্রতিভভাবে বলেন—আপনি শিল্পী মানুষ। বাইরের দুনিয়ার খবর আপনার সম্ভবত না জানারই কথা। আমি মদ-ই-অন রাজ্যের বর্তমান সম্রাট পারভেজ খুসরুর প্রধান অমাত্য।

ঈষৎ বিস্মিত ভাস্কর বলেন—সে কী! শুনেছিলাম নওশেরোয়াঁর পুত্র হরমুজ সেখানে সুলতান হয়েছে।

সপ্রু হোহো করে হেসে বলেন—হ্যাঁ। ঠিকই শুনেছিলেন। তবে সেটা নিশ্চয় আপনার ছেলেবেলায়। তারপর কত কী ঘটেছে। সম্প্রতি বাদশাহ হরমুজ গুরুতর ব্যাধিতে মারা গেছেন। এখন তাঁর পুত্র খুসরু বসেছেন সিংহাসনে। আমি আসছি তাঁরই আদেশে।

অন্যমনস্ক ফরহাদ আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে বলেন—হ্যাঁ, বলুন।

—আমার বাদশাহ একটি প্রমোদকানন গড়ে তুলেছেন। সে বড় আশ্চর্য

সুন্দর গুলিস্তান। দুনিয়ায় এক বেহেশ্ত। নানা রাজ্যের বাদশাহ্-উজির-আমীর-শাহজাদা-শাহজাদীরা তা দেখতে আসছেন। তাই আমার বাদশাহের ইচ্ছা, সেখানকার জন্য আপনাকে কিছু মূর্তি গড়ে দিতে হবে।

—দেব। তাই তো আমার কাজ। কিসের মূর্তি চান আপনার বাদশাহ ?

সপ্রু তার পাশে একটা পাথরে বসে বলেন—নারীমূর্তি।

—হ্যাঁ, তাই সবাই চায় বটে! কেমন নারীমূর্তির ? পরী না মানবীর ?

—মানবীর।

—বসনপরিহিত না নগ্ন ?

—নগ্ন।

ফরহাদ বাটালি তুলে প্রাঙ্গণ ও বারান্দায় অজস্র ভাস্কর্যের দিকে নির্দেশ করে বলে—তাহলে পছন্দ করে ফেলুন। অনেক নমুনা পেয়ে যাবেন।

সপ্রুর ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি ফোটে। বলেন—আপনি প্রতিভাবান প্রখ্যাত ভাস্কর। ইউনানী (গ্রিক) আর রুমী (রোমান) ভাস্করদের বিস্তর কাজ আমার প্রভু এবং আমি দেখেছি। আপনার সৃষ্টির সঙ্গে তুলনাই হয় না। কিন্তু ভাই যে ভাস্কর্য বাদশাহ খুসরু চান, তার নমুনা এখানে নেই।

ফরহাদ ক্রুদ্ধভাবে বলে—নেই ? এতগুলো মূর্তির একটাও পছন্দ হচ্ছে না আপনার ?

—না ভাই।

—আপনি অন্ধ। অন্ধের জন্যে আমি মূর্তি গড়ি না।

মৃদু-মৃদু হেসে সপ্রু অবিচলিত স্বরে বলেন—মহামান্য ভাস্কর! যদি বলি সে-সৌন্দর্যময় স্বর্গীয় ভাস্কর্য এখনও আপনার হাতের স্পর্শের অপেক্ষায় আছে ? যদি বলি, সে-অপরূপ শাশ্বত সৌন্দর্য সৃষ্টির সুযোগ আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে এখনও কল্পনাও করেন নি ?

ফরহাদ গোঁ ধরে বলে—আমার কল্পনার বাইরে তেমন কোন নারীসৌন্দর্য আছে বলে বিশ্বাস করি না।

—আছে বন্ধু, আছে। বলে সপ্রু জোব্বার ভেতর থেকে গুটিয়ে রাখা একটা চিত্রপট বের করেন। তারপর সেটা খুলে ফরহাদের সামনে ধরেন।

ফরহাদের দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুদুটি নিষ্পলক হয়ে ওঠে। শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন বা স্তব্ধ হয়ে যায়। ক্রমশ বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে তার প্রশস্ত কপালে, নাকের ডগায়। ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে কতক্ষণ। সংবিৎহারা, হতবাক, ভাবাবিষ্ট।

তারপর সে চিৎকার করে ওঠে উন্মাদের মতো—অসম্ভব!

—কী অসম্ভব ভাই ?

দুটি চক্ষু করতলে আবৃত করে ফরহাদ যন্ত্রণার্ত স্বরে বলে—আঃ! আবার সেই স্বপ্ন! একই নারী! একই তনুভঙ্গিমা। একই রূপ। নিশ্চয় আমি

আবার কখনও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর আবার সেই স্বপ্ন—আঃ!

সপ্রু তার কাঁধে হাত রেখে বলেন—স্বপ্ন নয় বন্ধু, আপনি সম্পূর্ণ জাগ্রত। আত্ম-সংবরণ করুন।

ফরহাদ গর্জন করে ওঠে—তাহলে আপনি ছদ্মবেশী কোন চীনা জাদুকর।

—মোটেই না। আমার কাছে মদ-ই-অনের শাহী পাঞ্জা আছে। এই দেখুন। বলে সপ্রু ধাতুনির্মিত পাঞ্জা বের করেন।

বিস্ময়াবিভূত ফরহাদ বলে—কিন্তু আমার স্বপ্নের নারী কীভাবে আপনার তসবিরে অঙ্কিত হতে পারে? একজনের স্বপ্ন কি অন্য জনের পক্ষে দেখা সম্ভব?

—না। সম্ভব নয়।

—তাহলে?

—এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। এ তসবির যার, সে-নারী এই দুনিয়ারই রক্তমাংসে গড়া দেহ নিয়ে বেঁচে আছে।

—কিন্তু তাকে যে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি আর তার মূর্তি গড়তে চেষ্টা করি। ফরহাদ কপালে করঘাত করে বলতে থাকে। হায়! এ দুনিয়ার কোন পাথরই তার মূর্তি গড়ার যোগ্য বলে মনে হয় না। তখন পিছিয়ে আসি। ভাবি, যা আছে মনে—তা মনেই থাক।

—আপনি কোহে-আরমানের সম্রাজ্ঞী শিরী'র নাম কি শোনেন নি?

—হয়তো শুনেছি, হয়তো শুনিনি। কেন?

—এ তসবির সম্রাজ্ঞী শিরী'র।

ফরহাদ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ। তারপর মৃদু স্বরে বলে—আশ্চর্য! তাঁকে তো আমি একটিবারও দেখিনি। তাহলে কেন তাঁকে এতদিন স্বপ্ন দেখছি?

সপ্রু এবার একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বলেন—সরাইখানায় আমার লোকেরা এতক্ষণ অধীর হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যাতেই আমরা মদ-ই-অনে ফিরে যাব। এবার কাজের কথাটা সেরে নিন ভাই।

ফরহাদ আহত মৃগশিশুর মতো বেদনাক্লিষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকে।

সপ্রু বলেন—বাদশাহের প্রমোদকাননের জন্য একশো শিরী' মূর্তি চাই। অবিকল যেমনটি তসবিরে আছে, একহাতে গোলাপ, পাথরে এক পা রাখা, নগ্ন-দেহ। এই নিন তসবির। স্বপ্নটপ্ন কোন কাজের কথা নয়। চোখের সামনে এই ছবি রেখে মূর্তি গড়বেন। আর এই রইল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা। বাকি ন'হাজার মুদ্রা মূর্তি নেবার সময় পাবেন।

আশরফির থলি প্রত্যাখ্যান করে ফরহাদ বলে—আগে কোন অর্থ আমি নিই না। কাজ শেষ হলে যা দেবার দেবেন। কিন্তু এ তসবির কে এঁকেছে জানতে চাই।

—বেচারার বরাত! সে এখন মৃত।

—সে কী!

—এ তসবিরওয়ালার নাম ছিল মোবারক। আহম্মক মোবারক স্ত্রীলোকের বেশে কোহিস্তানের সম্রাজ্ঞীর অন্দরমহলে ঢুকেছিল। তারপর প্রমোদকাননে ঢুকে গোপনে গাছের ডালে লুকিয়ে থেকে শিরীঁর ছবি এঁকেছিল।

—তারপর, তারপর?

—ধরা পড়ার উপক্রম হতেই পাঁচিল থেকে পরিখায় ঝাঁপ দিল। ব্যস! খতম!

—কিন্তু এ তসবির আপনি কীভাবে পেলেন?

—ঝাঁপ দেবার আগে পরিখার ওপারে ছুঁড়ে ফেলেছিল। হতভাগা নিজেকে খতম করেও প্রকৃত শিল্পীর মতো ছবিটা দুনিয়ার জন্যে রেখে গেছে। সপ্রু উঠে দাঁড়ান এবার। তারপর একটু হেসে ফের বলেন—ছবিটা পড়েছিল পাথরের খাঁজে একটা গর্তে। এক উটওয়ালা সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। কতদিন লুকিয়ে রাখার পর সেই উটওয়ালা গেল মদ-ই-অনে এক কাফেলার দলে। তার রোগা-উটটা একদিন মারা পড়ল। তার আবার একটা উট চাই। টাকা পাবে কোথায়। তাই এরেম শহরে গিয়ে বেচে দিল একটা সরাইখানার মালিকের কাছে। এ লোকটা আমার দোস্ত। সুতরাং বাকিটা বুঝতেই পারছেন।......

স্তম্ভিত নির্বাক ভাস্করকে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে সপ্রু অশ্বপৃষ্ঠে চলে গেলেন।...

পারভেজ খুসরুর মনে অশান্তির শেষ নেই। নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছেন। খুসরু জানেন, ইয়ার সপ্রুর কোন ত্রুটি ঘটে নি। নির্বোধ তসবিরওয়ালাই সে-ব্যর্থতার জন্যে দায়ী। বেন্দার মতো ধুরন্ধর সওদাগরকেও সদলবলে কোতল হতে হল ওই লোকটারই আহাম্মকীতে। শিরীঁকে হরণ করার আশা আর নেই।

খুসরুর করতলগত হলে যুবরাজ্ঞী শিরীঁর আর সম্রাজ্ঞী হওয়ার সুযোগই ছিল না। মুহিবানুকে আবার একটি সুলক্ষণা কন্যা সংগ্রহ করতে হত এবং সেই পালিতা কন্যা সাবালিকা হওয়ার আগে মুহিবানুর মৃত্যু হলে ততদিন অমাত্য-উজির-সেনাপতিরা নাবালিকা শাহজাদীর পক্ষে রাজ্যশাসন করতেন। বড় অদ্ভুত ওঁদের প্রথা।

কিন্তু বুদ্ধিমতী মুহিবানু তৎক্ষণাৎ শিরীঁকে সিংহাসনে বসিয়ে খুসরুর ভবিষ্যৎ আশাতেও ছাই ফেলে দিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞীকে অপহরণ করলে কোহে-আরমান এবং তার মিত্র রাজ্যের বাদশাহেরা একজোট হয়ে প্রতিশোধ নেবে। খুরসু তাই হতাশ।

সেই হতাশার মরুভূমিতে মোবারকের আঁকা নগ্ন শিরীঁর ছবি খুসরুকে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়ে মারছে। সে জানে এটা মরীচিকা, তাই সে তিলে-তিলে দগ্ধ হয়েছে এবং অবশেষে সপ্রুর পরামর্শে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে। শিরীঁর নগ্নমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবে প্রমোদকাননে। দেশবিদেশের বাদশাহ্‌দের আমন্ত্রণ করে এনে দেখাবে। আমন্ত্রণ জানাবে কোহে-আরমানের সম্রাজ্ঞী স্বয়ং শিরীঁকেও তাকে আসতেই হবে প্রথা অনুসারে। এসে স্বচক্ষে দেখবে এক বিচিত্র দৃশ্য। খুসরু সর্বসমক্ষে সেই মূর্তির মুখচুম্বন করবেন।

পিতামহ বাদশাহ নওশেরোয়াঁর যুগ থেকেই কোহে-আরমানের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক অটুট। পিতা হরমুজ মুহিবানুকে আদর্শ মহিলা হিসেবে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। পুত্রের ষড়যন্ত্রের কথা কানে যেতেই তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নির্বাসিত খুসরুর সে এক দুর্দিন গেছে। রুমশহরে বাদশাহ কয়জরের উজির বাহরাম সপ্রুর দোস্ত। বাহরামের বাড়িতে খুসরু আর সপ্রু আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কিন্তু মালিক সপ্রু বুঝি এ মর্তধামে শয়তানেরই প্রধান অনুচর। খুসরু জানেন, তাঁর পিতা বাদশাহ হরমুজের মৃত্যুর কারণ সাংঘাতিক বিষ। ইউনানী হেকিমদের কাছে সংগৃহীত সেই বিষ ত্বরিতে মৃত্যু ঘটায় না। দুঃসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

সপ্রুর সাহচর্যে খুসরু কালক্রমে বিবেকহীন। পিতার মৃত্যু হতেই মদ-ই-অনের রাজধানী এরেমনগরে ছুটে গিয়েছিলেন এবং সিংহাসনে বসেছিলেন। আমীর-উজির-সেনাপতিরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ন্যায্য উত্তরাধিকারী খুসরুকে মেনে নেন।

এখন পারভেজ খুসরু মদ-ই-মনের সার্বভৌম অধিপতি। রুমের উজির বাহরামের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন। ইনিই সেই প্রখ্যাত সিংহশিকারী বাহরাম। রাজ্ঞী বিলমোরান অসামান্য সুন্দরী। তবু খুসরুর মন ভরে না। শিরীঁর ধ্যানে তিনি মগ্ন। বুকে প্রতিহিংসার আগুন দাউদাউ জ্বলে। নিষ্ফল কামনা নিরন্তর কশাঘাতে জর্জরিত করে তাঁকে। শিরীঁর সামনে শিরীঁর মূর্তিকে চুম্বন ও আলিঙ্গনের দিন গুণছেন।

নওরোজের সময় সারা ইরান-তুরানের বাদশাহেরা একদিনের জন্য মৃগয়ায় যান। চিরাচরিত প্রথা। অন্তত একটি বন্যপ্রাণীও শিকার করা চাই।

সেবার নওরোজে মদ-ই-অন এবং কোহে-আরমান সীমান্তের পার্বত্য অরণ্যে

গিয়ে খুসরু ভেবেছিলেন একটি সিংহ শিকার করবেন। কোহে-আরমানের সম্রাজ্ঞী শিরীঁকে বীরত্বে তাক লাগিয়ে দেবেন।

শিরীঁরও সেই অরণ্যে মৃগয়ায় আসার সম্ভাবনা। প্রথা তাকে মানতেই হবে।

এতদিনে শিরীঁকেও মুখোমুখি দেখার আশা। খুসরু ব্যাকুল ছিলেন। তসবিরে যাকে দেখেছেন, বাস্তবে না জানি সে কোন মর্তদুর্লভ সৌন্দর্যের অধিশ্বরী!

মৃগয়ায় গিয়ে খুসরু পড়লেন বিপদে। আক্রান্ত আহত সিংহ তাঁর অশ্বকে ধরাশায়ী করল। খুসরুর অসি ও ভল্ল ভগ্ন। তৃণে বাণ নিঃশেষ। সামনে গর্জনকারী ভয়ংকর মৃত্যু। বিপন্ন খুসরু চিৎকার করে ডাকছিলেন সপ্রুকে।

সপ্রু তখন অরণ্যের অন্যপ্রান্তে। খুসরুর দেহরক্ষীরাও আহত এবং কেউ মূর্ছিত, কেউ বিভ্রান্ত, হতচকিত, পলায়নে তৎপর।

দুরন্ত সিংহ ঝাঁপ দিল খুসরুর দিকে। খুসরু আতঙ্কে চোখে বুজলেন।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর চোখ খুললেন।

সামনে একটি সিংহ পড়ে আছে। নিশ্চল, স্পন্দনহীন। তার স্কন্ধমূলে গভীরভাবে বিদ্ধ একটি ভল্ল।

মৃত সিংহের ওপাশে সামান্য তফাতে অশ্বপৃষ্ঠে এক মনুষ্যমূর্তি। সর্বাঙ্গ লৌহজালিকায় আবৃত। লৌহশিরস্ত্রাণ থেকে ঝরোকাসদৃশ লৌহজালিকা দোলায়িত। তার মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবি—লঘু মেঘের অন্তরালে পূর্ণশশী যেন।

খুসরু ভাবলেন স্বপ্ন। তারপর জানলেন, স্বপ্ন নয়।

খুসরু তাঁর প্রাণদাতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে অতিকণ্টে উচ্চারণ করলেন—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি কে?

—আমি যেই হই, প্রখ্যাত সিংহশিকারী বাহরামের জামাতা হওয়া আপনার উচিত ছিল না!

খুসরু চমকে উঠলেন। এ যে রমণী! অস্ফুটস্বরে চিৎকার করলেন—কে আপনি?

গুল্মাকীর্ণ পার্বত্য উপত্যকায় যেন আচম্বিতে মরুঝঞ্ঝা। প্রকম্পিত হল প্রস্তরময় সুকঠিন মাটি। উৎক্ষিপ্ত হল ধূলিকঙ্কররাশি। খুসরু শুনলেন তুরগীর খুরের শব্দ দূর-দুর্গমের দিকে অপস্রিয়মাণ।

ধূলিকঙ্কর বায়ুতাড়িত তুলে খুসরুর যেন স্বপ্নভঙ্গ হল। তাঁর সামনে কেউ নেই।

মুহূর্তে খুসরু বুঝলেন, কে ওই রমণী! আর সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার

পরিবর্তে জেগে উঠল সুতীব্র অবমাননার বোধ। ক্ষোভে অপমানের জ্বালায় খুসরু অস্থির।...

আবার এসেছে নওরোজের উৎসব। এ উৎসবে মদ-ই-অন রাজ্যে এবার আমন্ত্রিত হয়েছেন নানা রাজ্যের অধিপতিবৃন্দ, শাহজাদা-শাহজাদীরা, সওদাগরদল। সম্রাট নওশেরোয়াঁর সময় এমনটি হত। সম্রাট হরমুজ বিলাসিতা পছন্দ করতেন না বলে এ প্রথা লুপ্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র খুসরু পিতামহের সম্মানে আবার এ প্রথা চালু করতে চেয়েছেন।

কোহে-আরমানেও আমন্ত্রণপত্র নিয়ে রাজদূত গিয়েছিল। রাজমাতা মুহিবানু শিরীঁকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। অস্বাস্থ্যের অজুহাতে আমন্ত্রণ সুকৌশলে এড়িয়ে যাক্ শিরীঁ। কিন্তু শিরীঁ যাবেই। সিংহাসনে বসার পর থেকে শিরীঁ আর সেই সরলমনা শিরীঁ হয়ে নেই। সে আজ যথার্থ সম্রাজ্ঞীর দৃঢ় মনোবল এবং নির্ভীকতায় পরিপূর্ণ এক বীরাঙ্গনা। ক্ষেত্রবিশেষে সে ঈষৎ দুর্বিনীতাও বটে। আত্মবিশ্বাস যেন বা দিনে দিনে তার মানসিক কমনীয়তা বিনষ্ট করেছে। তাকে এখন অহংকারী এবং কঠোরস্বভাব বলে মনে হয়।

তার খুশখেয়াল বেড়েছে। কারণে-অকারণে ক্রুদ্ধ হয় সে। বান্দা-বাঁদী পরিচারিকা তো বটেই, এতকালের সহচরীরাও তার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। হারেম-ই-সতুন সর্বদা তটস্থ।

বিচারকর্ত্রীরূপে সম্রাজ্ঞী শিরীঁ বিকারহীন মুখে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়।

রাজ্যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ, সম্রাজ্ঞী যেন পুরুষদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। শাসনের প্রধান-প্রধান ক্ষমতাগুলি নারীদেরই দেওয়া হয়েছে। কবে না সৈনাপত্যের দায়িত্ব নারীর হাতে চলে যায়। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ রাজ্য এবং বিশেষ করে রাজধানী প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিত।

নওরোজের তৃতীয় দিনে আমন্ত্রণ এরেমনগরে। শতাধিক নারীসেনা নিয়ে সম্রাজ্ঞী শিরীঁ খুসরুর আমন্ত্রণরক্ষায় গেল। তার নিজের প্রযত্নে গড়া এই ঝটিকাবাহিনী।

সম্রাট খুসরু এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিলেন। নগরপ্রান্তে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন শিরীঁর। মরুময় প্রান্তরের দিগন্তে কোহে-আরমানের শাহী পতাকা দেখে চঞ্চল হলেন।

দীর্ঘ ধূলিমেঘরেখা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। তারপর ধাবমান অশ্বের আন্দোলিত সম্মুখভাগ দৃষ্টিগোচর হল। বাঁকা হাসি ফুটল খুসরুর ঠোঁটে। নকীবের উদ্দেশে হুকুম পাঠালেন তূর্যধ্বনি করতে।

কোহে-আরমানী নকীব সবার আগে উটের পিঠে আসছে। শাহী পতাকা উড়ছে। তারপর তাদের তূর্যধ্বনি শোনা গেল। এরেমী নকীব তার প্রত্যুত্তর দিল।

খুসরু অশ্বপৃষ্ঠে একটু অগ্রসর হলেন। কোহে-আরমানী সেনারা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াল। শিরী এগিয়ে এলেন অশ্বপৃষ্ঠে। মুখোমুখি হলেন দুজনে।

কিন্তু খুসরু চমকে উঠলেন।

শিরী সম্রাজ্ঞীর বেশে আসেনি! অতি সাধারণ রমণীর বেশ তার পরিধানে। তার যুগল প্রলম্বিত বেণীতে একটি শুভ্রপুষ্প। সমুন্নত পীনপয়োধর ঢেকে মাত্র একখণ্ড নীল কঞ্চুলিকা। নাভিমূল পর্যন্ত উন্মোচিত। নিম্নাঙ্গে তুরানী ঢঙে পরা চীনা রেশমের উজ্জ্বল নীল মেখরাব। দুই কানে দুটি রক্তিম পুষ্পকলি। তার দুই বাহু মুক্ত ও নিরাভরণ।

তার কটিতটে সংলগ্ন একটি বাঁকা খরসান। অস্থিনির্মিত খাপে ঢাকা।

অভিবাদন জানাতেই ভুলে গেলেন খুসরু।

শিরী মৃদু হেসে সম্ভাষণ করলে—নওরোজ আনন্দময় হোক এরেমাধিপতির।

খুসরু ভাবছিলেন, শিরীর উদ্দেশ্য কী? সংবিৎ ফিরে পেয়ে খুসরু প্রথামতো ডানহাত প্রসারিত করলেন।

করপৃষ্ঠে চুম্বনের রীতি আছে। খুসরু প্রলুব্ধ। সৌন্দর্যসম্রাজ্ঞীর ওষ্ঠাধরের স্পর্শ পেতে তাঁর চিত্ত চঞ্চল। একদিকে লোভ, অন্যদিকে প্রতিশোধস্পৃহা, আর অন্যদিকে অপূর্ণ কামনা। খুসরু হাত প্রসারিত করে বললেন—মদ-ই-অন কোহে-আরমান সম্রাজ্ঞীর স্পর্শে ধন্য হোক।

শিরী অশ্বপৃষ্ঠে ঈষৎ নত হয়ে ওষ্ঠস্পর্শ করল খুসরুর করপৃষ্ঠে।

তীব্র জ্বালা অনুভব করে হাত সরিয়ে নিলেন খুসরু। শিরীর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। খুসরু দেখেন, তার করপৃষ্ঠে শিরীর দাঁতের চিহ্ন এবং ক্ষীণ রক্তরেখা।

খুসরু ভাবলেন, এ কি শিরীর প্রেমের প্রতীক—নাকি ঘৃণার চিহ্ন?

আগের পরিকল্পনামতো প্রমোদকাননেই প্রথমে নিয়ে গেলেন শিরীকে।

সেখানে কারেয়াঁর প্রতিভাধর ভাস্কর ফরহাদের তৈরি একশো মর্মরীভূত শিরী।

একদা শাহজাদীমহলের উদ্যানে এক নওরোজের বিকেলে কিছুক্ষণ শিরী ওই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল। সম্পূর্ণ নগ্ন ও ভাবাবিষ্ট। অবিকল সেই

মূর্তি।

বাদশাহ-ওমরাহ ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন এবং শতমুখে তারিফ করেছেন। তারপর প্রত্যেকেই বলেছেন—এই মূর্তি যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। কেউ বলেছেন—কী অবাক! এ যেন কোহে-আরমানের সম্রাজ্ঞীরই নগ্ন প্রতিমূর্তি! কারেয়াঁর ভাস্কর এ মূর্তি গড়ল কেমন করে?

তারপর ফিসফিস কানাকানি শুরু হয়েছে। তাহলে কি কোহেআরমানী প্রথা গোপনে ভঙ্গ করে সম্রাজ্ঞী শিরীঁ ভাস্কর ফরহাদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখেছেন! তাহলে তো শিরীঁ সিংহাসনে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন! কোহে-আরমানীদের কানে গেলেই গন্ডগোল শুরু হবে।

এদিকে শিরীঁ প্রমোদকাননে ঢুকেই বিস্মিত। এ কি দুঃস্বপ্ন!

তার দিকে সবাই তাকিয়ে কানাকানি করছে। অজস্র কৌতূহলী তীব্র দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। খুসরু উল্লসিত। বারবার ঘোষণা করছেন—কারেয়াঁর প্রখ্যাত তরুণ ভাস্কর ফরহাদ নাকি এই মূর্তি স্বপ্নে দেখেছিলেন! তা স্বপ্নেই দেখুন, আর বাস্তবে দেখুন, গড়েছেন মনপ্রাণ ঢেলে। গভীর প্রেম আর দুরন্ত কামনা ছাড়া এ সৃষ্টি সম্ভব হয় কিনা আপনারাই বলুন!

বাদশাহ-আমীরের দল তারিফ করে বলেন—আলবাৎ, আলবাৎ! এ নারী ভাস্কর ফরহাদের প্রেমিকা না হয়ে পারে না! সুগভীর প্রেম ছাড়া এ সৌন্দর্য-সৃষ্টি সম্ভবই নয়।

শিরীঁর আকর্ণ গন্ডদেশ লজ্জায় দুঃখে সুরক্তিম। দৃষ্টি আনত। এক সহচরীর বাল্যস্মৃতি কেন যেন একদা তাকে প্রলুব্ধ করেছিল—সে চেয়েছিল, নহরকিনারায় প্রস্তরখণ্ডে একটি পা রেখে তেমনি এক প্রস্তরায়িত সৌন্দর্য হয়ে যাবে!

কিন্তু তার এ রূপ কারেয়াঁর ভাস্করের পক্ষে দেখা কেমন করে সম্ভব?

বিচলিতা, অপমানিতা সম্রাজ্ঞী শিরীঁ প্রমোদকাননের তোরণের দিকে ছুটে যায়। অশ্বপৃষ্ঠে উঠে দ্রুত আদেশ দেয়—কোহিস্তান ফিরে চলো!

ততদিনে কারেয়াঁয় ভাস্কর ফরহাদের মানসিক ভাববৈলক্ষণ্য ঘটেছে। মদ-ই-অন সম্রাটের জন্য একশো শিরীঁমূর্তি গড়ার পরও তার হাত থামেনি। তারপর যত মূর্তি গড়তে গেছে, প্রতিটি রূপ নিয়েছে শিরীঁতে। তার ভাস্কর্যভবন থেকে প্রাঙ্গণ জুড়ে ক্রমশ অসংখ্য শিরীঁমূর্তি। আর স্থান সংকুলান হয় না। যারা পাথর যোগায় তাকে, তারা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত। ক্রেতারাও ক্ষুব্ধ।

পছন্দমতো মূর্তি গড়ে দিচ্ছে না ভাস্কর। শুধু ওই একই মূর্তি!

ক্রমশ কারেয়াঁর সন্নিহিত পর্বতাঞ্চলে মূর্তি গড়ার উপযুক্ত পাথর অবশিষ্ট রইল না। ফরহাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আর একঘেয়ে একই মূর্তি কিনতে চায় না। ফরহাদের রুটি জোটে না দিনান্তে—বেশভূষা জীর্ণ, শতচ্ছিন্ন, মলিন।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাস্কর সারাক্ষণ উচ্চারণ করে—শিরীঁ! আমার শিরীঁ! স্থাবরজঙ্গম জুড়ে সে নিরন্তর শিরীঁকে দেখতে পায়। বিশাল আকাশে শিরীঁর মূর্তি দেখতে পেয়ে ছুটে যায় প্রান্তরে।। সবাই বুঝতে পারে ফরহাদ হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে হাতুড়ি ও ছেনি হাতে নিয়ে মেঘকে কাকুতি-মিনতি করে—তোমরা নেমে এস! আমি শিরীঁর মূর্তি গড়ব।

নদীর জলে ছেনি বিদ্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে করুণ স্বরে বলে—ঈশ্বরের দোহাই! তটিনী, তুমি কঠিনা হও। আমি শিরীঁকে গড়ে দিই তোমার প্রবাহে।

রাত্রির চাঁদকে ডেকে বলে—শিরীঁর রূপ নিয়ে সৌন্দর্যময়ী হবে এস। এস।

ঘর ছেড়ে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় ফরহাদ। হাতে হাতুড়ি ছেনি নিয়েই ঘোরে। অরণ্যে চলে যায় কখনও। বলে—হে বনভূমি, হে বৃক্ষপুষ্পরাজি! এস, তোমাদের শিরীঁতে পরিণত করি।

এভাবে ক্লান্ত ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর তরুণ ভাস্কর ঘুরতে-ঘুরতে চলে এসেছে এক অজানা জনপদে। পথের পাশে লুটিয়ে পড়েছে সে। চলচ্ছক্তিহীন।

ভিড় জমে যায়। কে এ মুমূর্ষু? ভিখারী মনে হলেও তার অপরূপ রূপ দেখে লোকের সন্দেহ জাগে। কোন ভাগ্যহত আমীর নন্দন, কিংবা রাজ্য থেকে বিতাড়িত শাহজাদা কি এই যুবক?

তখন নওরোজের উৎসব চলেছে।

নওরোজের সময় দীন ভাগ্যহত মানুষের সেবা করার রীতি প্রচলিত। ফরহাদকে আশ্রয় দিল একজন গালিচা-ব্যবসায়ী। হেকিম এনে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করল।

সুস্থ হবার পর ফরহাদ জানতে চায়—এটা কোন রাজ্য।

গালিচা-ব্যবসায়ী বলে—কোহে-আরমান এই রাজ্যের নাম। এ জনপদের নাম দোরান।

অমনি ফরহাদ লাফিয়ে ওঠে। অস্ফুট চিৎকার করে বলে—শিরীঁ! আমার শিরীঁ!

গালিচা-ব্যবসায়ী অবাক। সে বলে—বিদেশী! কোন শিরীঁর কথা বলছ তুমি? আমাদের সম্রাজ্ঞীর নামও শিরীঁ! আশা করি, তুমি তাঁর কথা বলছ না!

ফরহাদ শিশুর মতো হাসে।—সম্রাজ্ঞী কিনা জানি না। শুধু জানি, দুনিয়ার একটি মাত্র শিরীঁ আছে। সে আমার স্বপ্নের নারী। আমার প্রিয়তমা। আমি তার মূর্তি গড়েছি কতদিন ধরে। আবার গড়ব। দয়া করে আমাকে পাথর এনে দিন। আমার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আপনাকে প্রিয়তমা শিরীঁর একটি মূর্তি উপহার দিয়ে যাব।

সন্দেহাকুল দৃষ্টে তাকিয়ে ব্যবসায়ী বলে—আপনি কি ভাস্কর?

—হ্যাঁ। আমি সেই কারেয়াঁবাসী ভাস্কর ফরহাদ।

ধূর্ত ব্যবসায়ী উত্তেজনা দমন করে। খবর রটেছে, নওরোজের তৃতীয় দিনে মদ-ই-অনে গিয়ে সম্রাজ্ঞী শিরীঁ নাকি অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন। বাদশাহ খুসরুর প্রমোদোদ্যানে নাকি তাঁরই মূর্তি রাখা হয়েছে। সংঘর্ষ ঘটে যেত। কিন্তু সম্রাজ্ঞী বলেছেন—না। আগে সেই ভাস্করকে আমি চাই। তাকে দিয়ে পারভেজ খুসরুর মূর্তি বানিয়ে কোহিস্তানের প্রধান তোরণে রাখব এবং প্রতিদিন সকাল বিকেল দুইবেলা পঞ্চাশ ঘা করে কোড়া মারব খুসরু মূর্তিকে। তারপর যদি খুসরুর অপমানবোধ থাকে, সে-ই আগে কোহিস্তান আক্রমণ করুক।

কিন্তু কারেয়াঁ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে কাহে-আরমানী দূত। ভাস্কর ফরহাদ নিরুদ্দেশ। তবে বিস্ময়কর দৃশ্য, তার পরিত্যক্ত বাসগৃহ, প্রাঙ্গণ এবং কারেয়াঁর সর্বত্র অসংখ্য শিরীঁ মূর্তির ছড়াছড়ি। সম্রাজ্ঞীর পক্ষে অতি অপমানজনক ব্যবহার তো বটেই। আরমানী সেনারা গিয়ে তা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

সম্রাজ্ঞী শিরীঁ মনে-মনে ক্রুদ্ধ। দিকে-দিকে লোক পাঠিয়েছেন ফরহাদের সন্ধানে। যেভাবে হোক তাকে তুলে আনতেই হবে। প্রথমে শয়তান খুসরুর মূর্তিটা বানিয়ে নেবেন। তারপর নির্বোধ ভাস্করকে একহাতে বখশিশ অন্যহাতে কঠোর শাস্তি দেবেন।

শুধু তাই নয়, ঢোল সহরৎ করে ঘোষিত হয়েছে—যে ফরহাদকে দরবারে হাজির করাতে পারবে, সে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পাবে।

গালিচা-ব্যবসায়ীর চোখ লোভে খুশিতে চকচক করছিল। বলল—কী খুশির কথা! আপনিই সেই প্রখ্যাত ভাস্কর ফরহাদ? তাহলে বাদশাহ খুসরুর জন্যে আপনিই মূর্তি গড়েছিলেন? ভারি অপূর্ব আপনার হাতের কাজ! আপনি জানেন? সম্রাজ্ঞী শিরীঁ ওই মূর্তি দেখেই আপনার প্রেমে পড়ে গেছেন?

ফরহাদ অস্ফুটস্বরে বারবার বলে—শিরীঁ!

—হ্যাঁ, আপনার ছাড়া আর কার? চলুন, চলুন। আপনার প্রিয়তমাকে এবার স্বচক্ষে দেখে নয়ন সার্থক করবেন। উনিও যে আপনাকে খুঁজছেন ব্যাকুল হয়ে! চলুন, চলুন!

দ্বিধাগ্রস্ত ফরহাদ বলে—না। স্বপ্ন আর ধ্যানের প্রিয়তমা নারীকে আমি

বাস্তবে দেখতে চাইনে জনাব! থাক। সে আমার মনেই বেঁচে থাক আমৃত্যু।

—তা বললে কী চলে ভাই? যাকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছেন, তাকে রক্ত-মাংসে না পেলে প্রেমের তৃষ্ণা কি শুধু কল্পনায় মেটে? আদানপ্রদান এবং মিলনেই প্রেমের পরিপূর্ণতা।

ফরহাদ গোঁ ধরে স্বভাবমতো। বলে—মাফ করবেন জনাব। আমি রূপের পূজারী। আমার শিরীঁ আমার মনেই আমার সঙ্গে মিলিত। সারাক্ষণ আমার অঙ্গে তার মধুর মদিরসঞ্চারী স্পর্শ। বাতাসে তার অঙ্গসৌরভ। শিরীঁ! আমার শিরীঁ!

বলতে-বলতে ভাবব্যাকুল তরুণ ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। আবার মানসিক বৈলক্ষণ্যে আক্রান্ত হয়। চিৎকার করে ডাকতে থাকে—শিরীঁ! আমার শিরীঁ!

গালিচা-ব্যবসায়ীর ইঙ্গিতে তার বান্দারা ফরহাদকে ধরে ফেলে।

একটু পরে আবৃত তাঞ্জামে তাকে বন্দী অবস্থায় ঢুকিয়ে কোহিস্তানের পথে রওনা হয় গালিচা-ব্যবসায়ী। সঙ্গে ভাড়াটে রক্ষীদলও নেয়। বলা যায় না, কেউ টের পেলেই শাহী বখশিশের লোভে হামলা চালিয়ে এ রত্ন হস্তগত করবে।

এখন ফরহাদের দাম দশ সহস্র আশরফি।

হারেম-ই-সতুনের নির্জন উদ্যানে সম্রাজ্ঞী শিরীঁ তার পালিত সিংহ শিশুকে আদর করছিল। এমন সময় প্রতিহারিণীর মুখে কারেয়াঁর ভাস্করের সুসংবাদ পেল। চঞ্চল হয়ে উঠল।

মহিলা উজির কিসমতবানু দোরানবাসী গালিচা-ব্যবসায়ীকে ঘোষিত পুরস্কার দিয়ে বিদায় করেছেন। ফরহাদকে প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। তার পরিচর্যায় কোন ত্রুটি রাখা হয় নি। সুন্দরী পরিচারিকা আর রূপবান বালক বান্দার দল ফরহাদের সেবায় তৎপর।

ফরহাদ স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাকিয়ে আছে।

শুভ্র ফেনসন্নিভ সুকোমল উজ্জ্বল এমন শয্যায় সে কখনও শয়ন করে নি। কারেয়াঁয় নিজের গৃহে বস্তুত তার শয্যা বলতে কিছু ছিল না। কাজ করতে করতে পাথরে মাথা রেখে নগ্ন মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়ত।

গালিচা-ব্যবসায়ীর দেওয়া সামান্য পোশাক তার পরিধানে। কিন্তু রত্ন-খচিত গজদন্ত নির্মিত পালংক, কারুকার্যময় বর্ণাঢ্য স্তম্ভ আর দেয়াল, বিচিত্র

বসনভূষণে সজ্জিত যুবতী আর বালক ভৃত্যদল তার আদেশের অপেক্ষায় নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে—এই সব দেখে সে ভাবে বুঝি অদ্ভুত এক স্বপ্ন।

সম্রাজ্ঞীর প্রধান পরিচারিকা সবিনয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলে—মহামান্য অতিথির জন্য সম্রাজ্ঞী পরিচ্ছদ পাঠিয়েছেন।

একজন খোজা পরিচারক বিশাল স্বর্ণময় খাঞ্চায় উজ্জ্বল বহুমূল্য পরিচ্ছদ নিয়ে এগিয়ে আসে।

ফরহাদ তাকে নিবৃত্ত করে বলে—আমি দীনহীন সামান্য মানুষ।

—কিন্তু আপনি অসামান্য প্রতিভাধর শিল্পী। সম্রাজ্ঞী আপনার গুণমুগ্ধ।

—আপনার সম্রাজ্ঞীকে ধন্যবাদ।

—এখনই আপনাকে সম্রাজ্ঞীর কাছে যেতে হবে। তাই অনুগ্রহ করে বেশভূষা বদলে নিন।

ফরহাদ ব্যঙ্গে ঠোঁট বাঁকা করে বলে—আমি কোন সম্রাজ্ঞীর কাছে যাই না। তিনি সারা দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী হলেও না। আমাকে এখানে জোর করে ধরে আনা হয়েছে। আপাতত তাঁকে গিয়ে বলুন, অতি দ্রুত আমি এই উদ্ভট আবর্জনাস্তূপ থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

তার মুখে কষ্টের অভিব্যক্তি দেখে প্রধান পরিচারিকার নির্দেশে একজন সাকী অর্থাৎ বালক পরিচারক উৎকৃষ্ট শিরাজীপূর্ণ সোরাহী থেকে পানপাত্র ভরে সামনে তুলে ধরে। ফরহাদ বিকৃত মুখে প্রত্যাখ্যান করে বলে—আমি শরাব পান করি না।

চতুরা প্রধান পরিচারিকা কটাক্ষ হেনে বলে—যিনি মুহব্বতের অমৃত শরাব পান করেছেন, তার কাছে এ শরাব গরল, তা জানি। কিন্তু জনাব, এ শরাব সম্রাজ্ঞী শিরীঁর উপহার। আপনি পাত্রে ওষ্ঠস্পর্শ করলেই তিনি খুশি হবেন।

শিরীঁ শব্দ শোনামাত্র ফরহাদ সুপ্তোত্থিতের মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বলে—শিরীঁ! আমার শিরীঁ!

কক্ষে শব্দহীন হাসির ঝড় বয়ে যায়। সবাই ইতিমধ্যে জেনেছে, ভাস্কর ফরহাদ সম্রাজ্ঞী শিরীঁর প্রেমে নাকি উন্মত্ত।

প্রধান পরিচারিকার ভ্রূকুটিপূর্ণ কটাক্ষে কক্ষে আবার আদবকায়দা ফিরে আসে। পরিচারিকা ও সাকীদল সন্ত্রস্ত হয়। তারপর প্রধান পরিচারিকা বলে - সম্রাজ্ঞী শিরীঁ ব্যাকুল হয়ে আপনার অপেক্ষা করছেন। শীঘ্র পোশাক বদলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন চলুন।

ফরহাদ জেদের স্বরে বলে—সম্রাজ্ঞী শিরীঁকে আমি চিনি না।

—কিন্তু এইমাত্র আপনি নিজের মুখে উচ্চারণ করেছেন...

—সে-শিরীঁ সম্রাজ্ঞী নয়। সাম্রাজ্য, সিংহাসন, বিলাসব্যসন, হর্ম্যরাজি

তাকে প্রলুব্ধ করে না। বিশাল আকাশের নিচে চিরবসন্তের গুলিস্তানে সে এক প্রকৃতিনন্দিনী। মনুষ্যনির্মিত যা কিছু, তা সে গ্রহণ করে না।...আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠস্বরে তরুণ ভাস্কর বলতে থাকে।...তাই সে সতত আবরণহীনা—নিরাভরণা। তার দক্ষিণ করে থাকে প্রকৃতির উজ্জ্বল সৃষ্টি বসন্তগোলাপ—বাম পদ মর্মরখণ্ডে স্থাপন করে সে প্রেমতীর্থে গমনাভিলাষিণী। অমৃত-নির্ঝরের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় তার রূপ। সে-শিরীঁ আমার স্বপ্নবাসিনী—মর্তে তার অমর্ত ছায়াপাত মাত্র। ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না। আপনারা কার কথা বলেছেন? সম্রাজ্ঞী শিরীঁর! সে-শিরীঁ সাম্রাজ্য আর ক্ষমতার ব্যূহে বন্দী। তাঁর কটিদেশে প্রলম্বিত থাকে বিষাক্ত খরসান। তাঁর রক্তপিপাসা কিছুতেই মেটে না। ক্ষমতার দম্ভ তাঁকে করেছে দুর্বিনীতা। সশস্ত্র প্রতিহারিণীর প্রহরায় তিনি বিচরণ করেন। প্রতিটি রাতের শয্যা তাঁর কাছে সন্ত্রাস—কণ্টকে আকীর্ণ। নারীত্বের সৌন্দর্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রেম অসীম ঘৃণায় তাঁর যৌবনকে পদাঘাত করেছে। তিনি এক হৃদয়হীনা নারী—কিংবা নারীদেহধারিণী পুরুষমাত্র। যান, গিয়ে বলুন আপনার সম্রাজ্ঞীকে—ভাস্কর ফরহাদ বলছে, যদি তাঁর প্রমোদকাননের জন্য মূর্তির প্রয়োজন হয়, আমি সহস্র মূর্তি গড়ে দিতে পারি। সম্রাজ্ঞী শিরীঁর জন্য ফরহাদের মানসপ্রিয়ার একসহস্র মূর্তি। আর কিছু নয়। যান, গিয়ে বলুন তাঁকে।...

পাশের নির্জন কক্ষে সংকীর্ণ গোপন গবাক্ষে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে ছিল সম্রাজ্ঞী শিরীঁ।

সে নিস্পন্দ। শ্বাসপ্রশ্বাসও যেন স্তম্ভিত।

কয়েকমুহূর্ত পরে তার সংবিৎ ফেরে। কোহে-আরমানের এই দুর্গরাজ-ধানীতে কি এতক্ষণ ভূমিকম্প হচ্ছিল? মরুঅঞ্চল থেকে সহসা কি ধেয়ে এসেছিল ভয়ংকর সাইমুম?

ভুলে গিয়েছিল সে এক সম্রাজ্ঞী—ক্ষমতাশালিনী, ঐশ্বর্যবতী, রাজনীতি-নিপুণা।

গবাক্ষপথে ফরহাদকে দেখামাত্র তার অবচেতনাব্যাপী প্রচণ্ড হুলুস্থুল শুরু হয়েছিল। অলীক সাইমুমের ঝঞ্ঝাবেগে উৎক্ষিপ্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে-ছিল এক নিকষকালো যবনিকা। স্মৃতির গভীরতম প্রকোষ্ঠের দুয়ার গিয়েছিল খুলে।

এই যুবক যেন তার সুপরিচিত।

প্রথম যৌবনে এক আসন্ন নওরোজের রাতে সে একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিল।

বিশাল প্রান্তরে সে একা দাঁড়িয়ে আছে। পথ হারিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যেদিকে তাকায় ধুধু বালুকারাশি। তৃষ্ণায় তার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক।

সহসা দেখেছিল, তার দিকে এগিয়ে আসছে এক রূপবান তরুণ। কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, তীক্ষ্নাগ্র সমুন্নত নাসিকা আয়তন চক্ষু—কিন্তু দেহখানি ঈষৎ শীর্ণ, নীলাভ শিরাজাল বিস্তৃত সর্বাঙ্গে। সে সম্পূর্ণ নগ্ন। তার গাত্রবর্ণ বদখশানী আপেলের মতো ঈষৎ হরিদ্রাভ, ঈষৎ রক্তিম।

যুবকটির হাতে জলপূর্ণ মৃন্ময় ভৃঙ্গার। সে সামনে এসেই মৃদু হেসে বলে—তুমি কি তৃষ্ণার্ত?

শিরীঁর লজ্জা যুবকের নগ্নতায়।

যুবক বলে—তোমার লজ্জার কোন কারণ নেই। নিজের দিকে তাকাও, তুমিও নগ্ন।

শিরীঁ আরও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়। অথচ ধুধু তৃষ্ণা। সে নতমুখে অঞ্জলি প্রসারিত করে।

যুবক বলে—কিন্তু জলপানের এক শর্ত, আমার সঙ্গে যেতে হবে।

অস্ফুটস্বরে শিরীঁ বলে—কোথায়?

—জানি না। যুবক মৃদু হেসে দিগন্তের দিকে আঙুল তোলে। আবার বলে—হয়তো ওখানে, হয়তো অন্য কোথাও। যেখানে আর কেউ নেই, সেখানে।

শিরীঁ বলে—কিন্তু আমি যে কোহে-আরমানের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী! কেমন করে যাব তোমার সঙ্গে?

তার চেয়েও বড় সাম্রাজ্য আমার হৃদয়ে। রাজী?

তৃষ্ণার্ত শিরীঁ অগত্যা বলে—রাজী।

—তাহলে পান করো।...

সে-মুহূর্তে কার ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শিরীঁর। তাকিয়ে দেখে, শাহজাদীমহলের প্রমোদকাননে একটি বেদিকায় শুয়ে আছে সে। গুলশন তাকে ডাকছে।

সেই নওরোজের রাতে বড় শুভ লক্ষণ। মধ্যরাত থেকে বৃষ্টি শুরু।

কোহিস্তানে সাড়া পড়ে গেছে তখন। শয্যা ছেড়ে নগরবাসীরা বেরিয়ে পড়েছে। বৃষ্টিধারার অমৃতসিক্ততা বহু পুণ্যের ফল। কৃপণ আকাশের এক অভাবিত করুণা। দুই হাত তুলে তারা ঈশ্বরের গুণগান করে।

শাহজাদীর প্রমোদকাননেও নিশীথ রাতের বৃষ্টির স্বাদ নিতে চায় রমণীরা। আর শাহজাদী শিরীঁর মনে গভীর তৃপ্তির আবেশ। অঞ্জলি তুলে প্রার্থনার ভঙ্গীতে গ্রহণ করে ছিল আকাশের আশীর্বাদ।

তারপর সেই অত্যদ্ভুত স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়েছিল সে। কিংবা ভয় পেত ভাবতে কারণ, পুরুষ তার কাছে নিষিদ্ধ একটি শব্দ।

এতদিন পরে কারেয়াঁর ভাস্কর ফরহাদের মধ্যে সেই স্বপ্নে-দেখা যুবককে আবিষ্কার করে শিরীঁ বিচলিত। গুরুতর আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে।

এরই মৃন্ময় ভৃঙ্গারের সুশীতল জল তার তৃষ্ণা দূর করেছিল। তাই সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের আত্মদ্বন্দ্বের অবশেষে শিরীঁ সম্রাজ্ঞীর দৃঢ়তা ও সাহস ফিরে পায়। ক্রমে তার ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার মনোবল নিয়ে সে প্রস্তুত হয়। ধীর শান্ত পদক্ষেপে ফরহাদের কক্ষে প্রবেশ করে। পরিচারিকা, প্রতিহারিণী ও সাকীরা সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করে দুপাশে সরে দাঁড়ায়।

সম্রাজ্ঞীর ইঙ্গিতে তারা কক্ষ ত্যাগ করে।

কক্ষে এখন ওরা শুধু দুজন। পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সারা স্থাবরজঙ্গম অতি ঘোর স্তব্ধতায় সমাচ্ছন্ন। দুজনেরই অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিস্ফারিত, নাসারন্ধ্র স্ফুরিত, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, চক্ষু নিষ্পলক।

ফরহাদ এতকাল তার প্রিয়তমাকে নিরীক্ষণ করেছে ধ্যানে এবং মর্মরীভূত সৌন্দর্যে, নিজেরই সৃষ্ট ভাস্কর্যে। এখন সামনে সেই যৌবনময়ী সৌন্দর্য রক্তমাংসে প্রাণচঞ্চল—একান্ত বাস্তব। কয়েক মুহূর্ত সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। তার সৃষ্টির চেয়ে জীবন যে আরও সুন্দর!

তারপর তার দৃষ্টি বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। বিশীর্ণ গণ্ডদেশে নেমে আসে নীরব অশ্রুধারা!

সম্রাজ্ঞী শিরীঁ মৃদু কণ্ঠস্বরে বলে—কান্না কেন ভাস্কর?

—পরাজয়ের দুঃখে, সম্রাজ্ঞী! ফরহাদ ভগ্ন কণ্ঠস্বরে বলে।

—কিসের পরাজয়?

—এতকাল ভাবতাম, দুনিয়ার স্রষ্টার চেয়েও শিল্পী বুঝি বা শ্রেষ্ঠ। কারণ খোদাতালার সৃষ্টিতে যা অপূর্ণ আর অপরিণত, শিল্পীর সৃষ্টিতে তার পূর্ণতা ও পরিণতি। আমার বড় অহঙ্কার ছিল সম্রাজ্ঞী, আমি কারেয়াঁর ভাস্কর ফরহাদ—আমার সৃষ্টি যেন বা খোদাতালার সৃষ্টির চেয়েও সুন্দরতম শ্রেষ্ঠতম। এখন বুঝলাম, আমি তাঁর সৃষ্ট সৌন্দর্যের কণামাত্র অনুকরণ করতে পেরেছিলাম শুধু। আমি ব্যর্থ, পরাজিত।

মৃদু হেসে গ্রীবা ঈষৎ বাঁকা করে অপরূপ কটাক্ষে শিরীঁ বলে—আমি এত সুন্দর?

—সম্রাজ্ঞী, আপনার তসবির দেখে মূর্তি গড়েছিলাম। এক নির্বোধ তসবিরওয়ালার সন্ত্রস্ত কম্পিত হাতের রেখাসমষ্টি মাত্র। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে আঁকা সেই ছবি—যা দেখামাত্র মনে হয়েছিল, এ তো আমার স্বপ্নে দেখা নারী! স্বপ্ন না দেখলে ওই বিস্রস্ত রেখাপুঞ্জ থেকে কতটুকু রূপ আমি খুঁজে পেতাম?

বিস্মিতা শিরীঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—তাহলে আপনিও স্বপ্নে দেখেছিলেন!

—হ্যাঁ। দেখেছিলাম। তবে সে শিরীঁ সম্রাজ্ঞী নয়, প্রকৃতি-কন্যা।... ফরহাদ প্রবল আবেগে বলতে থাকে—তাই সংশয় জাগে, কোহে-আরমানের নাগরিকরা যেন প্রকৃতিকন্যা শিরীঁর রূপ হরণ করে তাদের সম্রাজ্ঞীকে ভূষিত করেছে। কিন্তু হায়! রূপ হরণ করে কিংবা রাজ্য, বৈভব, ক্ষমতা এবং অস্ত্র-শস্ত্রের মূল্যে যা পাওয়া যায় না, তারই অভাবে তাদের সম্রাজ্ঞী অপহৃত সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়েও ভিখারিণীতুল্যা!

—কী সেই বস্তু, ভাস্কর?

—প্রেমিকার হৃদয়।

সম্রাজ্ঞী শিরীঁ হাসিতে উচ্ছ্বসিতা—পরক্ষণে নিজেকে সংযত করে। তার ঠোঁটে বাঁকা খঞ্জরের মতো তীক্ষ্ন হাসি ফোটে। সে বলে—প্রেম স্বপ্নবিলাসীদের বিভ্রম মাত্র। প্রেমকে আমি ঘৃণা করি।

—এ আপনার শেখা কথা সম্রাজ্ঞী! তোতাপাখির বুলি। কোহে-আরমানের প্রথারক্ষার জন্য ওরা আপনাকে একথা শিখিয়েছে। নতুবা বলতাম, এ আপনার অভিমানমাত্র।

শিরীঁ সহসা ক্রুদ্ধ। তীব্র কণ্ঠস্বরে বলে—আপনি উন্মাদ!

—হ্যাঁ, আমি উন্মাদ। ফরহাদ প্রেমিকের ভাবাবেগে তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠে। এতকাল উন্মাদনা ছিল এক অনুকৃত সৌন্দর্যের জন্য। এ মুহূর্তে আমার উন্মাদনা জেগেছে প্রকৃত সৌন্দর্যের জন্য। এখন আমার অন্ধতা ঘুচে গেছে। শিরীঁ! আমার শিরীঁ! কেন তুমি সম্রাজ্ঞীর কদর্য আবরণে নিজেকে আবৃত রেখেছ? কেন সম্রাজ্ঞীর কলুষ ওষ্ঠে বাক্য উচ্চারণ করছ? তুমি কি জানো না, ওই ওষ্ঠ কতবার নরহত্যার আদেশ দিয়েছে? ঈশ্বরের দোহাই! প্রিয়তমা শিরীঁ! সাম্রাজ্য, বৈভব, ক্ষমতা এখনই পায়ে দলে বেরিয়ে এস। ঈশ্বরের আকাশ এবং প্রান্তর তোমাকে ডাকছে। গুলিস্তানের দুয়ারে বসন্ত অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না শিরীঁ, তার চঞ্চল অশ্বখুরধ্বনি? শিরীঁ, আমার শিরীঁ! আর এক মুহূর্ত দেরি নয়—এখনই চলে এস। বেরিয়ে এস আবর্জনাস্তূপ থেকে মুহব্বতের গুলিস্তানে।...

ভাবোন্মত্ত ফরহাদ দুই বাহু প্রসারিত করে এগিয়ে যায়।

শিরীঁর আয়ত নয়ন দুটিতে আতঙ্কের দৃষ্টি। সাইমুমতাড়িত পুষ্পবতী গুল্মের মতো সে মুহুর্মুহু প্রকম্পিত। মৃন্ময় ভৃঙ্গারের অমৃত বারিতে তৃষ্ণাপূরণের ঋণ পরিশোধের মুহূর্ত বুঝি বা আসন্ন! কোহিস্তানের হর্ম্য-রাজি, পর্বতমালা, প্রান্তর আর আকাশ থেকে যেন বা গম্ভীর স্বরে সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে—প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নারী! হুঁশিয়ার! তোমার সম্মুখে এক দুশমন।

সম্রাজ্ঞা শিরীঁ শ্বাসাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে গর্জন করে ওঠে—হুঁশিয়ার দুশমন!

হাবসী প্রতিহারিণীরা এসে দুজনের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীর সৃষ্টি করে। উন্মত্ত ফরহাদকে তারা লোহার শিকলে বেঁধে ফেলে। ফরহাদ মূর্ছিত।

ওরা ভূগর্ভস্থিত কয়েদখানায় নিয়ে যায় তার অচেতন দেহ।

ফরহাদ নির্জন কারাগারে বন্দী। শূলময় স্তম্ভ ও দেয়ালে সে শিরীঁকে দেখতে পায়। শিরীঁ! আমার শিরীঁ! চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ক্ষতবিক্ষত হয়। স্তম্ভকে শিরীঁ বলে জড়িয়ে ধরে। তারপর তাকে ছাদসংলগ্ন প্রলম্বিত শৃঙ্খলে আটকে রাখা হয়েছে।

ওদিকে সম্রাজ্ঞী শিরীঁর মনে অন্য ভাবনা। বাদশাহ খুসরুর অবমাননার প্রতিশোধ তো নেওয়া হয় না! ভেবেছিল, কারেয়াঁর ভাস্করকে দিয়ে তার মূর্তি তৈরি করিয়ে নেবে এবং আগামী নওরোজে নানা দেশের সম্রাটদের আমন্ত্রণ করে এনে তাদের সামনে সেই মূর্তিকে কশাঘাত করবে। বাদশাহ খুসরু স্বচক্ষে দেখবেন এই দৃশ্য।

গোপনে আরও ভাস্করের অনুসন্ধান চলে। কোহে-আরমানী দূত যায় ইউনান, রুম, চীনে। কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা, পথিমধ্যে অতর্কিতে ভাস্কর আক্রান্ত হয় দস্যুদের হাতে এবং মারা পড়ে।

ইউনানী, রুমী, চীনা ভাস্কর এভাবে নিহত হওয়ার পর আর কোন দেশেরই ভাস্কর কোহিস্তানে আসতে চায় না।

গুপ্তচরের মুখে শিরীঁর চক্রান্তের কথা খুসরু অবগত। তাঁর উজির সপ্রু ধুরন্ধর ব্যক্তি। কোহে-আরমানগামী সব রাস্তায় মদ-ই-অনের দুর্ধর্ষ সেনারা দস্যুর ছদ্মবেশে ওৎ পেতে আছে।

সুলতানা-মাতা মুহিবানু তখন অসুস্থ। তাঁর কানে যায় সব কথা। শিরীঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। শিরীঁ নিজ সংকল্পে অটল।

মুহিবানু ফরহাদের কাহিনীও শুনেছেন। অস্বস্তিতে উদ্বেগে তিনি অস্থির। তাঁর ব্যাধি বেড়ে যায়।

আর শিরীঁর সুন্দর মুখে ততদিনে মলিন্যের ছায়া জমেছে। সেই উজ্জ্বল দৃপ্ত যৌবনময়ী শিরীঁর দেহে যেন বা বলিরেখার সন্তর্পণ সঞ্চার। আহারে রুচি নেই। অনিদ্রায় দীর্ঘ রাত কাটে। কারণ-অকারণে ক্রুদ্ধ হয়। অন্তঃপুরে পরিচারিকা ও প্রতিহারিণীরা সদা সন্ত্রস্ত—দরবারে উজির-আমির-সেনাপতিরা উদ্বিগ্ন। সম্রাজ্ঞীর স্বেচ্ছাচারিতা দিনে দিনে বাড়ছে। তাঁরা মনে-মনে অসন্তুষ্ট। যে-কোন মুহূর্তে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে। সম্রাজ্ঞীর নামে কলঙ্ক রটেছে গোপনে।

এই নিশীথ রাত্রে পীড়িতা মুহিবানুর মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিল। রাজ-বৈদ্যদের নিদ্রাভঙ্গ করে ডাকা হল হারেম-ই-সতুনে। তাঁরা পরীক্ষা করে জনান্তিকে জানালেন, সুলতানা-মাতাকে মৃত্যুদেবতা স্পর্শ করেছেন। আর কিছুক্ষণ পরে তাঁর প্রাণশিখা নিবে যাবে।

মুহিবানু বিশীর্ণ হাতের ইঙ্গিতে কক্ষের সবাইকে চলে যেতে বললেন। শিয়রে উপবিষ্টা শিরীঁর কোটরগত কালিমালিপ্ত দুটি চোখে একবিন্দু অশ্রু নেই। তার দৃষ্টি তীব্র, উজ্জ্বল।

মুহিবানু অতিকষ্টে বলেন—বেটি শিরীঁ!

—মা!

—ঘরে কেউ নেই তো?

—না মা। শুধু তুমি আর আমি।

—তোমার বাল্যপরিচয় আমি জানিয়ে যেতে চাই।

—কেন মা? ওকথা জেনে আর লাভ কী?

—বেটি! কোহে-আরমানে অনেক সম্রাজ্ঞী তোমার মত রূপবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তোমার চেয়ে সহস্রগুণে দুর্ভাগা! কারণ, তুমি একটি অপূর্ব উপঢৌকন লাভ করেছ, তাঁরা তাতে বঞ্চিতা ছিলেন।

কী সেই অপূর্ব উপঢৌকন মা?

—মুহব্বৎ, বেটি। আত্মহননকারী প্রেম। মুহিবানু শ্বাসক্লিষ্ট স্বরে বলতে থাকেন। কোহে-আরমানের অধীশ্বরীদের সবাই ভয় পেয়েছে। ভালবাসতে পারে নি। তুমি ধন্য, শিরীঁ।

শিরীঁ নতমুখে নীরবে বসে থাকে। মুহিবানু বলেন—বিধাতার এক অপূর্ব লীলা, শিরীঁ। এতদিন গোপন রেখেছিলাম। মৃত্যুর আগে সে-কথা না জানালে বিধাতার কাছেই অপরাধী থেকে যাব। তুমি তো এখন জেনেছ, কোহে-আরমানের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী সংগ্রহ করা হয় সুলক্ষণা শিশুকন্যা হরণ করে।

—জেনেছি, মা।

—তোমাকে আমরা এনেছিলাম কারেয়াঁ থেকে।

বিস্ময়ে শিহরিত হয়ে শিরীঁ বলে—সে কী!

—হ্যাঁ, কারেয়াঁ থেকে। সে এক বিচিত্র ঘটনা, শিরীঁ! কোহে-আরমানের উজির ছদ্মবেশে একদল সশস্ত্র সেনা নিয়ে কারেয়াঁর সন্নিহিত প্রান্তরে চলেছেন। সঙ্গে আছেন রাজদৈবজ্ঞ। তাঁরই নির্দেশে ওঁরা যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন পথিমধ্যে একটি শিশুকন্যা নগ্নদেহে ধূলিখেলায় মগ্ন। আর তার সমবয়সী একটি শিশুপুরুষ—সেও নগ্ন, ভাঙা মৃৎপাত্রে নিকটবর্তী নহরের জল এনে তাকে ডাকছে। শিশুকন্যা তাকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়াল এবং অঞ্জলি পাতল। বড় অপূর্ব দৃশ্য। দৈবজ্ঞ থমকে দাঁড়ালেন। ব্যস্তকণ্ঠে বললেন,—মহামান্য

উজির! মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বাধা দিন জলপানে। ওই সেই প্রার্থিত সুলক্ষণা!

ব্যাকুল শিরীঁ বলে—তারপর মা, তারপর কী হল?

—মৃৎপাত্র কেড়ে নিল সেনারা। শিশুটি কেঁদে উঠল। আর তোমাকে তুলে নিয়ে বস্ত্রখণ্ডে ঢেকে উজির ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। আশ্চর্য, কোহিস্তানের প্রাসাদে যখন আমার সামনে তোমাকে আনা হল, দেখি তখনও তোমার আঙুল সিক্ত। দৈবজ্ঞ বললেন—এই কন্যা ঈশ্বরের অনুগৃহীতা। রাজ্যের সম্পদ বাড়বে। নদী হবে জলপূর্ণ। ভূমি হবে শস্যবতী।

শিরীঁ আত্মসংবিৎহারা। আপন মনে বলে—তাহলে কি তাকেই যুবকবেশে স্বপ্নে দেখেছিলাম?

—কাকে বেটি?

—সেই খেলার সঙ্গীকে।

—বলিস কী শিরীঁ!

—হ্যাঁ মা।...শিরীঁ আর আত্মসংবরণ করতে পারে না। অশ্রুধারায় গণ্ডদেশ প্লাবিত হয়। সে ভগ্নস্বরে বলে—সেই শিশু এতদিনে কোহিস্তানে এসে তার খেলার সঙ্গিনীকে ডাক দিয়েছে মা! আমি এখন কী করব?

মুহিবানু বিশীর্ণ হাতে শিরীঁর একটি হাত নিয়ে, ঈষৎ মাথা তুলে বলেন—বুঝেছি বেটি, বুঝেছি। ভাস্কর ফরহাদ তার নাম। দৈবজ্ঞ যা বলেছিলেন, তা যেন বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে।

—কী বলেছিলেন দৈবজ্ঞ?

—বলেছিলেন, এই কন্যার বাইশ বছর বয়স পূর্ণ হলে এক সংকটকাল আসবে। সে যদি তখনও শাহজাদী হয়ে থাকে, তার সম্রাজ্ঞী হওয়া সম্ভব নয়। যদি তখন সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সিংহাসনচ্যুত হতে হবে। মনে হচ্ছে, তোর জীবনের সেই সংকটকাল আসন্ন।

শিরীঁ মুহিবানুর বুকে মাথা রেখে নীরবে কাঁদে। মুহিবানু তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলেন—সম্রাজ্ঞী হওয়ার সুখ আছে, দুঃখ আছে তার অনেক বেশি। আমিও তো সম্রাজ্ঞী ছিলাম বেটি! এখন এই আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্তে মনে হচ্ছে, হায়, আমি কী ব্যর্থ! কী পেলাম সারাজীবনে? ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, শ্রদ্ধা। কিন্তু চিত্তের নিভৃত তৃষ্ণা তো মিটল না! শুধু ধূ ধূ মরুভূমি—নিষ্ফল বালুকারাশি! আঃ, কী জ্বালা আমার! মানবজীবনের—আমার নারীজীবনের সর্বোত্তম পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে গেলাম!

মুহিবানুর পাণ্ডুর জীর্ণ গণ্ডে দুফোঁটা অশ্রু টলটল করে। সহসা বলে ওঠেন—তুই পালিয়ে যা বেটি! আজ রাতেই চলে যা কোহিস্তান ছেড়ে। ফরহাদকে মুক্ত করে নিয়ে দূরদেশে গিয়ে জীবনযাপন কর। সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, ক্ষমতায় লাথি মেরে চলে যা শিরীঁ!

শিরী মাথা তুলে মুহিবানুর দিকে তাকায়। সে আত্মসংবরণ করেছে।

মুহিবানু বলেন—পারবিনে?

কয়েকমুহূর্ত পরে শিরী মাথা দোলায়।—না মা। ক্ষমা করো আমাকে। তা হয় না।

—কেন হয় না শিরী?

—শয়তান খুসরুর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া বাকি আছে। কোহে-আরমানের সম্রাজ্ঞী না হয়ে থাকলে সে-প্রতিশোধ নেওয়া দুঃসাধ্য হবে, মা। তুমিই ভেবে বলো!

মুহিবানু হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন—তুই পস্তাবি শিরী! তোকে হিংসা আর ক্ষমতার মোহ গ্রাস করেছে। তুই নিজে রসাতলে যাবি, কোহে-আরমানকেও রসাতলে নিয়ে যাবি।

শিরী অবিচল স্বরে বলে—সে নিয়ে তুমি ভেবো না মা। ঈশ্বরকে ডাকো বরং।

উত্তেজনায় মুহিবানু কাঁপতে থাকেন। কোটরগত বিবর্ণ চক্ষু নিষ্পলক—শিরীর প্রতি নিবদ্ধ। হায়, কোন পাষাণহৃদয়া নারীর মধ্যে নিজের অপূর্ণ তৃষ্ণার নিবৃত্তি আশা করছেন!

তারপর ক্রমশ দেহকম্পন প্রশমিত হয়। নির্বাণোন্মুখ শিখা শেষ মুহূর্তে যে উজ্জ্বলতায় জ্বলে উঠেছিল, তা অকস্মাৎ নির্বাপিত হল। মৃত্যুদেবতা মুহিবানুকে হিমশীতল ঊর্ণাজালে আবৃত করলেন।...

মুহিবানুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল মহাসমারোহে।

কোহে-আরমানের প্রথা—প্রাক্তন বা বর্তমান সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলে কারাগারের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা এর হেতু।

সব বন্দী মুক্তি পেল। ফরহাদও মুক্ত হল।

কিন্তু সে তখন বদ্ধ উন্মাদ। রাজপথে ঘুরে বেড়ায় শতচ্ছিন্ন বেশ, যেন এক জীবন্ত কঙ্কাল। শুধু তার চোখ দুটি উজ্জ্বল—দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী। সে আপন মনে বলে—শিরী! আমার শিরী!

জনতা তাকে নিয়ে তামাশা করে। বালক-বালিকা তার পিছনে লাগে! ঢিল ছোঁড়ে। তার দৃকপাত নেই। শুধু বলে—শিরী! আমার শিরী!

এদিকে সম্রাজ্ঞী শিরী বাদশাহ খুসরুর বিরুদ্ধে সমরাভিযানে প্রস্তুত হচ্ছে। উজির-অমাত্য-সেনাপতিদের উত্তেজিত করে তুলেছে সে। বলেছে—

কোহে-আরমান সম্রাজ্ঞীর অবমাননা আর কতকাল নীরবে সহ্য করবেন আপনারা? এতদিন ধরে আমি ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম—দেখি, সম্রাজ্ঞীর অবমাননার প্রতিশোধের কথা কেউ মুখ ফুটে বলেন কিনা। আশ্চর্য, আপনারা নীরব থেকেছেন। কেন এ নীরবতা? শয়তান ক্লীব খুসরুকে আপনাদের এত ভয়? নাকি সম্রাজ্ঞীর প্রতি আপনাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আর নেই? বেশ—যদি তা হয়, তাহলে আমি সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, খুসরুর প্রমোদকাননে আপনাদেরই এক সম্রাজ্ঞীর নগ্নমূর্তি চিরদিন দেশবিদেশের লোকের মনে কুৎসিত লালসার উদ্রেক করবে। এতে বুঝি কোহে-আরমানের গৌরব বাড়বে? কোহে-আরমানের বীরবৃন্দ কি এত হীনবল হয়ে পড়েছে?

বস্তুত সারা কোহে-আরমান যেন ঠিক এই-ই চেয়েছিল। প্রতীক্ষা করছিল শুধু সম্রাজ্ঞীর একটি আদেশের। সম্রাজ্ঞী নিজেই তো এতদিন নীরব ছিলেন।

সাজো সাজো রব পড়ে যায় চতুর্দিকে। গোপন মন্ত্রণাকক্ষে স্থির হয়, আগামী কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিনে নিশীথ রাত্রে মদ-ই-অনের রাজধানী এরেম শহর আক্রমণ করা হবে।...

সেদিন রাজধানীর অন্তর্বর্তী প্রান্তরে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ চলেছে। আজ মধ্যরাতে রণযাত্রা।

অপরাহ্নে সম্রাজ্ঞী শিরীঁ অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে কুচকাওয়াজ পরিদর্শনে। দুধারে নাগরিকদের ভিড়।

সহসা ভিড় থেকে কে চিৎকার করে ছুটে আসে—শিরীঁ! আমার শিরীঁ!

মুহূর্তকাল ঘুরে শিরীঁ দেখে যায় উন্মাদ ফরহাদকে। তার অশ্বের পদাঘাতে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভাস্কর। রক্ষীরা তাকে রাস্তা থেকে তুলে ফেলে দেয় ভিড়ে।.

ফরহাদ চিৎকার করে—শিরীঁ! আমার শিরীঁ!

ভিড়ে যারা তাকে চিনতে পারে, তারা বলে—এই সেই কারেয়াঁবাসী ভাস্কর! এই শয়তান আমাদের সম্রাজ্ঞীর অবমাননার কারণ!

তারা ফরহাদের গায়ে থুথু ফেলে। কেউ মুষ্ট্যাঘাত করে।

একজন তামাশা করে বলে—ওহে প্রেমিকপ্রবর! সম্রাজ্ঞী শিরীঁকে চাও

নাকি? তাহলে কথা শোন। এক কাজ করতে পারলে তাঁকে পেয়ে যাবে।

ফরহাদ ব্যাকুলভাবে বলে—হ্যাঁ, শিরীঁকে আমি চাই। শিরীঁ! সে আমার শিরীঁ!

ভিড় তাকে ঘিরে ধরে। কেউ তাকে প্রহার করে। আবার কেউ তাকে কুৎসিত পরিহাস করে। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে এক সুরসিক কসাই কপট গাম্ভীর্যে বলে—তাহলে ওই দেখ! দেখতে পাচ্ছ তো? ওই হচ্ছে বেসাতুন পাহাড়। ওই পাহাড় খোদাই করে যদি সম্রাজ্ঞী শিরীঁর একটা মূর্তি বানাতে পারো, ব্যস্! কেল্লা ফতে। সম্রাজ্ঞী শিরীঁর সঙ্গে আমরাই তোমাকে কল্মা পড়িয়ে শাদি দেব।

প্রেমোন্মাদ ফরহাদের দৃষ্টি বেসাতুন পর্বতের দিকে। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। শীর্ণ হাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে—তাহলে দয়া করে আপনারা আমাকে হাতুড়ি আর ছেনি দিন।

ওরা চেঁচিয়ে ওঠে—ওরে! হাতুড়ি আন, ছেনি আন!

একজন তামাশাকারী নিকটবর্তী ছুতোরের দোকান থেকে একটি কুঠার এনে দিয়ে বলে—এই দিয়েই চেষ্টা করে দেখ ভাই প্রেমবিশারদ। হাতুড়ি ছেনি কোথায় পাব বলো?

ফরহাদ কুঠার তুলে নেয় হাতে।

তারপর দৌড়ে যায় বেসাতুন পর্বতের দিকে।

পিছনে জনতা হাসিতে ভেঙে পড়ে। এমন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা কস্মিনকালে দেখেনি ওরা।

সেদিন মধ্যরাতে অকস্মাৎ এরেম শহরে আগুন জ্বলে ওঠে। ঘুমন্ত নগরবাসী জেগে যায়—হতচকিত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সম্রাট নওশেরোয়াঁর যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজিত এ রাজ্যে। নাগরিকরা যেমন, তেমনি সেনাবাহিনীও বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত। রণবিদ্যা প্রায় বিস্মৃত। বহিরাক্রমণের আশংকা ছিল না বলেই বটে, আবার ভোগী উচ্ছৃংখল বিলাসী বাদশাহ খুসরুর অদূরদর্শিতা এবং অহেতুক অহংকারী আত্মবিশ্বাস রাজধানীকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে ছিল। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে বিমূঢ় পতঙ্গের মতো অগ্নিদগ্ধ হতে থাকে এরেমনগরী।

খুসরু তখন প্রমোদকাননের এক কক্ষে সুরাপানে অচেতন। ঘুমন্ত ভূলুণ্ঠিতা নর্তকীদের মধ্যে শয়ান। কোহে-আরমানী নারী-সেনারা তাকে বহন

করে নিয়ে যায় নগরীর প্রান্তে সম্রাজ্ঞী শিরীঁর সামনে।

আর তার প্রমোদকাননের শিরীঁমূর্তি একের পর এক চূর্ণ হতে থাকে ভীম প্রহরণের আঘাতে। মধ্যরাতে ধূলিঝঞ্ঝা এবং মেঘ গর্জন যেন।

এরেম জুড়ে নারী ও শিশুদের ক্রন্দন, যোদ্ধাদের রণদান এবং অশ্বের হ্রেষা, অগ্নির তাণ্ডব। উজির সপ্রুর প্রাসাদ চূড়ে কোহে-আরমানীরা ব্যর্থ। সপ্রু বেমালুম গায়েব। নাকি নিহত রক্ষীদের লাশের তলায় তাঁর লাশ চাপা পড়েছে! সম্রাজ্ঞী শিরীঁর আদেশ ছিল তাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী-করা।

পূর্ব আকাশের প্রান্তে 'সোবেহ্-সাদেক' বা ব্রাহ্মমুহূর্ত উপস্থিত। কোহে-আরমানীদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ। লুণ্ঠন ও হত্যার পিপাসা তৃপ্ত। নকীবের তূর্যধ্বনিতে প্রত্যাবর্তনের সংকেত বাজে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ খুসরুর দেহ রুক্ষ কংকরময় মৃত্তিকায় টানতে টানতে নিয়ে আসে অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং সম্রাজ্ঞী শিরীঁ। তার একহাতে শৃঙ্খলপ্রান্ত, অন্য-হাতে কশা। খুসরুর নেশা ঘুচে গেছে। আর্তনাদ করেন যন্ত্রণায়। ক্ষমা প্রার্থনা করেন করুণ কণ্ঠস্বরে। শিরীঁ নির্বিকার। ঊষার স্মিত আলোয় তার মুখে সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কণামাত্র দেখা যায় না। কী নিষ্ঠুর ওই মুখ!

কোহে-আরমানীদের কাছে তাদের সম্রাজ্ঞীর এই বিকারহীন নির্দয় রূপ বংশানুক্রমে সুপরিচিত। বস্তুত, শুধু তারাই যেন বা জানত, নারীর চেয়ে কমনীয়-নমনীয় যেমন কিছু নেই—প্রয়োজনে তার চেয়ে নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন পাষাণও কিছু থাকতে পারে না।

তারা জানত, নারী নিষ্ঠুর হলে পুরুষকে সহস্রগুণে ছাড়িয়ে যেতে পারে। নারী রক্তপিপাসু হলে ধরিত্রীর বুকে রক্তের মহাপ্লাবন বয়ে যায়।

তাই একদা তারা নারীর হাতেই তুলে দিয়েছিল রাজ্যের দায়িত্ব। আজ ভুবনবিখ্যাত দুর্জয় সম্রাট নওশেরোয়াঁর পৌত্রকে বন্দী করে এবং তাঁর রাজধানী ভস্মীভূত করে তাদের সম্রাজ্ঞীর জয়ধ্বনি দিতে-দিতে তারা কোহিস্তান ফিরে আসছে। ঊষালগ্নের বিস্তীর্ণ রুক্ষহীন প্রান্তর আতঙ্কে যেন নিস্পন্দ।...

'...হে বেসাতুন! হে ধ্যানমগ্ন আউলিয়ার মতো নিস্পন্দ পর্বত! প্রস্তুত হও। তোমাকে উত্তীর্ণ করব এক মহান সত্যে। বিশ্বের সকল আদমসন্তান যুগযুগ ধরে তোমাকে অমৃত তীর্থের মতো দর্শন করবে।

'হে রুক্ষ প্রস্তরায়িত কদর্যতা! তোমার মধ্যে সঞ্জীবিত করব শাশ্বত

সৌন্দর্যকে। তুমি প্রস্তুত হও। সহস্র বসন্তের পুষ্পিত হাস্যরেখা উজ্জীবিত হবে তোমার সুপ্রাচীন জরাগ্রস্ত বলিরেখা-সংকুল ওই মুখে। অনন্ত যৌবনের ছন্দে উচ্ছলিত হবে তোমার জড় সত্তা। আমি তোমাকে দেব বিরাট প্রাণ।

'হে নির্জীব বিশালতা! বিশ্বের সুন্দরতমা নারীকে সৃষ্টি করব তোমার নিষ্ফল বস্তুরাজি থেকে। তুমি ধন্য হবে। যাবৎ চন্দ্রসূর্য আকাশে উদিত হবে, শ্রেষ্ঠ কবি তোমার জন্য কবিতা রচনা করবে। গায়করা গাইবে তোমারই গান।

'যুগযুগান্তকালের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হে গম্ভীর মৌন! তোমার মধ্যে জাগিয়ে তুলব আমার শিরীঁকে। নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বী রোজ কেয়ামতের বিচার-দিবস অবধি যাকে বন্দনা করবে, তাকে ধারণ করে তুমি সার্থক হও।...'

সেই দিনাবসানকাল থেকে সারা রাত্রি প্রেমিক ভাস্কর হাতে কুঠার নিয়ে এই ত্রিকোণ পাহাড় প্রদক্ষিণ করেছে।

অবশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রস্তুত হয়েছে মূর্তি নির্মাণে। হাতের কুঠার তুলেছে ঊর্ধ্বে। কিন্তু আঘাত করতে গিয়েই চমকে উঠেছে। কোথায় বেসাতুন পর্বত? এ যে তার শিরীঁ!

ফরহাদ পিছিয়ে আসে। আবার দেখে সৌন্দর্যময়ী শিরীঁতে বেসাতুন পর্বত রূপান্তরিত। সে চিৎকার করে ওঠে--শিরীঁ! আমার শিরীঁ!

সে পর্বতের অন্য প্রান্তে যায়। আবার কুঠার তোলে। আবার শিরীঁকে দেখতে পায়। হায়, কোন প্রাণে এই কোমল তনুদেহে সে কুঠারাঘাত করবে?

চতুষ্প্রান্ত ঘুরে ব্যাকুল ভাস্কর পর্বতগাত্রে শুধু শিরীঁকে দেখে। প্রিয়তমার শরীরে সে কুঠারাঘাত করতে পারেন না। কুঠার তুলেই অস্ফুট চিৎকার করে পিছিয়ে যায়। উন্মাদনা বেড়ে যায় তার। এই পাহাড় খোদাই করে শিরীঁর মূর্তি না করলে যে সে শিরীঁকে পাবে না!

সে কাকুতিমিনতি করে বলে—হে বেসাতুন! ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে মায়াজালে আচ্ছন্ন কোরো না! প্রিয়তম শিরীঁর মূর্তি গড়তে দাও আমাকে।

পূর্বদিগন্ত থেকে প্রসারিত সূর্যরশ্মি বিরাট পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে। আর প্রেমিক ভাস্কর দেখে, মহিমান্বিত শিরীঁ আলোকময়ী হয়ে উঠেছে। আকাশস্পর্শী বিশাল শিরীঁমূর্তিতে প্রাণ জেগেছে।

ক্রমশ সূর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ক্রমশ শিরীঁ প্রাণময়ী হয়। রক্তমাংসে সঞ্জীবিত হয় তার সত্তা। ভাস্কর ফরহাদের কুঠার নিবৃত্ত হয় অর্ধপথে। সে হাহাকার করে বলে—হায়, প্রিয়তমা শিরীঁর কোমল অঙ্গে আঘাত করা যায় না! তাহলে আমি কী করব?

উন্মত্ত ফরহাদ দেখে, আকাশ প্রান্তর পর্বতব্যাপী শুধু শিরীঁ আর শিরীঁ।

বিশ্ব শিরীঁময় হয়ে উঠেছে। স্থাবরজঙ্গম জুড়ে পরিব্যাপ্ত তার প্রিয়তমা নারী।

সে যেদিকে তাকায়, সেদিকে শিরীঁ। আর্তনাদ করে বলে—আমি পারব না—পারব না! বিভ্রমে আচ্ছন্ন প্রেমিক হাতের কুঠার ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে।

সেই কুঠার পাহাড়ের গায়ে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে এসে তাকে আঘাত করে। রক্তাক্তদেহে লুটিয়ে পড়ে ফরহাদ।...

তখন কোহিস্তানে চলেছে বিজয়উৎসব।

হতচেতন ক্ষতবিক্ষত বাদশাহ খুসরু প্রস্তরমঞ্চে শৃঙ্খলাবদ্ধ। নগরবাসীরা তার গায়ে পাথর ছুঁড়ছে। পাথরের স্তূপে ঢাকা পড়েছে হতভাগ্য খুসরুর লাশ।

রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে সম্রাজ্ঞী শিরীঁ ডেকে পাঠিয়েছে সহচরী গুলশনকে।

গুলশন গিয়েই অবাক।

সম্রাজ্ঞী শিরীঁর পরিধানে এ কী বেশ! অতি সামান্য জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড মাত্র। সম্পূর্ণ নিরাভরণা সে। পা-দুখানি নগ্ন। বিস্রস্ত কেশরাশি। ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি।

গুলশন বলে—এ কী সম্রাজ্ঞী!

শিরীঁ মৃদু হেসে বলে—গুলশন! তোমাদের সম্রাজ্ঞী গতরাত্রির যুদ্ধে নিহত। আমি সামান্যা নারী মাত্র।

—এর অর্থ কী সুলতানা?

—আমাকে বিদায় দাও, সখি! এখন আমার যাত্রার শুভলগ্ন।

অশ্রুপূর্ণ চোখে গুলশন বলে—আপনি কোথায় যাবেন সুলতানা?

—চুপ্। আমি সুলতানা নই। কারেয়াঁর এক নগণ্যা নারী মাত্র।...শিরীঁ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে। গুলশন! প্রিয় সখি আমার! আর যেন কেউ আমার গন্তব্য না জানতে পারে। শুধু তোমাকেই বলে যাচ্ছি। আমি চলেছি আমার বাল্যসঙ্গীর সন্ধানে। গুলশন! এই দিনটির জন্যে এতকাল প্রতীক্ষা ছিল আমার। বিদায় দাও এবার।

—কে আপনার বাল্যসঙ্গী, সম্রাজ্ঞী?

—ভাস্কর ফরহাদ।...শিরীঁ অশ্রুসমাচ্ছন্ন চোখে কাতর স্বরে বলে।...তাকে গতকাল রাজপথে শেষবার দেখেছি। জানি না, আর তাকে খুঁজে পাব কিনা। গুলশন! তার দেহে আমার নিষ্ঠুর অশ্ব পদাঘাত করেছিল। তাই দেখ,

আমারও শরীরে ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠেছে।

গুলশন আর্তস্বরে বলে—আঃ সম্রাজ্ঞী! এ কী করছেন আপনি?

—ভেবো না সখি! আমার প্রিয়তমকে পেলেই এ ক্ষতচিহ্ন মুহূর্তে মুছে যাবে।...

শিরীং কক্ষস্থিত গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে দরজা খোলে। গুলশন বলে—সম্রাজ্ঞী শিরীং! ভাস্কর ফরহাদ গেছেন বেসাতুন পর্বতে।

শিরীং ঘুরে দাঁড়ায়। অস্ফুটস্বরে বলে—কেন? কেন গুলশন?

তামাশাওয়ালারা তাকে বলেছিল, বেসাতুন পর্বত খোদাই করে আপনার মূর্তি গড়লে আপনাকে তিনি পাবেন। তারা তাঁর হাতে কুঠার এনে দিয়েছিল। প্রেমোন্মত্ত ভাস্কর এখন বেসাতুন খোদাই করে আপনার মূর্তি নির্মাণ করছেন।

শিরীং গুপ্তদ্বারের সোপানে নিমেষে অন্তর্হিত হয়।...

প্রান্তরবর্তী পর্বতমালায় একটি গুহায় সে-পথের শেষ। শিরীং গুহা থেকে বেরিয়ে চারদিকে তাকায়।

ওই সেই সুউচ্চ ত্রিকোণ বেসাতুনশীর্ষ! উজ্জ্বল সূর্যের কিরণে দীপ্ত এক নীলাভ বিশালতা।

শিরীং অজস্র প্রস্তরখণ্ড অতিক্রম করে ছুটে যায়। গুল্মকণ্টকে জীর্ণ বস্ত্র শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোমল পাদুখানি ক্ষতবিক্ষত হয়। রক্ত মেখে যায় পাথর ও ম্রিয়মাণ তৃণে। সে ডাকে—ফরহাদ! আমি এসেছি! ফরহাদ! কোথায় তুমি?

পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয় প্রেমিকার ব্যাকুল চিৎকার।

বেসাতুনের পাদদেশে রক্তাক্ত দেহে মুমূর্ষু ফরহাদ পড়ে আছে। তার বুকে বিদ্ধ কুঠার। শিরীং ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নেয়। ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে বলে—ফরহাদ! প্রিয়তম ফরহাদ!

মৃত্যুর ঊর্ণাজালে আচ্ছন্ন চোখে ফরহাদ তাকায়। বিশীর্ণ বিশুষ্ক অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিস্ফারিত। কম্পিত। কিছু বলতে চায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণ স্পন্দনে যেন বা উচ্চারিত হয়—শিরীং। আমার শিরীং!

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নারীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ। শিরীং ফরহাদের মাথা তুলে নেয় ঊরুদেশে। বারবার মুখচুম্বন করে বলে—এসেছি ফরহাদ! আমি এসেছি!

আর, যেন বা পুলকে আবেগ হর্ষে বিহ্বল বেসাতুন পর্বতের হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে। প্রস্তরাকীর্ণ উপত্যকা থরথর করে কাঁপতে থাকে। আকাশ বাতাস জুড়ে যেন বা সুগম্ভীর স্বরে প্রেমের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

মিলনের সেই অমৃতস্বাদ সঞ্চরণে যেন দুঃসহ ভাবাবেগে জড়ীভূত সুপ্রাচীন বেসাতুন আর স্থির থাকতে পারে না। প্রবল ভূমিকম্পে বিস্ফোরিত

হয়।

ততক্ষণে কোহিস্তানে খবর রটে গেছে। নির্বোধ গুলশন বিভ্রমঘোরে প্রকাশ করে দিয়েছে সম্রাজ্ঞীর অন্তর্ধানের কথা।

কোহিস্তান থেকে দলে দলে ছুটে আসছে নাগরিক সৈনিক সেনাধ্যক্ষ সেনাপতি আর উজির-আমিরবৃন্দ। সম্রাজ্ঞীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারা।

বেসাতুন পর্বতের কাছে আসার আগে সহসা শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ভূমিকম্প। তারা থমকে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। পৃথিবী টলমল করছে। আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে ধূলিমেঘ।

তারপর তারা দেখে, দুটি জ্যোতির্ময় দেহ বুকে তুলে নিল বেসাতুন। দুটি বিদ্যুৎরেখা এক হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে ভূমিকম্প থামল। পৃথিবী শান্ত হল। আকাশে ধূলিমেঘ হল অপসৃত। তারপর তারা সবিস্ময়ে দেখল, বেসাতুনের বুকে উচ্ছ্বসিত একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি হয়েছে।...

সুপ্রাচীন বেসাতুন পর্বতমালা এখনও রয়েছে। আজ হাজার বছর পরেও সেই অপরূপ ঝর্ণা বয়ে চলেছে। কোহিস্তান আর নেই। তার ধ্বংসাবশেষও কালক্রমে লুপ্ত।

বেসাতুনের পাশ দিয়ে যাবার সময় এখনও বণিক আর পর্যটকরা ত্রিকোণাকার পাহাড়চূড়া থেকে নির্গত সেই ঝর্ণাধারার স্ফটিকশুভ্র রূপ দেখে বিমোহিত হয়। ওই জল অতি পবিত্র।

প্রেমিক-প্রেমিকারা সেখানে গিয়ে ধূলিকণা মাথায় তুলে নেয়। পবিত্র ঝর্ণার জল ছুঁয়ে পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

নির্জন জ্যোৎস্নার রাতে নাকি চূড়ায় দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকে মুখোমুখি। শিরী আর ফরহাদ। দিনের দ্বিতীয় প্রহরে দূর থেকে মনে হয় পাহাড় নয়—আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি মূর্তি।

বেসাতুন পর্বতকে নিয়ে অজস্র অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে উত্তর ইরানে। হয়তো সবই কল্পনা। কিন্তু শিরী ফরহাদ অমর। শুধু ইরান নয়, সারা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে শিরী ফরহাদের অজস্র প্রেমকাহিনী জনপ্রিয় হয়ে আছে।

কবিরা তাদের নিয়ে কবিতা রচনা করে। গায়করা তাদের বন্দনা গাইতে ভোলে না। চিত্রকর তাদের ছবি আঁকে। ভাস্কর তাদের মূর্তি গড়ে।

ইউরোপীয় যন্ত্রসভ্যতার দুরন্ত সাইমুম বয়ে চলেছে আজ পশ্চিম এশিয়ায়। সেই বিপুল আঁধির মধ্যেও শিরী ফরহাদ প্রেমের উজ্জ্বলতায় এখনও দীপ্যমান।...

নিলয় না জানি

তখন রাঢ়বাংলার জনপ্রিয় লোক-নাট্যদল আলকাপের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি মেলা থেকে মেলায়। দলের লোকে আদর করে মাস্টার বলে ডাকে। কখনও আসরে আবেগে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে নাচিয়ে ছোকরার গানের সঙ্গে সুর মেলাই। কখনও বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে অভাজন শ্রোতাদের তাক লাগিয়ে দিই। আদাড় গাঁয়ে শেয়ালরাজা মাস্টার। মাস্টারীর ক খ-ও জানিনে। তবু ওরা বলে মাস্টার। পরম স্নেহে বড় বড় দাঁত খুলে পরিচয় দেয়—'খুব বড়' 'গেনে' বি. এ-এম. এ পাস। যা তা কথা নয়।'

এই শুনে আজিমগঞ্জ-নলহাটি লাইনের এক মরচেধরা সেকেলে রেলগাড়ির কামরায়—যার এঞ্জিনটা সম্ভবত টমাস আলভা এডিসনের মৃত্যুর বছর ইংরেজ সরকার আমদানি করেছিলেন এবং গায়ে বড় বড় হলদে হরফে লেখা ইউ. এস. এ—ননীবাবু নামে এক পঞ্চাশোত্তর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন "তা অত সব পাসটাস দিয়ে এই ছোটলোক বাউণ্ডুলেদের মধ্যে জুটলেন কী আক্কেলে মশাই?'

এ কামরায় অপেসপে ভিড় আছে। দলের জনাতিন আমার সঙ্গে, বাকিরা অন্য কোন কামরায় উঠেছে। খটখটে খরার মাস। দুধারে ঢেউ খেলানো ধু ধু ফাঁকা মাঠ। তখনও চাষারা তাইচুং কিংবা আই. আর. ধানের নামও শোনেনি। মাঠের আকাশ কাটাকুটি করে এগারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তারগুলোও আসেনি কোন নদীপ্রকল্প থেকে। সবে প্রথম যোজনা শুরু হতে চলেছে। দেশের গা থেকে দুশো বছরের ধুলো ময়লা ক্ষয়ের দাগ ততটা ঘোচেনি। শিক্ষিত আধা-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ চাপা গলায় বাঁকা হেসে দিশী সরকারের উদ্দেশে বলছে,—এবার পারলে হয়! মফঃস্বলের হাড়পাকা প্রৌঢ় ডাক্তার উকিল কেরাণীর মুখে অবিশ্বাস এবং হুট্ করতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠছে—কী জিনিস ছিল, কী এল! এই ননীবাবুই রেলগাড়ির ওপর তেতো হয়ে বলছিলেন—'প্রগতির গুঁতো মশাই, বুঝলেন? গাড়ি এগোবে সামনে—সামনে থেকে গুঁতো। ওই দেখুন না, এখনও সিগ্‌নাল কাত হয়নি।'

এই সব দেখেশুনে আমার রাগ হচ্ছিল। যারা লিখেছে, 'ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের সেই প্রচণ্ড সংগ্রাম', কিংবা 'চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা'—তারা বড্ড ভাবপ্রবণ। বেশির ভাগ লোকেই আসলে নিজেদের বাইরেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ছেলেবেলায় বাবাকে দেখতুম ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা করছেন এবং একপাশে দাঁড়িয়ে মণিবাবু স্কুলমাস্টার, হরনাথ নায়েব আর নবদ্বীপ ডাক্তার ফিকফিক করে হেসে বলছে, 'ইস্! উড়বে—নির্ঘাৎ উড়বে! স্বাধীনতার আকাশে ফুড়ুৎ...ফুড়ুৎ...হিক্

হিক্ হিক্!' আজকাল সেই সব লোক দেখি, এত বুড়ো হয়ে গেছে যে দেখলে মায়া হয়।

—'এ্যাঁ, কুতুবপুরের সৈয়দ সায়েবের ছেলে আপনি?' ননীবাবু একটু পরেই আরও অবাক হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে আমার মুখটা দেখতে দেখতে বললেন—'আপনার বাবাকে আমি চিনি। চিরোটি স্টেশনে আমার ডিসপেন্সারি ছিল ঊনিশ শো' তিরিশ-বত্রিশে। বক্তৃতার সময় ওঁকে পুলিশ এ্যারেস্ট করল—নিজের চোখে দেখেছি। জেল থেকে ফিরলে আমিও গলায় মালা দিয়েছিলুম। বাবাকে বলবেন। সব মনে আছে।'

একটু চুপ করে থেকে আচমকা ভদ্রলোক বিড়ি ধরালেন। দুটো শোষণেই সুতোয় ঠেকিয়ে খিক খিক করে হাসলেন।—'কি সর্বনাশ! তাঁর ছেলে আপনি এই হাঘরে উচ্ছন্নেদের পাল্লায় পড়ে ইহকাল-পরকাল নষ্ট করছেন? ছি ছি ছি! সোজা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। এক্ষুনি—'

কোণার দিক থেকে আওয়াজ এল—'সোজা ঘরে ফেরা কি এত সোজা ডাক্তারবাবু? এখন যে বাঁকা রাস্তায় পা। ঘরের ঠিকানা ভুলে গিয়েছেন। এখন উনি রাস্তার মানুষ।'

তাকিয়ে দেখি এক অদ্ভুত মূর্তি। কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে লোকটা। কাঁধ অব্দি কাঁচাপাকা চুল, যত দাড়ি তত গোঁফ, খাড়া বাদামী নাক, টানাটানা দুটো বিশাল চোখ—কিন্তু ভয়ংকর লাল এবং কোটরগত গূঢ় রহস্যময় ঝিলিক। তার কাঁধে এলোমেলো পড়ে আছে এক টুকরো লাল ময়লা কাপড়। বুঝলুম, ওটা পাগড়ির মতো বাঁধা ছিল, এখন চুলের ভাপ দূর করতে খুলেছে। গায়ে হাজার তালির চিত্রবিচিত্র মস্তো আলখেল্লা হাঁটু অব্দি ঢাকা। কিছু পরে আছে কি না বোঝাই যায় না। গলায় একগুচ্ছের লাল-নীল পাথরের মালা। কোলে একটা তেমনি হাজার তালি কাঁথার ঝোলা, একটা ডুবকি আর একটা একতারা। পান চিবুচ্ছে। পাতলা দুটো ঠোঁট টুকটুকে লাল। এবং মজার হাসি।

আমাকে তাকাতে দেখে ডান হাতটা তুলে একবার কপালে ঠেকাল। তারপর নিজে থেকেই পরিচয় দিল—'অধীনের নাম মদনচাঁদ শাহ্। নিবাস ইন্দ্রাডাঙগা পাড়া। দ্বারকা নদীর পাড়ে। বাবা কি গিয়েছেন কখনও ওদিকে? যাবেন। বড় মধুর জায়গা।'

হুঁ, মারফতী বাউলই বটে। ফকির যাকে বলে। ননীবাবু ওকে দেখে নিয়ে তক্ষুণি খুশি হয়ে বললেন—'আরে মদন ফকির যে! কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

মদনচাঁদ এবার ওঁকেও সেলাম দিয়ে বলল—'ভুঁইতোড়ের মেলায় গিয়েছিলাম ডাক্তারবাবু। ওখানে আবার আমার গুরুভাইয়ের ডেরা। দোস্তও বটেন। দিনকতক নাচলুম-কুঁদলুম। মেহমানি খেলুম। আজ ভোরবেলা মোরগ জবাই করে গরম-গরম ভাতও খাওয়ালে। এখন ঢেঁকুর তুলে পান চিবোচ্ছি।'

কামরায় হাসির ধুম পড়ে গেল। লোকটি আমুদে সন্দেহ নেই। ননীবাবু বললেন—'ওহে মদনচাঁদ, তোমার সেই মেয়ের বিয়ে দিলে কোথায়?'

এই যুদ্ধফেরত এঞ্জিনগুলো এত জোরে হুইসল্ দেয় যে কানের পর্দা ফেটে যাবার দাখিল। বাঁকের মুখে সেই বিকট ভোঁ বাজতে মিনিট তিন-চার সময় গেল। ততক্ষণ বুড়ো ফকির দু'কানে দুই তর্জনী গলিয়ে রাখল। তারপর ফের টানা ঘট্ ঘটাং ঘট্ ঘটাং, সেকেলে কামরার হাড় মটমটানি। মাঠে বাজপড়া শিমুলগাছে কয়েকটা শকুন বসে আছে। উজ্জ্বল রোদ্দুরে এই ফাঁকা ভূগোল যেন কাঁসার থালা। ঝনঝন করে বাজছে লু হাওয়ার ঝাপটানিতে।

ফকির বলল—'মরজিনার কথা মনে আছে দেখছি ডাক্তারবাবুর। ছোটতে বড্ড কিরমিতে ভুগত। পেট ফুলে ঢোল। আপনার ওষুধ খেয়েই সেরে ছিল। হুঁ, মরজিনার বিয়ে দিয়েছি ডাক্তারবাবু। এখন দেখলে আর চিনতেই পারবেন না।'

ননীবাবু পানজাবির ভেতর হাত ঢুকিয়ে ভুঁড়ি চুলকে বললেন—'ঠিকই বলেছ হে। তোমাদের গাঁ ছেড়েছি তা প্রায় বারো বছর। মানে নাইনটিন ফোরটিতে। তখন হিটলার দাপটে এগোচ্ছে! ইস্! দেখতে দেখতে সব হাওয়া হয়ে গেল হে ফকির সাহেব! সব হাওয়া!'

ফকির অমনি দু' আঙুল নাকের দুই ফুটোর দিকে নির্দেশ করে তত্ত্ব আওড়াল—'হুঁ, হাওয়ার কারবার। যাচ্ছেন আর আসছেন! বুঝলেন তো? ইনিই মহাকাল। এই যাচ্ছেন, এই আসছেন। সব খরচের ঘরে, ডাক্তারবাবু! জমার ঘরে তিনটে গোল্লা!'

বুঝলুম, এই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটি হাঘরে। সারাজীবন এখান ওখান করে বেড়াচ্ছেন। কোথাও থিতু হয়ে বসতে পারেন নি। এখন কোথায় জুটেছেন, জানতে আগ্রহ হল। কিন্তু ফুরসৎ পেলুম না। দুজনে কথাবার্তা চলেছে। তত্ত্বকথা। এইভাবে বাউন্ডুলেমি করে একটা ব্যাপার আমার জানা হয়ে গিয়েছিল ততদিনে যে এদেশের মানুষ বড্ড তত্ত্ববাগীশ। কথায় কথায় ফিলসফি আওড়ায়—সে মাঠের মুখ্যুসুখ্যু ভুট্‌চাষাই হোক, আর সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ বাবুই হোক। তার ফাঁকে হঠাৎ কাত হয়ে থাকা একতারাটা পিড়িং পিড়িং করে উঠল। ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে চেরা গলার গুনগুনানি জোরালো হতে থাকল। কথাগুলো প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না। পরে টের পেলুমঃ

তিরপুনীর (ত্রিবেণী?) ঘাটেতে এক মড়া ভাসতেছে/
মড়ার বুকে সর্পের ডিম্ব/হরিণ চরতেছে/
ভাইরে, হরিণা চরতেছে/......

আমার দলের ম্যানেজার নজর আলি বোকাবোকা হেসে মন্তব্য করল—'মারফতী গুহ্যকথা।'

চর্যাপদের লাইন মনে পড়ে গেল। 'হরিণারে তোর নিলয় না জানি।' উহুঁ

কেউ কেউ জেনেছিল। কেমন হে হরিণা, কী তার গড়ন ছিরিছাঁদ, কোথা তার নিলয়। অন্তত এই মদন-চাঁদ জেনেছে মনে হল। ওর টানা চোখে সেই জানার ঝিলিক, মুখটা তার তৃপ্তিতে উজ্জ্বল। অনেক পরে ওর গানের তত্ত্বকথাটা আমিও জেনেছিলুম। শবরূপে মহাকাশে এই ব্রহ্মান্ড 'কুল্‌-মখ্‌লুকাৎ' ভেসে আছে। তার মধ্যে সর্পবৎ বাসনার ডিম্ব। ডিম্বের মধ্যে পরম রূপবান ও পরম রূপ-বতী হরিণ-হরিণার বাস। তাদের মিলনেই জীবন, বিরহে মৃত্যুরূপী লয়। তবে কিনা মদনচাঁদ আউল মুসলমান সুফী। তার সামনে ননীবাবু ডাক্তার হিন্দু বামুন। বেশ মিলিয়ে দিল শেষ অব্দি। গান শেষে কথায় বলল—'আপনাদের কালী পুজোর ব্যাপার ডাক্তারবাবু। শবরূপী শিবের ওপর কালী-রূপী হরিণা চরেন-ফেরেন, নাচেন-কোঁদেন!' পরক্ষণে বুড়ো ফকির একহাতে একতারা তুলে নাচের ভঙ্গীতে গানের সুরে বলে উঠল—'ও মা দিগম্বরী নাচো গো/যেমন নাচো বাবার ঘরে তেমনি নাচো আমার ঘরে, মা-আ-আ-গো/...কী বলেন।'

ননীবাবু বিড়ি ধরিয়ে খুশীতে বললেন—'ঠিক ঠিক।'

মদনচাঁদ সায় পেয়ে আবেগে অস্থির। আবার গুন গুন করে গেয়ে উঠল। শুনে তো আমি অবাক!

'...রাম কি রহিম করিম কাল্লুল্লা কালা/
বসে আছেন সাঁই উজলা/...
যারে মা ফতেমা বলি/
তিনিই হলেন দুর্গাকালী/
তারই পুত্র হাসান-হোসেন গো/
যেন কার্তিক গণেশ দু'ভাইয়েতে মদিনায় করেন খেলা/
রাম কি রহিম করিম কালুল্লা কালা...'

গেয়ে একতারা রেখে চুলের জঙ্গল থেকে বুড়ো ফকির একটা আধপোড়া সিগ্রেট বের করল। একটু ঝুঁকে সবিনয়ে বলল—'ঝিলিক মারেন, ডাক্তারবাবু। টানি।'

ননীবাবু সস্নেহে সিগ্রেটটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—'হ্যাঁ, সব এক। ঘুরোলে কোঁৎকা, ফেরালে পাচন। হিন্দু-মুসলমান—একই জিনিসের রকমফের।'

এই সময় একটা হল্টে গাড়ি থামল। উঁকি মেরে দেখে ফকির বলল—'কাপাসী'র হল্টো। নামবেন কোথায় ডাক্তারবাবু?'

—'মৌরিতলায়। বছরখানেক হল, ওখানেই ডেরা পেতেছি। একদিন যেও হে।'

মদনচাঁদ ঘাড় নাড়ল—'যাবো। লিবারে বুঝলেন? লিবারে বড় টাটানি। গানে দম টানলেই শালা খ্যাঁচ মারে।...' বলে সে লিভার চেপে ধরল। মুখে

হাসি।

অমনি হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে বাকসোও আছে। লক্ষণগুলো শুনছেন, চোখ দুটো বোজা। হঠাৎ গাড়ি ছাড়তেই আরেক মূর্তির আবির্ভাব। দেখে তাক লেগে গেল আমার।

ননীবাবু হোমিওপ্যাথি ছেড়ে তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠলেন—'এ যে আউলে বাউলে ধুল পরিমাণ! বহুত আচ্ছা!'

বুড়ো আউল আড়চোখে আগন্তুককে দেখে নিয়ে মন্তব্য করল—'এ লাইনের মজাই এই।' তারপরই স্বভাবসিদ্ধ গুনগুনানি—

'এ মানব শরীল রেলের গাড়ি ছুট দিয়েছে ইষ্টিশেনে।

আজব ডেরেইভার বসে আছে

মারছে সিটি ইনজিনে॥

...আয় বাপ বোস এখানে—'

আগন্তুক কোন কথা বলল না। মিটিমিটি হেসে বুড়ো ফকিরের পাশে বসে পড়ল। ওকে দেখতে থাকলুম। এও এক আউল ফকির। কিন্তু বয়সে তরুণ। টকটকে ফর্সা রঙ নিয়েই হয়তো জন্মেছিল একদা। এখন রোদে বাতাসে কিছুটা তামাটে হয়ে উঠেছে। রুক্ষু একমাথা কটা চুল। গোঁফদাড়ির রঙও তাই। কিন্তু তা এত পাতলা যে তলার চামড়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর এত সুন্দর চেহারা আমি পাড়াগাঁয়ে দেখিনি কখনও। ওর পরনে একটা গেরুয়া ফতুয়া, গেরুয়া লুঙ্গি। গলায় একটা তক্তি আর পাথরের মালা না থাকলে হিন্দু বাউল বলে ভুল হত। হাতে যথারীতি একতারা এবং ডুবকি, কাঁধে ঝোলা। বাড়তির মধ্যে এক পায়ে ঘুঙুর বাঁধা রয়েছে। সবাই আমার মতো হাঁ করে ওকে দেখছিল। ও ঝোলার মধ্যে হাত ভরে একটা ছিলিম আর পুরিয়া বের করতেই মদনচাঁদ ওর উরুতে জোর থাপ্পড় মেরে বলে উঠল—'ও আমার বাপ রে! সোনা রে! মাণিক রে!

তরুণ ফকির সবিনয়ে আস্তে বলল—'আবগারির মাল নয় হুজুর। ঘরে পালা গাছের ফসল।'

মদনচাঁদ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল—'মুখে ফুলচন্দন পড়ুক রে! তুই আমার গতজন্মের বেটা রে! এ্যাদ্দিন কোথা ছিলিস রে!'

ননী ডাক্তার ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা দেখছিলেন। ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন —'মদনচাঁদ! মারা পড়বে কিন্তু।'

মদনচাঁদ তখন অন্য মানুষ। দাঁত বের করে বলল—'যে মরেই আছে, সে আর কী মরবে ডাক্তারবাবু?' বলেই আমার দিকে ঝিলিক হানল। সায় চাইল। —'কী বলেন বাবা?'

হাসলুম। সত্যি বলতে কী, তখন আমিও চাপা লোভে আক্রান্ত। মাঝে মাঝে ওই নেশাটাও করে থাকি সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গগুণে। ইন্দ্রিয়গুলোর তার

চড়া সুরে বাঁধা হয়—সেই পরমাশ্চর্য অনুভূতির কথা বলে বোঝাতে পারব না। দেশকালের বাইরে কী আছে, তা জানতে হলে এই জিনিসটি মোক্ষম, এদেশী সন্ন্যাসী-ফকিররা মান্ধাতার আমলে টের পেয়েছিলেন।

কিন্তু সামনে এই প্রৌঢ় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, বাবার সঙ্গে দোস্তিটোস্তি ছিল বলে দিয়েছেন। একে সিগ্রেট খাওয়াই যাচ্ছে না তো ছিলিম! উসখুসানি শুরু হল আমার মধ্যে। মৌরীতলা আর কদ্দুর?

তরুণ ফকির পরম প্রযত্ন ও স্নেহে গাঁজা কুচিকুচি করে ছুরি দিয়ে কাটল একটা কৌটোর ওপর। তারপর এক টুকরো আদা আর এলাচ বের করল। এই সময় এক টুকরো নারকেল ছোবড়াও এগিয়ে দিল ফকিরের দিকে। বুড়ো পটাপট কিছু আঁশ ছিঁড়ে গুলতি বানাল এবং মাঝে মাঝে ফুঁ দিয়ে কুচোগুলো উড়িয়ে দিল। দুজনের কাজেই গভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। ম্যানেজার নজর আলি চাপা মন্তব্য করল আবার—'শেখার মত জিনিস!'

সতর্ক আগুনে ছোবড়ার গুলিতে লাল হলে হাতের চেটোয় তুলে বুড়ো ফকির ছিলিমে রাখল এবং চেপে দিল। তরুণ ফকির ছিলিম দুহাতে বাড়িয়ে বলল—'নেন হুজুর!'

মদনচাঁদ পুলকিত হয়ে ওপরে চোখ তুলে যা একখানা টান ঝাড়ল, দেখে তাক লেগে যায়। তারপর দম আটকে ঠোঁট দুটো এঁটে গলার ভিতর ঘড়ঘড় করল—'গাও!' অর্থাৎ খাও।

এ ওর এককাঠি সরেস। ছিলিমের তলার দিকে চোঁ চোঁ চড়চড় আওয়াজ শোনা গেল। শেষে 'উপ্' করে চূড়ান্ত গিলে ধেড়ে স্যাঙাতের দিকে ধরল—'গান।' অর্থাৎ খান।

গাড়ির সবাই চুপ করে দেখছি। তিনবারের বার ছিলিম পট্পট্ আওয়াজ তুলেছে! তরুণ ফকির হাতের চেটোয় ছিলিম উবুড় করে ছাই নিল। গরম ছাই ফুলকি সুদ্ধ। তারপর পড়ল 'ঠিকরি' অর্থাৎ তলার আটক দেওয়া ক্ষুদে একটা গোল শক্ত জিনিস। হয়তো মোটা কাঁকর, নয়তো ইঁটের টুকরো। ছিলিম সাফ করে ঠিকরি পুরে ভেতরে 'সাফি' অর্থাৎ সাফ করার একটু কালো ন্যাকড়া—যা ছিলিমের তলায় ধোঁয়ার ছাকনা হিসেবে জড়ানো ছিল, সেটা গুঁজে দিয়ে ঝোলায় চালান করল। ওদিকে মদনচাঁদ চোখবুজে ধ্যানস্থ। মুখটা উঁচু করে রেখেছে। তরুণ ফকির সব সামলে আমার দিকে ঘুরে বলল—'হুজুর চিনতে পারছেন?'

মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। আরে! এ তো সেই আবদুল্লা ফকির! কাটোয়া-সালার রেললাইনের এক গাড়িতে আলাপ হয়েছিল আগের বছর চৈত্রে। সালারে জুয়াড়িদের মেলায় গানের আসর সেরে ফিরছিলুম। বড় চমৎকার গলা আবদুল্লার। সচরাচর আউল বাউলদের গান ভূপালী রাগিণীর কাঠামোতে বাঁধা থাকে। সা রে গা পা ধা সা। আবদুল্লা তার সঙ্গে আশ্চর্য কায়দায় ভৈরবী

মেশাচ্ছিল সে কী গান, নাকি নাড়িছেঁড়া কান্না—এ দুর্লভ জীবন কী কাজে লাগাবো, সেই ব্যাকুলতা! বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন এরকম—'এ জীবন লইয়া কী করিব?' আবদুল্লা বারবার একটা লাইনে মাথা কুটছিলঃ

'সাড়ে তিন হস্ত মাটি দিলে গুরু!

হাল তো দিলে না...'

পরে জেনেছিলুম, ও খান্দানী অর্থাৎ বংশগত ফকির নয়। চাষীর ছেলে। ছেলেবেলায় অনাথ। শেরজান শাহ্ নামে এক খান্দানী ফকিরের স্নেহে তার আস্তানায় মানুষ। মারফতী শিক্ষাদীক্ষা তারই কাছে।

কিন্তু তারও পরে যা জেনেছিলুম, তাতে চমকে গিয়েছিলুম। সুদর্শন নামে এক জুয়াড়ী বলেছিল—'মাস্টার, আবদুল্লা ফকিরের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করবেন না। ওকে যা দেখছেন, তা নয়।'

বলেছিলুম—'তার মানে?'

—'শালা দাগী আসামী। চুরি ডাকাতি খুনোখুনি প্রচুর করেছে অল্প বয়স থেকে। তিনবার জেল খেটেছে। তা ছাড়া লম্পটের হদ্দ। একবার এক রেপ কেসে ফাঁসতে বসেছিল। কাপাসীর বড় ফকির নয়নচাঁদের ইনফ্লুয়েন্স আছে নানা মহলে। পীরের দরগার সেবক কি না! তাকে ধরে বেঁচে যায় আবদুল্লা। সেই থেকে আর ও তল্লাটে পা দিতে পারে না।'

কিন্তু শেষ অব্দি আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি কথাটা। অত সুন্দর চেহারা, অমন ভাল গায়, আর ওই আত্মভোলা চালচলন!

সুদর্শন একটু হেসে ফের বলেছিল—'সাপের ড্যাকা দেখেছেন মাস্টার? দেখতে বড্ড সুন্দর। কিন্তু বিষের রাজা। ছোঁ দিলে ফাদার-মাদার বলতে দেয় না!'

কে জানে! কিন্তু মাঝে মাঝে ওর সেই আশ্চর্য গানটা মনে পড়ে যেত। উদারায় নেমে এসে কড়ি ও কোমল নি জড়িয়ে সা-এ এক মারাত্মক মোচড়! আঃ, বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল আবদুল্লা, ও যেন আমার কথাই বলছিল! এ জীবন পেয়েছি, কিন্তু ফসল ফলানোর যন্ত্রই যে দেওয়া হয়নি! কী করব এ নিয়ে? নিশুতি রাতের জম-জমাট আসর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতুম। অন্ধকারে স্তব্ধ উদ্ভিদমণ্ডলী, মাথার ওপর লক্ষকোটি নক্ষত্র—মাঝে মাঝে নাচিয়ে ছোকরার ভাঙা রাতজাগা আড়ষ্ট গলার গান ভেসে আসছে। মনে হত, এ কোথায় আছি আমি? কেন আছি? এই রাস্তায় হেঁটেই কি আমি কোন উদ্দেশ্যের তীর্থে পৌঁছতে পারব? দূর ছাই, জীবনের মানেই যে খুঁজে পাইনে!

এই আবদুল্লার মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছিলুম যেন। এক বছর পরে ফের তার সঙ্গে দেখা। অথচ চিনতেই পারিনি। নিজের নেমকহারামীর উপর রাগ হল। পর মুহূর্তে মন বিশাল খুশিতে ভরে উঠল। ওর কথার

—'জী হুজুর।' আবদুল্লা তার সবল বাহুর কব্জিতে তামার বালাটা একবার অকারণ নাড়া দিল। এ'টে বসা গলার তক্তিটা ঢিলে করে দিল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকল।

বললুম—'কেমন আছ আবদুল্লা? ইস্, এক বছর পরে দেখা!'

আবদুল্লা মাথা নেড়ে ফের বলল—'জী হুজুর।'

—'তাহলে আর কী! চলো আমাদের সঙ্গে। পাচণ্ডির মেলায় গান আছে।'

অমনি মদনচাঁদ খপ করে আবদুল্লার বালা-পরা হাতটা ধরে ফেলল। —'ক্ষেপা! গত জন্মের বেটাকে কেড়ে নিয়ে পালায় সাধ্যি কার? মরেও বে'চে আছি না? কী বলেন আপনারা?'

বুঝলুম, বুড়ো ওর ছিলেমের লোভে পড়ে গেছে। সহজে ছাড়বে না। অথচ আবদুল্লাকে দেখে কী এক ভাবপ্রবণতা আমাকে তোলপাড় করছে—ওকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না। বললুম—'ফকিরসাহেব, এবারকার মতো ওকে ছুটি দাও। নয়তো তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।'

মদনচাঁদ ঝু'কে এসে বলল—'তার চেয়ে আমি ডাকি হুজুরকে। ইন্দ্রাতে মাদারপীরের থানে মেলা বসবে আজ জষ্টিমাসের শেষ রোববার। একদিনের মেলা। হাজার আউল-বাউল ফকির-ফাকরা এসে নাচবেন কুঁদবেন। নদীর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে থান। সে এক জিনিস বাবা! চোখ জুড়োবে, জনম সাথক হবে। চলুন!'

লোভে ভেতরটা গরগর করে উঠল। কিন্তু ম্যানেজার নজর আলি খোঁচা মেরে বলল—'অসম্ভব কথা। বায়না মারলে ও তল্লাটে পা দেওয়া যাবে না। তার ওপর নতুন মাস্টারের নামেই বায়না দিয়েছে। আপনি না থাকলে যন্ত্রপাতি কেড়ে নেবে না?'

টের পেলুম, ওর কথা আমার তোলপাড়ের মধ্যে কুটো হয়ে ভেসে যাচ্ছে। আবদুল্লা আমাকে শক্ত করে ধরে আছে। ইন্দ্রার মাঠে মাদারপীরের থানে মাদার গাছগুলোয় লাল-লাল ফুল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেখানে ঝাঁকড়া চুল নাড়া দিয়ে একতারা শূন্যে তুলে গান ধরেছে আউল পুরুষেরা। আমাকে আর কেউ আটকাতে পারবে না।

কিন্তু পালানোর সুযোগ চাই। সুযোগ খুঁজতে থাকলুম। পাঁচণ্ডি আর একটা জংশনের পরের স্টেশন। পে'ছিতে তিনটে বেজে যাবে। এখন শুধু একটা কাজ করার আছে। দলের এই তিনটে লোককে কোন অজুহাতে কামরা থেকে বের করে দেওয়া।

ননীবাবু ঘড়ি দেখে বললেন—'আধ ঘণ্টা লেট হবে। ততক্ষণে ওহে ছোকরা ফকির সায়েব! জুতসই একখানা লাগাও দেখি! যেমন চেহারা, তেমনি

জিনিস চাই কিন্তু!'

আবদুল্লা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—'হুজুরের আশীর্বাদ! আমার গুরুর দয়া!'

মদনচাঁদও সায় দিয়ে বলে উঠল—'দয়া পাব কী রে বেটা! পেয়ে ভুট হকে আছিস। মন খুলে ঝেড়ে দে! রাস্তায় যে ঘর বেঁধেছে, তার আবার ইদিক উদিক কী রে?'

আবদুল্লা একতারা তুলে পিড়িং পিড়িং শুরু করল। তারপর গুন গুনানি। আঃ, সেই সুর! সেই ভৈরবীর মোচড়! বাইরের নিসর্গ যেন থেমে দাঁড়াল এতক্ষণে—অথচ ট্রেনে চাপলে উল্টোটাই মনে হয়। আর এই ট্রেনটাও যেন বড় নিঃশব্দ হয়ে পড়ছে। চাকায় চাকায় চাপা ধ্বনিপুঞ্জ, যেন পবিত্রতার হানি না ঘটে। ননীবাবু গান শুনেই আহ্লাদে বলে উঠলেন—'সাধু! অমৃত! আহা হা!'

আবদুল্লা অমনি বাঁ হাত কানে রেখে গেয়ে উঠল গলা ছেড়েঃ

'আজব শহর-নহর বানাইলে কোন জন/

হায় হায় আজব শহর/

...সেই শহরে রথ চালাইছে একজনা তার সারথি/

দুই ঘোড়াতে টানছে জোরে/দুই দিকে জ্বলছে বাতি

হায় হায় আজব শহর...

সমের মাথায় বুড়ো ফকির হাঁকরে উঠল—'শরীল! হায় শরীল রে!' ট্রেনের হইসল কাঁপা কাঁপা সুরে বেজে উঠল। আবদুল্লা উঠে দাঁড়াল। নাচ জুড়ে দিল। ননীবাবু জানলা দিয়ে উঁকু মেরে বললেন—'আ মলো! মৌরীতলা এসে গেল যে! লেট কোথায়? এ যে রাইট টাইম।' গাড়ির ভেতর একটু ব্যস্ততা পড়ে গেল। আবদুল্লার তাতে গ্রাহ্য নেই। ননীবাবু বোঁচকাবুচকি সামলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে আবদুল্লার দিকে ধরলেন। আবদুল্লা একতারাটা বাড়াল। তার খোলে ঠকাস্ করে আধুলিটা পড়ল। ট্রেন থামতে শুরু করেছে। মৌরীতলা বড় স্টেশন। ননীবাবু বললেন—'ওহে মদনচাঁদ, আসতে ভুলো না। আর, তোমার মেয়েকেও বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে। পারলে এনো সঙ্গে।'

তন্ময় বুড়ো শুধু মাথা নাড়ল। আমার দিকে ঘুরে ননীবাবু বললেন—'আর বাবাজীবন! সময় হলে একবার ডিসপেনসারিতে এসো। তোমার বাবা আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু। আসবে তো?'

আমিও মাথা নাড়লুম। পকেটে হাত পুরেছি ততক্ষণে, সিগ্রেট না টানলে এবার মরে যাব! ট্রেন দাঁড়াল। ননীবাবু নেমে গেলেন। ভিড়ও ফাঁকা হয়ে গেল। এই সময় ম্যানেজার নজর আলিকে বললুম—'তোমরা একবার খোঁজ-খবর নাও, ওরা কে কোথায় উঠল। তিনজনেই যাও। গাড়ি অনেকক্ষণ

দাঁড়াবে। দেখ, সবাই চাপতে পেরেছে নাকি। আর শোন, একেকজন একেক কামরায় গিয়ে খোঁজ নাও।'

পরামর্শটা মনঃপূত হল ওদের। তক্ষুনি 'ঠিকই বলেছেন' বলে ওরা ধুড়মুড় করে নেমে গেল। মদনচাঁদ আমাদের ঝিলিক হানল। বুড়ো ভারি চালাক। আবদুল্লা ওদিক গান চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মদনচাঁদ ওর হাত ধরে টানল।—'খুব হয়েছে বাপ্। সব খরচ করিস নে। ওবেলা থানে লড়িস, তখন দেখব কেমন তাকদ!'

আবদুল্লা বসে পড়ল। তারপর বলল—'বাবাসায়েব না বললেও যেতুম। ইন্দ্রায় পীরের মেলাতেই যাচ্ছিলুম।'

"—'তাই নাকি?' বলে মদনচাঁদ ওর কাঁধে থাপ্পড় মারল।—'শোন বেটা। চিশতী আর মখদুমী দু' দলের পাল্লা হবে কিন্তু। আমরা তো চিশতী। তোরা?'

আবদুল্লা তাকাল।

—'খান্দান কী তোদের?'

আবদুল্লা দেখলুম অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। আমি জানি, কোথায় ওর দ্বিধা। ও তো জাত-ফকির নয়। কী বলে শুনতে কান পাতলুম। আবদুল্লা মুখ নামিয়ে আস্তে বলল—'আমার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। মূলছাড়া ঘুরি। ছোটবেলা থেকে মখদুমী খান্দানের সেরজান শাহ্ মানুষ করেছিলেন। তেনার কাছেই শিক্ষেদীক্ষে। তিনিই গুরুর গুরু মহাগুরু অধমের।'

'—অ।' বলে একটু চুপ করে থাকল মদনচাঁদ। একটুখানি হতাশ দেখাচ্ছিল ওকে। তারপর বলল—'তাহলে মখদুমী তোরা। তা হোক্। একই গাছের দুই শেকড় বই তো নয়।'

বুললুম—'চিশতী আর মুখদুমীটা কী ফকিরসায়েব?'

মদনচাঁদ জবাব দিল—'চিশতী হল খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর চেলা চামুণ্ডা। ওনার কবর আছে আজমীর শরীফে। বার দুই গেছি। আর মখদুমী হল খাজাবাবা মখদুম শাহের চেলারা। সুফী আউলদের নানান ভাগ বাবা। হিঁদুদের মতো জাত-গোত্তরের ওড় নাই।'

একটু হেসে বললুম—'তুমি তো শুনেছ, আমি সৈয়দবংশের ছেলে। আমার বংশও কিন্তু সুফী পীরবংশ। তোমাদের মতো সাধনভজন নিয়েই থাকার কথা।'

মদনচাঁদ লাফ দিয়ে আমার হাত ধরল।—'তাই মুখের ছিরিছাঁদে এত চেনাচেনা লাগে বাবা! হুঁ হু—সেলাম, হাজার সেলাম। ওরে বাপ্‌রে বাপ্! আপনারাই আমাদের মূলগুরু—মহাগুরু। ওই যে বলে নাড়ীর টান! তখন থেকে তাই মনকে বলছি, মনা রে মনা! কেন এই ছেলেটাকে তোর আপন লাগে বল দিকিনি? মন এই এক তারায় জবাব দিলে—চিনি চিনি, চিনি কি চিনি?

ফের শালা একতারা শব্দ করে বলে—চিনি না চিনি না, চিনি কি চিনি? না। বাপ্তোৎ বড্ড চাতুরী করে! এই শুনুন না!'

বলে সে বারকতক একতারাটা বাজিয়ে দিল ওই বোলে। দুই ফকির এক-সঙ্গে হেসে উঠল। ট্রেনও ছেড়ে দিল। দলের লোকগুলোর তখনও পাত্তা নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। বললুম—'ইন্দ্রা আর কদ্দুর ফকির-সাহেব?'

মদনচাঁদ চাপা ও চতুর হেসে বলল—'ছেলেধরা ছেলে ধরে লিয়ে পালাচ্ছে। দূর বা কাছ কী তার? সামনে টিশিনে টুপ করে তিনটিতে খসব। মাঠের পথে ক্রোশ দুই মাত্তর। সন্ধ্যার অনেক আগে পেঁ'ছে যাব। মরুক না শালা গেনেরা! আমারই বা কী—আপনারই বা কী?'

আবার হাসির ধুম পড়ে গেল তিনজনের। কামরায় আর কেউ নেই।

ধু ধু বিশাল মাঠে চলেছি তিনটি মানুষ। বীরভূমের সীমানা ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকলুম মাঠের মাঝামাঝি। চলেছি পুবে। পিছনে খরার সূর্য ঢলেছে ততক্ষণে। হু হু বাতাস বইছে। রোদের তাপ ততটা পাচ্ছি না। একটা পুকুরপাড়ে বটতলায় পেঁ'ছে মদনচাঁদ বলল—'বেটা, নতুন আউলকে দীক্ষা দে!' অর্থাৎ ছিলিম। মন নেচে উঠল।

ছায়ায় জাঁকিয়ে বসে তখনকার মতো নিষ্ঠায় ছিলিম টানা হল। আমি একটানেই ভেসে গেলুম। আর সাহস হল না।

তারপর টলতে টলতে ঝিমধরা তিনটি আউলবাউল—নিজেকে তাই ভাবতে ভাল লাগছে—মাঠের শেষে বাদশাহী সড়কে পেঁ'ছলুম। কাঁচা সড়কে সবে খোয়া পড়ছে। বড় বড় সব ড্রেজার আর কংক্রিট তৈরীর মেশিন কাজ করে যাচ্ছে। টের পেলুম, দ্রুত দেশটা বদলে যাচ্ছে। মদনচাঁদ জানাল—'সামনে বছর বাস-মোটর চলবে। গাঁ-গেরাম আর দিনে দিনে থাকবে না বাবা, সব শহর হয়ে যাবে। যাক। আমরা তো রাস্তার বাসিন্দে! আমাদের আবার শহর-লগর-বন্দর! কী বলেন?'

ইন্দ্রা পেঁ'ছতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ভারি ক্লান্ত। অনভ্যস্ত নেশা পেয়ে বসেছে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। গাঁয়ের শেষে নদীর পাড়ে ওদের ফকির-পাড়া। দূর থেকে আবছা মেয়েদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। মদনচাঁদ জানাল—'দিনরাত পাড়ায় শ্যালশকুনের লড়াই। কান পাতা দায়। আজকাল সব পেটের ফকির হয়ে গিয়েছে কিনা। চাষবাসও করবে, আবার ভিক্ষেও করবে। আমি বেলাইন ধরিনি তা বলে। হুঁ, দেখবেন—কাঁটা বেঁধে না। শালা শেয়া-কুলের ঝাড়গুলো যেন কী দেখেছে।'

শেষ দিকে মাটির ঘর আর খড়ের চাল—একটা খোলামেলা বাড়ি। নীচে নদীর বাঁকে সোনালি বালির চড়া দেখা যাচ্ছিল। দেখেই মন ভরে গেল। বুড়ো ফকির আচমকা চেঁচাল—'বেটি! হেই বেটি! মরজিনা! মরজিনা রে! এসে

পড়েছি!'

খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে একটা মেয়ে কাপড় মেলে দিচ্ছিল। বাঁশের খুঁটিতে দড়ি বাঁধা আছে। সদ্য অবেলায় নেয়েছে। পিঠে কালো চুলের ঝলমলানি কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে। টুপটাপ তখনও জল ঝরছে। গায়ে জামা নেই। পশ্চিমের সূর্য তার পাঁজরে গিয়ে পিছলে পড়েছে। কী নিটোল গড়ন! সে ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার চোখ ঝলসে গেল।

ভুরু কুঁচকে সে আমাদের দেখছিল। সবার আগে বুড়ো ফকির দড়বড় করে এগোচ্ছে। তার পিছনে আবদুল্লা, শেষে আমি। যেন তিনটি হরিণকে বাঘিনী নিষ্পলক তাকিয়ে দেখছে।

বুড়ো প্রায় নেচে কুঁদে বলল—'দুই জব্বর ছেলে ধরে এনেছি বেটি। এবার বঁটি বের কর. কেটেকুটে রেঁধেবেড়ে খাওয়া।'...তারপর হা হা হা হা উদ্দাম হাসি।

হ্যাঁ, কেটেকুটে মাংস টুকরো করে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতেই বুঝি এই আউল-কন্যার জন্ম। কেন কে জানে, থরথর করে কেঁপে উঠলুম। মনে হল, কী বিপদ ওঁৎ পেতে বসেছে।

মরজিনা গামছায় চুল ঝাড়তে ঝাড়তে দাওয়ায় উঠল। তারপর কোণা থেকে একটা মাদুর বের করে বিছিয়ে দিল। মদনচাঁদ বলল—'শিগ্গি ভাত চাপিয়ে দে বেটি। ক্ষিধেয় বেহ্মাণ্ড জ্বলছে। আর দেখ, আগে একটুকুন চা করতে পারিস নাকি। এই নে। দুধ—দুধ আছে তো?'

সে ঝোলা থেকে একটা চায়ের প্যাকেট বের করে দিল। মরজিনা নিঃশব্দে সেটা নিয়ে দাওয়ার কোণায় উনুনের কাছে গেল।

মদনচাঁদ বলল—'জামাইবেটা কোথা গেল, মা?'

জবাবে মেয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ জানে না।

বুড়ো ঝোলা রেখে বলল—'একদৌড়ে নদীর ঘাটে হাত পা ধুয়ে আসি। যাবেন নাকি বাবারা?'

"আবদুল্লা বলল—'হুঁ। চলুন। মাস্টারসায়েব, আসুন।'

আমি তখন গড়িয়ে পড়তে পারলে বেঁচে যাই। বললুম—'না। তোমরা যাও।'

দুজনে চলে গেল। আমি কনুই ভর করে দাওয়ার নীচে পা ঝুলিয়ে আধশোওয়া হলুম। তারপর আড়চোখে দেখি, মরজিনা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। অচেনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা সৌজন্যের পরিচয় নয় গ্রামাঞ্চলে। তাই চুপ করে থাকলুম। আর বলবই বা কী?

হঠাৎ মরজিনা একটু হাসল।—'আপনি আলকাপের দলের মাস্টার না?'

চমকে এবং খুশি হয়ে বললুম—'হ্যাঁ। তুমি কিভাবে জানলে?'

—'কাপাসীর মেলায় আপনার গান শুনেছিলুম। বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। ওখানে আমার মামুর বাড়ি। আপনার নামটাও জানি।...'

আগে ভাবতুম, আউল হয়তো বাউলেরই মুসলিম প্রতিশব্দ। কথাটা ভুল। হিন্দু বাউল আর মুসলিম আউল সম্প্রদায় অবশ্য কতকটা এক জাতেরই মানুষ। কিন্তু আউল কথাটা এসেছে আরবী ভাষার আউলিয়া থেকে। আউলিয়া মানে ঈশ্বরের বন্ধু, পবিত্র মানুষ বা সাধুসন্ত। আবার আউল মানে আদি।

বাংলার মাটির গুণে আউলিয়া মেঠো স্নেহে আউল হয়েছে বাউলের পাল্টা-পাল্টি। এরা মূলত সুফী সম্প্রদায়। হিন্দু উপনিষদদর্শন অবিকল প্রতি-বিম্বিত সুফী মতবাদে। এদের উৎস খুঁজতে হলে চলে যেতে হয় ইসলামের প্রথমযুগে ইরাণে। জরথুস্ত্রীয় দর্শনের সারাবত্তার সঙ্গে ইসলামী তত্ত্ব জারিয়ে এই মতের উদ্ভব। বিদেশী মুসলমান রাজা-বাদশা-যোদ্ধারা অনেকেই সুফী সন্তদের গুরু বলে মেনেছিলেন। তাঁরা যখন ভারতে এলেন, স্বভাবতঃ গুরু সন্ত আর তাঁদের চেলাচামুণ্ডারাও পিছন-পিছন চলে এলেন। এইভাবে সারা ভারতে সুফী দার্শনিকদের ডেরা গজিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু বাংলার মাটির কী এক আশ্চর্য গুণ, এর আবহাওয়ায় কী বিচিত্র স্বাদ—বৌদ্ধ যুগের সিদ্ধাচার্যদের একাংশ যেমন স্রেফ নিরামিষ বাউল হয়ে মরমী বৈষ্ণবতত্ত্বে ডুবে গেলেন, তেমনি একাংশ তান্ত্রিক সাধুতে রূপ নিলেন। সে-তন্ত্রচর্চা ডাকিনী-তন্ত্র যোগিনীবিদ্যা মারণ উচাটন বশীকরণের দিকেও এগিয়েছিল। এর পাশে এসে জুটলেন সুফী আউলিয়া আর তাঁদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা। এক অদ্ভুত দর্শন-সমন্বয় ঘটে গেল। আউলে-বাউলে-তন্ত্রে জট পাকানো একটা ব্যাপার ঘটল। হিন্দু বাউলরা বৈষ্ণবতত্ত্বের দিকে ঝুঁকল। ওদিকে সুফী আউলরা তো সেই একই তত্ত্ব ততদিনে শাখাপ্রশাখা ফুলেফলে ভরিয়ে দিয়েছেন। এঁদের রাধা-কৃষ্ণ, ভক্ত এবং ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমচর্চা। ওঁদেরও তাই। সুরা-সাকীর প্রতীক ভাঙলে ঈশ্বর প্রেম এবং ভক্ত বা 'মাশুক' বেরিয়ে পড়ে। যে রাধা, সেই কৃষ্ণ। মুসলিম আউল বললেন, 'আনাল্ হক্।' আমিই ঈশ্বর, আমিই সত্য। আলখেল্লার কাঠামোতে উপনিষদের ধাঁচ। তাতে বৈষ্ণব তত্ত্বের ঘোর গেরুয়ার ঝলমলানি। তাই বাঙালী সুফী আউল মদনচাঁদ যখন একতারা বাজিয়ে হিন্দু বাউলদের প্রিয় গান একই দরদে নিজের গান বলে গাইল, তখন আমি অবাক হলুম না।

'পড়ে গৌরলীলার বাজারে

অবাক যাই হেরে।
একটা সাপে-নেউলে একটা
ইদুর-বেড়ালে।
একই জায়গায় বসত করে
একই মেশালে।
তা দেখে এক মড়া হাসে
সদা, গৌররঙ্গে রব করে।
অবাক যাই হেরে।'

সচরাচর হিন্দু বাউল বলে গুরু, মুসলিম আউল বলে সাঁই। কখনও ওই মদনচাঁদের মুখেই হিন্দু রীতিতে 'সাঁই'-এর সঙ্গে 'গো' মিলে গিয়ে গোসাঁই হয়ে ওঠে। যেমন তার এই গানটাঃ

'শুধু মিছে ধন্দ বাজে গোসাঁইজী,
কোন্ ভবে বেঁধে আছ ঘর।'...

চেপে ধরলে মদনচাঁদ বলল—'বাবার মুখে আগুন! আমি কি হিঁদুর মতো গোঁসাই বললুম? বললুম 'গো'—মানে ওগো সাঁইজী!' সে হা হা করে প্রচুর হাসে। আবার বলে—'তাতে দোষ ধরলে নাচার। যিনি গোঁসাই তিনিই তো সাঁই। বাবা রে বাবা! জাত না পাঁত! কী হিঁদু কী মোছলমান—শরীল! শরীলখানা বিবেচনা করুন।' এই বলে শুনিয়ে দিল ফেরঃ

'হাড়ের গাঁথুনি চামড়ার ছাউনি উজানে পড়ে গেল ভাটি,
দিনে দিনে খসে পড়ল রঙমহলের মাটি/গো সাঁইজী,
কোন্ ভবে বেঁধে আছ ঘর/'...

হেতমপুরের নিতাই বাউল একই গান গেয়েছিল। শুধু 'রংমহলের' বদলে সে গেয়েছিল 'রূপমহলের মাটি'। আবার সন্ধ্যা বাউলনী গেয়েছিল 'সাত-মহলের মাটি'। তাই শুনে মদনচাঁদের মন্তব্যঃ 'মহল তো বটে। না কী?'

কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার—হিন্দু বাউলরা তান্ত্রিক বশীকরণ তুকতাক থেকে একেবারে আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। অথচ মুসলিম আউলদের অনেকে ওই বিদ্যা একই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি এক আউলের সঙ্গে পরিচয় হল ইন্দ্রার ওপারে জঙ্গলে মাদার পীরের দরগায়।...

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হতে-হতে পিদীমের আলোয় গরম-গরম ডাল-ভাত খাওয়া হয়ে গেল। বুড়ো হাপুসহুপুস খেতে খেতে করুণ মুখে মাঝে মাঝে জানাল—'আমার পেটটা বড়। অপরাধ নেবেন না বাবারা!'

চৌকাঠের ওপাশে ঘরের মেঝেয় বসে আছে মরাজিনা। মুখ টিপে হেসে বলল—'কেউ চোখ দেয়নি। তুমি খাও না, কত খেতে পারো। তিনকাঠা চালের ভাত রেঁধেছি।'

মদনচাঁদ অমনি চোখ কপালে তুলল।—‘ওরে! ও যে তপ্তখোলায় পানির ফোঁটা। আমি একাই দুকাঠা খাব। আর এই আবদুল্লা ব্যাটার গতরখানা দেখছিস? দেখ্ ভাল করে!’...এই বলে সে আবদুল্লার একটা বাহু খামচে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করল।

মরজিনার চোখের পাতা নেমে যেতে দেখলুম। গালের ওপর কাঁপা-কাঁপা আলো পড়েছে। এক ঝলক আলতার ছোপ দেখলুম। যুবকের বলিষ্ঠ বাহুর দিকে যুবতী কি সোজাসুজি তাকাতে পারে? আবদুল্লা খুব সম্ভ্রমে খাচ্ছে অতিথির মতো—বিনয়ে মুখটা নীচু। আঙুলের ডগায় আলগোছে ভাত তুলছে। আস্তে মুখে পুরছে। একি তার গাঁজা তৈরির মতো সেই নিষ্ঠা, নাকি স্রেফ আদব কায়দা? সে সাবধানে চিবুচ্ছে। থালার কানার ভাতটিকেও সযত্নে আঙুলে টেনে নিচ্ছে। পরিচ্ছন্ন খাওয়া। ঠোঁট বেশি নড়ে না। তা লক্ষ্য করে তুখোড় আউল বুড়ো বলল—‘আ মর! এ যে দেখছি নতুন জামাই আনলুম গো! মুখপোড়া ছেলের কি মুখে হাঁ নেই? দোব আঙুল ঠুসে মুখে!’

আবার এক ঝলক রক্ত মরজিনার গাল থেকে কানের লতি অব্দি ছড়িয়ে পড়ল। আমার চোখের ভুল? যাই হোক না কেন, আচমকা এক চাপা ঈর্ষার জ্বালা টের পেলুম। হয়তো ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমার মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল।

কিন্তু এই বুড়ো ফকিরের চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। বলে উঠল—‘মরণ! নতুন সাঁইয়ের বুঝি গোঁসা হল? সাধছিনে বলে? ওরে বাপ্, তুই আমার ঘরের ছেলে। খা, ঠেসে খা।’

মরজিনা নীচু মুখেই বলল—‘নাও, হয়েছে! সবাই তোমার মতো গোঁসার গোঁসাই নয়।’

মদনচাঁদ বলল—‘নয় তো, খাচ্ছে না কেন? ওই টুকুন ভাত তখন থেকে খালি মাখছে আর মাখছে। বাবাজীবন, এ ফকির-ফাকরার ঘর। ও বেলা কী জুটবে, ভাবতে নেই।’

মরজিনা চোখে ঝিলিক দিয়ে বলল,—‘হ্যাঁ, এ বেলা ঘি-ভাত, ও বেলা হাভাত! থাক্, আর নিজের কীর্তি বড়মুখে জাহির কোরো না। খাচ্ছে, খাও! মাস্টারমশাই, ভাত নিন।’

একহাতা ভাত আমি বাধা দেবার আগেই থালায় পড়ল। ভাত নয়, আমি দেখলুম নিটোল একটি রাঙা হাতে রেশমি চুড়ির জেল্লা আর টুংটাং বাজনা। বুড়ো ঠিকই বলেছিল—‘শরীল! হায় শরীল!’ চিরোল আঙুলে ধরা এনামেলের ঝলমলানি চাপা পড়ে গেছে চুড়িপরা হাতের উজ্জ্বলতায়। সরু নাকের নাকছাবিতে নক্ষত্র জ্বলছে। কানে ঝুলন্ত চুলের ফাঁকে সোনার রিং দিগন্তের বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিচ্ছে—যেন কোথাও দূরে তুমুল ঝড়জলের আয়োজন। ওর গলার নীচের মাংসটা মনে হল নিথর তুষার—অতি হিম এবং মৃদু

নিঃশ্বাসের তাপেই সব গলে ভেসে যাবে।

খাওয়াটা জমিয়ে তুলতে পারলুম না। অথচ ক্ষিদে ছিল প্রচণ্ড। ডাল ভাত আলুসেদ্ধ ডিমভাজার মধ্যে স্ত্রীলোকের বাৎসল্য নিশ্চয় উজাড় করে দেওয়া ছিল। তবু এক পাপক্লিষ্ট অন্যমনস্কতা আমাকে টলাচ্ছিল বারবার। আমার মনের পাপকে আমার চেয়ে আর বেশি কে জানে?

আঁচাবার সময় মদনচাঁদ হঠাৎ বলল—'শালাব্যাটা এল না। মরুক গে। রোজ আর গরু খোঁজা করে খুঁজতে পারিনে। ইস্ মেয়ে নিয়ে যেন আমায় উদ্ধার করেছে গুখেকোর পো!'

আবদুল্লা বলল—'কে?'

—'আমার জামাই শালা!'

শুনে আবদুল্লা আর আমি হো হো করে হেসে ফেললুম। মরজিনা এঁটো থালা গোছাতে গোছাতে আঁচলে হাসি ঢাকল। বললুম—'জামাইকে শালা বলছ ফকির সাহেব?'

মদনচাঁদ গম্ভীর মুখে বলল—'বলছি কি ওকে? ওর আক্কেলটাকে। দেখুন না, আমি মুসাফির মানুষ। দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। ঘরে যোবতী মেয়েটা একা থাকবে কী সাহসে? তাই মুখপোড়াকে এনে বাদশা বানিয়ে রাখলুম। তো বাবারে বাবা! এ ব্যাটা যেন মনসুর হেল্লাজ।'

মনসুর হেল্লাজ ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার প্রখ্যাত সুফী দার্শনিক ও সাধক। প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। পরে সাধুসন্ত হন। 'আনাল্ হক—আমিই ঈশ্বর, আমিই সত্য,' এই মতের প্রবক্তা তিনি। এর মধ্যে ইসলাম-বিরোধী কাফের দার্শনিকের গন্ধ পেয়ে তাঁকে শূলে বিঁধিয়ে হত্যা করা হয়।

মনসুর হেল্লাজের সঙ্গে ওর জামাইয়ের কিসে মিল, তখনও জানিনে। শুধু টের পাচ্ছি, সে কর্তব্যপরায়ণ ঘরজামাই নয়। একুশ বাইশ বছরের রূপসী বউকে একা রেখে সে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় নিশ্চয়। জানবার ইচ্ছেয় বললুম—'তোমার জামাইয়ের নাম কী ফকিরসাহেব? কোথায় দেশ?'

মদনচাঁদ তার গলার মালা জলে মুছতে মুছতে বলল—'বাঞ্চোতের নামও মনসুর। কাপাসীর ছেলে। ও গাঁয়ে আমার শালার বাড়ি। শালাও জাত-ফকির। সে একবার কথায়-কথায় বলল—ভাগ্নীর বয়স বাড়ছে। এমন সোমত্ত মেয়ে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি ঠিক? তো আমি বললুম—থুই কোথায় বলো? মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে খাবে, মাথায় উকুনে।'

স্বভাবসিদ্ধ হেসে বুড়ো ফের জানাল—'শালা জামাই দেখে দিলে। খোঁড়া ফকিরের নাতি মনসুর। নেশা-ভাং করে ঘোরে। গুণ্ডামির জন্যে বদনামও আছে। মাঝে মাঝে মোড়লেরা মিয়ারা ধরে বেদম পিটোয়। কখনও ভিক্ষেসিক্ষেও করে ব্যাটা। দেখে শুনে মায়া জন্মাল। যা থাকে কপালে বলে ওখানে শালার বাড়ি বসেই রাতারাতি সাদী পড়িয়ে দিলুম। বাড়ি আনলুম।

ভাবলুম, গলায় গেরো পরিয়ে বশ মানাব। তো শালার ব্যাটা শালা উড়নচণ্ডী হাভেতে। ঘরবাগে মনই নেই। আর, উঠতে-বসতে মেয়েটাকে পিটুনি দেয়।'

মরজিনা ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'হুঁ মুরোদ! ওর পিটুনির ধার ধারি? আজ দুপুর বেলা টাকা টাকা করে ঝগড়া বাধিয়ে ছিল। পীরের মেলায় বাবু মনোহারি বেচবে শখ হয়েছে। নলহাটি যাবে মাল কিনতে। বলে, দশটা টাকা দে।'

মদনচাঁদ কান পেতে শুনছিল। বলল, 'হুঁ। তারপরে? দিলি, না দিলি না?'

—'আমার টাকার গাছ আছে কি না।'

—'দিলেই পারতি! একুশটা টাকা রেখেছিলুম না?'

মরজিনা তেড়েমেড়ে বলল, 'বাঃ বাঃ! এই না হলে সাধু! সেদিন একটা ছাগল কিনে দিলে না এগারো টাকায়? কার হরেহম্মে এনেছিল, ছাগলটাও শেয়ালে মারল।'

মদনচাঁদ গুম হয়ে বলল, 'হুঁ। বাকি দশটা?

—'নাও হিসেব নাও।'—বলে মরজিনা এক হাতে লম্ফ নিয়ে উঠোনে নামল। অন্য হাতের আঙুল গুণতে গুণতে বলল, 'শুক্কুরবার গাঁজা কিনতে সাতসিকে নিলে। তারপর রেলের ভাড়া বলে নিলে পাঁচ টাকার একটা নোট। কত থাকল?'

আবদুল্লা বলে দিল, 'তিন টাকা চার আনা।'

—'তিনটাকা চার আনা। এক টাকায় গামছা কিনলুম কাল। ন্যাতা দিয়ে কতকাল চুল মুছব শুনি? একমাথা চুলে পানি বসে-বসে উকুনের বাথান হয়েছিল।'

মদনচাঁদ বলল, 'হুঁ রইল দুটাকা চার আনা।'

—'তুমি গেছ সেই শুক্কুরবার। এলে আজ রোববার। এই তিন দিনে নুন তেল চাল ডালের হিসেব করো। বারো আনা সের হয়েছে চাল। করো—হিসেব করো।'

বুড়ো অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আহা থাক, থাক।'

মরজিনা এক পা বাড়িয়ে মুখিয়ে উঠল—'কেন থাকবে? আজ ছিল মাত্র আট আনা। এ বেলা তিনকাঠা চাল মধুফকিরের বৌর কাছে ধার আনলুম। ডিম আনলুম দুটো নগদ আঠার পয়সা দিয়ে। একপো ডাল নিলে চার আনা। আলু এক পো চৌদ্দ পয়সা। হাতে ছিল সাত পয়সা—দোকানে বাকি আনলুম সাত পয়সা। আর আমার কাছে কী থাকে?'

অমনি সেই সেই হড়কা বানের মতো হা হা হা হা হাসি। বুড়ো হাসির চোটে ঝুঁকে পড়ে বলল—'ন্যাংটো করে দিলি বেটি মেহমানদের সামনে! কাপড় কেড়ে নিলি!'

মরজিনা হাঁফাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি, ওর চোখে জল টলটল করছে। নাক-ছাবিটা তিরতির করে কাঁপছে। মুখ ফিরিয়ে চলে গেল ঘরের দিকে। কান্না জড়ানো স্বরে বলল, 'ভাবলুম বাপ আমার সফর থেকে ফিরছে। না জানি ঝোলা বোঝাই কত চাল থাকবে। আমার বরাত!'

মদনচাঁদ আর্তনাদ করে উঠল চেরা গলায়, 'বেটি! মা মরজিনা! দোহাই তোর! আল্লার ইচ্ছায় ফকিরের ঝোলা কখনও খালি থাকে না! ভুঁইতোড়ের মেলায় নগদ তিন টাকা পেলা পেয়েছি। ভাবিস নে!'

বলে সে নড়বড় করে ঘরে মেয়েকে সামলাতে গেল। আবদুল্লা আমার হাত ধরে টানল। দুজনে উঠোন পেরিয়ে নদীর ধারে দাঁড়ালুম। অন্ধকারে নদীর তলাটা রহস্যময় দেখাচ্ছে। রাতের বাতাসে ঝোপঝাড় দুলছে। নক্ষত্রের আলোয় নীচে বালির চড়া আবছা টের পাওয়া যায়। ওপারে বাঁকের দিকে একখানে আলো জুগজুগ করছে দেখলুম। অনেক লোক নদী পেরিয়ে মেলায় চলেছে। জায়গাটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। আবছা ভেসে আসছিল গানের সুর। মাদারপীরের দরগায় এখন জমজমাট আসর চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ অন্য মানুষ হয়ে গেলুম। এখন আর কোথায় মরজিনা, কোথায় বুড়ো ফকির—কোথায় তাদের টাকা আনা পয়সার হিসেবনিকেশ এবং দারিদ্র্য! সব এই বিশাল রাতের আকাশের নীচে প্রকৃতির ব্যাপকতায় একেবারে তুচ্ছ হয়ে উঠল। তারপর শুনি আবদুল্লা গুণগুণ করছে ঃ

মানুষরতন চিনলি না মন
এমন জীবন আর কী হবে।
শুধু আকিঞ্চন বসনভূষণ
মণিকাঞ্চনে কাল কি কাটিবে॥...

—'আবদুল্লা!'

—'জী।'

—'তুমি বিয়ে করোনি কেন?'

আবদুল্লা অস্ফুট হাসল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'স্যার, আপনি বি. এ, এম. এ পাশ, শিক্ষিত ব্যক্তি। এটাও বোঝেন না রাস্তায় যার পা—তার গায়ে রাস্তার টান লাগে। আমার সাঁই বলতেন—বেটা আবদুল্লা, ওই টান বড় টান। পা তোর থির মানবে না। মাটি যে টলোমলো সারাক্ষণ। পা বাঁধলি কি মলি—তখন দাঁতক্যালানো মড়া। তাই বলি স্যার, যখন আমার গায়ে সামনের টান, তখন পিছুটান নাই বা নিলুম। স্ত্রীলোক টানে পিছন থেকে। বলে—থিতু হও। এই দেখ ঘর। ঘরের মধ্যে গেরস্থালী। এই দেখ শোবার পালঙ্ক, ওই দেখ মুখ দেখার আয়না, আর আমি জ্বলি চেরাগ হয়ে। তুমি সুখে নিদ্রা যাও। কেমন কিনা?'

আনমনে বললুম—'হুঁ।'

—'স্যার, আমাদের মারফতী মতে বলে, এই যা সব দেখছেন—এই দুনিয়া আসমান বেহ্মাণ্ড চাঁদ সুরুষ, সবই 'জাহের' (প্রকাশ্য বিষয়)। ধরুন, এই জাহের হল মাটির ওপর বৃক্ষ। কিন্তু বৃক্ষের যে মূল আছে তলায়। মূল ছাড়া কিছু নেই। ওই মূল তো আমরা দেখতে পাইনে চামড়ার চোখে। ওই মূলের নাম 'বাতন' (অপ্রকাশ্য বা অন্তরালবর্তী। দার্শনিক ভাষায় থিং-ইন-ইটসেলফ্ বা পরম সত্তা)। হুজুর বিজ্ঞমান ব্যক্তি। এবার দেখুন, রাস্তায় হেঁটে না গেলে মূলের 'বাতনে' পৌঁছানো যায় কি? যায় না। ঘরবন্দী হলুম, না জাহেরে বাঁধা পড়লুম। গাছের ডালে ঘুরি ফিরি, নাচি কুঁদি মুখপোড়া হনুমানগুলোর মতো। ফল খাই। পাতা ছিঁড়ি। লুঠপাট করি। হায়, মূল যে দেখা হয় না!'

যেন বা ও অবভাসতত্ত্ব আওড়াল। এ্যাপিয়ারেন্স এবং রিয়্যালিটির গুহ্যকথা। এই বয়সে অতসব শিখল কোথায়? আমি অবাক হয়ে বললুম—'কিন্তু তোমাদের সুফী গুরুরা তো বৈষ্ণবদের মতো রাধা-কৃষ্ণ যুগল মিলনের কথা বলেছেন! স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রেম-মুহব্বতেই খোদার নিশানা খুঁজে পেয়েছেন।'

আবদুল্লা অতটা হয়তো বুঝল না। বলল—'জী হ্যাঁ। সেও এক রাস্তা। একদল আউল নারীভজা। আমি অন্যদলে। মেলায় গেলে সব দলের তত্ত্বই জানবেন। কই, দেশলাই দিন। একটা সিগারেট খাই। নিন—আপনিও খান!'

ওর একতারা আর ঝোলাটা কাছেই আছে সব সময়। ঝোলা থেকে একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করল। অবশ্য জ্বালতে গিয়ে তা চোখে পড়ল। দুজনে সিগ্রেট টানছি, এমন সময় মদনচাঁদ হেরিকেন হাতে বেরুল। হেঁকে বলল—'বাবাজীরা কোথা গো?'

আবদুল্লা সাড়া দিল—'আসুন বাপজী। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

—'মালেক সাঁই মওলা!' ফকির হাঁক দিতে দিতে চলে এল বুড়ো। বাঃ! তেল চুকচুকে মুখ—দাড়ি ও চুলে তেল ঘষেছে। সিঁথিটি চমৎকার বাগিয়েছে। পিছনে মরজিনাও এসেছে। ওর মাথায় এতক্ষণে ঘোমটা দেখলুম। আঁচলের খুঁটে চাবি ঝুলছে।—'বেটিকেও আনলুম। একা-একা ঘরে থাকবে। জামাই শালার পাত্তা নেই। এসে দেখবে, পাখি উড়েছে। তখন বুক চাপড়ে মরবে।'

একটু শঙ্কিত হলুম। বললুম—'একেবারে ঘর ছেড়ে এলে নাকি ফকির সাহেব?'

মদনচাঁদ জিভ কেটে বলল—'কথার কথা বলছি, বাবা। বেটি, হেরিকেন লিয়ে তুই আগে-আগে হাঁট্। রাস্তা দেখিয়ে চল্, মা। এ তিন বেটা কানা।'

মরজিনা বলল—'উঁহু। আমি পিছনে যাব। তোমরা এগোও।'

আবদুল্লা ঝোলা থেকে একটা তিন-ব্যাটারি টর্চ বের করে জ্বালল। মদনচাঁদ লাফিয়ে উঠল।—'আই আমার বাপ রে! সোনা রে! মাণিক রে! তিভুবন উজালা করে দিলে রে!'

বলেই সে হেরিকেনটার কাচ তুলে ফুঁ দিয়ে নেভাল। তারপর সবার আগে আবদুল্লা, তার পেছনে আমি, তারপর মদনচাঁদ, পিছনে মরজিনা—নদীর তলায় সরু ধাপ বেয়ে নেমে গেলুম। নদী শুকনো। একখানে একফালি স্রোত বইছে। কালো স্বচ্ছ জল মাথা কুটছিল অন্ধকারে। আলো পেয়ে যেন পুলকে শিউরে উঠে চমকাল। ওপরটা ঢালু। কুমড়ো, তরমুজ এ সব চাষ করা হয়েছে। কাঁটার বেড়া আছে। সংকীর্ণ পথে উঠতে থাকলুম। হঠাৎ শুনি মদনচাঁদ বলছে—'মরণ! মেয়েকে আমার পানির নেশায় পেলে গো! চলে আয়, চলে আয়।'

পিছনে ঘুরে দেখি, মরজিনা বাচ্চা মেয়ের মতো স্রোতে পা ডুবিয়ে যেন খেলা করছে। আবদুল্লার টর্চের আলো ঘুরে গিয়ে ওর গায়ে পড়তেই দুহাতে মুখ ঢেকে একটু ঘুরে বলল—'আঃ!'

তখন টর্চের আলোটা পথ বরাবর নীচের জলঅব্দি ওর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। স্বচ্ছ জলের তলায় মরজিনার আলতাপরা পা দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হ্যাঁ, সেও সেজেছে। মুখে স্নো পাউডার মেখেছে মনে হল। কপালে লাল মোটা একটা টিপ। খোঁপা বাঁধা চুল। ঠোঁট কামড়ে ধরে দৌড়ে উঠে এল সে।

আবার আমার বুকে একটা ঢিঢ পড়ল। যেমন করে বাঘিনী ছুটে আসে হরিণের পালের দিকে, ওই আসার মধ্যে তেমনি একটা ভঙ্গী। এবং হরিণ কথাটা মাথায় এল বলে মদনচাঁদকে বললুম—'সেই গানটা একটু হোক ততক্ষণ। সেই যে সর্পের ডিম্ব...'

বুড়ো দেরী করল না। পাড়ের বাঁধে উঠে হেঁড়ে গলায় ধরল ঃ

'তিরপিনীর ঘাটেতে এক মড়া
ভাসতেছে/
মড়ার বুকে সর্পের ডিম্ব/
হরিণ চরতেছে/...'

বিশাল অন্ধকার প্রান্তরে সেই উদ্দাম অবাধ সংগীত রহস্যময় শ্রুতি-পারের ধ্বনিসমূহকেও জাগিয়ে-জাগিয়ে তোলপাড় করতে থাকল। আবদুল্লা সমের মুখে ফকিরী নাদ বা 'জিগির' হাঁকল সগর্জনে ঃ 'মালেক সাঁই মওলা!'

টের পেলুম দুই আউল ক্রমশ নিজের আসল মূর্তি ধরছে। ক্রমশ অচেনা হয়ে উঠছে আমার চোখে। পীরের দরগার কাছাকাছি গিয়ে দুজনে অদ্ভুত বোলচাল শুরু করল ঃ

'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্/
মাফি কলমা গায়রুল্লাহ্/
হাস্তে রাব্বি সাল্লেল্লাহ্/...

এই ধ্বনিপুঞ্জের আক্রমণাত্মক ক্ষমতা অসাধারণ। এ বুঝি সেই নাদব্রহ্ম। হিজল অঞ্চলে এক তান্ত্রিক সাধু অমাবস্যার রাতে ঔং নাদে আমাকে ভয়ার্ত করে ফেলেছিলেন। সেই মহাকাশ-মহাকাল একাকার করা অতিমানবিক ভয়ংকর গর্জন এখনও মনে পড়লে বুক কেঁপে ওঠে। সেই নিশুতি রাতে নির্জন কালী মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে টের পাচ্ছিলুম সারা অস্তিত্ব গমগম করে অনন্ত ড্রামের মতো বাজছে—ঔং! যেন সৃষ্টির নাভিমূল থেকে উঠে আসা ওই নাদ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সৃজন-পালন-সংহারকে ওতপ্রোত করে ফেলছে মহাকালের পাত্রে। ঔং! এই গর্জনে কামনা আছে, তাই সৃষ্টি আছে। প্রেম আছে, তাই পালন আছে। ঘৃণা আছে, তাই সংহার আছে।

'মাফি কল্মা গায়রুল্লাহ্!' মদনচাঁদ শেষবার দম নিয়ে গর্জাল। আবদুল্লা পাল্টা হাঁক ছাড়ল ঃ 'হাস্তে রাব্বি সাল্লেল্লাহ্!' তারপর দুজনে একসংগে চিৎকার করে উঠল—"মালেক্ সাঁই মওলাঃ!"

দরগার সামনে গাছপালার তলায় সামিয়ানা আর হ্যাসাগ জ্বলছে। অজস্র ফকিরফাকরার ভিড়। ডুমডুম ঢোলক বাজছে। একতারার পিড়িং পিড়িং চলছে। কানের কাছে একতারাটা ধরে মুখ কাত করে এবং চোখ বুজে এক ঢ্যাঙা আলখেল্লাধারী সুদর্শন প্রৌঢ় ফকির একটু-একটু নাচছে। মদনচাঁদ যেন আগুন লাগলে দিশেহারা হওয়ার মতো দুহাত তুলে দৌড়ে আসরে ঢুকে পড়ল। তার পেছনে পেছনে ঢুকল শান্তভাবে আবদুল্লা। আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। যাব নাকি ভাবছি। পিছন থেকে মরজিনা চাপা গলায় বলে উঠল—'ওই সঙের মধ্যে ঢুকে কি করবেন? দেখছেন না ছিলিমের ধোঁয়ায় সব ঝাপসা। নেশা ধরে যাবে। আমার তো ধরেই গেল। ইস্, মা গো! ভুতপেরেতের বাথান।'

ঘুরে দাঁড়ালুম। অজস্র চোখ আউলকন্যার দিকে। নানা গাঁয়ের গেরস্থ মানুষ- ভক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আছে, ফকিরও আছে। বললুম—'কোথায় যাব তাহলে?'

চোখ টিপে হাসল আউলকন্যা। 'তার চেয়ে মেলা দেখি, আসুন!'

পা বাড়ালুম। লোকেরা তাকাচ্ছে। অস্বস্তি হচ্ছিল। এক রাতের মেলায় অল্পেস্বল্প দোকানপাট এসেছে। এদিকটা বিশাল অনাবাদী বিলাঞ্চল। উলুকাশের জংগলে ভরা। নদীর পাড় বরাবর ঘন গাছপালার জটলা। তলা সাফ করে দোকান বসেছে। মরজিনার থামার ইচ্ছে নেই। মেলার শেষে গিয়ে সে বাঁয়ে ঘুরল। গাছ ঝোপঝাড়ে ভরা জায়গাটা। কোন লোক নেই। ওদিকে কোথায় যাচ্ছে? আমার দিকে ঘুরে একটু হেসে বলল—'আসুন, কানা দরবেশের পায়ে সেলাম করে আসি।'

—'এখানে দরবেশ থাকে নাকি?'

—'হুঁ। দু'চোখ কানা। দরগার পেছনে একটা ঘরে থাকে। ভরের দিন লোকে মানতের সিধে দিয়ে যায়। তাই রাঁধাবাড়া করে খায়। তপজপ করে। খুব ভাল মানুষ।'

এই জনহীন বিলাঞ্চলের জঙ্গলে একা এক অন্ধ সাধুসন্ত থাকেন! খুব কৌতূহল হল। মরজিনা গাছ পেরিয়ে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে বলছে—'শেকড়। হোঁচট খাবেন না যেন।'

শেকড়ের নয়, আমার ভয় সাপের। কিন্তু ও যেভাবে হাঁটছে, মনে হল প্রতিটি ইঞ্চি ওর মুখস্থ। মেলার আলো ক্রমশ-মুছে গেল। একেবারে দরগার পিছনে চলে এসেছি। অন্ধকারে একটা লম্ফ জ্বলতে দেখলুম। ইটের ভাঙা পাঁচিল—মধ্যে গেট মতো। ভিতরের উঠোনে ম্লান আলো পড়েছে। কয়েকটা চৌকো প্রকাণ্ড পাথর পড়ে আছে। এ নিশ্চয় সেকালের কোন বড় তীর্থ। একটা ইঁটের ঘর দেখা যাচ্ছিল একতালা। ওপরে খড়ের চাল। সম্ভবত ছাদ ধ্বসে পড়ার পর এই ব্যবস্থা। চারপাশে ইটের স্তূপ। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ ঝাঁঝালো হয়ে নাকে লাগল। উঠোন ভরা ফুল দেখলুম। লম্ফটা জ্বলছে ঘরের ভিতরে একটা বেদীতে। দরজার কাছে একটা নীচু জলচৌকিতে যে বসে আছে, সেই বুঝি কানা দরবেশ। কালো পোষাক, আথায় কালো পাগড়ি! গলাভর্তি বড় বড় হরেকরঙা পাথরের মালা। পাশে একটা মোটা লাঠি—তার মাথায় পেতলের ময়ুর। একটা ধূপচি ধোঁয়াচ্ছে হাতের কাছে। ধূপের মিঠে গন্ধ পেলুম এবার। দরবেশের চুল-দাড়ি সাদা। গায়ের রঙটা কালো। প্রকাণ্ড মানুষ। হাতে একটা 'তসবীহ্' বা জপমালা রয়েছে। উঠোনের মাঝামাঝি যেতেই শ্লেষ্মাজড়ানো গলায় বললেন—'কে?'

অমনি মরজিনা প্রায় দৌড়ল।—'তোমার বেটি বাবা।'

—'আই মা! মরজিনা বিবি? আয়, কাছে আয়। এ্যাদ্দিন কেন আসিস নি মা?'

মরজিনা হেঁট হয়ে ওঁর দু'পায়ে চুমু খেল। বুড়ো দরবেশ তসবীহ্ সুদ্ধ হাত ওর মাথায় পিঠে বুলিয়ে বিড়বিড় করে কী মন্ত্র আওড়ালেন। তারপর বললেন—'তোর সঙ্গে কে আছে বেটি? মনসুর বেটা?'

—'তোমার মাথা খারাপ? এক নতুন মানুষ। খুব শিক্ষিত লোক। গানের মাস্টার।'

—'বাপজান, বসুন।'

ভক্তি বলা ঠিক হবে না, রীতি মানতেই পায়ে হাত ছুঁইয়ে সেলাম করলুম। আমার পিঠেও তসবীহ্ পড়ল। তারপর মুখ তুলে দেখি, কানা চোখ দুটো দিয়ে দরবেশ আমাকে যেন দেখছেন। গা শিউরে উঠল। কী

দেখছেন আমার মধ্যে? পাপজনিত বিহ্বলতা? আলোর কাছে এসে পড়া স্তম্ভিত কোন কালনাগ?

—'বাবার নাম? মোকাম?'

সব বললুম। মরজিনা জলচৌকির কোনায় বসে ঘরের ভিতরটা দেখছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি। দরবেশ বললেন—'বেটি, বেটাকে বসার জায়গা দে।' তখন মরজিনা ঘরে ঢুকে একটা তাল পাতার চাটাই এনে পেতে দিল। বসলুম। সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে—অথচ দরবেশের সামনে খাব কি না, দ্বিধা হচ্ছে। দরবেশ একটু একটু দুলছেন আর মালাটা জপ করছেন। ঠোঁট কাঁপছে—তার মানে কিছু উচ্চারণ করছেন। হঠাৎ মরজিনা ঘরের ভিতর থেকে চোখ ফিরিয়ে হাসি-মুখে দরবেশকে বলে উঠল—'বাবা, আঙুর ফল খাব!'

দরবেশের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হল। বললেন—'কী খাবি? আঙুর ফল? যাঃ, ভাগ্ ভাগ্!'

মরজিনা বালিকার ভান করে ঠোঁট উল্টে বলল—'নাঁ—খাঁবো!'

আমি অবাক। হঠাৎ এই বিলের জঙ্গলে ভুতুড়ে আস্তানায় আউলের মেয়ের আঙুর খাবার সখ হল কেন? হাঁ করে তাকিয়ে থাকলুম। দরবেশ দুলতে দুলতে বললেন—'এখন আঙুর ফল কোথা? অন্য কিছু খা।'

—'নাঁ। আঙুর ফল খাঁবো!'

আউলকন্যার ঠোঁটের কোণায় দুষ্টু হাসি, আমার দিকেও ঝিলিক হানছে। যেন বলছে দেখুন না কী অবাক কাণ্ড ঘটবে! দরবেশ খিকখিক করে হাসছিলেন! বললেন—'মুখের কথা বললেই তো হল না বেটি। যাবে পাহাড়ী মুলুকে, আনবে—তারপর তো! সে কি এখানে মেলে?'

—'উঁহু। হুকুম করলেই আসবে। সেবার কেমন করে কথা বলতে না বলতে এল?'

দরবেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন।—'সেবার আমার নিজেরই খেতে ইচ্ছে হয়েছিল কিনা।'

—'তাহলে এবারও ইচ্ছে হোক্।'

—'নাঃ। ব্যাটারা এখন ঘুমুচ্ছে। ডাকলেই রেগে যাবে।'

মরজিনা ঘরের দিকে উঁকি মেরে বলল—'ইস্, ভারি আমার রাগ! দাঁত কেলিয়ে ওই তো পড়ে আছে তিনজনে।'

আমার চোখ গেল সেদিকে। দেখে থ হয়ে গেলুম। কালো কাপড়ে ঢাকা একটা বেদী রয়েছে ঘরের দেয়ালঘেঁষে। তার ওপর তিনটে মড়ার মাথা। ওপরের ঝাড়বাতির মতো রঙীন কাগজের মস্তো কয়েকটা নক্সাকাটা ফুল ঝুলছে। তার চারদিকে শোলার সাজ, রাঙতা বসানো সব থুপি ঝুলছে। ঝিকমিক করছে রাঙতাগুলো। পিদীমটা জ্বলছে বেদীর নীচে। কয়েকটা আগরবাতি ধোঁয়াচ্ছে। এতক্ষণ টের পেলুম এই দরবেশ এক সিদ্ধাই তান্ত্রিক।

সুতরাং ভরও হয় প্রেতশক্তির। মাথা দুলিয়ে জব্বর খেল দেখান। এই রকম ভরের খেলা আমি প্রচুর দেখেছি। স্ত্রীলোক, পুরুষ—হিন্দু বা মুসলমান যে ধর্মেরই হোক, নাকি প্রেত বা দৈবশক্তির আবির্ভাব ঘটে থাকে তাদের মধ্যে। এও এক কালচার!

দরবেশ বললেন—'ভরের দিন আসিস। আঙুর খাওয়াব। আজ অন্য কিছু খা।'

মরজিনা গোঁ ধরে বলল—'সে তো শুক্কুরবার। অত দেরী আমার সয় না।'

দরবেশ হঠাৎ সুরকিভরা মেঝে থেকে একটু লালচে মাটি তুলে নিলেন। নখগুলো বড়, তীক্ষ্ন কালচে। দেখে একটু ঘেন্না হল নিশ্চয়। মাটিটা নিয়েই বললেন—'নে বেটি, হাত পাত। সঙ্গে সঙ্গে মুঠো করবি।'

আমার চোখের সামনে এক তাজ্জব ঘটনা ঘটল। মরজিনার হাতে দরবেশের হাত পড়ল এবং মরজিনা হাত মুঠো করল। দরবেশ হাতটা সরিয়ে নিতেই মরজিনা মুঠো খুলে অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠল—'মোণ্ডা!'

দেখি, ওর হাতের তালুতে একদলা ভাঙাচোরা মোণ্ডা! মোণ্ডাটা সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে মরজিনা বলল—'এখন না, পরে খাব। বাবা, এবার নতুন মানুষকে কিছু দেবেন না? বড় মুখ করে এসে বসল!'...বলে সে আমার দিকে কটাক্ষ হানল।

দরবেশের অন্ধ ঘোলাটে তারাবিহীন চোখ দুটো আমার দিকে ঘুরল। এ যদি দিনদুপুর হত—কোন জনপদে ভিড়ে ঘটত, যদি না এটা হত কোন জনহীন আদিম নিসর্গ—এবং এই অন্ধকার রাতে আস্তানার কালো কালো গাছপালা বাতাসে শন শন করে দুলছে—আমি একটুও আক্রান্ত বোধ করতুম না। ম্যাজিক আর ধোঁকাবাজির খেল আমি তো অনেক দেখেছি! কিন্তু এই টিমটিমে লম্ফের আলোয় আমার যুক্তিবোধ রুগ্ন কুকুরের মতো কেঁউ করেই চুপ করে গেছে মনের তলায়। এক মায়াজগতে ঢুকে পড়েছি সঙ্গে সঙ্গে। এ সেই প্রিমিটিভ মানুষের জগৎ—অলৌকিক শক্তিসমূহের দ্বারা সতত আক্রান্ত যা। হাজার হাজার বছর পিছিয়ে গেছি হঠাৎ। বুক কাঁপছে। ঊরু ভারি হয়ে গেছে। চোখ নিষ্পলক। মরজিনাও ঘোর স্তব্ধ। শুধু ঠোঁটে একটু হাসি। সে-হাসি কিসের আমি জানি না। নাকি অতীন্দ্রিয় মায়াজগতের এক গাইডের আত্মতৃপ্তিটুকু? সে যেন বলতে চায়, দেখ—কোথায় এনেছি তোমাকে!

দরবেশ অন্তত দু'মিনিট নীরব। তারপর বললেন—'বেটা! তোর নামের মানে জানিস?'

আস্তে বললুম—'না।' কারণ, আমার নামের মানে কী, জানবার আগ্রহ বোধ করিনি কোনদিন। আজন্ম যা দেখে বা শুনে আসছি, যেমন বাবা মা গাছ

মাটি ধানক্ষেত সূর্য—তার কোন মানে নিয়ে আমার কী দরকার? যেমন, গাছ কী আমি জেনে গেছি, তেমনি আমার নামটা বলতে কাকে বোঝায়, তাও জানা হয়েছে। তার বাইরে কী জানার থাকতে পারে?

দরবেশ বললেন—'সিরাজ মানে চেরাগ। লম্ফ। পিদীম। ওই যেমন জ্বলছে। ওই যে বাতি দেখছিস, সেই বাতি। কথাটা আরবী। আরবীতে যা সিরাজ, ফারসীতে তাই চেরাগ। আরবীর শিন হরফ ফারসীতে চে। (অর্থাৎ স হয়েছে চ) আর আরবীর জে ফারসীতে গাপ (অর্থাৎ জ হয়েছে গ)।'

মুহূর্তে আমার মধ্যেকার এক অলক্ষ্য অন্ধকার সরে সকালের ঝলমলানি জেগে উঠল। প্রদীপ আমার নাম? দীপশিখা—আমি আলো! কী অবাক! আবেগ আমাকে হতবুদ্ধি করল।

—'বেটা!' দরবেশ ডাকলেন। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন—'কিন্তু পিদীমের তলায় আঁধার থাকে, জানিস তো?'

আস্তে বললুম—'হুঁ। জানি।' আর মরজিনা আমাকে দেখতে থাকল।

—'বেটা, হুঁশিয়ার। খুব হুঁশিয়ার। তলায় আঁধার নিয়ে ঘুরছিস! আঁধারে সাপব্যাঙ পোকা মাকড়ের উপদ্রব হয়। কিন্তু সাঁইজীর মহিমা দেখ বাবা, তোর ওপরটা কী উজালা! রোশনিতে দৃষ্টি ঠিক্‌রে যায়। হায়রে হায়, এ বড় তাজ্জব!'

চুপ করে থাকলুম। ধরা পড়ে গেছি। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি এই অন্ধ ত্রিকালযজ্ঞ ফকিরের কাছে। আমার তলার অন্ধকারে পাপের সরীসৃপ নড়ে উঠেছে।

হঠাৎ নড়ে উঠলেন দরবেশ। মুখটা ঝুঁকে এল আমার দিকে। ওর নোংরা শরীর ও আলখেল্লার ভ্যাপসা দুর্গন্ধ এসে লাগল। চাপা গলায় বলে উঠলেন—'পালা! শীগগির এদের কাছ থেকে পালিয়ে যা! তোর এ লাইন নয়। কষ্ট পাবি। যা, এক্ষুনি পালিয়ে যা!'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম—'কোন লাইনে তো আমি আসিনি ফকির সাহেব। এসেছি একরাত্তির মারফতী গান শুনতে। সকালেই চলে যাব।'

দরবেশ কেমন হাসলেন।—'ক্ষ্যাপা বেটা আমার! একটা রাত! একটা রাতেই দুনিয়া বদলে যায় রে! একটা রাতেই সব ওলট-পালট হয়ে যায়। হুঁশিয়ার! এ রাত বড় সহজ রাত নয় রে!'

অবাক হয়ে দেখি, মরজিনা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মুখটা গম্ভীর। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। সে আমার চোখের দিকে ইসারা করল—চলে আসুন। তারপর দাওয়া থেকে উঠোনে নামল। আমি কী করব ভাবছি। একটা অন্ধ লোকের ওপর এই হঠকারিতা দেখানো কি উচিত হবে? কিন্তু মরজিনা উঠোন থেকে জোরে হাত নেড়ে ডাকল।

কোন কথা না বলে উঠে গেলুম। ভাঙা ফটক পেরিয়ে যেতে যেতে শুনি

দরবেশ ডাকছেন—'মরজিনা! বেটি মরজিনা!'

আরও দুবার ডেকে চুপ করে গেলেন কানা দরবেশ। অন্ধকারে গাছপালার মধ্যে ঢুকে মরজিনা থমকে দাঁড়াল। এত দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল যে মুখোমুখি বুকে বুক ঠেকার উপক্রম হল।

কিন্তু সে সরে গেল না। আর আমি তো অবশ মানুষ তখন। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনলুম। গন্ধ পেলুম। যেন কোন ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। ওদিকে রুষ্টা বাঘিনী ফুঁসছে।—'বুঝলেন কিছু? মাথায় ঢুকল? আপনি না বি.-এ এম.-এ পাস?'

একটু হেসে বললুম—'কী বুঝব?'

—'ফকির না ফাক্‌রা! ফিকির আর ধান্দাবাজী! কবে চিনেছিলুম—আমারই ভুল!' মরজিনা ছটফট করে কথাগুলো বলল।—'বরাবর হারামী বুড়ো কানা। আমাকে ওইরকম ভাবে! না জানি চোখ থাকলে ভিরমি খেয়ে আরও যা খুসি বলত! আমি জানি না আবার?'

—'তোমাকে তো কিছু বলেন নি, মরজিনা। আমাকেই বললেন।'

মরজিনা ঘুরে পা বাড়াল। ও কি কান্না চাপছে? বলল—'কানাবুড়ো, তোরই তলায় আঁধার যত, পাপ যত, সাপব্যাঙ, সব তোরই মধ্যে বাস।'... তারপর আঁচলের গিঁট খুলে সেই মোণ্ডাগুলো ছুঁড়ে ফেলল।—'ও মেজিকবাজী বুঝি ধরতে পারি না? ঝোলার হাতায় লুকিয়ে রেখে কেরামতী দেখায়! আঙুরফল! ওর চৌদ্দপুরুষ আনবে পাহাড়ী আঙুরফল! মানিনে—আমি কিচ্ছু মানিনে। ওই যে কথায় বলে—ঝড়ে মরে কাক, ফকির দেখায় জাঁক।'

তখনও ব্যাপারটা আমার কাছে আবছা। কেন হঠাৎ ওর মধ্যে এই ধ্বংস ঘটল—কেন এতদিনের বিশ্বাস ও সংস্কার হঠাৎ ঘুচে গেল, তখনও স্পষ্ট টের পাচ্ছিনে। বললুম—'মরজিনা, ওঁর ওপর এত রাগলে কেন বলবে?'

মরজিনা দাঁড়াল। তারপর হু-হু করে কেঁদে ফেলল।—'মাস্টার, ও আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছে! উঃ, মাগো!'

নিঃসঙ্কোচে ওর দু' কাঁধে হাত রেখে বললুম—'ছিঃ মরজিনা, তুমি অত ছোট নও। ফকির যাই ভাবুক, আমার মনে তোমার জন্যে কোন পাপ নেই।'

মরজিনা আলতোভাবে হাত ছাড়িয়ে এগোল। আঃ! এই অদ্ভুত সময়ে, এই অন্ধকার অরণ্যের নির্জনে, আউল-কন্যাকে ভালবাসি বলার চরম সুযোগটা কীভাবে হারালুম!...

এখন আউলদের আসরে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। কে একজন প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে বলে উঠছে—মালেক্ সাঁই মওলা! অমনি শতাধিক ফকির পাথরের মালাগুলো জোরে নাড়া দিয়ে অন্তত দু-তিন মিনিট কোরাসে গর্জন করছেঃ দম্ দম্ মাদার দম্। দম্ দম্ মাদার দম্। তারা দুলছে। আসরে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। বাকি অন্য লোকেরা সবাই চুপচাপ। মেলাও যেন কথা বন্ধ করলেন। দোকানগুলো ফাঁকা। হেরিকেন বা মোমের আলোয় দোকানীরা গুটিসুটি বসে আসরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবার চিৎকার উঠল—মালেক্ সাঁই মওলা! আবার আদিম গর্জনে আবৃত্তি চলল—দম্ দম্ মাদার দম্! দম্ দম্ মাদার দম্!

দূরে দাঁড়িয়ে আছি মরজিনার পাশে। কেউ আর আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না। মরজিনা আনমনে খুব আস্তে বলে উঠল—'মাদারপীরের ভর নেমেছে আসরে। এক মাদার এখন শয়ে শয়ে।'

ব্যাপারটা বুঝলুম না। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পাথরের মালার আওয়াজ, শতাধিক কণ্ঠস্বরের ওই গর্জন, সব মিলিয়ে একটা দেখা বা শোনার মত ব্যাপার। আবদুল্লাকে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। মদনচাঁদকে দেখতে পেলুম। বুড়ো চোখ বুজে মালা ঠকঠকিয়ে জোর আওয়াজ তুলছে আর দুলছে।

খুব জানবার ইচ্ছে হল, এ-সবের মানে কী। বললুম—'কে মাদারপীর, কেন জাণ্টিমাসের শেষ রোববারে এই পরব, আর কেনই বা একে মাদারের বিয়ে বলে- তুমি নিশ্চয় জানো মরজিনা?'

মরজিনা ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিসফিস করে বলল—'জানি। কিন্তু এখন কথা বলতে নেই।'

ওই একঘেয়ে ব্যাপারটা ক্রমশ বিরক্তি ধরিয়ে দিল। বললুম—'মাথা ধরেছে। আমি বরং নদীর ধারে বাঁধে ঘুরি গিয়ে।'

বলেই পা বাড়ালুম। একটু এগিয়ে ঝোপ ঠেলে বাঁধে উঠেছি, হঠাৎ দেখি মরজিনা আসছে। বাঁধে এসে সে একটু হেসে বলল—'আমারও মাথা ধরেছে। হাওয়া নিই খানিক।'

বাঁধের নীচে ঢালু হয়ে মাটি নদীর তলায় মিলেছে। সব্জী ফল-মূলের ক্ষেত আছে মনে হল। বললুম—'এক রাতে নাকি সব ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, মরজিনা। কানা দরবেশ বলছিলেন। তোমার এমন করে আসা কি ঠিক

হল?'

মরজিনা চাপাগলায় বলল—'কান্নার ওপর জেদ করেই দেখি না, কী হয়। আপনি ভয় পেয়েছেন, তাও জানি। কিন্তু মাস্টার, নিজে ঠিক থাকলে টলায় কে?'

—'মরজিনা, আমার পা চিরদিন টলে বেড়াচ্ছে। হুঁশিয়ার!'

আউলকন্যা হেসে উঠল।—'আমি মানুষ চিনি। ও মাস্টার, মাদারপীরের কথা শুনবেন বলছিলেন না?'

—'হ্যাঁ। বলো, শোনা যাক্।'...বলে সিগ্রেট ধরালুম এতক্ষণে।

মরজিনা অন্ধকার মাটি দেখতে দেখতে বলল—'তাহলে এখানে বসি।' তারপর সে বাঁধের নগ্ন মাটিতেই ধুপ করে বসে পড়ল। ডাকল—'দাঁড়িয়ে থাকলে চোখে পড়বে লোকের। বসুন মাস্টারমশাই।'

আমার একটু অস্বস্তি হল এ-কথা শুনে। এই মেয়েটি পরস্ত্রী। ভিখিরী ফকির বাউলবাড়ির মেয়ে, বাপ ছাড়া কেউ আগলে রাখার ছিল না। সুতরাং স্বাধীনতায় বেড়েছে বন্য গাছের মত, সরল ও সূর্যমুখী। আজীবন বাপের সঙ্গে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছে। বাপ গান গেয়েছে এবং হয়তো ভিক্ষেটা হাত বাড়িয়ে সেই নিয়েছে। এক ধরনের বেহায়াপনা তো তার পক্ষে স্বাভাবিকই। সাহসও প্রচুর থাকা উচিত।

কিন্তু না—তাই বলে ওকে স্বৈরিণী ও সহজলভ্যা ভাবতে পারব না। কারণ, সতত তার চারদিক ঘিরে একটা অদৃশ্য ঘূর্ণীর মতো একটা জোরালো ব্যক্তিত্ব চক্রব্যূহ তৈরি করে আছে। এটা টের পেতে কারও দেরী হবে না।

তবু এ এক প্রত্যন্ত পাড়াগাঁ। হাজার হাজার বছরের পুরনো সংস্কার, নীতিবোধ কিংবা সতীত্বের স্পর্শকাতর ধারণাগুলো এখানকার আবহাওয়ায় কিলবিল করে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। অন্য কারো কথা ভাবছি না, যদি ওর সেই দুর্দান্ত গোঁয়ার স্বামীটি এভাবে আমাদের এখন দেখতে পায়, কী ঘটতে পারে ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু ওর তীব্র ডাক এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্যও নেই। অবশেষে মনে মনে যুক্তি দাঁড় করালুম—আমি তো ওর সঙ্গে প্রেম করছি না গোপনে। আর মনের পাপ, তাকেও বললুম—সরে যাও কিছুক্ষণ। দূরে অপেক্ষা করতে পারো, কিন্তু সামনে নয়।

অন্তত হাত তিনেক তফাতে বসলুম। নক্ষত্রের এটায় সাদা দীর্ঘ মাটি ঝকমক করছে। পিঠের দিকে সম্ভবত জামবনের পাহারা। পায়ের নীচে সব্জীক্ষেত ঢালু হয়ে নদীর তলায় চলে গেছে। হঠাৎ একটু হাসল মরজিনা।
—'জষ্টিসংক্রান্তিতে পোকামাকড় বেরোয়। ওইখানেই মনসাতলা। পরশু সংক্রান্তি না মাস্টার?'

উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম—'কে জানে!'

—'হুঁ। সংক্রান্তি। ওই যে সুমশাম জায়গাটা দেখছেন, ওখানে মা মনসার

থান। পরশু আবার ধুমধাম। ঢাকঢোল বাজবে। দুধের নদী বইবে। মা মনসার ছেলেপুলেরা বটের জড়শেকড় থেকে বেরিয়ে দুধ খাবে। গায়ে চাপিয়ে নাচনকোঁদন করবে ওঝারা। ঝাঁপান গাইবে। বীরভূম সাঁওতাল পরগণা দুমকা থেকে আসবে পাহাড়ী বেদে বেদেনীরা। দুটো দিন থেকে যান। থাকবেন তো ?'

শুধু বললুম—'দেখি।'

মরজিনা একটু চুপ করে থেকে বলল—'আপনি চ্যাড়া মানেন ?'

—'সে আবার কী ?'

খিলখিল করে হাসল সে।—'ও মা! আপনি কোন্ দেশের মানুষ গো ? জানেন, কানা দরবেশ মড়াসাধক ? নদীতে বর্ষায় মড়া ভেসে আসে। সে মড়া তুলে তার বুকে বসে তপজপ করে। বাপজান দেখেছিল। হুঁ—যে তিনটে মাথা দেখলেন তার থানে, সেই তিনটে মড়ার চ্যাড়া কানা-বুড়োর চাকর হয়ে আছে। কানার ভিতরে চোখ আছে—বাপজান বলে।'

হেসে বললুম—'তুমি তো মিথ্যে ম্যাজিকের কেরামতী বললে তখন ?'

'—তখন আমার রাগ হয়েছিল। এখন ভয় করছে। মনে হচ্ছে, ঠিক করিনি। আমার কোন ক্ষতি হবে—মন বলছে, মাস্টার। ঠিকই ক্ষতি হবে।'

ওর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ টের পেলুম। কুসংস্কারের ভয়ঙ্কর শক্তির কথা আমি জানি। তাই ওকে আশ্বস্ত করতে বললুম 'ওসব থাক। তুমি মাদারের বিয়ের কথা বলবে বলছিলে। বলো।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মরজিনা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে বলল—'বলি !'

সুফী পীর মাদার শাহ্ ছিলেন নারীবিদ্বেষী আউল। ওই আবদুল্লা যে নারী-ভজা আউলের কথা বলছিল, তাদের উল্টো মতের সম্প্রদায়। (কে জানে আবদুল্লাও নারীবিদ্বেষী আউল কি না। অথচ সুদর্শন জুয়াড়ীর কাছে শুনেছি, সে ধর্ষণের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল নাকি !) যাই হোক, মাদার শাহের মতে, নারী ঈশ্বরের দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। অতএব তিনি মেয়েদের দেখতে হবে বলে মুখ ঢেকে থাকতেন। আশ্চর্য এক বুজুর্গ বা অলৌকিক শক্তিধর এই আউল নাকি একই সময়ে নানা জায়গায় থান বা দরগা বানিয়ে বাস করতেন। একই মানুষ একই সময় আছেন সবগুলো থানে। ব্যাপারটা ভাববার কথা নয়, মাস্টার ?...হ্যাঁ, নিশ্চয় ভাববার কথা।...তা একবার হল কী স্বামীর অত্যাচারে একটি মেয়ে মাঠের পথে পালিয়ে আসছে বাপের বাড়ি, হঠাৎ কালবোশেখীর ঝড় উঠল। মেয়ে তখন মাদারপীরের থানে গিয়ে আশ্রয় নিল। যুবতী মেয়ে। জনহীন থানের উপর গাছ-পালা ভেঙে পড়ছে ঝড়ে। বৃষ্টিও পড়ছে। বাজ ডাকছে। তরুণ পীরের মুখ ঢাকা, মেয়ে তো দেখেই ভয় পেয়ে গেছে।—তুমি যেই হও, দোহাই তোমার, মুখ দেখাও—দাতা

না দানো, ভূত না মানুষ, কে আছো এই বিজন তেপান্তরে এমন আজব বেশ-ভূষা নিয়ে! বলুন মাস্টার, ভয় হবে না?

...নিশ্চয় হবে। ঝড়জলের মধ্যে মাঠের ঘরে এক মুখঢাকা মানুষ! তার-পর?

...তরুণ ফকিরের লোভ হল—হয়তো সাধই জাগল। কতদিন স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন নি। নাকি পাপ এল চুপিসাড়ে—এতদিন পরে! মাস্টার, সে কি পাপ?...কে জানে, কী পাপ, কী পুণ্য!...হুঁ। ফকির মুখের ঢাকনা খুললেন। চোখ জ্বলে গেল।...

হঠাৎ ওকে থামতে দেখে বললুম—'তারপর কী হল?'

মরজিনা যেন সলজ্জ গলায় মুখ ফিরিয়ে বলল—'আপনি পুরুষ আমরা স্ত্রীলোক। ঘিয়ের সামনে আগুন। তাহলে কী হয় মাস্টার?'

—'ঘি গলে যায়।'

—'গলে গেল।'

মরজিনাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললুম—'বলো।'

'মেয়ে বললে, তা কি হয়? আমি পরের বউ। তালাক না হলে বিয়ে করি কেমন করে? বাপের বাড়ি যাই। তালাক হোক। তুমি অপেক্ষা করে থাকো আউলের ছেলে, আমি তোমার কাছে আসব।

ফকির বলে, আমার চালচুলো নেই, পথের কাঙাল। তুমি মিথ্যে ধোঁকা দিচ্ছ মেয়ে। আসবে না। মানে, ফকিরের যুবক বয়স। মাথায় খুন চড়েছে। গরম ঘি টবগব করে ফুটছে। তবে সেটা আসল কথা নয়, বাপজান বলে—মাদার শাহ্ সেই মেয়ের চোখে বাতি দেখেছিল। কোন্ বাতি জানেন? দুনিয়া ধ্বংসের পর (রোজ কেয়ামত অর্থাৎ ইহুদিদের ডুম্স্‌ডে) যখন সব আত্মার বিচার হবে, তখন তাদের বলা হবে—চুলের মতো মিহি ধারালো সাঁকো পুলসিরাত পেরিয়ে বেহেশতে যাও। সেই পুলের নীচে দোজখ। দাউদাউ আগুন জ্বলছে। পুণ্যির জোর যায়, সে পেরিয়ে যাবে। যারা পাপী, তারা নীচে পড়ে যাবে। নারীভজা মারফতী মতে বলে, তখন ঘোর আঁধার। পুল পেরোবে—কিন্তু বাতি কই? চেরাগ কই? স্ত্রীলোক হচ্ছে সেই চেরাগ। যদি ইহকালে তাকে কলিজার মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারো, তাকে ভজন-সাধন করে থাকো, তবে তখন সেই আঁধারে বুকের তলার বাতি তোমায় পথ দেখাবে। নারীভজা আউলের এই হল সার কথা।...মাস্টার, সেদিন আপনি কী করবেন—ভেবেছেন?'

—'না ভাবিনি।'...মনে মনে ভাবলুম, কানা দরবেশ বলেছেন, আমিই চেরাগ।

মরজিনা চাপা হাসতে থাকল।...'বাতি দেখে ফকির মজল। তবে সবার চোখে তো বাতি থাকে না। এই যে আমাকে দেখলেন কতক্ষণ, বাতি আছে মনে

হল? কিছু নেই মাস্টার, কিছু নেই। আমার বর বলে, তোর মুখে পাপের আঁধার থমথম করছে শালী বেটি! ঠিকই বলে।’

মুখে বললুম—‘কে জানে! তুমি মাদার ফকিরের কথা বলো মরজিনা।’ কিন্তু মনে মনে বললুম—এই তো তোমার কাছেই এক চেরাগ জ্বলছে, মরজিনা।

...‘ফকির পাগল। আগুনে ঝাঁপ দিলেন। মেয়ের ধারাল নখে ফালা ফালা হয়ে গেল শরীর। রক্তের ধারা দগদগ করতে থাকল। কাপড়চোপড় ফেড়ে গেল। মেয়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদে আর নখের আঁচড়ে কেটে বলে—না, না, না!

...নিষ্পাপ তরুণ রক্ত এক সাধক-পুরুষের। তার স্বাদও পেল সেই মায়াবাঘিনী। সেও শেষ অব্দি অত কাণ্ডের পর মজল। মাস্টার, মেয়েমানুষের রীতিই এরকম। যাবার সময় বলে গেল—অপেক্ষা করে থেকো। আমি আসব। কিন্তু যে একবার চলে যায়, সে তো কালের হাতের ঢেলা, মাস্টার। তার আর ফেরা হয় না। কাল তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে। উল্টোদিকে আসবে কেমন করে? এল না। গানে তাই তো বলে—‘কাল আসি বলে/গেল কালো চলে/সে-কালের আর কত বাকি’। কৃষ্ণের পথ তাকিয়ে রাধা বসে ছিলেন বৃন্দাবনে।’...

‘মরজিনা, এসব তুমি জানো?’

‘কেন, তোমারা শুনিনা নাকি? মরণ আমার!’

‘হুঁ, তারপর?’

‘...রক্তাক্ত শরীরে ফকির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। অপেক্ষা করেন। দিন যায়, দিন চলে যায়—যায় দিন যায় মাস। ছয় ঋতু বছর যায়। আবার এমনি জষ্টি মাস এল। শেষ রবিবার ফি বছর ফকিরের ভর হয়। ওইদিন শিষ্যরা আসে নানা দেশ থেকে। তারা এল। এসে কী দেখল? একটা গাছ—সারা গায়ে কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। গাময় কাঁটা। আর, সেই নখের আঁচড়ের রক্তগুলো হয়েছে ফুল থোকা থোকা লাল ফুল।

‘সেই প্রথম মাদার গাছ জন্মালে দুনিয়া। মাদার শাহ্ রোদ-ঝড়-জলে দাঁড়িয়ে মাঠের পথ তাকাতে-তাকাতে মাদার-গাছ হয়ে গেলেন। হায়, হতভাগিনী মেয়েটা আর এল না!’

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আউলকন্যা বলল—‘দিনে এসে দেখবেন মাদার-গাছে কেমন লাল লাল ফুল ফুটেছে এখন। এখন জষ্টিমাস। আজ সেই শেষ রবিবার। ফুল তো ফুটবেই। শরীলের রক্ত ইশ্কের (প্রেমের কামনার) সুখে ফুল হয়ে ফুটেছে। আর, সারা গায়ে কষ্টের কাঁটা। আমি যখনই তাকিয়ে দেখি, আমার বড় ভয় করে মাস্টার—কী দেখতে কী দেখি। আমার বড্ড ভয় করে!...’

ব্যাপারটা নিছক বৃক্ষপুজা নাকি ভাবছি, হঠাৎ মনে হল একটা কালো কিছু পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরেই বললুম—‘কে?’

—'ভয় পাবেন না স্যার, আমি।'

আবদুল্লা। নিঃশব্দে এইভাবে এসে দাঁড়িয়েছে কখন—অস্বস্তিতে বুক কাঁপল। বললুম—'আরে, এস, এস। মাথা ধরেছিল বড্ড। তাই ফাঁকায় এসে বসলুম। তারপর মরজিনার কাছে মাদারপীরের বিয়ের পরবের কথা জেনে নিচ্ছিলুম। তুমি কি আসরে ছিলে?'

—'নাঃ!' বলে আবদুল্লা বসল আমার পাশে। সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে বলল—'খান।' তারপর অকারণ তার টর্চটা জেবলে নদীর তলা অব্দি ফেলল।

মরজিনা বিরক্ত হয়ে বলল—'আঃ! আলো ভাল্লাগে না।' তারপর উঠে পড়ল।—'আপনারা গল্প করুন। আমি আসরে গান শুনিগে। এবার দু' দলের পাল্লা হবে।'

আবদুল্লা সসম্ভ্রমে বলল—হ্যাঁ। যান, শুনুনগে। ভাল আশয়বিশয় নিয়ে পালা। নারী আর • পুরুষ।'...সে হাসতে থাকল।—'ফকির ফাকরার আজব লীলাখেলা!'

মরজিনা চলে গেল। তারপর বললুম—'আসরে তোমাকে দেখলুম না তখন। কোথায় ছিলে?'

—'গোলমাল আমাকে সয় না, হুজুর। এদিক উদিক ঘুরলাম। আমারও মাথা ধরেছে। ছিলিম টানবেন নাকি? আমি টানব।'

—'নাঃ। থাক্?'

—'তবে আমারও থাক্।' বলে সে পা দুটো ছড়িয়ে একতারাটা রাখল উরুর ওপর। দেশলাই কাঠিটা টর্চের ওপর বাজাতে থাকল। একটু পরে বলল—'মাস্টারজী!'

—'বলো, আবদুল্লা।'

—'এই মেয়েটাকে দেখে আমার এক-জনের কথা মনে পড়ে। চাঁপা নাম। সেকেন্ডা-মুখদুলমগরের রুহুল ফকিরের মেয়ে। রুহুল কানা সেজে ভিখ মাঙতে যেত—চাঁপার হাতে তার লাঠি। গেরস্থবাড়ির খোঁজখবর জেনে নিত। তারপর রাতে বাপবেটি মিলে হানা দিত। বাপ সিঁদ কেটে পথ করে দিত। মেয়ে উদোম হয়ে তেল মেখে ঢুকত। একবার হল কী, রাধারঘাটে এক মিয়ার বাড়ি ঢুকেছে। বর্ষার মাস। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। মিয়ার নাম মোজাম্মেল হোসেন। খুব বড়লোক। বউ মরে আর বিয়েসাদী করেনি। বিকেল থেকে তার বাড়ি আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাচ্ছিল বাপ আর মেয়ে। বাপ মিয়ার দহলিজঘরে শুতে পেয়েছে, মেয়ে পাশেই আছে। খাওয়া-দাওয়া ভালই দিয়েছে মিয়া। তারপর নিশুতি হলে সিঁদ দিয়ে নিজের মূর্তি ধরেছে।'

আবদুল্লা হো হো করে উঠল।—'তারপর বাপ ঘরের কানাচে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েকে সিঁদপথে ঢুকিয়ে। বাপের হাতে মেয়ের কাপড়চোপড়। ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। নেই তো নেই-ই'। মশার কামড়ে রুহুল অস্থিল। এই করে

তো রাত পোহাল। মেয়ে ফিরল না।'

'বল কী!'

'জী হ্যাঁ। অস্তে পস্তে ব্যাটা পালাল। অমন কাণ্ডের পর আর থাকা যায় কি?'...একটু চুপ করে থেকে আবদুল্লা বলল—'মেয়ে এখন সুখেই আছে। তিন চাট্টে বেটাবেটি হয়েছে আল্লার দোয়ায়। মোজাম্মেল হোসেন তাদের ইস্কুলে পড়াচ্ছে। শালাও তো কম ধূর্ত নয়। তেলেতেলে গতর নিয়ে যোবতী মেয়ে উদোম হয়ে সিঁদপথে ঢুকেই পড়বি তো পড়্, সাক্ষাৎ যমের সামনে। শালা সব টের পেয়ে ওঁৎ পেতে ছিল।...'

গল্পটা শুনে আমিও হেসে ফেললুম। 'শ্বশুর জামাইয়ের সম্পর্ক কেমন?'

—'ভাল না। মানে, মিয়ার মান যাবে। তাই গাঁয়ের কানাচে দেখলেই লোক লেলিয়ে দেয়। বুড়ো কেঁদে বেড়ায়। অবশেষে মহাব্যাধি এসে থাবা মারলে শরীলে। দেখবেন, রাধারঘাটের বাজারে গঙ্গায় ধারে বসে আসে। ভিখ মাঙছে। একদিন ওখানেই মরে পড়ে থাকবে। আর মেয়েরও জান বাবা! কী কঠোর জান! বাপটাকে ভুলেই গেল! মাস্টারজী এই হল মেয়েমানুষ।'

একটু পরে বললুম—'অন্যরকম মেয়েমানুষও আছে। তারাই বেশি সংসারে। নয়তো সংসার কবে ধ্বংস হয়ে যেত, আবদুল্লা।'

'কে জানে! আমি দোখনি দেখি না, স্যার।'

সুযোগ পেয়ে বললুম—'কিন্তু রাগ না করলে একটা কথা জিগ্যেস করব তোমাকে?'

—'আমার রাগ হয় না হুজুর। হলে আমি কবে ধ্বংস হয়ে যেতুম।'

—'তোমার নামে কিছু বদনাম শুনেছিলুম।'

আবদুল্লা হাসল না। বলল—'হুঁ। আমার বড় ঘেন্না ধরে যেত দুনিয়াদারীকে। তাই মাঝে মধ্যে খুন জখম করতুম। তা সত্যি। কিন্তু আমি কখনও চুরিডাকাতি করিনি মাস্টারজী, আমার সাঁইয়ের কিরে। আসলে আমাকে ভয় পেত তল্লাটের লোকে। তাই যার কাছে যা চাইতুম, দিত। এখনও দেয়। এই টর্চবাতিটা দিয়েছিল সালারের সাহাবাবু।'

সালার স্টেশনের কাছে সাহা ব্রাদার্সের লোহা-লক্কড় চুন-সুরকি-সিমেণ্টের কারবার আছে দেখেছিলুম। বেশ কয়েকটা ট্রাকেরও মালিক ওরা। তারা আবদুল্লাকে ভয় করে? লোকটার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকালুম। মরজিনার কথা মনে পড়ল এ সময়। বলে ফেললুম—'আবদুল্লা, তুমি নাকি একবার আরও একটা বিচ্ছিরি কেসে পড়েছিলে?'

আবদুল্লা অন্ধকারে নড়ে উঠল। '—শুনেছেন? শুনবেন। আপনিও তো দেশচরা মানুষ। কিন্তু স্যার, সব বিলকুল মিথ্যে। তল্লাটের বড়লোক মিলে চক্রান্ত করেছিল, ব্যাটা বড় শয়তানী করে বেড়াচ্ছে। একে গারদ ঘরে ভরতে

পারলে শান্তি হয়। তখন এক রাত্তিরে আমার ডেরায় পাঠিয়ে দিলে এক খারাপ মেয়েমানুষকে। আপনি নিশ্চয় জানেন স্যার, সালারের ওদিকে এদের উৎপাত আছে ?'

—'হুঁ, শুনেছিলুম।'

—'দেশ স্বাধীনের পর পাড়াটা উচ্ছেদ হয়েছে। সেখানকারই এক মেয়েমানুষ পাঠালে আমার কাছে। আমি জানতে পেরে ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিলুম। অমনি চেঁচামেচি শুরু করলে। লোক ওঁৎ পেতে ছিল। এসে চড়াও হল। একা যুঝতে পারলুম না। খুব মার দিলে শালারা। তারপর থানায় নিয়ে গেল। কেস সাজাল। সে এক কাণ্ড, স্যার।'

—'তাই বলো। শুনে আমার অবাক লেগেছিল।'

আবদুল্লা শান্তভাবে বলল—'আমার গুরুর শিক্ষা, স্ত্রীলোক পায়ের তলার কাঁটা। বিঁধলে উপড়ে ফেলে দাও। রাস্তা তোমার সিধে, সামনে নাক বরাবর। আপনাকে তো বলেইছি। বলিনি হুজুর ?'

—'হুঁ, বলেছ। কিন্তু এমন জীবনে কী পাচ্ছ তুমি, কী পাবার আশা করছ আবদুল্লা ?'

—'আপনি কী পাচ্ছেন, কী পাবার আশা করছেন স্যার ?'

—'কিচ্ছু না। আমি গান ভালবাসি। মানুষ ভালবাসি। মানুষের ভিড়ে ঘুরতে ভালবাসি। তুমিও তো গাইছিলে—"মানুষরতন চিনলি না মন"!'

—'বটে। কিন্তু আমার লক্ষ্য আলাদা।'

—'কী, শুনি ?

—'শুনবেন ?' বলে সে মুখ তুলে পশ্চিমে নদীর পারে আকাশে উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র দেখতে থাকল। তারপর বলল—'শুনলে হাসবেন। কিন্তু যা একজনের কাছে হাসি ; অন্যজনের কাছে কান্না। আমার বয়েস কত হতে পারে বলু তো স্যার ?'

—'কত ? বড় জোর বাইশ-তেইশ। তুমি আমার চেয়ে নিশ্চয় একটু ছোট।'

—'সবেতেই ছোট। আমার বয়েসের হিসেব আমার আছে। দেশ স্বাধীন হবার বছর আমি আঠারোতে পা দিয়েছি। তাহলে আপনার হিসেবেই ঠিক। কিন্তু কেন আমার বয়সের হিসেব আছে, জানেন ? আমার ডেরায় গেলে দেখবেন, ফি বছর জষ্টির রোববারে দেওয়ালে একটা করে খড়ির আঁক দিয়ে রাখি। এবার আগাম দিয়ে এসেছি। বলবেন, এমন কেন ? আমার পালক বাপ শেরজান শাহ্‌ ছিল আমার নিজের বাপের দোস্ত। বাপ চাষীমানুষ। কিন্তু গাঁজা ভাং খেত। দুষ্টু মানুষও ছিল। মাকে মারধর করত। আমার চেহারা মায়ের মতো। শরীল-স্বভাব বাপের মতো। তো, আমার জন্মের দিন শেরজান শাহ্‌ মাদারের বিয়ের পরব থেকে মেঠাই নিয়ে দেখতে গিয়েছিল। বাপ বলত—

শালা ফকির রসগোল্লার রসে মন্তর পড়ে ব্যাটার ঠোঁটে ছুঁইয়েছিল। ব্যাটাটা ভেসে যাবে। তাই হল স্যার। ভেসেই এলুম।'

একটু চুপ করে থাকার পর সে ফের বলতে থাকল—'আজকের দিনে দুপুর-বেলা আমার জম্মো। আমার বয়স যখন ছ' বছর কাঁটায় কাঁটায়, শেরজান শাহ্ আমাকে কাঁধে নিয়ে মাদার পীরের মেলা দেখতে গেল। নিশুতি রেতে ফিরে এলুম। এসে দেখলুম, ঘরে মা নেই। পালিয়েছে। বাপও তার খোঁজে বেরিয়েছে। হুজুর মাস্টারজী, ছ' বছরের ছেলে আজ তেইশে পড়ল—এখনও আমার বাপ ফিরল না, মা'ও ফিরল না। আমি দেশে দেশে ঘুরছি—যদি পেয়ে যাই হঠাৎ। হাওড়া-কলকাতা-মেদিনীপুর, দুমকা, মালদা, পদ্মার পার—কোথায় যাইনে? যাই, খুঁজি। যদি হঠাৎ পেয়ে যাই একজনকেও। মন বলে—বেটা চিনবি তো? চিনতে পারবি তো? আমি বলি—রক্তের টান আবদুল্লা, নাড়িতে একই ধারা বইছে।'...বলতে বলতে সে হঠাৎ নাড়ির কাছটা আলখেল্লার ভেতর হাত ভরে যেন হিংস্র হাতে খামচে ধরল।—'এইখানে। এইখানে বড় যন্তন্না, হুজুর! আমি নাড়ির ঘায়ে কুকুর পাগল, হুজুর! আঃ আহা-হা হা!'

'আবদুল্লা! ও আবদুল্লা!'

আবদুল্লা ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে বলল—'কাঁদিনি স্যার। কাঁদতে কেউ শেখায় নি। এই আওয়াজ দিলে নাড়ির ব্যথার শান্তি হয়। আঃ! আহা-হা-হা!'

কী বলে ওকে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পেলুম না। এই সময় আসরের দিক থেকে গানের আওয়াজ ভেসে এল। কে গলা ছেড়ে তান দিচ্ছে—দমকে দমকে স্বর উঠছে মুদারা থেকে তারা পর্দায়—যেন সত্যি সত্যি কে নাড়ির যন্ত্রণায় হাহাকার করছে। তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালাম।—'চলো আবদুল্লা। এবার গান শোনা যাক্।'

সে আস্তে বলল—'যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি। ছিলিম টানব—হেঁঃ হেঁঃ!'

টেনে টেনে হাসল সে। যেন যন্ত্রণাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। আমি চলে গেলুম। কে জানে কেন, মনে হচ্ছিল—আমার এক্ষুনি কোন একটা শক্ত অবলম্বন দরকার। না হলে পা যে ভাবে টলমল করছে, পড়ে যাব—আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারব না। এ কোন জগতে এসে পড়েছি হঠাৎ?

সবে চার-পাঁচ পা হেঁটেছি, মনে হল কেউ দাঁড়িয়েছিল, হন হন করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। ঝোপের ও পাশে আসরের আলো এসে পড়েছে। তাই মূর্তিটা আলোর এলাকায় পৌঁছতেই চিনলুম। মরজিনা!

মরজিনা তা হলে এতক্ষণ লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিল? কেন? সে কি আমাদের আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিগ্ধ? তাই হবে। দেশচরা মেয়ে। পুরুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আছে। অবিশ্বাস তাই থাকার কথা। আড়ালে

থেকে সম্ভবত যাচাই করছিল দুজন আগন্তুক মানুষকে। তা ছাড়া ধূর্ত কানা দরবেশকে সে যতই তখন রাগের ঝোঁকে অগ্রাহ্য করুক, সংস্কারবশে মানতে বাধ্য। দরবেশ আমাকে বলেছেন, 'তোমার তলায় অন্ধকার আছে' এবং 'এক রাতে ওলট পালট হয়ে যায়।' মরজিনা তাই যেন অস্বস্তিতে সন্দেহে ভেতর-ভেতর ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ মনে হল, তাহলে কি আমাকে যাচাই করতেই সে অমন চলে এল নদীর ধারে নির্জনে অন্ধকারে? ভাগ্যিস, আমি বেফাঁস কিছু বলে ফেলিনি।...

তখন আসর জমজমাট। এক বুড়ো আউল একতারা শূন্যে তুলে পিড়িং পিড়িং করতে করতে মাঝে মাঝে কানের সঙ্গে চেপে ধরছে, যেন সুরের খুব ভেতরকার জিনিসগুলো নিয়ে নিচ্ছে—খরগোস যেমন করে পাকা তরমুজের শাঁস কুরেকুরে খায় এবং বুড়োর মুখটা টলটলে রসে পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটোর দৃষ্টি নিজের দু ভুরুর মধ্যিখানে—তারা দুটো আধখানা হয়ে ওপরকার পাপড়ির তলায় ঢুকেছে। তার পাকা চুল ঢেকে মস্তো লাল রেশমী 'তাজ' অর্থাৎ উষ্ণীষ। ওরা 'বাতন' বা অপ্রকাশ্য ভাব জগতের বাদশাহ কিনা, তাই ওই 'তাজ'। ঝিলমিল করছে তাজের গায়ে জরির কাজ। বাঁ হাতে ডুবকিটা পেটের কাছে প্রায় ঢোকানো—হঠাৎ গুবগুব করে আওয়াজ না তুললে টেরই পেতুম না।

সে আচমকা লাফিয়ে তান ধরলঃ হা-হা-হা-হা...আ-আ-আ-আ... উ-রি-রি-রি-রি...তা-না-মা-না...না-আ-আ-আ...এবং তারপর নীচের দিকে কাকে কটাক্ষ হেনে একই সুরে বলে উঠল, 'বোলো না, বোলো না, বোলো না। সাধু অমন কথা বোলো না!' তরপর ওই কথাগুলো যেন একতারাটাই বলছে এ ভাবে সে একতারাটা বসে থাকা এক আউলের কানের কাছে নামিয়ে বারকতক বাজিয়ে দিল। এ বেশ রসের কারবার। সামনা-সামনি না থাকলে স্বাদ পাওয়া যায় না। মুখ তুলে দেখল না আমাকে। আন্দাজ তিন গজ লম্বা তিন গজ চওড়া আসর ঘিরে ফকিরের ঝাঁক মৌমাছির মতো হুল বাগিয়ে বসে আছে। কে আমার হাত ধরে টানল। দেখি, মদনচাঁদ। সরে জায়গা দিল বুড়ো। কানে কানে বলল, 'আমার বেটাকে কোথা রেখে এলেন?' জবাব দিলুম, 'নদীর ধারে ছিলিম টানছে।' কিন্তু মেয়ের কথা বুড়ো জিগ্যেস করল না।

আসর গাঁজার ধোঁয়াল নীল। কুয়াশার পর্দায় রহস্যময় কাণ্ডকারখানা চলছে যেন। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত ছিলিম সামনে কেউ ধরল, 'হুজুর সেবা করুন।' দেখি, প্রথমে দেখা সেই প্রৌঢ় ঢ্যাঙা ফকির। তক্ষুনি দম কষে ফেরত দিলুম। কাসতে থাকলুম বেমক্কা। তালকাটা বা রসভঙ্গের ভয়ে মুখে হাত রেখেই বসলুম। তারপর আমি ভেসে চলেছি সেই 'বাতন'লোকের জগতে, অবলম্বনহীন। নক্ষত্র ছাড়িয়ে ছায়া-পথ পেরিয়ে কতদূর—কতদূর! দেখছি, হাজার হাজার আউল চুল দাড়ি একতারা ঘুঙুর ডুবকি নিয়ে চোখে ঝিলিক

দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে চার পাশে।

পালাকার ফকির তখন গান ধরেছে ;

...বাবা আদম খেয়ে গন্দম
পড়েছেন ফাঁপরে ॥'

হুঁ, আবদুল্লা বলছিল, আসরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়' নারী পুরুষ। এ বুড়ো তাহলে পুরুষপক্ষ। নারীদ্বেষী আউল। নারী নরকের দ্বার। নারী সাধনা পথের কাঁটা। সে এ কথা বোঝাতেই কোরানের (বাইবেলেরও) সৃষ্টি-তত্ত্ব পেশ করছে। গন্দম বা নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবার প্ররোচনা দিয়েছিল 'হাওয়াবিবি' অর্থাৎ হবা। ইভ। ফকিরের বক্তব্য'—ওই বৃক্ষের ফল খাওয়ামাত্র আদম নিজেদের নগ্ন দেখলেন—চোখ খুলে গেল। আ ছি ছি! জিভ কাটল ফকির। বুড়োর সে কি ঢঙ? যেন সত্যি ন্যাংটা সে, এমনি ভঙ্গীতে এক-তারা-ডুবকিটা দু হাতে নিজের তলপেটে চেপে ধরে এক পা অন্য পায়ের ওপর কাটাকুটি করে কুঁজো হল একটু—কি না, শরমে বাঁচে না। ভিড় হাসতে থাকল। তারপর তড়াক করে লাফ দিয়ে মুখে এবং একতারায় আওয়াজ দিলঃ 'ন্যাংটা ন্যাংটা ন্যাংটা ন্যাংটা! আমরা সবাই ন্যাংটা। ওরে সোনারা, ওরে মাণিকরা! তাকিয়ে দ্যাখ্, তাকিয়ে দ্যাখ্, ওরে বাছা, এলুম ন্যাংটা, আছি ন্যাংটা, যাব ন্যাংটা তা হলে আর কথা কী?'

এই সঙ্গে কান্নার ঢঙে ফকির সুর ধরলঃ

'সুখে ছিলাম ভালই ছিলাম,
চিলোকেতে (স্ত্রীলোকেতে) ন্যাংটা করে,
বাবা আদম খেয়ে গন্দম,
পড়েছেন ফাঁপরে ॥'

তারপর তার ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে কানে তালা ধরে গেল।...মূর্খ সাধু! ধিক্ ধিক্ শত ধিক্! ডুবকিতে বোলও উঠলঃ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্! ওরে ওরে সাধুর ব্যাটা মহাসাধু! কাল তোকে দংশাল। বিষের জ্বালায় তুই জ্বলে মরলি। পড়ে রইল তোর সাধন ভজন বন্দেগী, পড়ে রইল বেহেশতের বাগবাগিচা, তুই জ্বলতে জ্বলতে আড়াল-আবডাল খুঁজে বেড়াচ্ছিস! কেন? না—কাম। তোর চোখে কাম। আরে ছি, ছি, ছি! ওয়াক থুঃ! শুধু তো সম্বল ওই সাড়ে তিন হাত একখানা শরীল! তুলতে ফেলতে মড়া। তা বাদে তোর সম্বল নাই ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্! এবং ফের গান গেয়ে উঠল সেঃ

'ছয় দোষেতে মিলে মিশে,
ওই দেহতে বসত করে ॥
বাবা আদম খেয়ে গন্দম,
পড়েছেন ফাঁপরে ॥'

এই ছয় দোষ হল ঃ কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ ও মাৎসর্য। নিতান্ত হিন্দুতত্ত্ব।

আসর জমজমাট করে সে বসে পড়ল। মুখে জয়ের হাসি। ক'জন নারী-দ্বেষী ফকির তাকে তালপাখার হাওয়া দিতে থাকল। একজন তৈরী ছিলিম বাগিয়ে ধরল সামনে—ডান-হাতের দু-আঙুলে ছিলিমটা ধরা, বাঁ হাতের মুঠো ডান হাতের কনুইয়ে ঠেকানো। তার মানে সম্ভ্রম জানাতে দুহাত ব্যবহারই রীতি, কিন্তু যেহেতু বাঁহাতে শৌচকর্ম করে বলে সতত অশুচি, তাই ওই ব্যবস্থা। প্রশান্ত হেসে ঘামেজেভা মুখে বুড়ো ছিলিম টানতে থাকল।

এবার উঠল সেই ঢ্যাঙা প্রৌঢ় ফকির। বুঝলুম প্রতিদ্বন্দ্বী নারীভজা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। আসরে দাঁড়িয়েই সে একতারা ডুবকিসহ দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে বলল, 'বাঃ বাঃ! বাঃ রে বাঃ! বাহা বাহা বাহবা! নানা ভঙ্গী ও কায়দা দেখিয়ে মাজা দুলিয়ে নাচন কোঁদন করে সে সটান ধুয়ো ধরে ফেলল ঃ

কালনাগিনীর মাথার মণি চেরাগ জেবলেছে।
সেই চেরাগে আন্ধারো ঘর আলো হয়েছে॥...

গানটা শোনা মনে হল। প্রৌঢ় আউল গান ছেড়ে রীতি অনুসারে মাঝে মাঝে কথায় যুক্তি দাঁড় করাচ্ছিল। কখনও নতুন গান ঢুকিয়ে দিচ্ছিল সে। মূল গানের মধ্যে কতকটা একই সুরের অন্য গান।

কুদরতের জাহেরবাতন।
কে বুঝিতে পারে॥'

তারপর ফের গান ছেড়ে প্রেমিকের মিষ্টি চোখে তাকিয়ে (তার চোখদুটো বড় সুন্দর) কথায় বলল, 'কী বলছিল গো বুড়ো খোকা?' (আসরে হাসির ঝড় অমনি) কাম! হুঁ—কাম। কিন্তু মাণিকরা, সোনারা, আমি বলি—তা না, তা না। না না না না। কাম্ না, কাম্ না কাম্ না,—কামোনা! (কামনা) ওরে গাড়োল, তুই নাদান—তুই কি বুঝবি কামোনার গুহ্যকথা?'...

হঠাৎ আমাকেই দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'এই তো এখানে আছেন এক ছিক্ষিত পণ্ডিত বেক্তি। পুছ করে দ্যাখ, কামোনা কারে বলে। বন্ন পরিচয়খানা খুলে দেখলেই পাবি—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কেতাব। স্বরে অ স্বরে আ। কয়ে আকার ময়ে ওকার দন্তনয়ে আকার।'

বুঝলুম, এ ফকির ফকির-মহলের 'ছিক্ষিত বেক্তি।' পাঠশালায় পড়েছিল নির্ঘাত! সে আমায় নীরবতায় সায় পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বলল, 'কামোনা হল কি না ইশ্‌ক! ইশ্‌কের আগুনই বলো, বিষই বলো, এই দেলের (মনের) মধ্যেতে জ্বলছে। বাবা সকল, খোদারও কি জ্বলে নি? না, যদি জ্বলল, তবে কেন এই কুল-মখলুকাৎ (তাবৎ সৃষ্টি) হল? কেন খোদা সেরা সাধক আজাজিল ফেরেশতাকে (দেবদূতকে) ডেকে বললেন—আমি আদম গড়ব। ও আজাজিল, তুমি আমাকে মাটি এনে দাও!' তারপর ফের গান ঃ

'শম্‌শম্‌ বিলের কাদা এনে,
আজাজিল তার মাটি ছানে॥...

...'এরপর খোদা আদমের মাটির মূর্তির নাকে নিজের পবিত্র সত্তার এক চিল্‌তে ফুঁ ভরে দিলেন। আদম হাঁচলেন। ব্যস, কাম ফতে। দম চলাচল শুরু হল। খোদার আদরে সাঁকো বাঁধা হল। সেই সাঁকো দুনিয়ায় এসে হারিয়ে ফেলল মানুষ।

'...ওদিকে কিন্তু আদম একা। একা না বোকা! দোকা চাই গো, এক্ষুনি চাই।...

আদমের কাঁদন শুনে,
বাঁদিকের পাঁজর ভেঙে,
গোস্ত থেকে দিলেন হাওয়া গড়ে॥
কুদরতের জাহের-বাতন,
কে বুঝিতে পারে॥'

আবার জমে উঠল আসর। কিন্তু নেশায় শরীর ঝিমঝিম করছে, শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে। নাঃ ছিলিম টানা আমার পোষায় না। উসখুস করছি, আসর থেকে বেরিয়ে কোন দোকানে শোয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না। একজন চেনা মনোহারিওলাকে লক্ষ্য করেছিলুম। লোভ বেড়ে গেল তার কথা মনে পড়ে। উঠে এলুম বাইরে। কেউ বাধা দিল না। সবাই মৌজ হয়ে রয়েছে।

বেরিয়ে প্রথমে মরজিনাকে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। তারপর আবদুল্লার কথা মনে পড়ল। সে কি এখনও বাঁধে বসে রয়েছে? তার কথা মনে পড়তেই আর মনোহারির দোকানে গেলুম না। ঝোপঝাড় পেরিয়ে বাঁধে চলে গেলুম। ফাঁকা বাতাসে বসলে নেশাটা কাটতে পারে।

কিন্তু কোথায় আবদুল্লা? তাকে না দেখতেই আচমকা সাপের ভয় হল। কাঁপতে কাঁপতে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন করে প্রায় লাফ দিতে দিতে আবার আলোয় এসে বাঁচি।

মনোহারিওলার দোকানটা উঁকি মেরে দেখেই বুঝলুম, জায়গা হবে না। লোকটা নিজেই হাত পা কুঁকড়ে শুয়েছে একটুখানি ফাঁকা জায়গায়—তার চারিদিকে জিনিসপত্তর। পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

মরজিনাই। বা কোথায়? মেয়েদের ভিড়ে সে নেই। মেয়েরা প্রায় সবাই চাষী-মজুর মুসলিম বাড়ির—চাদর মুড়ি দিয়ে বসে গান শুনছে। মরজিনা আর যাই করুক, চাদর মুড়ি দেবে না। তা হলে কি কানা দরবেশের কাছে মাফ চাইতে গেল সে?

মেলা ঘুরে সেই দরগায় গেলুম। ফটক দিয়ে উঁকি মেরে শুধু কানা দরবেশকে দেখা গেল। সে বসে-বসে দুলছে। ঠোঁট কাঁপছে। মালা জপছে।

ফিরে আসছি, হঠাৎ চাপা কথা-বার্তার শব্দ কানে এল। শব্দ লক্ষ্য করে এগোলুম। ওই যে বলেছিল, মনে পাপ—চেরাগের তলায় অন্ধকার। বুক কাঁপল। কী দেখবার আশা করছি। বড় বড় গাছ আছে এদিকটায়। তলায় তাই কোন ঝোপ গজায় নি। একেবারে নগ্ন মাটি। ইটের টুকরোয় হোঁচট খাচ্ছি। ও পাশে বিলাঞ্চল—কী একটা পাখি ডাকছে ট্রি ট্রি ট্রি... ট্রি ট্রি ট্রি। অনেকদূরে কোথায় আগুন জ্বগজ্বগ করছে। সম্ভবত গয়লাদের গরুমোষ চরাবার বাথানে।

গাছের ওপাশে বসে আছে দুটি মানুষ। কী ভাবে বসে আছে, অন্ধকারে বোঝা যায় না। কিন্তু তারা চাপা গলায় কথা বলছে।

আলতো খিলখিল হাসিটা অন্ধকারে ফুল খসে পড়ার মতো ব্যাপার ঘটাল। ও হাসি মরজিনার। পুরুষ-কণ্ঠে আওয়াজ শোনা গেল, 'হাসির কথা না। আপনি হাসবেন না।' সর্বনাশ! এ যে আবদুল্লা!...

—'আউলের ছেলে, আমাকে আপনি-টাপনি করা কেন, শুনি?'

—'ভয়ে, নাকি ভক্তিতে।'

—'আমার মরণ! আমি সামান্য মেয়ে। ভিখ মেঙে খেয়ে এত বড়টা হয়েছি।'

—'আমি তারও অধম।'

—'আউলের ছেলে!'

—'জী!'

ফের খিলখিল হাসি।—'জী-আপনি ছাড়া আর বুলি শেখা নেই নাকি? মরণ, মরণ!'

—'আপনাকে আমার বড় ডর লাগে মরজিনা, আপনি চলে যান।'

—'তাড়িয়ে দিচ্ছ আউলের ছেলে?'

'জী না। আপনি বউমানুষ। আমি পরপুরুষ।'

টের পেলুম মরজিনা উঠল। আড়ালে ঘন হলুম। সে যখন হন হন করে এগিয়ে দরগার ফটকে গেল, তখন থানের একচিলতে আলোয় তাকে দেখতে পেলুম। তারপর তাকে আরও ভাল করে দেখার জন্যে পা বাড়াতেই আচমকা আবদুল্লার টর্চ আমাকে ধরে ফেলল।

আবদুল্লা কিন্তু চমকাল না।—'মাস্টারজী নাকি?' বলে সে এগিয়ে এল এবং আলো নিবিয়ে দিল। তারপর বলল, 'মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। কথা আছে বলে ডেকে এনে আবোলতাবোল পুছ্ করে। বুঝি না। চলুন, আলোয় যাই।'

কোন কথা না বলে ওর সঙ্গে হাঁটতে থাকলুম। ফটকের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখি, মরজিনা কানা দরবেশের পায়ের ওপর মাথা গুঁজে পড়ে আছে। পিঠটা কাঁপছে। দরবেশ তার পিঠে মালাসুদ্ধ হাতটা বুলোচ্ছেন।

এবার বললুম, 'মরজিনার কী হল, বলতে পারো আবদুল্লা?'

আবদুল্লা চাপা হেসে মাথা দোলাল। পা বাড়িয়ে বলল, 'ভেবেছিলুম, এখানে দুটো দিন কাটিয়ে যাব—হবে না। মাটি বড় পিছল, হুজুর। পা টলছে। সাঁইয়ের ইচ্ছে।...'

আবদুল্লা গানের আসরে ঢুকল না। আমার হাত ধরে টেনে মেলার শেষদিকে এগোল। এতক্ষণে টের পেলুম, তার এই আচরণ অস্বাভাবিক। ট্রেনে সে বলেছিল ইন্দ্রায় মাদারের বিয়ের মেলায় আসছে। অথচ এ তার কেমন আসা? আউল ফকির এসে দলে ভিড়বে। নাচবে কুঁদবে গাইবে। নিজেদের গোষ্ঠীতে পালায় পরবের সুযোগে এমন মেলামেশা অনেকবার চোখে পড়েছে আমার। এতে একলা চলার কষ্টটা ঘুচে যায়। কাটোয়া-আমোদপুর ছোট লাইনে বোরেগীতলার হিন্দু বাউলদের মেলাও আমি দেখেছি। তখন সব বাউল-বাউলনী জোট বেঁধে গোষ্ঠীসুখে বুঁদ হয়ে থাকে। দেখেছি বাবাজীতলার আখড়ায় ঝুলনপূর্ণিমায় শয়ে শয়ে বাউলবোষ্টম সঙ্গিনী নিয়ে হই হই করছে। বাউল হোক, কিংবা আউল হোক, একই পথের পথিক সব। রীতিনীতি একই রকম। ছিলিম, নাচগান, লাল চোখের ঝিলিক, মন খোলা বিশুদ্ধ হাসি নিয়ে 'ভাবের বাগানে হরেক/ফুল ফুটিয়া ম' ম' করে। সেই ভাবেতে ভাব লাগায়ে/ ক্ষ্যাপা মোন/ও ক্ষ্যাপা মোন হাত পা ছোড়ে॥'

কিন্তু আবদুল্লার মুখটা গম্ভীর। ভাবের বাগানের ম' ম' করা ফুলের গন্ধ ওকে আবিষ্ট করছে না। ওর মনে ক্ষ্যাপামি জাগেনি। ও হাত পা ছুঁড়ছে না। আড়ষ্ট ভারি একটা শরীর টেনে নিয়ে ঘুরছে। উদ্দেশ্যহীন।

একটা খোলামেলা পানবিড়ির দোকানের পিছনে ফাঁকা জায়গা খানিকটা। সেখানে একটা গরুর গাড়ি দেখা গেল। গাড়িতে ছই রয়েছে। চাকায় দুটো প্রকাণ্ড বলদ বাঁধা। বলদ দুটো বসে আবছা অন্ধকারে জাবর কাটছে। কখনো আলোর দিকে ঘুরলে তাদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠছে। ভয়ংকর নীল সেই উজ্জ্বলতা। চমকে ওঠার মতো।

গাড়িতে কারা বসে আছে। মোড়ল মাতব্বরগোছের মানুষ নিশ্চয়। হয়তো পীরের থানে মানত দিতে এসেছে, নয়তো স্রেফ গান শুনতে। এ ধরনের লোক কিন্তু ছিলিম মাহাত্ম্যও বোঝে দেখেছি।

কিন্তু কোথায় চলেছে আবদুল্লা? আবার নদীর ধারে ধারে বাঁধে গিয়ে বসতে চায়? জিগ্যেস করতে যাচ্ছে হঠাৎ গরুর গাড়ি থেকে হেঁড়ে গলায় কে

হেসে উঠল। তারপর বলল, 'বাঃ বাঃ! ভালো, ভালো!' এবং তক্ষুনি কবিয়ালী ছড়ার সুরে : 'আকাশে উড়লে কী হবে/শকুনের, চক্ষু থাকে ভাগাড় পানে॥ আসুন, আসুন, আসুন ওস্তাদজী। আসতে আজ্ঞা হোক।'

কাছে গিয়ে দেখি, হরিণমারার আবুল মহাজন। ধবধবে সাদা ধুতি পরনে, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী আর গলায় সোনার চেনপরা এই বেয়াল্লিশ-বছরের লোকটির হাতে বন্দুকও দেখেছি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট (তখন অঞ্চলপ্রধান নামটা চালু করা হয়নি)। যাত্রার দলে পার্টিও করে। পঞ্চায়েতী চুয়াল্লিশ বছরের লোকটির হাতে বন্দুকও দেখেছি। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট (তখন অঞ্চলপ্রধান নামটা চালু করা হয়নি)। যাত্রার দলে পার্টও করে। পঞ্চায়েতী বিচারে আসামীকে জরিমানাও করে। সব সময় পান খায়। আমাকে বলেছিল, আপনার মতো অতটা পাস দিইনি। ক্লাস সেভেনে পড়া ছেড়েছি। যা শিখেছি, সম্পত্তি রাখতে ওই যথেষ্ট।'

বললুম, 'আরে, মহাজন সাহেব যে! আপনি এখানে?'

আবুল মহাজন ছইয়ের সামনে থেকে নেমে মুখোমুখি হল। একই পোষাক। পিঠে বন্দুকটিও আছে নিয়মমতো। বলল, 'রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন নবরত্ন। সেই রত্নের দুই রত্ন আনতে গিয়েছিলুম কাপাসী স্টেশনে। ইন্দ্রায় নদী পেরিয়ে দেখি এলাহি কারবার। এনারা বললেন, গাড়ি থামান প্রেসিডেণ্ট সাহেব। কিঞ্চিৎ গান শুনে যাই। আমারও খেয়াল হল। ব্যস। শেষ রাতে ফের রওনা দেব বিলের পথে।'

কাপাসী স্টেশন থেকে হরিণমারা দশ মাইলের কম নয়। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। খরায় মাঠের আল কেটে জমির ওপর গাড়ি যাতায়াত করে। ওদিকে বিলও শুকিয়ে যায় অনেকটা। উলুব্যানাকাশের জঙ্গলে দুটো চাকার ঘষটানিতে দু ফালি টানা দাগ জেগে ওঠে। ওটাই তখন চলাচলের রাস্তা।

বললুম, 'নবরত্নের দুই রত্ন! তার মানে?'

আবুল মহাজন গাড়ির দিকে ঘুরে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর তলা থেকে দম কমানো হেরিকেনটা বের করল। দম বাড়িয়ে বলল, 'স্বচক্ষে দেখে চিনুন। চিনতে পারছেন?'

চিনলুম। মহাজন ঠিকই বলেছে। সাগরদীঘি এলাকার জীনাদিঘী গ্রামের সারাবাংলাখ্যাত কবিয়াল শেখ গোমহানী দেওয়ান আর তাঁর বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল প্রখ্যাত লম্বোদর চক্রবর্তী হাঁটু দুমড়ে বসে আছেন। দুই প্রৌঢ় চারণকবির আসর মানে সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। আমি কপালে হাত তুলে দুজনকেই আদাব দিলুম। ওঁরা মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'আদাব, আদাব।' এই মানুষ দুটির বিনয়ের তুলনা নেই, তা জানি। মনে হঠাৎ হওয়া ঘুরে গেল। চলে যাব নাকি মহাজনের সঙ্গে? কবিগান শোনা মন্দ হবে না—বিশেষ করে এই দুই শ্রেষ্ঠ রথীর লড়াই দেখা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

আবদুল্লা কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও ঘুরে কবিয়ালদের দেখতে থাকল। লম্বোদরবাবু বললেন, 'বাবাজীবনের নাম ?'

নামটা বলে দিল আবুল মহাজন। সেই সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় অন্যান্য খবরাখবর। শুনে প্রৌঢ় লম্বোদর কবিয়াল হাসতে হাসতে বললেন, 'কাব্যে আছেঃ "সিরাজের সেই প্রিয়া যদি মুগ্ধ করে মোর হিয়াকে/তাহার লাগি দিতে পারি সমরখন্দ বোখারাকে॥" বাবাজীবন নিশ্চয় হাফিজ পড়েছেন ? বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের তর্জমা।'

একটু অবাক না হয়ে পারা যায় না। ইনি এ সব পড়েন-টড়েন তা হলে! পরে বুঝেছিলুম, শিক্ষিত-জনেরা যাই ভাবুন—গ্রাম্য কবিয়াল নিজেদের যথার্থ কবি বলেই মনে করেন। কেন মনে করবেন না ? শেখ গোমহানী যখন গেয়ে ওঠেন, 'আমার বুকের রক্তে হোক্ মা তোমার পায়ের আলপনা', তখন তাঁকে কবি না ভাবার কারণ নেই। ক' বছর আগে কলকাতায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মঞ্চে শেখ গোমহানীকে যে পদ বানিয়ে গাইতে শুনেছিলুম, চারণ-কবির খাঁটি কবিত্বে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। সম্ভবত ঔপন্যাসিক তারাশংকরও মঞ্চে ছিলেন তখন।

থাক ও সব কথা। ইন্দ্রার মাঠে ফকির বাউলের মেলায়, এই আলো-অন্ধকারে, রহস্যময় নিসর্গে, ওই দুটি মানুষ আর এই আবুল মহাজনকে দেখে তাক লেগে গিয়েছিল। মহাজন আরও জানাল, হরিণমারার খেলার মাঠে কৃষি প্রদর্শনীর মেলা বসেছে। নতুন ব্লক অফিস হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে এই আয়োজন। মহাজনের সব ব্যাপারেই জাঁকজমক। কবিগান দিতে হবে। তো কবির কবি সেরা-কবি'দের আসরে হাজির করা চাই। এবং নিজেই আনতে গেছে গাড়ি নিয়ে। একা মানুষ। বড় সংসার। এখানে রাতকাটানো মানে, এতক্ষণ বাড়িতে ডাকাতি হল কি না—সেই উৎকণ্ঠায় থাকা। অথচ 'মহাকবিরা' বলেছেন আউলদের গান শুনবেন। তাই উপায় কী ?...

কবিয়ালদ্বয় গানের দিকেই কান করে আছেন। তাই ওঁদের বিরক্ত করা ঠিক নয়। মহাজনের হাত ধরে এক পাশে সরে গেলুম। সে পানজাবির পকেট থেকে একটা দামী সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে বলল, 'খান।' তারপর হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক তিনটেয় রওনা দেব। এখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। যাবেন নাকি ওস্তাদজী ?'

ও আমাকে ওস্তাদ বলে, ওটা তামাশা। আর, তখন তো আমি গ্রাম-ভারতের বনেদী ফোক কালচারে বুঁদ হয়ে কাটাচ্ছি, ওস্তাদ শুনতে মন্দ লাগে না। ওদিকে দেশজুড়েও তখন শিক্ষিত পন্ডিত মিলে খুব ফোক ফোক করছেন। না—শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। শহরের মঞ্চে হঠাৎ ফোকের দাপট বেড়ে গেছে। স্বাধীনতার পর ঘরের বুনিয়াদ হাতড়ানোর ঝোঁক বেড়েছে।

মহাজনের আমন্ত্রণের জবাব দিতে যাচ্ছি, দেখি—আবদুল্লা হনহন করে

অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। মহাজন বলল, 'জুড়িদারটিকে চেনা বলে মনে হল। কী নাম বলুন তো?'

—'আবদুল্লা ফকির। সালার এলাকায় ডেরা।'

—'সালার-তালিবপুরের সেই আবদুল্লা গুন্ডা? বলেন কি?' মহাজন চমকে উঠে অন্ধকারের দিকে জ্বল-জ্বল চোখে তাকাল।

বললুম, 'গুন্ডা! ওকে আপনি চেনেন নাকি?'

মহাজন চাপা গলায় বলল, 'কী সর্বনাশ! আপনি ওর সঙ্গে ঘুরছেন? দেখবেন, আপনাকে ন্যাংটো করে সব কেড়ে নিয়ে পালাবে। আরে আপনি জানেন না, আমার গাঁয়ে গিয়ে কমাস আগে গুন্ডামি করে এসেছে।'

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তা হলে কি আবদুল্লাকে আমি চিনতে পারছিনে? বললুম, 'বয়স কম। স্বাস্থ্য ভাল। তা ছাড়া ও তো জাত-ফকির নয়—চাষার ছেলে। তাই হয়তো রক্ত চড়ে থাকে মাথায়। যাক্ গে, ওসব তুচ্ছ লোকের দিকে আপনার মতো মানুষের চোখ না থাকাই ভাল।'

মহাজন মেনে নিল কথাটা। 'তা হয়তো ঠিকই বলছেন। হুঁ, সিগ্রেটটা যে জ্বাললেন না! নিন!'...বলে সে একটা লাইটার বের করে হাওয়া বাঁচিয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে দিল। নিজেরটাও ধরাল। কিন্তু আবদুল্লা যেদিকে গেছে, দৃষ্টিটা সেদিকে মাঝে মাঝে ফেলতে থাকল। মহাজনের চাপা উত্তেজনা বেশ আঁচ করতে পারছিলুম।

এই সময় আসরের দিকে একটু চাঞ্চল্য চোখে পড়ল। দেখি, মরজিনা কানা দরবেশের ময়ূরমুখো লাঠিটা ধরে তাকে আসরে নিয়ে যাচ্ছে। ফকিররা গান থামিয়ে হঠাৎ সেই জিগির (নাদ) হাঁকতে শুরু করেছেঃ দম্ দম্ মাদার! দম্ দম্ মাদার! দম্! মুহূর্তে আবহাওয়া বদলে গেল। আবার সেই অশরীরী অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব ঘটল যেন এই অরণ্য-প্রান্তরে। তারপর কানা দরবেশ আসরে বসলে সেই সমবেত গর্জনটা থেমে গেল। কিন্তু এবার দর-বেশের অন্য মূর্তি। ওর গলায় একটা মড়ার মাথা ঝুলছে। সোজা হয়ে সে বসে আছে। দু হাত বুকে বাঁধা। মুখটা উঁচু। ঠোঁট কাঁপছে। ওদিকে মরজিনা তখন আসর থেকে বেরিয়ে আসছে। আমার মনে হল, বাঘিনী যেন এপাশে ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে হরিণের পালের মধ্যে দিয়ে আসছে। সারা আসর আর মেলা ঘোর স্তব্ধ। কী হয় কী হয় এমন একটা মুহূর্ত গোনার আবহাওয়া যেন।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। দরবেশ আচমকা এক হাঁক ছাড়ল। পিলে চমকানো আওয়াজ। রাতের স্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে গেল ওই চেরা গলার চিৎকারে। সম্ভবত আনাল্ হক্ (অর্থাৎ আমিই সত্য, তাই আমিই ঈশ্বর) কথাটাই সে উচ্চারণ করল। কিন্তু 'হক্' শব্দটা 'হাক' অথবা 'হাঁ—আ—আক্' হয়ে উচ্চারিত হল। তারপর একটা ঢোল বেজে উঠল গুড় গুড় গুড় গুড়...

গুম্ গুমা…গুম্ গুমা…গুম্ গুমা…গুম্ গুমা! তারপর একসঙ্গে কয়েকশো একতারা বেজে উঠল। সে এক আজব ঝংকার। হাজার হাজার, নাকি লক্ষকোটি ভোমরা একসঙ্গে গুঞ্জন করছে বিরাট বাগানে—যেখানে লক্ষকোটি ফুল ফুটেছে নিষুতি রাতে। ওই ঝংকারের মধ্যে ধীরে জেগে উঠল একটা মিহি—অতি মিহি কণ্ঠস্বর, তারসপ্তকের শেষ স্বর থেকে নেমে আসছে সেটা, ধীরে, মন্দ্রসপ্তকের দিকে, এবং মনে হচ্ছে এই স্বরাবোরহ সম্পূর্ণ হতে শুধু এই রাত নয়—আরও দিন মাস ঋতু বছর এবং গোটা জীবনটাই কেটে যাবে। কাঁপতে কাঁপতে সেই অবরোহণ ঘটছে। যেন অতীন্দ্রিয় ভাব জগত থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জগতের বাস্তবে নেমে আসছে কোন এক শক্তি অথবা সত্তা। বিমূর্ত হতে চলেছে মূর্ত। চর্যাপদের 'নিলয় না-জানা' হরিণী বুঝি সতর্ক পা ফেলে-ফেলে এই অরণ্যে এসে দাঁড়াবে—বড় চঞ্চল তার দুটি পিঙ্গল চোখ আর সোনালি শরীর। তার প্রতীক্ষায়ই এই মুহূর্ত গোনা শুরু হয়েছে।…

আমি অভিভূত হয়ে বলে উঠলুম—'বাঃ!' কিন্তু আবুল খিক খিক করে চাপা হাসল। তখন বললুম—'কী হল? হাসছেন যে?'

—'আপনার চোখ আছে। থাকবে না? আর্টিস্ট মানুষ আপনি।'

—'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি আর্ট। আর, আপনিও তো আর্টিস্ট, মহাজন সাহেব।'

মহাজন চতুর হেসে বলল—'এ বয়সে আর অমন আর্টিস্ট হওয়া মানায় না ওস্তাদজী। আপনার মানায়। তরুণ বয়স। এই থ্যাঁদানেকো চুলপাকা আবু হোসনের রসের নাল গড়িয়ে আর কী হবে?'

ওর কথার লক্ষ্য কী, এতক্ষণে টের পেলুম। ওর চোখ মরজিনার দিকে। মুহূর্তে লোকটাকে ঘেন্না হল। ও এই আশ্চর্য অশরীরী ও সংগীতময় আবহাওয়ার বাইরে দাঁড়িয়ে রক্তমাংসের হিসেব কষছে। ওর বংশগত পদবী মহাজন। নিশ্চয় ওদের সুদের কারবার ছিল। টাকা আনা পাই সুদের হিসেব ছাড়া কিছু বুঝত না—সেই রক্তস্রোত ও মেধা ওর মধ্যে আছে।

চুপ করে আছি দেখে মহাজন আমার পাঁজরে ওর পলার আংটিপরা আঙুলটা খুঁচিয়ে দিল।—'কী! চোখে ঘোর লেগে গেল নাকি? বুঝেছি মিয়া সাহেব, এ আসর ফেলে পা বাড়াতে কোন্ জোয়ান ছেলের মনই বা চাইবে? থাকুন, থাকুন।'

ওর ভাঁড়ামি এবার অসহ্য লাগল। একই মানুষের যে কত চেহারা থাকে! কত রকম প্রকৃতিও। পঞ্চায়েতী কাছারিতে বিচারকের আসনে বসে এই লোক-টিকেই অসাধারণ গাম্ভীর্যে রায় দিতে দেখেছিলুম। এই লোকটিই খড়ের জঙ্গলে খুনে বুনোশুওর মেরে সরকারী পুরস্কার পেয়েছিল। এবং এই একই লোক 'মহারাজ নন্দকুমার' যাত্রাপালায় মীর কাশিমের পার্ট করে এস-ডি-ও, সার্কেল অফিসার প্রমুখ রাজকর্মচারীদের হাততালি কুড়িয়েছিল।

এবং সেই একই লোক তারপর আমাকে বলছে ফের—'মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছে করে ভাই, আপনার মতো বেরিয়ে পড়ি সব ছেড়ে ছুড়ে। শালা বটের গাছ হয়ে আছি যে! হাজারটা ঝুরি আর শেকড় বাকড়। ওপড়ানো যায় না।'

বললুম—'ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে কী হত, ভাবছেন?'

মহাজন চোখ টেরা করে আমার দিকে একবার তাকাল। বলল—'কত কী কত! অন্তত ফকির-ফাকরার ডেরায় ঢুকে হাঁড়ির দুধটুকু চোঁ চোঁ করে গিলে পালিয়ে যেতুম। চাল চুলো নেই তো ধরবে কাকে? যেমন ওই আবদুল্লাটা।'

—'ওই মেয়েটিকে আপনার ভাল লাগল, তাই না?'...হাসতে হাসতে বললুম।—'ওর নাম মরজিনা। ইন্দ্রার মদন ফকিরের মেয়ে। ওর বরও আছে। ভারি তেজী মেয়ে মহাজন সায়েব। সামলানো কঠিন।'

মহাজন সুড়সুড়ি পেয়ে হেসে খুন।—'ওরে বাবা! সব হাল হদিস যে ঠোঁটের ডগায়। বুঝেছি। ভালো, ভালো। চালিয়ে যান। আমিই শালা কিছু পারলুম না। শুধু মুখটুকুন সার!'

এই সময় শেখ গোমহানী ডাকলেন—'বাবা মহাজন! একবার নামব। আলো দেখাও।'

আবুল মহাজন তক্ষুনি এগোল। হেরিকেনটা তুলে কবিয়ালকে বলল—'আসুন। ওখানে বসবেন। জঙ্গলে ঢুকবেন না যেন। নদীপার জায়গা। পোকামাকড়ের উপদ্রব হতে পারে।'

সে কবিয়ালের সঙ্গে এগোল। দেখলুম, কবিয়ালের হাতে একটা পেতলের বদনা। এই ফাঁকে আমি সরে পড়লুম মেলার দিকে।

মরজিনাকে দেখা গেল না। ফাঁকায় কয়েকটা ছোট্ট মনোহারি দোকান রয়েছে। গ্যাসবাতি জ্বলছে। একটাতে ছড়ির মাথায় বাঁধা হেরিকেনও ঝুলছে। তলায় চটের ওপর কিছু চুড়ি চিরুনী আলতা আর একটা নতুন মাঝারি সাইজের রঙীন টিনের সুটকেস। লোকটা হাত তুলে সেলাম দিয়ে ডাকল—'আসুন মাস্টারজী! সেক্রেট্ খান।'

সে একটা শস্তা সিগ্রেটের প্যাকেট তুলে ধরল। লোকটা যে একজন আউল, তাতে ভুল নেই। হাত কাটা কালো ঢিলে ফতুয়া আছে গায়ে। পরনে ফিকে ছাইরঙা লুঙি। কোমরের ঘুনসিতে কয়েকটা চাবি ঝুলছে। হাঁটু দুমড়ে বসে আছে সে। কালো গায়ের রঙ। মুখে পাতলা গোঁফদাড়ি। নাকটা থ্যাবড়া, কিন্তু সুচলো ডগা। মাথায় চুল বিশৃঙখল, কিন্তু বড় চুল নয়। তার দু' কানে রুপোর আংটা রয়েছে। দু' কব্জিতেই আবদুল্লার মতো তামার সরু বালা।

মাস্টারজী বলে ডাকল, কাজেই চেনে মনে হচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে একটু হেসে নিজের পরিচয় দিলে বলল—'বান্দার নাম মনসুর আলি। আপনি যেনার মেহমান (অতিথি), তিনি আমার শ্বশুর।'

কী কাণ্ড! এই সেই মরজিনার বর! ঘরজামাই এবং 'পাজি হতচ্ছাড়া শালা ব্যাটা' মনসুর ফকির! তা হলে অবশেষে মনোহারি দোকান বসানোর নেশাটা যেভাবে হোক মেটাতে পেরেছে, বোঝা যাচ্ছে, বসে পড়লুম ওর চটে। সরে জায়গা দিল। বলল—'দেরী হয়ে গেল আসতে। বেচা কেনা এক পয়সাও হল না। বুঝুন ব্যাপার, নলহাটির বাজারে মাল কিনে গাড়িতে চেপেছি, তখন বেলা ছ' সাড়ে ছ'। তার মানে, সন্ধ্যে। আসতে দু' ঘণ্টা লাগল। তারপর বাড়ি ঢুকে দেখি, ঘরে তালাকুলুপ আঁটা। আস্তেপস্তে চলে এলুম। ততক্ষণে যারা কিনবে, গেরস্থ বাড়ির ছেলে মেয়ে বউ ঝি, সবাই মানত দিয়ে কেটে পড়েছে। এখন তো শুধু গান-শুনিয়ে লোক আর ফকির ফাকরার রাজত্ব। কিনবে কে এ সব জিনিস?'

কথাবার্তা শুনে বেশ ভালই লাগল লোকটাকে। বয়স ত্রিশের ওপরে, তাতে ভুল নেই। বলিষ্ঠ গঠন। চনমনে চাউনি। সব সময় ঘুরছে দৃষ্টিটা। বললুম—'হঠাৎ এমন মনোহারির শখ হল কেন?'

—'আমার হুজুর বরাবর নানান জিনিস মাথায় খেলে। গত সনে ভাগে জমিও নিয়েছিলুম দু' বিঘে। শ্বশুর বলে—খবর্দার। হাল চষতে নেই। হল না—ছেড়ে দিলুম। বউটারও বাপের দিকে টান। বাপের কথায় ওঠে-বসে। সে একটু ইদিকে টললে চাষ-বাসটা করতুম।'

—'তোমার বুঝি ফকিরী লাইন পছন্দ নয়?'

মনসুর সিরিয়াস হয়ে বলল—'কথাটা তা নয় মাস্টারজী। গেরস্থ ফকির তো কম নেই দুনিয়ায়। তা ছাড়া আমি একটা কথা ভাবি বুঝলেন? খোদা এই গতরখানা দিয়েছেন। বেশ, সাধন ভজনের জন্যেই দিয়েছেন। কিন্তু গতরখানাতে তো রেলের ইঞ্জিনের মতো জলটা কয়লাটা ঢোকাতে হবে? গতর না টিঁকলে সাধন ভজন হবে কী করে? শ্বশুরব্যাটা বলে—ভিখ মাঙো। আমার তা পোষায় না হুজুর। একবার রেলে ভিখ মাঙছি, এক বাবু বললেন—অমন ষাঁড়ের গতর নিয়ে ভিক্ষে করছ, লজ্জা করে না? আমার মাথায় আগুন ধরে গেল, মাস্টারজী। সেই থেকে ছেড়েছি। কথাটা তো ভুল বলেন নি, বলুন না?'

কথাগুলো তো ভালই। বললুম—'তুমি ঠিকই বলেছ, মনসুর।'

মনসুর কানের আংটা দুটোয় অকারণ একবার আঙুল ছুঁয়ে নিল। বলল—'আপনার সঙ্গে আরেক ফাকরা জুটেছে শুনলুম। কী নাম যেন...'

—'আবদুল্লা।'

—'হুঁ।'...বলে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। জ্বলজ্বলে হিংস্র দৃষ্টি। চাপা গলায় বলল—'আপনার সঙ্গে ওর খুব দোস্তি আছে নাকি?'

—'না। পথে আলাপ। কেন?'

—'আমাকে মাফ করবেন, হুজুর। শালাকে আমি মারব।'

চমকে উঠলুম!—'সে কি। কেন?'

—'মাস্টারজী, ওর মতলব খারাপ। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। শালাকে আমি মেরে দেশ ছাড়া করব।'

আবুল মহাজনের মতো এই লোকটাও খোলস ছেড়ে বেরিয়েছে অন্য মূর্তিতে। এই জংলা জায়গায় আদিম প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে নিরাপত্তাটা মাঝে মাঝে কেমন বিপন্ন হয়ে যায়, ততদিনে অনেকবার টের পেয়েছি। আমার ওপর ওর রাগ হয়েছে কি না, কে জানে! ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বললুম—'আবদুল্লা আর আমি তোমার শ্বশুরের একরাতের মেহমান। এই আসর ভাঙলেই আমরা চলে যাব। তুমি ভাই কোন গন্ডগোল করো না।'

মনসুর হিংস্র মূর্তিতে হিসহিস করে বলল—'শালার দৌড়টা দেখছি। ভাবছে, আমি কিছু দেখছি না—বুঝছি না। ওরে চাঁদ আমার! আমার নাম মনসুর। গাময় চোখ।'

ভয় পেয়ে গেলুম। আবদুল্লাকে সতর্ক করা উচিত। অথচ ওর তো কোন দোষ নেই। ও মরজিনার প্রতি এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। দোষ তো মরজিনারই। মরজিনাই যেন ওকে প্ররোচিত করতে চায়।

এই সময় আমার মনে পড়ে গেল, ফকির-ফাকরাদের মধ্যে মারামারি অকল্পনীয় হলেও এমন একটা ঘটনা আমার দেখা হয়েছিল। অবশ্য সেটা তেমন মারাত্মক কোন হিংসাজনক সংঘর্ষ নয়—সামান্য লড়াই। এবং হাস্যকরও বটে।

কান্দী মহকুমার নীচু অঞ্চল হিজল ইউনিয়ন। অজস্র বন্যাবিরোধী বাঁধ আছে ওই এলাকায়। একবার দুপুরবেলা বাঁধের পথে আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়াতে হল। দুই ফকির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বচসা করছে। একটু পরেই বচসার উপলক্ষ্যটা বুঝতে পারলুম। কোনো গ্রামে খুব খানাপিনার ব্যাপার আছে। সম্ভবত বিয়েটিয়ের ভোজ। প্রথম ফকির খবর পেয়ে সেখানেই যাচ্ছিল। পথে দ্বিতীয় ফকিরের সঙ্গে দেখা। প্রথম ফকিরের গাঁজার স্টক ফুরিয়েছে। তাই ভেবেছে, দ্বিতীয় ফকিরের কাছে নিশ্চয় কিছু আছে এবং সেই আশায় সে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, খানাপিনার খবরটাও দিয়েছে। কিন্তু তার বরাত, দ্বিতীয় ফকিরেরও স্টক খালি। অগত্যা হতাশ প্রথম ফকির পা বাড়ায়। দ্বিতীয় ফকির তার পেছন ধরে। অমনি প্রথম ফকির তাকে চার্জ করে—'তুমি কেন যাবে? তুমি তো জানতেই না খানার খবর। খবর্দার, যাবে না।' দ্বিতীয় ফকিরের বক্তব্য—বারে! খানা তো ও দিচ্ছে না যে তাকে আটকাবে। প্রথম ফকিরের পাল্টা বক্তব্য—কথাটা সে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অতএব দ্বিতীয় ফকির জানে না যে কোথায় খানা হচ্ছে। অতএব ও অন্য কারো কাছে খবরটা

না পাওয়া পর্যন্ত থানায় যাবার অধিকারী নয়।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের অদ্ভুত বিতর্ক শুনছিলাম। সংলাপটা অবিকল মনে আছে। এখানে টুকে দিচ্ছি ডাইরি থেকে—

"প্রঃ ফকির। তোমার যাবার কোন রাইট নেই।

দ্বিঃ ফকির। তোমার আটকাবারও রাইট নেই।

প্রঃ। খবরদার! পা বাড়ালেই ঠ্যাং ভাঙব।

দ্বিঃ। ইস্! ভারি পালোয়ান। এক মুর্গির জোর নেই—বলে রুস্তম ফকিরের ঠ্যাং ভাঙবে!

প্রঃ। দেখবি? দেখবি তবে হাতেম ফকিরের বাহুবল?

দ্বিঃ। আও! চলা আও!"

বাধা দেবার আগেই ঘুষি তুলে চক্কর শুরু হল। অবিকল সিনেমার ফাইটিং। নির্ঘাৎ ওরা সিনেমা দেখেছে। ঘুষি বাগিয়ে ঘুরতে গিয়ে আচমকা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বাঙালী প্রথায় জাপটে ধরল এবং বাঁধের ওপর পড়ল। আমার চোখ গেল অন্য দিকে। বাঁধের ঢালু গা বেয়ে তারের হাতল লাগানো একজোড়া গোল টিন—যাতে ওরা ভিক্ষের চাল নেয়, ঠকাঠক আওয়াজ তুলতে তুলতে গড়িয়ে চলেছে। চাল ছিল কি না, বোঝা যাচ্ছিল না। টিন দুটো জড়াজড়ি ওই ভাবে নীচের জলে গিয়ে পড়তে অসম্ভব সময় নিল। তারপর দুজনকে টানাটানি করে ছাড়ালুম। বিচারক হতে হল। সে অন্য ব্যাপার। কিন্তু এখনও চোখে ভাসে এক জোড়া ভিক্ষেপাত্র অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে বাঁধ বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে। আপন মনে হাসি। আর কেউ তো দেখতে পেল না এই আজব দৃশ্য!

কিন্তু এখন যার আভাস পাচ্ছি ইন্দ্রার মেলায়, এই নিষুতি রাতে এবং অন্ধকার জঙ্গলে জায়গায়, তা মোটেও হাস্যকর হবে না। দুজনেই সম্ভবত মারামারিতে পাকা। দুজনেরই বদনাম শুনেছি ইতিমধ্যে। খুব ভয় পেয়ে গেলুম. কী বলব ভেবে পেলুম না। সবচেয়ে অবাক লাগল, এই লোকটা তা হলে মেলায় আসার পর বউ কিংবা আবদুল্লার ওপর কড়া নজর রেখেছে এবং অনুসরণও করেছে গোপনে! কিন্তু তা যদি হয়, তা হলে ওর মনোহারি দোকান আগলাবার জন্যে কাকে ও রেখেছিল?

হ্যাঁ, তাই বটে। একটা দশ-বারো বছরের ছেলে, পরনে ছেড়া পেণ্টুলুন আর গায়ে ময়লা গেঞ্জি, একটু পরেই এসে সামনে দাঁড়াল। বলল—'মামী উইদিকে গেল।'

মনসুর চোখ টেপল তাকে। ধমক দিয়ে বলল—'মামীর ব্যাটা আমার। আয়, বোস চুপচাপ।'

লোকটা চরও লাগিয়ে রেখেছে তা হলে। ছেলেটিকে দেখতে দেখতে বললুম—'এ কে?'

—'জী, এতিম (অনাথ) বালক। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে চেয়েচিন্তে খায়। আমি ওকে পুষ্যি নিয়েছি আজ।'

—'আজই?' একটু হাসলুম।

মনসুর হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল—হ্যাঁ। বিবেচনা করুন, বেবসা করব। সারাক্ষণ তো একা বসা যায় না—নানান কাজে ওঠা চলা করতে হবে। তখন একজনকে দরকার। বাপ্ ধনাই, চুপচাপ্ বোস। খদ্দের এলে থামতে বলিস। আসছি। মাস্টারজী আপনি ইচ্ছে হলে বসুন। শ্বশুরের কুটুম। অসন্মান করবে না মনসুর।'

সে প্রায় লাফ দিয়ে চলে গেল। আরও ভয় পেয়ে গেলুম। আবার দরবেশের হুঁশিয়ারি মনে পড়ল—এক রাতে ওলট পালট হয়ে যায়। প্রথমে মনে হল, মদনচাঁদ বুড়োর কানে ব্যাপারটা তোলা যাক্। কিন্তু সে আসরে বুঁদ হয়ে আছে।

'ভাবের জগতে ও মোন/ব্রিক্ষি (বৃক্ষ) হয়ে রবি।
ফুল ফোটাবি ফল ধরাবি/রসুলুল্লা (পয়গম্বর মহম্মদ) পাবি॥
মক্কা গেলি হজ করিলি,
নমাজ পড়লি জাকাত (উদ্বৃত্ত সম্পদ দান) দিলি,
ও ভোলা মোন, তোর দেলের (বুকের) মধ্যে কাবা শরীফ,
মুর্শিদ নামের চাবি॥"

একই গানের রকমফের ঃ

'মুর্শিদ ধরে বসে থাক্ মোন/মক্কা দেখতে পাবি॥'

মদনচাঁদের বোজা চোখের সামনে এখন পবিত্র চাবির আবির্ভাব। দুনিয়া রসাতলে গেলেও সে নির্বিকার।

আবদুল্লাকে বলব? কিন্তু সেও তো কম নয়। হাঙগামাটা তাতে আরও বেড়ে যাবে বৈ কমবে না। আর মরাজিনার কাছে এখন যাওয়া বৃথা। মনসুর তাকে এতক্ষণে চার্জ করে বসেছে হয়তো।

হঠাৎ শুনি ঃ 'মামু, দু আনা পয়সা দাও না!'

ধনাই ক্যাবলাকান্তের মতো হাসতে হাসতে বলছে। বোঝা যাচ্ছে সব লোককেই ও মামু বলে ডাকে। বললুম—'পয়সা কী করবি রে?'

—'সন্দেশ খাব।' বলে ও রেশমি চুড়ির বাণ্ডিলটা তুলে বাজাতে থাকল।

—'এই! ভেঙে যাবে। তখন মামুর হাতে চাঁটি খাবি। রেখে দে!'

ও গ্রাহ্য করল না। কখনও চুড়ি, কখনও সেফটিপিন আলতার শিশি, চুলের ক্লিপ নাড়াচাড়া করতে থাকলে।

'রঙের বাজারে এসে মোন গিয়েছে মজে।
দিনে দিনে গুরু, দিনকানা হলাম গো।
রাস্তা পাই না খুঁজে।

এ রঙের বাজারে॥'

ওর চোখের দৃষ্টিটা প্রথমে ছিল সুপরিচিত গ্রামীণ ধূসরতায় আচ্ছন্ন। ক্রমশ দেখি সূর্যোদয় ঘটছে। দিগন্ত রাঙা। কিন্তু না—ওটা লোভ নয়। খুশি। সুখের বিহ্বলতা ও ছুঁয়ে ছুয়ে রঙীন দ্রব্যরাজির বাস্তবতা পরখ করছে নতুন জহুরীর মতো। ওর ছোট্ট অনাথ এবং স্বাধীন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন টের পাচ্ছি। ফের যখন হঠাৎ এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় ও বলে উঠল —'দাও না মামু দু আনা পয়সা!' তক্ষুনি পকেট হাতড়ে একটা দু আনি বের করে দিলুম। ও হাতের চেষ্টায় পেতলের দু আনিটা উল্টে-পাল্টে দেখে যেন কুবেরের ধন পেয়েছে এ ভাবে একটি লাফ দিল।—'এট্টুকুন বসো মামু। যাব, আর আসব।'

ছেঁড়া পেন্টুলুন ময়লা গেঞ্জিপরা ছোঁড়াটা দিশেহারা হয়ে পোকার মতো ছটফট করতে করতে মেলার আলোয় মিশে গেল। অগত্যা এই রঙের বাজারটুকু আগলানোর দায় আমারই। দায়টা নৈতিক তো বটেই।

তারপর অস্থির হচ্ছি। এই নিষুতি রাতের মেলার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর আদিমতম সংঘর্ষ কি ঘটল এতক্ষণ? ওদিকে আসরে গানের ক্ষান্তি নেই। গাঁজার ধোঁয়ায় কুয়াশার মতো একটা নীলচে ব্যাপার আসরটা রহস্যময় করে তুলেছে। দোকান ফেলে যাওয়া উচিত কিনা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, এমন সময় লম্বা ছায়া ফেলতে ফেলতে মনসুর ফকির এল। মুখটা থমথমে। হাঁফাচ্ছে। তারপর চমকে উঠলুম। ওর কষা এবং নাকের কাছে একটু রক্ত, হাতা কাটা কালো ফতুয়াটা বুকের ওপর ফালা হয়ে ঝুলছে। লাল পাথরের মালাটাও ছেঁড়া। বসতে গিয়ে দু-তিনটে মোটা পাথর ঠকঠক করে গড়িয়ে পড়ল। সে মুখ নামিয়ে মালাটা দেখল এবং পাথরগুলো কুড়িয়ে আপন মনে ছেঁড়া সুতোর ডগা পাকিয়ে ফুটো দিয়ে ভরতে ব্যস্ত হল।

মারামারি একটা হয়েছে। কিন্তু সেটা কার সঙ্গে? এবং যা কিছু হয়েছে, তা মেলার বাইরেই কোন অন্ধকার জায়গায় হয়েছে। কারণ, কোন গণ্ডগোল শুনিনি। এ সব লোকের মেজাজ আমি জানি। এখন কিছু জিগ্যেস করলে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, খালি মনে হচ্ছে, ওর দাম্পত্য জীবনের এই দ্বন্দ্বে পরোক্ষে কোথাও যেন আমি জড়িয়ে আছি। তাই সে মালাটা গিঁট দিয়ে ঠিকঠাক করে নেওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকলুম। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর সে লুঙির একটা ধার তুলে কষা এবং নাকের কাছটা মুখে রক্তের ছোপগুলো দেখতে থাকলে বললুম—'আমি উঠি, মনসুর।'

মনসুর মাথা শুধু দোলাল। কোন কথা বলল না।

আমি আবদুল্লার খোঁজেই চললুম। বাঁধের দিকে এগিয়ে তাঁকে বার দু-তিন ডাকলুম। সাড়া না পেয়ে ফের মেলায় এলুম। মেলার ও মাথায় ছোট্ট দুটো খাবারের দোকান। পাঁপর ভাজা তেলেভাজাই বেশি সেখানে, দু গামলা

রসগোল্লা আর পান্তুয়াও আছে। আর আছে এলাকার সেরা মিষ্টি কদমা। একটা দোকানের সামনে দেখি কোমরে এক হাত, অন্য হাতের আঙুল কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই ধনাই ছোঁড়াটা। খুবই গভীর ধরনের চিন্তায় ডুবে আছে। কাছে গিয়ে গায়ে হাত না রাখা পর্যন্ত সে টের পেল না তার নতুন মামুর অস্তিত্ব। যেই পেল, মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাবলা হাসিটি হেসে দিল। বললুম—'কী রে? সন্দেশ খেলি?'

মাথা দোলাল। আঙুল কামড়ানো লালা ভেজা হাতটা দেখিয়ে দিল। দু আঙুলে দু আনিটা ধরা আছে।

—'কী হল?'

ধনাই দুঃখিত মুখে বিড়বিড় করে বলল—'দু আনায় একটা, মামু।'

—'তাই কেন্। কিনে খা। কী?'

—'ভাবছি।'

একটুকু ছোঁড়া তাহলে ভাবতে জানে! সে ভাবে!—'কী ভাবছিস রে?'

—'ভাবছি।'

হেসে বললুম—'বেশ। ভাব্ তাহলে।' সে দাঁড়িয়ে থাকল আগের ভঙ্গীতে—দৃষ্টি গামলার দিকে। বুঝলুম, একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। মোটে একটা রসগোল্লা বা পান্তুয়াতেই তার কুবেরের সম্পদটা ছাড়া হয়ে যাবে যে! সে সেই শূন্যতার কথাই যেন ভাবছে। দার্শনিক। মারফতী তত্ত্বের বীজ ঢুকেছে যে ভাবেই হোক—বায়ু তাড়িত হয়ে কিংবা পাখি প্রজাপতি পোকা-মাকড়ের সাহায্যে যেমন নিসর্গে গাছেরা বংশবৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে।

তারপর সেই হাল্কা হাসি আমার মুখ থেকে মুছে গেল। 'এক রাতে ওলট-পালট ঘটে যায়।' ঘটল কি কিছু? মন অস্থির। মরাজনাই বা কোথায় গেল? মেলাটা নিতান্ত ছোট। তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল। ভাবতে ভাবতে পুব দিকের গাছপালার তলা দিয়ে কানা দরবেশের আখড়ায় গেলুম। ভূত প্রেতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু খাঁ খাঁ নির্জন ওই আস্তানা, মধ্যরাতে ভিতরের বেদীতে তিনটি মড়ার মাথা আছে এবং পিদীম জ্বলছে—ভূতের ভয় অবচেতনার তলা থেকে মাকড়সার মতো অনেকগুলো রোমশ হাত বাড়িয়ে এগোচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। চলে যেতে পা বাড়িয়েছি, আচমকা কাছের একটা গাছ থেকে কী ধুপ করে পড়ল এবং অমানুষিক হেসে উঠল হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ... হিঁ হিঁ হিঁ! ভুতুড়ে নাকি স্বরের হাসি। আমি আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। জীবনে অমন ভয় কখনও পাইনি।

তারপর ছায়ামূর্তিটি সামনে এসে দাঁড়াল। আস্তানার ফটক দিয়ে পিদীমের আলো নয়—একটু ছটা আসছিল। তাতেই বোঝা গেল, মূর্তিটার কোমরে একফালি লেংটি আছে—বাকি শরীরটা রোগা, ঢ্যাঙা, বিকট। সে

নাকিস্বরে বলে উঠল—'ডর পেলি নাকি?'

তারপরেই সে আমার একটা হাত ধরে ফেলল। আমি নিঃসাড় হলেও টের পেলুম হাতের তালুটা বেশ গরম। ভূতের হাত ঠান্ডা বরফের মতো হওয়া উচিত। ত যখন নয়, তখন এ ব্যাটা নিতান্ত মানুষ। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। পারলুম না। সে ফের হিঁ হিঁ করে হেসে উঠতেই বাঁ হাত তুলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে কষে চড় মারলুম ওর গালে। অমনি আশ্চর্য, হাত ছেড়ে দিয়ে সে শুকনো পাটকাঠির পাঁজার মতো গড়িয়ে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠল, 'শালা মে'রেছে রে'!'

এবং হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। আমি অপ্রস্তুত। বললুম, 'কে রে তুই?'

তার কান্নার মধ্যে যা বক্তব্য, তাতে বোঝা গেল—সে যেই হোক তাতে আমার বাবার কী? কেন তাকে মারা হল? হাত যে কুষ্ঠ হয়ে গলে যাবে জানে না? ইত্যাদি।

এই সময় কেউ অন্ধকার থেকে আসছে, তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

—'কী হল স্যার?'

আবদুল্লা। বললুম 'আরে কী কান্ড! এই ভূতের মতো লোকটা আচমকা...'

আবদুল্লা বাধা দিয়ে বলল, 'আমাকেও তাই করেছিল একটু আগে। শালাকে আমি এক চড় কষিয়েছি।'

—'কে ও?'

—'একটা মাস্তান। শুনলুম, খোনা মাস্তানবাবা বলে ডাকে সবাই। কানা দরবেশ সাহেবের কাছে থাকে।'...আবদুল্লা হাসতে লাগল। 'মরজিনাবিবি তো বলল, ওকে মারা উচিত হয়নি। খুব বড় সাধক নাকি। মুখের কথা যা বলে, ঠিকঠিক ফলে যায়। আমাকে বললে—কুষ্ঠ হবে! হোক না। সাঁইজীর ইচ্ছে।'

শিউরে উঠলুম, হয়ত কুসংস্কার। মুখে অবশ্য হেসে বললুম, 'আমাকেও বলেছে। যাক্ গে, শোন। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। জরুরী দরকার।'

খোনা মাস্তানবাবাটি হঠাৎ এ সময় উঠে দাঁড়াল। দু হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার নেচে দিল। মাজাও দোলাল। তারপর ঝাঁকড়া জটা ও দাড়ি নেড়ে আবদুল্লার দিকে আঙুল তুলে ছড়ার সুরে বলল—

'মাঁ রিঁ (রে) মাঁ!
ছোঁড়া, পী'রি'ত ক'রেছে'।
দ'ই খে'য়েছে ভাঁড় ভে'ঙেছে।
কাঁথায় হে'গেছে॥'

তারপর 'মাঁ রি' মাঁ' বলতে বলতে সে তড়াক করে কাঠবেড়ালির মতো কাছের গাছটায় উঠে পড়ল। আমরা দুজনে হেসে উঠলুম। আবদুল্লা বলল, 'শালা মাস্তান, একে খোনা, তার ওপর গাছে-গাছে বেড়ায়। ভূতের মামু শালা!'

তারপর সে আমার কাঁধে হাত রেখে এবং পা বাড়িয়ে চাপা গলায় বলল, 'মরজিনা ফের আমার পিছু লেগেছিল। হেনসময়ে ওর মরদ হাজির। ওদের খুব মারামারি হল। দেখে চলে এলুম।'

আবদুল্লার সঙ্গে আসতে আসতে টের পেলুম, যা আস্তানার পিদীমের ছটা ভেবেছি, তা নয়। ওই ছটা দশগজ অব্দি ছড়িয়ে আসতেই পারে না এবং কোন কেরামতিও নয় পীরের থানের। আসলে হয়েছে কী, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদটা সবে ভেসে উঠেছে। বিলাঞ্চলের তৃণভূমি জুড়ে হাল্কা জোৎস্না পড়েছে। দূরের হট্টিটি পাখীটা ডেকে চলেছে—ট্টি...ট্টি...ট্রি! ট্রি...ট্টি...ট্টি। সেই দূরের বিস্তার যেন স্বপ্নে দেখা ধূসর মায়া বিশ্ব...

চলতে চলতে আবদুল্লার কী হল, জিকির (জপের নাদ) হাঁকতে শুরু করল। ঠোঁটের ডগার পুরো জিভের সাহায্যে উচ্চারণ করল সে, 'লাইলাহা' (কোন উপাস্য নেই) এবং গলার তলায় বুকের দিক থেকে দম টেনে ভৌতিক মিহি ও চাপা আওয়াজে বলল, 'ইল্লাল্লাহ' (ঈশ্বর ব্যতীত)...।...এইভাবে চলল তার জিকির। 'লাইলাহা......ইল্লাল্লাহ্' বুকের ভিতর দম টানার সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার ফলে বিকৃত ধ্বনিপুঞ্জ 'ইল্লাল্লাহ্'!

কেন এমন করছে সে? ভেবে পেলুম না কিছু। সে কি ভয় পেয়েছে? নাকি চিত্তচাঞ্চল্য দমন করছে? যে জন্যেই করুক, রাত দুপুরে নির্জন জঙ্গলে এবং আবছা জ্যোৎস্নায় সঙ্গীকে এমন ভুতুড়ে আওয়াজ করতে দেখলে গা ছমছম না করে পারে না। তার চেহারা চরিত্রও বদলে যায়। তাকে মনে হয় একটা জমাট রহস্য।

মেলার দিকে এলে সে হঠাৎ চুপ করে গেল। তরাপর আসরটা দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'এবার মাদারের বিয়ের বাজী পুড়বে।'

দেখলুম, আসর গুটিয়ে লোকেরা ব্যস্তভাবে একটা কিছু করছে। আসরের পুব দিকে কিছু ফাঁকা জায়গা—শেষ প্রান্তের জঙ্গল ঘুরে এইমাত্র

আমরা আসছি সেই ফাঁকা জায়গায়, কয়েকজন ফকির দুটো বাঁশের খুঁটির মতো জিনিস বয়ে নিয়ে গেল। খুঁটির ওপর দিকটায় অজস্র বাঁশের বাতা বাঁধা রয়েছে। আবদুল্লা আমার হাত ধরে টানল। উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'আসুন। গাছবাজী দেখি।'

ভিড়টা দেখে জানলুম, যতগুলো লোক এখানে জুটেছে ভেবেছি তারও বেশি। বসে ছিল বলে সংখ্যা বোঝা যাচ্ছিল না। ফাঁকা জায়গায় সেই বাঁশের গাছবাজী দুটো পোঁতা হল। কিছু তফাতে একধারে ভিড় করে ফকির ও সাধারণ মানুষগুলো দাঁড়িয়ে গেল। আমরাও ভিড়ে ঢুকলুম, কানা দরবেশ সবার আগে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে আছে মদনচাঁদ।

একটা লোক—সে ফকীর নয়, স্বয়ং বাজীকর মনে হল, বারুদমাখা সলতে আর পিদীম নিয়ে এগোল বাঁশের গাছ দুটোর দিকে। তারপর দুটো সলতে ধরিয়ে দুটো খুঁটিতে গুঁজে দিল। তারপর দৌড়ে এসে কানা দরবেশের পাশে দাঁড়াল। চড়চড় শব্দে ওদিকে বাজী জ্বলে উঠল। কয়েক মুহূর্তেই বাঁশের খুঁটির দুটো আগুন ফুলের গাছ হয়ে উঠল। ডালপালা ছড়ানো বেশ বড় গাছই বলব। ডগায় একটা করে আগুন ফুল। তা থেকে নানা রঙের স্ফুলিঙ্গ উড়ছে। ভারি সুন্দর দৃশ্য। ভিড় একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, 'দম্ দম্ মাদার দম্!' আমার আশেপাশে সবাই কথাটা উচ্চারণ করছে। আবদুল্লাও। এই প্রবল সংক্রমণ আমাকেও পেয়ে বসল। এবং গলা মিলিয়ে দিলুম যূথের চিৎকারে, 'দম্ দম্ মাদার দম্।'

শ্রেণীবদ্ধ যূথের আদিম রহস্যময় নাদ কতক্ষণ ধরে চলল। ততক্ষণে বাজীকর হাউই ওড়াচ্ছে। একটার পর একটা ক্ষুদে ধূমকেতু রাতের আকাশে তীব্র ঝলকানি তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল, অন্তত কয়েকশো বছর পিছিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কালের বোধ বলতে কিছু নেই আমার মধ্যে। এই সময় ওপাশে মেয়ের ভিড় থেকে উলুধ্বনি শোনা গেল। মুসলিম মেয়েরা তো উলু দেয় না! সম্ভবত নিম্নবর্ণের হিন্দু মেয়েরাও এসেছে পীরের বিয়েতে। তারাই উলু দিচ্ছে। ব্যাপারটা জমে উঠল চমৎকার। মনে মনে সকৌতুকে মাদার শাহের উদ্দেশ্যে বললুম, কী? বিয়ের সাধ মিটল তো এবার?

পিছনে শূন্য আসরের হ্যাসাগের আলো ওদিকে পৌঁছুচ্ছে না। যা আলো, তা বাজীর। দেখি, জনা পাঁচছয় ফকিরের আচমকা ভর উঠল। অদ্ভুত একটা গর্জন করে একে একে তারা শুকনো ঘাসের উপর গড়িয়ে পড়ল। হাঁটু ভাঁজ করে নমাজ পড়ার ভঙ্গীতে দু হাত হাঁটুতে রেখে, মাথা দোলাতে শুরু করল। কারো মাথায় জটা আছে। জটাগুলো পটাপট্ ঘাড়ে ও পিঠে পড়ছে। দোলনটি বাড়ছে আর বাড়ছে। এদিকে ভিড়ও দ্বিগুণ উদ্যমে উচ্চারণ করছে, 'দম্ দম্ মাদার দম্!'

হঠাৎ আবদুল্লা আমার হাত ধরে টানল। তার মুখে চাপা হাসি। 'মজাটা দেখুন!'

হ্যাঁ, মজা বটে। এক প্রৌঢ় প্রায় জলে ঝাঁপ দেবার ভঙ্গীতে মেয়েদের ভিড় ঠেলে বেরুতে চায়। তাকে কারা আটকাতে চেষ্টা করছে। ব্যাপার কী?

একটু পরেই ভাঙা ডালের মতো ছিটকে এসে বেরিয়ে এল। কাপড় বেসামাল। দু হাঁটুতে হাত রেখে একই ভঙ্গীতে সেও মাথাদোলানি শুরু করল।

এ সব ব্যাপার বেশিক্ষণ দেখলে, একঘেয়েমির জন্যই হয়তো, রহস্য খুইয়ে ফেলে। আমি আবদুল্লার হাত ধরে টানলুম। সে বাধা দিল না। দুজনে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলুম।

বেরিয়েই ফের আবদুল্লা 'জিকির' হাঁকতে শুরু করেছে—কিন্তু চাপা গলায়। 'লাইলাহা...ইল্লাল্লাহ্!' তারপর দেখি, তার সঙ্গেই আমি যাচ্ছি। আজ সারারাত সে যা করছে, আলো ছেড়ে ভিড়ের বাইরে অন্ধকারে গিয়ে ডুব মারছে, তাই করার মতলব যেন।—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? একথার জবাব সে দিলই না। তখন বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম। সে আমার কথা ভুলেই গেল যেন। একাই শান্ত ভঙ্গীতে পা ফেলতে ফেলতে হয়তো বাঁধের দিকে এগোল। গেরুয়া পোষাকপরা একটি মূর্তি, হাতে একতারা। কিন্তু পায়ের ঘুঙুরটা সেই যে সন্ধ্যায় মদনচাঁদের বাড়িতে খুলে ঝোলায় পুরেছে—আর পরে নি। মূর্তিটা পর্দার ফিল্মে ফেড্ আউট হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তখন আমি ক্লান্ত টের পেলুম। ঘুম-ঘুম ঝিমুনি লাগছে। কোথাও শুয়ে পড়তেই হবে। শোবার জায়গার খোঁজ করা দরকার।

আবুল মহাজনের গাড়ির কাছে এসে দেখি, কবিয়ালদ্বয় আর আবুল মহাজন নেই। গাড়োয়ানটা গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। সে জানাল, 'ওনারা বাজী-পোড়া দেখতে গেছেন।'

জীবনে আর কখনও এমন করে মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে বেড়াইনি। আলকাপ দলের আসরে রাতের পর রাত জেগেছি, একটুও ঘুম পায়নি। অথচ এ রাতে এত ঘুম, এত ক্লান্তি এবং মাথা গোঁজার একটুখানি জায়গার জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরা! পা টলছে। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। নিজের ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটি মানুষ একটি করে লক্ষ্যের দিকে হেঁটে চলেছে। তাই কোন ক্লান্তি নেই ওদের। ঘুম নেই। প্রতিটি মুখে উজ্জ্বলতা। আর আমি লক্ষ্যহীন, মুখে বিরক্তি ও ক্লান্তির কালচে ছোপ, পায়ে স্খলনের টান, ঘুরছি আর ঘুরছি।

কয়েক পা এগোতেই মরজিনাকে দেখতে পেলুম। মেলার দিক থেকে সে আসছে। খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে তার আসা। এসেই আমাকে দেখে কেমন হাসল। 'কোথায় কোথায় ঘুরছেন মাস্টার? বাজীপোড়া দেখলেন না?'

মাথা দোলালুম। এ মুহূর্তে আর কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না—শুধু একটি প্রার্থনাঃ শুতে চাই।

আমাকে চুপচাপ দেখে সে বলল, 'কী? শরীল খারাপ করছে?'

কোন রকমে বললুম, 'কোথাও শোবার জায়গা আছে?'

তার মুখে কি বাৎসল্য দেখলুম? বলা কঠিন। সে ব্যস্তভাবে বলল, 'আবার ছিলিম টেনেছেন বুঝি? এক কাজ করুন। আমি চাবি দিচ্ছি। বাড়ি চলে যান। চৌকাঠের কাছে লম্প আছে। জ্বেলে বিছানা করে নেবেন। পারবেন না যেতে?'

ফের মাথা দোলালুম। একা নদী পেরিয়ে ওদের বাড়ি খুঁজে বের করার সাধ্য হয়তো নেই।

মরজিনা ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বলল, 'আপনাকে রেখে আসতুম। কিন্তু...কিন্তু পাঁচজনে পাঁচকথা বলব। হাজার হলেও আমি তো মেয়েমানুষ মাস্টার!'

এ যেন ছেনালিপনা। রাগে জ্বলে উঠলুম। কিন্তু মুখে বললুম, 'বলবেই তো।'

হঠাৎ নড়ে উঠল সে। 'এক কাজ করুন। কানা বুড়োর আস্তানায় চলুন। থানের চ্যাড়ারা (প্রেত শক্তি) আপনার কোন ক্ষতি করবে না। শুয়ে নাক ডাকাবেন। কোন চিন্তা নেই। পারবেন না? ভয় লাগবে?'

হ্যাঁ, খুব ভাল জায়গার কথাই বলেছে বটে। এটা মাথায় আসা উচিত ছিল অনেক আগেই। কানা দরবেশের বুজরুকিতে আমার ভয় পাবার কিছু নেই। শুধু ভয়, ওই ব্যাটা খোনা মাস্তানকে। সেই গেছোবাবা নিশ্চয় ব্যাপারটা দেখবে এবং তার যা বদ অভ্যাস, হয়তো ঘুম বরবাদ করে ফেলবে। ওকে অনুসরণ করতে করতে বললুম, 'দেখ, খোনা মাস্তান বাবা জ্বালাতন করবে না তো?'

মরজিনা বলল, 'না। ওকে বলে দেব। আমাকে খুব ভালবাসে।'

এর আগে আমরা আস্তানায় গেছি পুবদিক ঘুরে। এখন ওদিক বাজী-পোড়া এবং ভরের খেলা। ভিড় জমে আছে। তাই এবার গেলুম পশ্চিম ঘুরে। ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে সরু এক ফালি পথ। ঘাস নেই বোঝা যাচ্ছিল। এর মানে, এই পথ দিয়েই লোকে দরবেশের কেরামতি দেখতে যায়। ফিকে জ্যোৎস্না গাছপালার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়েছে এবার। মোটামুটি সব দেখা যাচ্ছে। আস্তানার ভাঙা ফটকের কাছে হঠাৎ থেমে মরজিনা পিছনে ঘুরলে। তারপর গাছপালার দিকে মুখ তুলে বলে উঠল, 'মাস্তান বাবা! ইনি আমাদের নিজের লোক। আস্তানায় শোবেন। খবর্দার, লক্ষি বাবা! জ্বালিও না যেন!'

কোন সাড়া এল না। ব্যাটা পাগলটা কোথায় হনুমানের মতো বসে আছে কে জানে! শোবার জায়গায় যাচ্ছি—এতেই ঘুমের টান জোরালো হয়ে উঠেছিল।

ভেতরে পেঁছে দাওয়াটা দেখতে দেখতে মরজিনা বলল, 'পিঠে লাগবে। এখানে শুতে পারবেন না। ভেতরে শোন। কোন ভয় করবেন না। কোন ক্ষতি হবে না আপনার।'

ঘরের মেঝে, আশ্চর্য, পাথরের! নিশ্চয় তুর্কি বা পাঠান আমলের ব্যাপার। তবে প্রত্নতত্ত্ব এখন নয়। মোটামুটি বড় ঘর। ওপরে খড়ের চাল ভুষকালো। পিদীমের ধোঁয়ায় ওই অবস্থা। বেদী থেকে হাত তিনেক তফাতে মাদুর পেতে দিল মরজিনা। তারপর খিল খিল করে হাসল। 'মুখ মে শা ফরিদ, বগলমে ইট! ও মাস্টার, বুড়োর তাকিয়ায় শুতে পারবেন না। বুড়ো গোঁসাও করবে। তাই বলছি, ইট পেলে ভাল হত। তাই না মাস্টার?'

ও খুব হাসছে। পিদীমের অল্প আলোয় ওর হাসি আর শরীর জুড়ে রহস্য ছমছম করছে। তাকাতে ভয় করছে। আমি চিরকালের ভীরু। এবং এই ঘরটা হয়তো পবিত্র। পবিত্র, তার কারণ কোন ধূসর বিস্তৃত ইতিহাসের এক সন্ন্যাসীর দীর্ঘশ্বাস এখনও হয়তো জমে আছে এর বাতাসে। কিন্তু সেই প্রেমিক সন্ন্যাসীর সাহস কোথায় আমার মধ্যে যে সারা শরীরে নিতে পারি নখের আঁচড় এবং সূর্য উঠতে-উঠতে আমিও হয়ে উঠতে পারি কাঁটায় ভরা লাল লাল ফুল ফোটানো একটি মন্দার বৃক্ষ?

খুঁজে পেতে কোণা থেকে একটা পুঁটুলি আনল মরজিনা। বলল, 'দরবেশ বুড়োর জোকাটোকা আছে হয়তো। থাক্! বালিশ হবে। নিন।'

তক্ষুনি গড়িয়ে পড়লুম। মরজিনা বেদীর তিনটে মড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুড়োকে গিয়ে বলে দিচ্ছি, ওর আস্তানায় মেহমান্ (অতিথি) ঘুমোচ্ছে। ব্যাস্। এই তিন আঁটকুড়ে মিনসেকে সামলে নেবে। আর ভাবনা কিসের? ঘুমোন। সকালে যাবার সময় ডেকে নেব।'

হঠাৎ সব ঘুমের বানবন্যা শুকিয়ে গেল। শরীর কেঁপে উঠল। হৃৎপিণ্ডে জোর রক্ত চলাচল হতে থাকল। ওই যুবতী আউলকন্যা কি আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে? এমনভাবে নিঃসংকোচে মিশছে—কথা বলছে খোলাখুলি, ওকে যদি...

মরজিনা তখন বাইরে। তার পায়ের শব্দটা জোরে বাজতে থাকল। ঢাকের মতো। তারপর মিলিয়ে গেল। তখন লজ্জা পেলুম। ছিঃ! একি ভাবছিলুম! দরবেশ বলেছিলেন, 'চেরাগের তলায় অন্ধকার'। এই সেই অন্ধকার।

কিন্তু আর ঘুম নেই। নেই-ই। কাত হলেই দেখতে পাচ্ছি বেদীর ওপর তিনটে মাথা—যেন আমার দিকেই ঘুরে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। ক্রমশ একটু একটু ভয় জাগল। অস্বস্তি হতে থাকল। এমন অদ্ভুত জায়গায় কখনও শুইনি। এবং নিজেকে কখনও এমন জঘন্যভাবে ব্যর্থ বলে মনে হয়নি। সিগ্রেটের পর সিগ্রেট খাচ্ছি। আবার চমকে উঠে মড়ার মুণ্ডুগুলো দেখছি।

ক্রমশ ওরা জীবন্ত হয়ে উঠছে। ক্রমশ ওদের নিঃশব্দ হাসি বিকটতর হচ্ছে। অসহ্য হয়ে উঠলে একলাফে গিয়ে পিদীমটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলুম। নিতান্ত ঝোঁকের বশে, বোকার মতো।

হ্যাঁ, বোকামিই হল। এখন অন্ধকারে বিপদটা আরও বেড়ে গেল। এতক্ষণ তো ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। এখন অন্ধকারে ওরা কী করছে দেখতে পাচ্ছি না। এর ফলে নানা আজগুবি ধারণা গজাতে থাকল মাথায়। মনে হল, ওরা ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি ফিসফিস কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছি। ঘরে এতক্ষণ যেটা খেয়াল করিনি—অদ্ভুত একটা গন্ধ—সুগন্ধই বটে, ক্রমশ বাড়ছে। ধূপ ধুনো কাঠ-মল্লিকা ফুল ও পুরনো ময়লা ঘরের ঐতিহাসিক সব রকম গন্ধ মিলিয়ে সেটা বেশ ভুতুড়ে ব্যাপার। কখনও মনে হচ্ছে, গন্ধটা পচে ওঠা স্নো পাউডারের। কখনও তাজা ফুলের। গন্ধ যে রূপময় শব্দময় হয়ে উঠতে পারে, এমন করে কখনও টের পাইনি। অন্ধকারে এমনিতে তাকালেই কত কী রঙের ছটা দেখা যায়। এখন ওই গন্ধটা অজস্র রঙের ছটা হয়ে পোকামাকড়ের শব্দের মধ্যে তুমুল হল্লা শুরু করল।

হঠাৎ বুঝলুম, গন্ধটার একটা অংশ আমার মাথার নীচে এই পুঁটুলি থেকেই বেরোচ্ছে। শুঁকে দেখলুম। পুরনো বই বা কাপড় চোপড়ের গন্ধে আমার এক ধরনের হ্যালুসিনেশান ঘটে। ব্যাপারটা 'জন্মান্তরের ধারণা গজিয়ে দেয়। কোন জন্মের ভাসা-ভাসা কথা, দৃশ্য পরিচিত সব ঘটনা। আমি কি কোনদিন এই ঘরে ছিলুম? তখন আমার কী নাম ছিল?

কিন্তু না।...তিনটে মড়ার মুণ্ডু বেদী থেকে উঠে যেন আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। চিত হয়ে শুয়ে আছি। সিগ্রেটটা টেনে জ্বলজ্বলে করে দেখার চেষ্টা করছি সেটা সত্যি ঘটছে কিনা। হঠাৎ আমার পায়ে কার হাত পড়ল। লাফ দিয়ে উঠলুম। 'কে রে? কোন্ শালা?' আতঙ্কের আর্তনাদ ছিল শালা শব্দে।

অমনি খোনা মাস্তানের হিঁ হিঁ হিঁ হাসি শোনা গেল এবং সে বলল, 'ঘুঁমো ঘুঁমো। পাঁ টিঁপে দিঁই! অঁই দ্যাঁখ্—বাঁছা আঁমার নঁস্ফঝস্ফ কঁরে! মঁরণ আঁমার! শোঁ নাঁ বাঁছা! শোঁ। পাঁ টিঁপি।'

এই সব বলতে বলতে সে আমার একটা পা টেনে ধরে টেপা টিপি শুরু করল। তখন হাসতে হাসতে শুয়ে পড়লুম। পা টেপানো অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে। ঠাকমা পা না টিপলে ঘুম আসত না। আজকাল আলকাপ দলের নাচিয়ে ছোকরা পা টিপে ঘুম পাড়ায়। সুতরাং খোনা মাস্তানের পা টেপাটা আরামদায়ক।

ওর হাত অবশ্য নোংরা হওয়াই স্বাভাবিক। তা হোক। টিপুক্। আপাতত মড়া তিনটের ভয়টা ঘুচেছে।

একটু পরে ব্যাটা সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। ওর নখ আছে ঢের

পেলুম। পা ছুঁড়ে বললুম, 'এই! খবরদার! সুড়সুড়ি দেবে না বলছি!'

—'অঁ। বাঁছার সুঁড়সুঁড়ি লাগে! পোঁড়া কঁপাল আঁমার! জাঁনিস? কাঁনা বুঁড়োর সুঁড়সুঁড়ি নেঁই। শাঁলা মঁড়ার মঁড়া। দাঁত কেঁলিয়ে ঘুঁমোয়। হ্যাঁরে, যাঁর চোঁখই নেঁই—সেঁ ঘুঁমোয় কেঁমন কঁরে? আঁমার ধন্দ লাঁগে!'

সত্যি তো। চোখের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক আছে। যার চোখ নেই, সে ঘুমোয় কীভাবে? হেসে বললুম, 'মাস্তান বাবা, বাজী পোড়া দেখতে যাও নি?'

সে খোনা গলায় যা জবাব দিল, তা এই ঃ বাজী দেখতে দিলে কই তাকে? সেই যে কবে মাদার শাহ্ তাকে গাছে তুলিয়ে দিয়ে বলেছিল—ব্যাটা, বিলবাগে নজর রাখিস। মেয়েটা এলেই খবর দিবি। তার আর নামাই হ'ল না। আঁটকুড়ি মিথ্যুক মেয়েটা যে এলই না! মাস্তানের ভাবনা হয়—সে মানব শরীল ধরে আছে। এ শরীল একদিন তাকে ছাড়তে হবে। মৃত্যুর দেবদূত আজরাইল তার প্রাণটা নিয়ে সাত স্তর আসমানের পারে চলে যাবেন। গাছ থেকে লাসটা জমিনে গিরে যাবে। তখন কে মাদারপীরের দায়িত্বটা পালন করবে?

এ সব বলার পর সে মন্তব্য করল, 'শাঁ সাঁহেবের (মাদার পীর) ঢঁঙ! পীরিতের গঁলায় দঁড়ি!' এবং ফের সেই ছড়াটা, আওড়াল খোনা গলায় ঃ

'মাঁ রিঁ মাঁ!
ছোঁড়া পীঁরিত কঁরেছে।
দঁই খেঁয়েছে ভাঁড় ভেঁঙেছে
কাঁথায় হেঁগেছে॥'

এবং সেই মারাত্মক ভয় জাগানো হাসি—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

রাত কি শেষ হয়ে এল? বাইরের ফিকে জ্যোৎস্না কেমন সাদা হয়ে দাওয়া ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকছে এতক্ষণে। 'এক রাতে সব ওলট পালট ঘটে যায়!' কিছু কি ঘটল এতক্ষণ? আমি এখানে যেন লুকিয়ে আছি নিজের মাথা বাঁচাতে। আবদুল্লা মায়াগ্রস্ত হরিণের মতো বারবার নির্জনে যাচ্ছে, এদিকে বাঘিনী যেন সব সময় তাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারটা এতক্ষণ কি শেষ? হয়তো রক্তমাংস ছিঁড়ে খাওয়া চলছে এতক্ষণে। আমার শুয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

আর এই এক পাগলা মাস্তানের হাতে পা পিটিয়ে নেওয়ায় কি আমার পাপ হচ্ছে? লোকটা আসলে স্নেহপ্রবণ সরল এক মানুষ। শিশুর মতো। ওকে আমি কেন পা টেপাচ্ছি! ধিক্ আমাকে।

ফের পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ও ছাড়বে না। তখন চেঁচামেচি করে বললুম—'মার খাবে বলে দিচ্ছি! ছাড়ো পা—ছেড়ে দাও এক্ষুনি!'

ও শুধু হাসে। শুধু বলে—'আঁরে থাঁম্ থাঁম্!'

সিন্দবাদ নাবিকের গল্পের দ্বীপবাসী যখবুড়ো যেন। অগত্যা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলুম। লোকটার গায়ে কি এতটুকু জোর নেই? পড়ে গিয়ে তখনকার মতো চেঁচিয়ে উঠল—'শাঁলা মেঁরেছে রেঁ!'

এই সময় মেলার দিকে একটা হট্টগোল শোনা গেল। হাঙ্গামা লাগল নাকি? উঠে দাঁড়ালুম মাস্তান এবার হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে। খুব খারাপ লাগল। কিন্তু অনুশোচনা প্রকাশের সময় নেই। দৌড়ে বাইরে গেলুম। দেখলুম, ভোর হতে দেরী নেই। জঙ্গলে পাখিরা জেগে উঠেছে। ভাঙা চাঁদটা উঁচু মাদার গাছগুলোর ডগায় টাঙানো লাল নীল সাদা পতাকার ভিড়ে প্রচণ্ড সাদা হয়ে গা ঘষছে।

হট্টগোলটা মেলায় হচ্ছে না। নদীর দিকেই কিছু ঘটছে। সবাই দৌড়ে যাচ্ছে সেদিকে। আমিও হন্তদন্ত হয়ে এগোলুম। যাবার সময় আবুল মহাজনের গাড়িটা আর দেখতে পেলুম না। ওরা বিলের পথে রওনা দিয়েছে তা হলে।

ঝোপঝাড় ভেঙে সবার সঙ্গে বাঁধে গেলুম—মেলার পশ্চিমে। অনেক লোক বাঁধে দাঁড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে নীচের দিকে কী দেখাচ্ছে। গিয়ে দেখি, নীচের নদীর চড়ায় একটা ছোটখাট ভিড়। উঁচুতে আছি, কিন্তু তখনও আলো আবছা। স্পষ্ট বোঝা গেল না ব্যাপারটা। তখন ঢালু পাড়ের তরমুজ ক্ষেত মাড়িয়ে নীচে চলে গেলুম।

নদীখাতটা বেশ চওড়া। আসার সময় কিছু বুঝতে পারিনি। বালির চড়ার ভিড়ের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখি, দুজন লোক—ফকিরই বটে, পরস্পরকে জাপটে ধরে যেন কুস্তি লড়ছে। তারা বালির ওপর গড়াগড়ি করে লড়ছে। আর মদনচাঁদ ওদের ছাড়াবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে করযোড়ে ভিড়কে বলছে—'তোদের দোহাই রে! ছাড়িয়ে দে রে! ও বাবারা! তোদের পায়ে ধরি রে!'

যা ভেবেছি, তাই।

আবদুল্লা আর মনসুর।

আমার গায়ে অত জোর নেই। তা ছাড়া পৃথিবীর আদিমতম একটা ব্যাপার নিয়ে এই সংঘর্ষ। ভদ্রলোকের তর্জন গর্জন শাসানি বা অনুরোধের কোন মূল্যই নেই এখানে। তবু দুচারবার চেঁচিয়ে ডাকলুম—'আবদুল্লা! ছেড়ে দাও!' নদীখাতে হু হু বাতাস বইছে। আমার কথা ভেসে গেল কোথায়। কিন্তু আশ্চর্য, ভিড়ে গেরস্থ ও ফকির সবাই আছে। তারা দাঁত বের করে মজা দেখছে। তাদের দিকে ঘুরে বললুম—'কী দেখছ সব? ছাড়িয়ে দাও না!'

ভিড়ের ভিতর কেউ বলল—'দেখুন না। মজাটাই দেখুন!'

কী নিষ্ঠুর এরা! এর মধ্যে মজাটা কোথায়? আবদুল্লা এবার মনসুরের

পিঠের ওপর বসেছে। মনসুর ওর একটা পা উবুড় অবস্থায় কষে ধরে আছে—ভেঙে ফেলবে যেন। আবদুল্লা দু'হাতে গলা টিপে ধরেছে। আঁতকে উঠে ফের চেঁচালুম—'মরে যাবে যে! আবদুল্লা!'

হঠাৎ আমার মাথা খুলে গেল। অন্ততঃ এই মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। চেঁচিয়ে উঠলুম—'পুলিশ আসছে! পুলিশ! পুলিশ!'

ভিড় ঘুরে এদিকে ওদিকে খুঁজতে ব্যস্ত হল। অমনি আবদুল্লা এক লাফে দুষমনের গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। ওদিকে মনসুরও পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসার জন্য হামাগুড়ি দিয়েছে।

আবদুল্লা যেন দিশেহারা হয়ে চর পেরিয়ে বাঁধে উঠল। বড় হাস্যকর দৃশ্য। তাকে অদৃশ্য হতে দেখলে সবাই। তার একতারাটা ভেঙেচুরে পড়ে আছে একখানে। আলো আরও ফুটেছে তখন। মনসুর উঠে দাঁড়িয়েছে। বালি ঝাড়ছে বুক থেকে। কালো ফতুয়ার বাকিটুকু ফর্দাফাঁই। নাকে কষায় রক্ত। কপালে রক্ত। হাঁপাচ্ছে মোষের মতো। তার গায়ে হাত বুলোচ্ছে মদনচাঁদ। কাঁদছে।

কিন্তু আমার মুখের কথা এমন করে ফলে যাবে, ভাবিনি। কাকতালীয় যোগই বলা যায়। উত্তরে খানিকটা দূরে নদী-পারাপারের ঘাট। সেদিকে তাকিয়ে লোকগুলো চাপা গলায় উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—'কানাই দারোগা আসছে!'

ভোরের আলো দ্রুত ফুটে উঠল। সব কিছু স্পষ্ট ফুটে উঠছিল পৃথক সত্তায়—যা ছিল সারা রাত একাকার। ঘাটের দিক থেকে সাইকেল ঠেলে নিয়ে আসছিল জনা তিন পুলিশ। আরও কাছে এলে দেখা গেল একজন অফিসার, অন্য দুজন কনস্টেবল। সঙ্গে জনা দুই গ্রাম্য লোকও রয়েছে।

কানাই দারোগা দশ গজ দূর থেকে হেঁকে বললেন—শুকনো নদীতে মড়া ভেসে এল নাকি রে? ভিড় করেছিস কেন সব?'

বেশ আদুরে কণ্ঠস্বর। লোকটা লম্বা হাল্কা গড়নের। কাছাকাছি হলে মদনচাঁদ একগাল হাসল। চোখ তখনও ভেজা।—'আসেন, আসেন। হুজুর মা বাপ আসেন! আর বলবেন না—সব গাঁজাখোর ফকিরফাকরার দল। এটুকুনেই মাথা গরম। মারামারি বাধিয়েছিল। ছাড়িয়ে দিলুম।'

কানাই দারোগা বললেন—'মদনচাঁদ যে! মেলা কেমন হল? আসার বড় ইচ্ছে ছিল। তো শালা এই খুনে এলাকা। সময় কোথায়?'

ফকিরের দল অকারণ হাসতে লাগল। মদনচাঁদ বলল—'তবে চলুন হুজুর। চলুন। চলুন। ফের আসর বসবে। দুচারখানা পদ শুনবেন। তবে ভাঙা আসর, হুজুর!'

দারোগা বললেন—'ওহে মদনচাঁদ! তোমার জামাই বাবাজী কোথায়?'

মদনচাঁদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।—'কেন হুজুর?'

দারোগা সে কথার জবাব না দিয়ে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

—'আপনি কোথায় থাকেন? কী নাম?'

বললুম। শুনে দারোগা ফিক্ ফিক্ করে হাসলেন।—'ভালো, ভালো!'

তারপর কী একটা ঘটল। ধুপ ধাপ শব্দ শুনে ঘুরে দেখি, মনসুর দৌড়াচ্ছিল—একজন কনস্টেবল তার বেটন ছুঁড়ে মেরেছে এবং হাঁটুর উল্টো-দিকে লাগতেই সে চরে উবুড় হয়ে পড়ল। কনস্টেবলটা একজনের হাতে সাইকেল গুঁজে দিয়ে দৌড়ে তাকে ধরে ফেলল। কাঁধ খামচে নিয়ে এল। মদনচাঁদের জিভ বেরিয়ে গেছে। ভিড় অবাক।

কানাই দারোগা বললেন—'যাক্‌গে। ল্যাঠা চুকল।' তারপর আমার উদ্দেশ্যে বললেন—'ও মশাই! এই যে সব দেখছেন, এরা দিনে সাধু, রাতে এদের অন্য মূর্তি। দেখে শুনে চলবেন।'

মদনচাঁদ ঘরঘর করে বলল—'হুজুর, জামাই কী করেছে?'

—'থানায় যেও'খন, শুনবে।' বলে কানাই দারোগা সাইকেল ঘোরালেন। অন্য কনস্টেবলটিকে বললেন—'সমাদ্দার! তোমরাও এস তা হলে। আমি একবার থান ঘুরে যাই। এলুমই যখন।'

মদনচাঁদ আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল—'বাবা, মাস্টার বাবা! আপনি তো ছিক্ষিত বেক্তি। এট্টুকুন আমার হয়ে ধরা পাকড়া করুন না দারোগাবাবুকে। বাবা, এট্টুকুন অনুগ্রহ করুন!'

আমি বিব্রত হয়ে বললুম—'এখন কিছু বলা ঠিক নয়। ঠিক আছে। উনি তো থানে যাচ্ছেন। তখন সুযোগ পেলে দেখব। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

কানাই দারোগা ঘাটের দিকে চলছেন। পিছনে ভিড়ও চলেছে। কনস্টেবলরা আসামী নিয়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে উল্টো দিকে চলে গেল। মদনচাঁদ যাচ্ছে আর দারোগাবাবুর পা ধরার চেষ্টা করছে। দারোগাবাবু হাসতে হাসতে বেটন তুলছেন। তখন সে ভয়ে সরে আসছে...

মেলায় তখন সব গুটিয়ে ফেলার তোড়জোড় চলেছে। আসরের সব হ্যাসাগ নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। কানা দরবেশ বসে আছেন। গানের আসর ফের শুরু হবে মনে হল। একতারাগুলো আওয়াজ তুলেছে। মাঝে মাঝে ডুবকি বেজে উঠেছে। কোন ফকির বসে থেকেই পা বাড়িয়ে ঘুঙুরে শব্দ তুলছে।

ভোরের আলোয় পীরের থানটা এতক্ষণে দেখলুম। পাথরে ভিত বাঁধানো ফুট তিনেক উঁচু চার কোণা একটা জায়গা। সেখানে মাটির ওপর কয়েকটা ছোট বড় মাদার গাছ রয়েছে। লাল ফুলে উজ্জ্বল সব গাছ। তলায় নিকোনো কিছু জায়গায় অজস্র মানুষ, ক্ষুদে মাটির ঘোড়া, মাটির থালায় সিন্নি, এবং অনেক-গুলো পিদীম—কোনোটা নিবু নিবু, কোন্‌টা নিবে গেছে। কোনোটা

ধোঁয়াচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড ধুপচিতেও ধোঁয়া ফুরিয়ে যাচ্ছে। পাশে একটা চামর পড়ে আছে।

দারোগাবাবু একজনকে সাইকেল ধরতে দিয়ে থানে গেলেন এবং মিনিট তিনেক জোড় হাতে মাথা নুইয়ে থাকলেন। তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে হেঁট হয়ে ধুলো নিলেন। মুখে ও মাথায় ঠেকালেন। এই সময় একজন ফকির কানা দরবেশের হাতে চামরটা দিয়ে এল এবং তাঁর হাত ধরে ভিড় ঠেলে দারোগাবাবুর কাছে নিয়ে এল। দারোগাবাবু মাথা ঝুঁকিয়ে আদাব করে আস্তে বললেন—'আমি কানাই বাবা। ভাল আছেন? দোওয়া করুন।'

কানা দরবেশ হাতের চামরটা বুলিয়ে দিলেন দারোগাবাবুর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত। লোকটা কি সত্যি অন্ধ? তার ঠোঁট যথারীতি কাঁপছে। এর পর সে দারোগাবাবুকে লক্ষ্য করে বারতিনেক ফুঁ ছুড়ে মারল। আওয়াজ হল—ছুঃ! ছুঃ! ছুঃ!

এ সব হয়ে গেলে কানাই দারোগা থান থেকে সরে এলেন। একজনকে বললেন—'শালার দোকানটা কই?'

ভিড় ওঁকে নিয়ে চলে গেল। বুঝলুম, খবর পেয়ে গেছেন—মনসুর দোকান করেছে মেলায় এবং মালটা আটক করা হবে। ওদিকে গেলুম না। মনসুর যে কোথাও চুরিচামারি করে দোকানের টাকা যোগাড় করেছে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

চা খেতে ইচ্ছে করল এবার। চায়ের দোকান রাতে দেখেছিলুম যেন। এখন ভাঙার মুখে সেটা আর খুঁজে পেলুম না। তখন মনে হল, নিশ্চয় ভুল দেখেছিলুম।

মদনচাঁদ দারোগাবাবুর পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণে ভীষণ একা লাগল। অবাঞ্ছিত মানুষ—নিতান্ত অনুপ্রবেশকারীর মতো। তখন আবার মরজিনার অবলম্বন খুঁজতে কী যে ব্যাকুলতা এল! ছটফটানি শুরু হল। কোথায় সে?

সূর্য ওঠা পর্যন্ত মেলা ও আস্তানা তন্নতন্ন খুঁজলুম। সে নেই। তা হলে কি বাড়ি ফিরে গেছে? ঘুরতে ঘুরতে বাঁধে গেলুম। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লুম মাটিতে। সিগ্রেট টানা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে? এদিকে ফের ঘুমটা আসছে। আরও মারাত্মক হয়েই আসছে।

কখন দু'হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে বসে বসে ঘুমোচ্ছি। পিঠে রোদ লাগছে টের পেলুম। মুখ তুলে পৃথিবী দেখলুম। উজ্জ্বল রোদে ভেসে যাচ্ছে সব কিছু। আমার পিঠের দিকে গাছপালা। গুঁড়ি ফাঁক দিয়ে সূর্য আলো পাঠিয়ে দিয়েছে। মাথা ঘুরছে। কেন যে ছাই চলে এসেছিলুম এখানে! কী পেলুম? না শোনা হল গান, না ডোবা হল ভাবের জগতে! শুধু কষ্টই পেলুম।

খড়খড় আওয়াজ শুনে ঘুরে দেখি ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে আবদুল্লা আসছে। খালি গা। আলখেল্লা কোমরে জড়ানো, গেরুয়া লুঙির হাঁটুর কাছটা ছেঁড়া। মুখটা গম্ভীর—কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। চোখদুটো জ্বলছে। লাল। ঝড় খাওয়া গাছের মত চেহারা।

কিছু বললুম না। অন্য দিকে ঘুরে মেলা ও আস্তানাটা দেখে নিলুম। বিলকুল ফাঁকা। ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে সব। খাঁ খাঁ করছে পীরের থান। সামিয়ানাটাও নেই। নদীর তলায় শেষ দলটা চলে যাচ্ছে সবে। খুবই অবাক লাগল। একরাতের খেলা তা হলে কি নিছক স্বপ্ন?

আবদুল্লা এসে পাশে বসে পড়ল। একটু হেসে বলল—'পুলিশ না এলে শালাকে জানসুদ্ধু খতম করতুম! আফশোস!'

গম্ভীর মুখে বললুম—'তুমি মহাবীর!'

—'স্যার কি রাগ করেছেন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বললুম—'মারামারি করছিলে কেন?'

—'আমি করিনি। চড়ায় গিয়ে বসে ছিলুম। ও আচমকা গিয়ে...'

—'মিথ্যে বলো না। তোমার সঙ্গে মরজিনা ছিল।'

—'হুঁ ছিল...', ঘুরে দেখি, মুখটা নীচের দিকে। আঙুলে মাটি খুঁটছে। একটু পরে ফের বলল—'কিন্তু আমি তো তাকে ডাকিনি! আমার কী দোষ? ঘিয়ের কাছে আগুন গেলে গলবে না?'

আমার চোখে চোখ রেখে সে হঠাৎ হিংস্রতায় ফেটে পড়ল।—'বলুন! গলবে না? বলুন!'

আমার কাছে যেন জবাব না পেয়েই আবদুল্লা আরও ক্ষেপে গেল। গলা থেকে পাথরের মালাগুলো পটাপট ছিঁড়ে তরমুজের ক্ষেতে ফেলে ছিল। তখন ওর হাতটা ধরে ফেললুম।—'আরে! করছ কী আবদুল্লা! তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে নির্ঘাৎ! মালা ছিঁড়ে ফেললে! এখন গলায় কী দেবে বলো তো?'

আমি না হেসে পারছি না। ওর ওই 'বলুন' প্রশ্নটার মধ্যে যে বাচ্চা ছেলের দাবি আর ভঙ্গী ছিল, মালা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলাতেও তাই। বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা সে। এ হয়তো স্বাভাবিক। আমার হাত থেকে নিজের হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে সে মুখ নীচু করে বলল—'আজ আমি ধর্ম দিয়েছি মাস্টার! আমার সবটুকুন মান ইজ্জত রসাতলে গিয়েছে!'...এবং ঠিক রাতের

মতো পেট খামচে ধরে ককিয়ে উঠল—'আঃ আহা—হা—হা!'

চমকে উঠেছিলুম। পিঠে হাত রেখে বললুম—'ধর্ম গিয়েছে বলছ কেন?'

আবদুল্লা দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে ভাঙা গলায় বলল—'অত বড় পাস দিয়েছেন, এটা বোঝেন না স্যার? আবদুল্লার মারফতী নষ্ট হয়েছে। আঃ আহা—হা—হাঃ!!'

আমি তাজ্জব। আউল জগৎ এতদিন আমার বাইরে বাইরে ছিল। এবার যেন ভেতরে পা দিয়েছি। এই আউল মানুষগুলোকে কিছুতেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলাতে পারছিনে। এরা যেন অন্য ধাতুতে গড়া। এদের মানসিকতা আলাদা। চিন্তা ভাবনা আলাদা। রুচি ইচ্ছা পাপ পুণ্যবোধ সম্পূর্ণ পৃথক। যেন গ্রহান্তরের মানুষ!

তাহলে বাঘিনী চুপিচুপি এগিয়ে আজ রাতের শেষ যামে নদীর চড়ায় হরিণের শরীরে নখ আর দাঁত বসিয়েছিল! সবটুকু রক্ত শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলেছে। আবদুল্লা ফকিরের তপস্যা বলতে যা কিছু ছিল, সব নষ্ট হয়ে গেছে।

আবদুল্লা আবার ককিয়ে উঠল—'আমার সব বরবাদ হয়ে গিয়েছে স্যার! আবদুল্লার জিন্দেগীটা (জীবন) জুঠা (এঁটো) হয়ে গিয়েছে। আঃ! আহা—হা—হা!'

ওকে কী ভাবে বোঝাব ভেবে পেলুম না যে, এটাই পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম। তাই যা কিছুই ঘটুক—কোন অন্যায় হয়নি, কিংবা এতে পাপেরও কিছু নেই। আমার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সে বুঝবে বলে মনে হয় না। তাই ধমক দিয়ে বললুম—'তুমি কী আবদুল্লা। তুমি পুরুষ না হিঁজড়ে? পুরুষের কাজ করেছ। তাই বলে এখন মেয়েছেলের মতো কান্নাকাটি করতে হবে? শুনলে লোক হাসবে না?'

আবদুল্লা জোরে মাথা দুলিয়ে বলল—'আপনি বুঝবেন না গো কিছু বুঝবেন না।'

জেদের সঙ্গে বললুম—'বুঝে কাজ নেই! তোমাদের ও সব আজগুবি ব্যাপার আমি বুঝতেও চাইনে। এখন যা বলছি, শোন। যা হবার হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে কেটে পড়ো। আমার দলের ভাগ্যে কী হল কে জানে। চলো, আমরা সোজা রাস্তা ধরে কোন স্টেশনে যাই। তারপর—'

আবদুল্লা বাধা দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে গেছো বাবা খোনা মাস্তান হিঁ হিঁ করে হেসে উঠল—'তোঁরা কী কঁরছিস রেঁ এঁখনও? ঘঁর যাঁবিনে?'

দিনের আলোয় তাকে দেখলুম। রোগা পাঁকাটি গড়ন, গায়ে ময়লায় চাকরা-বাকরা, মাথাভরা জটা, গোঁফ-দাড়িও অসামান্য—একটা ভূতের মূর্তি!

হাতে ও পায়ে বড় বড় নখ দেখে ঘেন্না হচ্ছিল। কোমরে কোনমতে আব্রু রক্ষা করার মতো একফালি কালোকুচ্ছিত লেঙটি আছে। রাতে এই মূর্তিটা এখনকার মতো দেখতে পেলে নির্ঘাৎ ভিরমি যেতুম। সব চেয়ে খারাপ লাগল, ও আমার পা টিপেছে ওই নোংরা হাতদুটো দিয়ে। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো। এক্ষুনি স্নান না করে ফেললে চলবে না।

আবদুল্লা ওর দিকে নজর দিল না। আমি তেড়ে গেলুম—'তুমি আবার পেছনে ঘুরছ কেন? ভাগো বলছি!'

মাস্তান ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর ঠোঁট উল্টে অভিমান দেখিয়ে বলল—'ওঁরে আঁমার চাঁদু! মেঁহ্‌মানি ক'রবি ব'লে ডাঁকতে এ'লুম-তোঁ ব'লে কি'না—যাঁ ভাঁগ!

আমার ভঙ্গী নকল করে সে ফের হেসে উঠল ভুতুড়ে গলায়।

চড় তুলে বললুম—ভাগ্! মেহ্‌মানি করবি? কি খাওয়াবি, শুনি?'

হঠাৎ খুব সিরিয়াস হয়ে গেল মাস্তান। গম্ভীর মুখে থানের দিকে হাত নেড়ে যা বলল, তা হল এই ঃ থানের আশেপাশে বিস্তর মানতে মুরগি-মোরগ চরে বেড়ায়। প্রতি জ্যৈষ্ঠের শেষ রোববার লোকেরা অনেক মোরগ-মুরগি মানত মেনে থানে ছেড়ে দেয়। সেগুলো এখানেই চরে ফিরে খায়। রাতে গাছপালায় আশ্রয় নেয়। মানতে জীব তো কেউ ধরে খায় না। তাই জঙ্গল খুঁজলে অনেক মিলবে। বুনো হয়েছে বটে, তবে তাড়িয়ে ধরাটা তেমন কঠিন কাজ নয়। অতএব আমরা যদি অন্তত একটা ধরতে পারি, খেয়ে তাজা হয়ে যাব। দরবেশ বকবেন! দরবেশকে পাঁচসিকে সেলামী দিতে পারব না?

মাস্তান ফিসফিস করে আরও জানাল ঃ এমনি করে দরবেশ গোপনে অনেকের কাছে সেলামী নিয়ে মুরগি ধরার হুকুম দিয়েছে। তারা কে? ইন্দ্রার ছেলে ছোকরা চ্যাংড়ারা—আবার কে? তারা মদ খায় যে। মদের চাট সস্তায় পেতে থানের জঙ্গলে চলে আসে। তারা তো কিছু মানে না পীর বা ফকির। অলিআউলিয়ার বুজরুকিতেও বিশ্বাস নেই।

যদি দরবেশকে সেলামী না দিয়ে ধরে? ধরুক না। তক্ষুনি দরবেশ খবর দেবে ইন্দ্রার মোড়ল-মাতব্বরদের। বিচার হবে মুরগি-চোরদের। ইন্দ্রার মোড়লরা খুব বিশ্বাসী মানুষ। তবে দরবেশ তো কানা মানুষ—অনেক সময় মুরগি কেউ ধরলেও টের পান না। পায় শুধু এই মাস্তান বাবা। কারণ, সারা জঙ্গলে গাছপালায় হনুমানের মতো ঘুরে বেড়ায় সে। গাছের ডালে বসেই সাধনভজন করে। তার চোখ এড়াবে সাধ্য কার?

ওই মুরগি খেলে শাপ লাগবে না তো? না, না—মোটেও না। দরবেশের হুকুম নিয়ে খেলে কিচ্ছু হবে না। কিন্তু না জানিয়ে খেলে মুখে রক্ত উঠবে। কত জনের উঠেছে। বলাই শেখের ছেলে সেবার তাড়ির সঙ্গে মানতে মুরগির মাংস তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। গলায় আটকে দম্ আটকাল! ব্যাস্! দেখে

আয় গিয়ে, তার কবরের ওপর শ্যাওড়াগাছ গজিয়েছে। সেই গাছের ডালে বসে একটা কাক ডাকে সব সময়—কা কা কা! খা খা খা! কাকটা ঠাট্টা করে, বুঝতে পারলি তো!

'সব বুঝলুম—কিন্তু মাংস কাটাকুটি রান্নাবান্না কী ভাবে হবে? আর, সঙ্গে ভাতও তো চাই।'

মাস্তান হাতের ইসারায় একটা মাটির পাত্রের আয়তন দেখিয়ে জানাল—দরবেশের ঘরে চাল আছে। হাঁড়ি আছে। মশলা পাতি মাস্তানকে পয়সা দিলেই এনে দেবে। তেলের শিশিরও অভাব নেই। শুধু আরও পাঁচসিকে পয়সা দিতে হবে দরবেশকে।

আর হাঁড়িতে কিছু বেশি চাল যেন দেওয়া হয়। এ বেলা দরবেশ তাহলে কষ্ট করে রাঁধবেন না। কানা মানুষ। রাঁধতে কষ্ট হয়। এদিকে উনোনে লকড়ি ঠেলতে ঠেলতে মাস্তানের দুহাতের অবস্থাটা একবার দ্যাখ্ ছেলেরা!... সে দ'শহাতের তালু চিত করল। তারপর হি' হি' করে হেসে বলল—'হ্যাঁরে! আমি অ'ত ক'ষ্ট ক'রব। তো'রা দু'-মু'ঠো না' দি'য়ে কি' খে'তে পা'রবি?'

আবদুল্লা এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল। বললুম—'শুনলে তো? চলো আজ আস্তানায় বনভোজন করা যাক্। খালি পেটে পথ চলতে কষ্ট হবে।'

আবদুল্লা অন্যমনস্কভাবে বলল—'আপনি চলুন। আমি নদীতে একটা ডুব দিয়ে আসি।'

—'নদীতে তো পানিই নেই দেখছি।'

আবদুল্লা দক্ষিণের বাঁক দেখিয়ে বলল—'ওখানে একটা দহ আছে।'

গত রাতে তাহলে ও সবখানে চষে বেড়িয়েছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছিল কি? অথচ নদীটা যেন বিশাল বাধা হয়ে ওকে আটকে ছিল। হয়তো নদীর চড়ায় নেমে ওপারে পালাবার মতলব করতেই বাঘিনী গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—'আমিও নাইব। চলো।' বলে মাস্তানকে বললুম—'আমরা আসছি। দরবেশকে গিয়ে বলে রেখো কিন্তু।'

মাস্তান দুহাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা পা বাড়ালুম। বাঁধ ধরে কিছুটা গিয়ে পিছু ফিরে দেখি, তখনও মাস্তান একই ভঙ্গিতে আছে। এতক্ষণে মনে হল, কাল রাতে আমাদের গতিবিধি ওকে কৌতূহলী করে তুলেছে। সে ত আসলে একজন মানুষ।

কিন্তু তারপরই ওর জন্য বড় মায়া হল। একটু অনুতাপও জাগল। ওকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা অন্যায় হয়েছে। ওর মধ্যে শিশুর সারল্য আর বয়স্কের মানবতাও কি কম? কেমন পা টিপে দিচ্ছিল অত রাতে! আর, এখন হঠাৎ এসে খাওয়ার কথাটাও বলল।...মন কেমন করে উঠল। বাইরের খোলস দেখে কতটুকু চেনা যায়? বাইরে ও পাগলাটে স্বভাবের এক নোংরা মানুষ—অথচ ভেতরে কী জ্বলজ্বলে মানুষামি ঝক্ ঝক্ করছে! মনে মনে বললুম—

ক্ষমা কর।

দহের ধারে এসে মুখ তুলল আবদুল্লা। কাঁধের ঝোলায় হাত ভরে বলল—'বাড়তি লুঙি আছে। জামাও আছে একটা। তবে হাফশার্ট্। ফকিরি লেবাস (পোশাক) নয়। মাঝে মাঝে পরি।'

ঝোলাটা কি ভাবে অত কাণ্ডের পর বাঁচাল বোঝা গেল না।

কানা দরবেশকে আড়াইটে টাকা গুণে দিতেই হাত বাড়িয়ে নিল এবং টিপে টিপে পরখ করল, ওকে ঠকাচ্ছি কি না। তারপর বলল—'আধুলিটা মেকি নয় তো বাবা? অন্ধকে নিয়ে মস্করা করতে নেই।'

ওকে আশ্বস্ত করার পর খোনা মাস্তানকে নিয়ে মুরগি ধরতে বেরিয়ে পড়লুম। আবদুল্লা এখন অন্য মানুষ। গাঁয়ের যোয়ান ছেলে। হাতে একটা ডাল নিয়েছে। থানে তিনটে মুরগি আর একটা প্রকাণ্ড লেগহর্ন মোরগ শুকনো পাতা উল্টে পোকা খাচ্ছিল। মোরগটা দেখে চেঁচিয়ে উঠলুম—'ওইটে!' মাস্তান হিঁ হিঁ করে হাসতে লাগল। আবদুল্লা ডালটা ছুড়ল ঠ্যাং লক্ষ্য করে। লাগল না। আচমকা বনের স্তব্ধতা ও প্রশান্তি খান খান হয়ে গেল বিকট ক্যাঁ কোঁ চেঁচামেচিতে। মুরগি তিনটে যথার্থ পাখির মতো দিব্যি উড়ে ঘন জঙ্গলে গিয়ে পড়ল। লেগহর্ন উঠে গেছে মাদার গাছের ডগায়। সেখান থেকে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে আর আপৎকালীন আওয়াজ দিচ্ছে—ক'ক্ কঁ কঁ কঁ কক্ কক্! আবদুল্লা দ্বিতীয় বার ডালটা ছুড়লে সে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে গাছপালার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ওরা বুনো হয়ে গেছে।

খোনা মাস্তান পরামর্শ দিল—গত-কাল যে সব মুরগি মানত দিয়ে গেছে, সেগুলো এখনও বুনো হয়ে যায়নি। ঘরপোষা হাতঘাঁটা জীব তারা। কিন্তু কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে সারা জঙ্গল তোলপাড় করছি। পাত্তা নেই। একখানা অনেক ডানা পাখনা দেখা গেল। শেয়ালের কীর্তি নিশ্চয়। মাস্তান এই জঙ্গলের ভাল ট্র্যাকার এবং বিশেষজ্ঞ। সে জানাল—শেয়ালের খুব উৎপাত আছে এখানে। থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া অনেক মানুতে মুরগি থান থেকে পালিয়ে নদীর ওপারে যায়। ঘরপোষা জীব ঘরের খোঁজে যাবেই। এদিকে আজকালকার মানুষ বড্ড লোভী। কৃপণ এবং স্বার্থপর। মুরগি ফিরে গেলে বলবে—পীর দয়া করে ফেরত পাঠিয়েছেন। অতএব ধরে খেলে কোন পাপ নেই।

খোনা ভূতটার একঘেয়ে নাকি স্বর শুনে শুনে তেঁতো হয়ে গেলুম। সব কথা বোঝাও যায় না। আবদুল্লা তার পাবড়া তুলে তেড়ে গেল—'থামবি শালা?' মাস্তান অভিমানে চুপ করে গেল।

এই বনভূমিতে নিজেদের দেখাচ্ছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের তিনটি আদিম প্রাণী। শিকারে বেরিয়েছি। আর এই মাস্তানটা আমাদের গোষ্ঠীর রোজা

—ওর আধিভৌতিক বিদ্যার জোরে শিকার মিলবেই মিলবে। আবদুল্লাকে তো ভীল যুবক মনে হচ্ছিল। গলায় তক্তি, হাতে বালা, লুঙিটা মালকোচা করে পরা। খালি গা। ঝাকড় মাকড় চুল আর হাল্কা গোঁফদাড়িতে ওর আদিম সৌন্দর্য খুলে গিয়েছিল তখন।

কিন্তু আর কাঁহাতক ঘোরা যায়? হন্যে হয়ে জঙ্গলের পূর্বদিকে উলুকাশের বিলাঞ্চল ঘুরে ফের যখন থানে এলুম, তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ঘামে স্নানের সুখ নষ্ট হয়েছে। আবদুল্লা চোখ পাকিয়ে বলল,—'চলুন, টাকা ফেরত নিই। এই খোনা শালা ধাপ্পা দিয়েছে! বরাতে গোস্ত-ভাত নেই।'

ওর কথা শেষ হতে না হতে মিরাকল্ ঘটে গেল। খোনা মাস্তান মাথা নীচু করে ঝড়ে কাত হয়ে থাকা একটা হিজল গাছের তলা দিয়ে এগোচ্ছিল। আচমকা মাথার ওপর তাকে হাত বাড়াতে দেখলুম। তারপর কোঁ কোঁ কোঁ চেঁচামেচি এবং ওর হাতে একটা মাঝারি সাইজের মুরগির ঠ্যাং দেখা গেল। আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম। আবদুল্লা দৌড়ে গিয়ে মুরগিটা কেড়ে নিল। মহা আনন্দে তিনজন থানের দিকে দৌড়লুম। সবার আগে মাস্তান। সে দুহাত তুলে নাচতে নাচতে যাচ্ছে।

আস্তানার ভাঙা ফটকে ঢুকেই আবদুল্লা থমকে দাঁড়াল। আমিও। কানা দরবেশের কাছে বসে আছে মরজিনা বিবি। সদ্য নেয়েছে। ভিজে চুল পিঠের ওপরে ভেসে যাচ্ছে। পরনে ফিকে হলুদ ডোরাকাটা তাঁতের সাড়ি—একেবারে নতুন। টকটকে লাল ব্লাউজ পরেছে। কপালে একচিলতে কাচ পোকার টিপ। নাকে নাকছাবি। আমাদের দিকে ঘুরে বলল—'মেহমানী করতে এলাম, মাস্টার!'

আড়চোখে দেখি, আবদুল্লার মুখটা গম্ভীর। সে মুরগিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাওয়ায় উঠল এবং তার ঝোলা থেকে একটা ছুরি বের করল। দেখে আঁতকে উঠলুম। সর্বনাশ! এ যে রীতিমতো ড্যাগার! সাত আট ইঞ্চি ফলা চকচক করছে। বাঁটটা সাদা এবং নকশা-কাটা। এ সব ছোরা খাপে ভরা থাকে। ঝোলার মধ্যে নিশ্চয় খাপ আছে।

সে মাস্তানকে ডাকল—'আয় রে! জবাই করি। ভাল করে ধরবি। হাত ফসকে পালালে তোকেই জবাই করব।'

মাস্তান ঘাড় নেড়ে হি হি করতে করতে এগিয়ে এল। মুরগিটা সে যে ভাবে ধরল, বোঝা গেল এ কাজে সে অভ্যস্ত। আস্তানার বাইরে চলে গেল দুজনে। ফটকের বাইরে থেকে আবদুল্লা হঠাৎ আমাকে ডাকল—'এক বদনা পানি আনুন স্যার।'

হ্যাঁ, জলটা জরুরী। রক্ত ধোয়ার জন্যে তো বটেই—ধর্মীয় প্রক্রিয়া হিসেবে জবাই করা মুরগির গায়ে জল ছিটোতে হবে। মরজিনা উঠে গিয়ে দরবেশের

এনামেলের বদনাটা এনে দিল। জল ছিল তাতে। মরজিনার ঠোঁটে চাপা হাসিটুকু আমার চোখ এড়াল না। পীরিতের নেশায় আউলের মেয়ে যেন নিজের আত্মাকে বাজী ধরেছে।

মুরগি কাটা দেখতে আমার কষ্ট হয়। মুখ ফিরিয়ে বদনাটা রেখে চলে আসছি, আবদুল্লা ফের ডাকল।—'কথা আছে স্যার, যাবেন না।'

মাস্তান কাটা মুরগিটা নিয়ে একটা গাছের তলায় হাত পা ছড়িয়ে বসল। ডানা ছাড়াতে ব্যস্ত হল। ওর নোংরা হাতের কথা ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু আবদুল্লা আমার হাত ধরে টেনেছে। ওর হাতে ধোয়া ছুরি। সে চাপা গলায় বলল—'আবার এসেছে।'

হাসলুম!—'হুঁ। এসেছে তো।'

—'কী করব বলুন তো স্যার?'

—'কী করবে?'

আবদুল্লা ছুরির ধারটা আলতো আঙুলে পরখ করতে করতে বলল—'আপনি না থাকলে এই জঙ্গলে শালীকে জবাই করে পুঁতে দিতুম।'

—'পারতে?'

—'আমি সব পারি।'

—'কিন্তু ও তোমার প্রেমে পড়েছে। প্রেম কে পায় আবদুল্লা?'

—'আমি স্ত্রীলোকের প্রেম টেম চাইনে। আমি একজনাকেই ভজি। নিরাকার সাঁই নিরঞ্জন।'

—'বেশ তো। সোজা বলে দিও।'

মিটিমিটি হাসছিলুম। আবদুল্লা আমার চোখে চোখ রেখে বলল—"আচ্ছা মাষ্টার। নারী আর পুরুষে সহবাস করলে বাচ্চা হয়। হয় তো?"

—'হয় নিশ্চয়। তা না হলে তুমি আমি—এ সব মানুষ কি ভাবে এল দুনিয়ায়?'

—'যদি বাচ্চাটাচ্চা এসে যায়, কী হবে?'

ওর কাঁধে হাত রেখে বললুম, 'তুমি এখনও বড্ড ছেলেমানুষ আবদুল্লা। ওকে বিয়ে করে ফেললেই সব চুকে যায়। অবশ্য, ওর স্বামী আছে। কিন্তু ও তো স্বামীকে ভালবাসে না।'

আবদুল্লা বুদ্ধিমান হয়ে বলল—'যদি স্বামী ওকে তালাক না দেয়?'

সমস্যা। মুসলিম শরীয়তে স্ত্রীর তালাক দেবার অধিকার নেই। স্বামীর আছে। বললুম—'কোন মেয়ে যদি স্বামীকে না চায়, একদিন না একদিন তালাক পাবেই।'

আবদুল্লা অস্থির হয়ে বলল—'কদ্দিন? কদ্দিন পথ তাকিয়ে থাকব, বলুন তো? সে আমার পোষাবে না। আপনাকে বলে রাখছি মাষ্টার, আমার এটুকুন ভুলচুকের জন্যে খামোকা পেটের বাচ্চা জন্মে কষ্ট পাবে—আসল

বাবাকে খুঁজে পাবে না—এটা হয় না। আমি ওকে জবাই করে' পালাব।'

শিউরে উঠলুম। ওর কথার ভঙ্গী যথেষ্ট সিরিয়াস। ওকে আর এ সব ব্যাপারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সত্যি ও খুন করতে পারে। কঠোর স্বরে বললুম—'আবদুল্লা। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মরজিনার যদি এতটুকু ক্ষতি হয়, তুমি বাঁচবে না। আমার সব পরিচয় তুমি পাওনি। ভেবেছ, আলকাপের দলে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াই—এ আবার কে? তুমি হুঁশিয়ার!'

আবদুল্লা বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছিল। আমার কড়া হুমকি শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শুকনো হাসল। হাসতে হাসতে মাথাটা দোলাল। তারপর বলল—'আপনি বুঝবেন না গো, বুঝবেন না। এই আবদুল্লা কী ছিল, কী হয়ে গেল।'

—'আমার গা ছুঁয়ে বলো, মরজিনার কোন ক্ষতি করবে না।'

সে আমার চোখে চোখ রাখল। আশ্চর্য, ওর মুখে এক খামখেয়ালি ছেলেমানুষের আদল দেখতে পাচ্ছি। চাপা হাসছে সে। নিছক দুষ্টুমির ছাপ পড়েছে হাসিতে।

—'গা ছুঁয়ে বলো, আবদুল্লা।'

—'বলছি গো, বলছি। তাই বলছি।' বলে সে আমার হাতে হাত রাখল।

এ সময় ফটকে মতিজনাকে দেখা গেল দৌড়ে আসতে।—'ও মাস্তান বাবা! মরেছে রে, মরেছে! ও কি করে ডানাপাখ্না তুলছ তুমি? সব ছাল উপড়ে গেল যে। ছি ছি ছি! দাও, আমাকে দাও। হেগে ছোঁচে না—তাকে দিয়েছে মুরগি ছাড়াতে। লোকগুলোর এতটুকু বুদ্ধি নেই!'

সে আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে মাস্তানের হাত থেকে মুরগিটা কেড়ে নিল।...

দরবেশের ঘরে শিল নোড়ারও অভাব নেই। ইন্দ্রা থেকে মাস্তান মশলাপাতি আনল। প্রকাণ্ড কাঠ-মল্লিকার তলায় ইটের উনুন করা হল। কারণ, এ তো বনভোজন। আবদুল্লা আর মরজিনার মধ্যে টুকরো কথাবার্তাও চলতে থাকল এবং ওদের সংলাপের দিকে কান পেতে বসে থাকলেও রোমান্টিক কিছু নয়। নেহাৎ কেজো কথার আলাপ। যেমন—'আউলের ছেলে, পেঁয়াজ কাটো তো!'...

'অত মাল দিচ্ছ কেন? হুঁ। ছিলিম টেনে টেনে জিভ দগদগে হয়ে গেছে বুঝি? সইবে না?' একটু হাসি। তারপর দ্বারকা নদীর মাছের কথা। দহের 'জ্যান্ত পাথরটা'র কথা—যা অনেক মানুষ মেরেছে। ওদিকে আবদুল্লার এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা। একবার কলকাতা যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। হাওড়া স্টেশনে নেমেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে আসছে। এক স্টেশনে শোনে, এ

গাড়ি যাবে মেদিনীপুর। কি বিপদ তখন।...বিপদ কিসের? যদ্দুর গাড়ি যায়, গেলে ক্ষতিটা কী? দুনিয়াটার ওড় কোথায়, দেখতে ইচ্ছে করে না? মরজিনার ত করে। ইচ্ছে করে, রেলগাড়ি চেপে চলে যায়—চলেই যায়—শুধু চলেই যায়—কতদূর—কতদূর; ঘরের জন্যে একটুও মন খারাপ করবে না।... বোষ্টমীদের মতো ভেক নিলেই হয় তাহলে।—ইচ্ছে করে বই কি। কিন্তু তেমন বোষ্টমটি কই?...

এই বাক্যটিতে কিঞ্চিৎ রোমান্টিকতার আঁচ ছিল। আবদুল্লার জবাব শুনতে ওঁৎ পেতে আছি—ব্যাটা হাঁদারাম চুপ করে গেছে তো গেছেই।

কিন্তু একটা ব্যাপার এতক্ষণে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। গত রাতে দুজনের মধ্যে যা ঘটেছে, তা খুবই আকস্মিক এবং বিনা ভূমিকায়। হঠাৎ আদিমতম প্রবৃত্তির বিস্ফোরণ ঘটেছিল—প্রস্তুতির অবকাশ দেয়নি। তাহলে বলা যায়, হঠকারী শরীরের সিঁড়ি বেয়ে প্রেমের পাহাড়ে চড়ার ব্যর্থতা ঘটে গেছে। এই হয়তো সেই আদি মানুষ-মানুষীর পতন। প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে শরীরের দরগায় ওরা পোঁছবার সুযোগ পেল না!...

রান্না শেষ হতে সূর্য একটু ঢলে গেল। চারজন পুরুষ দাওয়ায় বসেছি। সামনে চারটে এনামেলের থালা—আস্তানার সম্পত্তি। সেই সময় 'মালেক সাঁই মওলাঃ' হাঁকতে হাঁকতে দুই আলখেল্লাধারী ফকির হাজির। দুজনের একজন মদনচাঁদ। সে গম্ভীরমুখে ঢুকছিল। দাওয়ার কাছে এসে ইয়া রব্ (হে খোদা!) বিকট হাঁক মেরে নাচ জুড়ে দিল। তার সঙ্গীও বুড়ো। লোভার্ত চোখে খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মরজিনা ধমক দিয়ে বলল— 'একটু অপিক্ষা করতে হবে। মেহমানরা খাক্ আগে।'

মদনচাঁদ বলল—'আমরা কি মেহমান নই রে জননী?'

কানা দরবেশ বললেন—'ভাতে কম পড়লে, বেটি মরজিনা, কুঠিতে চাল আছে—ফের হাঁড়ি চড়াও। তক্লিফ কিসের? ভাই সাহেবরা, বসুন। ততক্ষণ জিরিয়ে নিন।'

মরজিনার পাকা গিন্নির চালচলন। মাঝে মাঝে বাঁ হাতের চেটোয় নাকের ডগা ঘষে নিচ্ছে। ঠোঁট কামড়ে হাতায় ভাত তুলে বলছে—'আরো চাট্টি দিই?' গত সন্ধ্যায় পরিবেশনের সময় ওর এই চেহারার অনেকটাই চাপা ছিল।...

ফের রান্না চড়ল। এবার আবদুল্লা কলসী নিয়ে নদী থেকে জল এনে দিল। ওই জলই আমরা খেয়েছি। এ সময় হঠাৎ মদনচাঁদ ডাকল—'বেটি মরজিনা! কাপাসীর থানা থেকে আসছি। তোর দোস্ত-বাপও আমার সঙ্গে ছিলেন। খুব সাধাসাধি করলুম, জামাইয়ের জামিন দিলে না। শালা ব্যাটা দিনদুপুরে মোতিহাজির দোকানে সিঁদ দিয়েছিল। হাজি গেছে জোহরের (দুপুর) নামাজ পড়তে। পেছনের গলিতে গিয়ে জানালা ভেঙেছে। হাত বাকশোতে তের টাকা ক'আনা ছিল। তাই নিয়ে কেটে পড়েছে। এদিকে

বেরোবার সময় কুলসুমের মা গলিতে গোবর চাপড়ি ছাড়াতে গেছে। গিয়ে শালা চোট্টার মুখোমুখি।...'

মরজিনা উনোনে লকড়ি ঠেলতে থাকল। কোন মন্তব্য করল না।

মদনচাঁদ একটু ইতস্তত করে কাশল। কেশে ফের বলল—'তবে একটা খারাপ খবরও আছে, বেটি। কান করে শোন্।'

মরজিনা একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—'দশ যেখানে, খোদা সেখানে। দশের সামনে খুলে বলতে দোষ দেখি না বেটি।'...বলে ফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ল বুড়ো। ফের বলল—'তোর কপাল মন্দ রে! সখ করে কালসাপ ঘরে এনেছিলুম, চিনতে পারিনি। দুধ কলা দিয়ে পুষে এবার ডংশে দিলে।'...সে কেঁদে উঠল।

আবদুল্লা আপন মনে ছিলিম তৈরি করছে। মুখটা নীচু। কানা দরবেশ জলচৌকিতে বসে মালা জপছেন। মাস্তান গাছতলায় মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে ঠ্যাঙ নাচাচ্ছে। আমি বললুম—'কি ব্যাপার?'

মদনচাঁদ ভাঙা গলায় বলল—'থানার বারাণ্ডায় সবার সামনে শালার ব্যাটা শালা চেঁচিয়ে বলে দিলে--তোমার বেটিকে তালাক্ তালাক্ তালাক্—তিন তালাক্!'

মরজিনা ফের একবার তাকিয়ে মুখ ঘোরাল।

কান্না সামলে নিয়ে মদনচাঁদ বলল, 'ভাবিস নে মা! তিন মাস দশদিন বাদে আবার তোর নিকে দোব। এবার আর ভুল হবে না। সোনার চাঁদ রাজার ব্যাটা রাজা এনে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো ছিটোব।'

তার সংগী বলল—'হ্যাঁ আমার হাতে তেমন ছেলে আছে...'

ওরা যখন কথা বলছিল, একটা কথা আমার মাথায় ঘুরছিল ক্রমাগত। মনসুরের সঙ্গে আবদুল্লার মারামারির কারণ কি মদনচাঁদ বুঝতে পারেনি? না বোঝার মত বোকা তো সে নয়! জামাইটি তার স্নেহভাজন ছিল সত্য। জামাইকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে সে মাথা কুটছিল। এমন কি থানা অব্দি গিয়ে সাধাসাধিও করেছে জামিনের জন্যে।

এখন ফিরে এসে সে মেয়েকে দেখছে আবদুল্লাকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে কানা দরবেশের আস্তানায়। অথচ কোন ভাবান্তর দেখতে পাচ্ছি না তার। এর মানে কী?

শেষ অব্দি কথাটা ছেড়ে দিলুম! মনে মনে মেনে নিলুম যে এই সব ফকির বাউলের রীতিনীতি বা মনস্তত্ত্ব বোঝার সাধ্য আমার নেই। আবদুল্লার কাণ্ড দেখে তো টের পেয়েই গেছি, এরা যেন গ্রহান্তরের মানুষ। বৃহত্তর যে সমাজের মানুষ আমি, তার বাইরে এক আলাদা গণ্ডীর মধ্যে এরা থাকে। এদের নিজস্ব ধ্যানধারণা চিন্তা ভাবনা আছে—যার সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। থাকতেও পারে না।

তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি বরাবর। দু’ চারজন ফকির বাউল দৈবাৎ এক্ জায়গায় এসে পড়লেই গাঁজার ধুম পড়ে যায়। তারপর গানের আসর তো বসবেই।

দুই বুড়ো ফকির হাত পা ছড়িয়ে বসে প্রচণ্ড রকমেরই খেল। তারপর মর্জিনাকে খাবার হুকুম দিল। তখন বিকেল প্রায় চারটে। কারও কাছে ঘড়ি নেই। অবশ্য এরা ঘড়ির ধার ধারে না। যদিও বাবুদের কাছে সময় জিজ্ঞেস করে। আমিও ঘড়ি ভুলতে বসেছি। শুধু আভাসে টের পাই কখন কটা বাজল।

মর্জিনা স্ত্রীলোক। তাই ঘরে ঢুকে সবার চোখের আড়ালে গেল। তারপর খেজুর পাতার একটা তালাই দিয়ে গেল। আমরা সবাই কাঠমল্লিকার ছায়ায় জাঁকিয়ে বসলুম। বসার পর মদনচাঁদ এতক্ষণে আবদুল্লাকে প্রথম যে কথাটি বলল, তা হল ঃ ‘মাণিক! কই তোমার সেই ঘর-পালা গাছের মাল? বাবাকে একবার শুঁকিয়েই ঝোলায় ভরে রেখেছ ছেলে? (জিভ কেটে) আ ছি ছি! অমন কত্তে নেই। গোনা (পাপ) হয়।’

আবদুল্লা সলজ্জ হেসে বিনীত-ভঙ্গীতে বলল—‘সাজি হুজুর।’

হঠাৎ চমকে ওঠা স্বরে মদনচাঁদ বলল, ‘অই বাপ্! তোর মালা কই? ও মাণিক! তোর গায়ে হাফশার্টের লেবাস! (পোষাক) এ কি কথা! আ ছি ছি ছি!’

আবদুল্লা কোন জবাব দিতে পারছে না। মুখ নীচু করে হাতের চেটোয় অন্য একটা ছোট ছুরি দিয়ে গাঁজা কুঁচোচ্ছে। মদনচাঁদ আমার দিকে ঘুরে দুঃখিত মনে প্রশ্ন করল—‘হুজুর কোন সংবাদ রাখেন?’

অগত্যা বলে দিলুম,—‘তোমার জামাইয়ের সঙ্গে মারামারির সময় ছিঁড়ে গেছে।’

কথাটা বলে হয়ত ভুল করলুম। মদনচাঁদ বলল—‘হুজুর মাস্টারজী! এখানে যাঁরা, তাঁরা সবাই আমার আপন। একটা কথা খালি আমি তখন থেকে ভাবছি। জামাই শালার সঙ্গে আমার এই বেটার কলহ হল ক্যানে? নাকি আগে থেকে কোথাও কোন রকম বিসংবাদ ছিল—এখন সামনাসামনি পেয়ে জাপটা জাপটি বেঁধে গেল? আমি তো কিছু ঢুঁড়ে পাই নাই বাপ!’

আবদুল্লা একবার তাকিয়ে মুখ নামাল। নারকোল ছোবড়াটা মদনচাঁদের সঙ্গীর দিকে এগিয়ে দিল। মদনচাঁদ ফের বলল—‘বেটা আবদুল্লা!’

তারপর গুমোট স্তব্ধতা। কাঠমল্লিকার ফুল পড়ছে। আস্তানার উঠোন ভরা মিষ্টি গন্ধ। মানুতে মুরগির একটা পাল এখন খানিকটা দূরে এঁটো-গুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুরগি হয়ে মুরগির হাড়ে ঠোঁটের ঠোকর চালিয়ে যাওয়া কোথাও দেখিনি। এখানে দেখলুম। অনেক রকম পাখি আছে এখানে। ‘বউ কথা কও’ ডাকছে কোথাও। একপাল সাতভেয়ে থানের মাদার

তলায় তলায় নেচে নেচে হল্লা করছে। টকটকে লাল ওই সব মন্দার ফুলের গায়ে নদীর পার থেকে সূর্য মুঠো মুঠো রোদ ছুঁড়ছে। এই সব প্রাকৃতিক প্রশান্তিকে মানুষের আবেগ খুব নাড়া দিচ্ছে মনে হল। মদনচাঁদ মুখ নামিয়ে আবদুল্লার মুখের দিকে ঝুঁকে ফের বলল—'শরম করিস না বেটা। বল্।'

আড়চোখে দেখলুম মরজিনা হাত দশেক তফাতে একটা ছাতিম তলায় দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছে—মুখ অন্যদিকে ফেরানো। মদনচাঁদ আবার আবদুল্লাকে ডাকতেই আবদুল্লা মুখ তুলল। তারপর নিষ্পলক চোখে বলল—'সাধু! তুমি বড় ন্যাকা।'

অমনি বুড়ো ফকির ছিটকে সরে গিয়ে এত জোরে হেসে উঠল যে কানে তালা ধরে যায়। হাসতে হাসতে সে এপাশে ওপাশে দুলতে শুরু করল। তারপর চেঁচিয়ে বলতে থাকল—'ওরে, এ কি কথা শোনালি রে! ও সাঁইজী! আমার কি হবে—হায়, হায় আমার কি হবে! তোমরা সবাই দ্যাখ, দ্যাখ—আমার বেটির মুখের পানে চেয়ে দ্যাখ—আর দ্যাখ আমার বেটার মুখখানা। তোমাদের মনে কী হয়, বলো। বলো, সবাই বলো। চাঁদে কলঙ্ক আছে, এ দুই মুখে নাই। আমি তো দেখি না বাবাসকল! আমি কিছু দেখি না।'

মরজিনা গর্জে উঠল—'বাপজান!'

—'এই মা! আমি মানুষ চিনি রে, চিনি। দেশে দেশে মানুষ দেখে বেড়াই। আমার চোখে ফাঁকি দেবে সাধ্যি কার? এ বেটা আমার বড় সাধক। ওর চোখে জ্বলছে মারকতী চেরাগ। ও বেটা বড় সহজ বেটা নয়।'

বুড়ো কি গৃহপালিত গাছের উৎকৃষ্ট গাঁজার লোভে আবদুল্লাকে এমন সার্টিফিকেট দিচ্ছে? কিছু অসম্ভব নয়। গাঁজার ব্যাপারে অনেক ফকিরই হয়তো এমন ক্ষণবাদী হয়ে যায়। আবদুল্লার গাঁজাটুকু টানার পর তখন ও কি বলে, শোনার অপেক্ষা করা যাক্।

মদনচাঁদ তার কথা শেষ হবার পর একতারায় বোল তুলে গেয়ে উঠল ঃ

'দেখে এলাম আজব বিক্ষ
আসমানে তার মূল।
ডাল ছাড়া তার পাতা গুরু
বোঁটা ছাড়া তার ফুল।
সেই বিক্ষে এক পাখি আছে।
দিবারাত্র বোল ধরিছে—
মহম্মদ রসুল।
আমি দেখে এলাম॥'

ইতিমধ্যে ছিলিম তৈরী। আবদুল্লা প্রথমে ছিলিমটা দু হাতে ধরে দৌড়ে কানা দরবেশের কাছে গেল। দরবেশ একখানা মোক্ষম টান মেরে ফেরত দিলে, সে ফের দৌড়ে আমাদের কাছে এল। তারপর মদনচাঁদের সামনে ধরল। মদন-

চাঁদ তক্ষুনি গান ও একতারা রেখে অন্তত এক মিনিট চোখ কপালে তুলে ছিলিমটা শোষণ করল। তারপর দিল তার সঙ্গীকে। ও বুড়ো যেন উপোসী ছিল। ছিলিমে ফুলকি উড়িয়ে শেষে আমার পালা। ব্যাপারটা বড্ড সংক্রামক। কোন রকমে আনাড়ি টান মেরে কাশতে কাশতে ফেরত দিলুম। আবদুল্লা কিন্তু ছোট্ট একটা টান দিল মাত্র। ওতেই ছিলিম খতম। সে হাতের তালুতে গরম ছাই ঢালল। ওদিকে মদনচাঁদ চোখ বুজে ফের গানটা নিয়ে পড়েছে।

ওটুকুতেই আমার ঘোর লেগে গেছে। তার ওপর সিগ্রেট টানা মাত্র ঘোরটা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তখন ওখানেই শুয়ে পড়লুম। ওদের গানের আসর চলতে থাকল। গাঁজার নেশায় গান শোনা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। স্বাভাবিক অবস্থায় ওই স্বাদটা মেলেই না। গানগুলোর শরীর অব্দি দেখতে পাচ্ছিলুম, যেন হাত বুলিয়ে দেওয়া যায়। শব্দগুলো জাঁকজমক সাজ পোশাক পরেছে মনে হচ্ছিল। একটি স্বরের আশে পাশে কত রকম স্বর স্বাভাবিক অবস্থায় অশ্রুত থাকে—সঙ্গীতবেত্তারা বলেন, এবং সেই সব অশ্রুত স্বর, এমন কি শ্রুতিপারের স্বরগুলোও স্পষ্ট শোনা যায়। শুনতে শুনতে নক্ষত্রলোক পেরিয়ে অন্ধকার কোন মহাকাশে তলিয়ে যেতে থাকলুম। তারপর কী ঘটল, জানি না। সেই অতল শূন্যতাময় অন্ধকারে কিন্তু 'আমি' নামক পিদীমটা দিব্যি জ্বলতে থাকল। শুধু এইটুকুই বলতে পারি।...

যখন জাগলুম, তখন আমার ওপর সুপরিচিত পার্থিব অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কোথায় আছি বুঝতে একটু সময় লাগল।

সেই কাঠমল্লিকার তলায় তালাইয়ে শুয়ে আছি। অজস্র ফুল আর বড়ো বড়ো পাতা পড়েছে গায়ের ওপর। উঠে বসে ঝেড়ে ফেললুম। আস্তানার ঘরে পিদীম জ্বলছে। ঘরটা কোণার দিকে বলে আলো আসছে না এখানে। গাছ-পালার ফাঁকে নক্ষত্র দেখা গেল। রাত কি বেশি হয়েছে? দাওয়ায় বসে অন্ধ দরবেশ দুলছে আর মালা জপছে। রাগ হল। কেন কেউ জাগিয়ে দেয়নি? আর ওরা গেলই বা কোথায়? এই সব ফকির ফাকরাগুলো বড্ড স্বার্থপর তো!

এই সময় ফটক দিয়ে আবদুল্লাকে তার টর্চ হাতে নিয়ে ঢুকতে দেখলুম। সে আমাকে বসে থাকতে দেখল নিশ্চয়—অন্ধকার খুব ঘন নয়। টর্চটা জ্বালল না। বলল—'মাস্টারজী, জেগেছেন?'

সে কাছে এলে বললুম—'হ্যাঁ। এরা সব কোথায়? তুমিই বা কোথায় ছিলে?'

আবদুল্লা বসে জবাব দিল—'নদীতে গিয়েছিলুম বাজে কাজে।'

'বাজে কাজ' মানে জৈব প্রয়োজনে যাওয়া। ওর প্রয়োজন বলতে কি

বোঝাচ্ছে, বলা কঠিন। বললুম—'মদনচাঁদরা বুঝি বাড়ি চলে গেছে?'

—'হ্যাঁ।'

একটু হেসে বললুম—'তোমাকে ডাকেনি বুড়ো?'

—'ডেকেছিল। যাইনি।'

খিদে পেয়ে গেছে। ফের একটা রাত এখানে কাটাতে হবে নাকি? সিগ্রেটও ফুরিয়ে গেছে। পাঁচটা প্যাকেট ছিল, সব শেষ। বললুম—'তোমার কাছে সিগারেট আছে?'

—'নাঃ। বিড়ি টানবেন?',

—'তাই দাও।'

বিড়ি টানতে টানতে বললুম—'তা হলে এবার বেরিয়ে পড়া যাক্! চলো, ইন্দ্রায় গিয়ে দেখি, খাবারের দোকান-টোকান আছে নাকি।'

আবদুল্লা বলল—'এখন রাত কত জানেন? বারোটার কম নয়।'

—'বারোটা!'

—'জী। একটু আগে রাত দু'-পহরের শিয়াল ডাকছিল।'

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লুম। তাহলে পেটে খিদে নিয়ে এখানেই রাত কাটাতে হবে দেখছি। মন তেঁতো হয়ে গেল। বললুম—'কী করবে ভাবছ?'

—'কী করব? এখানেই শুয়ে পড়া যাক্।'

—'কিন্তু খিদে পেয়েছে যে!'

—'সে ব্যবস্থাও কি করিনি ভাবছেন? মাস্তানকে পাঠিয়ে মুড়ি এনে রেখেছি।' বলেই সে লাফিয়ে উঠল।—'দেখি তো শালা চোট্টা মুড়িগুলো নিয়ে কেটে পড়ল নাকি। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই!'

সে তালাইয়ের কোণা থেকে তার ঝোলাটা টেনে নিয়ে গর্জে উঠল—'দেখছ দেখছ শালার কাণ্ড? যা ভেবেছিলুম, ঠিকই। শালাকে আজ মেরেই ফেলব।'

বলে সে টর্চ নিয়ে দৌড়ে বেরুল। বাইরে টর্চের ঝলকানিতে গাছগুলো জ্বলে যেতে থাকল। খোনা মাস্তান রাতের বেলা গেছোবাবা। কোন গাছে ভূতের মতো ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে মহানন্দে মুড়ি খাচ্ছে নিশ্চয়।

উঠে পায়চারি করতে গিয়ে সাপের কথা মনে পড়ল। তখন এই গাছতলায় রাত কাটানোর কথা ভাবতেই আঁতকে উঠলুম। আমারও একটা টর্চ রাখা উচিত। দরবেশের কাছে গিয়ে ডাকলুম—'ফকির সাহেব!'

সাড়া পেলুম না। ও দুলছে আর মালা জপছে। ঠোঁট কাঁপছে। বার তিন ডেকে বিরক্ত হয়ে গাছতলা থেকে তালাই আর দুজনের ব্যাগ নিয়ে এলুম। এ ব্যাটা মামদো ফকির যা করে করুক, ওর ভূতের ঘরে আবার রাতটা কাটাবই। দেখি, ওরা তিনটে মড়া কী করতে পারে।

ঘরে ঢুকে তালাই পেতেছি, তখন দরবেশ অন্ধের পা ফেলে খুব ব্যস্ত-ভাবে ঢুকে পড়লেন। তারপর কোণার দিকে গিয়ে বসলেন। এনামেলের সেই

কালো কুচ্ছিত হাঁড়িটার চাকান খুলতেই বুঝলুম, পাছে আমরা ওঁর রাতের খানাটা মেরে দিই, তাই তৎপর হয়ে উঠেছেন। হাসি পেল না। রেগে বললুম 'আপনি কি ভাবছেন, আমরা আপনার ভাতগুলো খেয়ে ফেলব ?'

জবাব দিলেন না। আমার দিক পিঠ রেখে হাঁড়ি থেকেই ভাত গিলতে শুরু করলেন। মরজিনা বুদ্ধি করে ওঁর জন্য কিছু ভাত রেখেছিল তাহলে। তারপর মাংসের হাঁড়ি থেকে এক টুকরো হাঁড় বের করে কামড়াতে দেখে অবাক হলুম। ওইটুকু মুরগির মাংস সাতজন খাওয়ার পরেও কি করে এখনও হাড় থেকে যায় ? আসলে ঝোল দিয়েই আমাদের খাওয়া হয়েছিল। মাংসও খুব ছোট টুকরো ছিল। এ ছাড়া কোন ব্যাখ্যা হয় না।

একটু পরে আবদুল্লার ডাক শোনা গেল—'মাস্টারজী !'

সাড়া নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। বললুম—'খুঁজে পেলে ?'

আবদুল্লা হাসতে থাকল।—'আস্ত হনুমান ! ডাল পাতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। জানতেও পারতুম না। কিন্তু গাছতলায় মুড়ি দেখেই টর্চ-বাতি হাঁকড়ালুম। অমনি শালা একেবারে ডগায় চলে গেল।'

—'তুমি ঢিল ছোঁড়ার ভয় দেখালে না ?'

—'হুঁউ।'—বলে আবদুল্লা দরবেশকে দেখতে পেল। বলল—'ইস্ ! আগে জানলে বাপজীর খানাটাই মেরে দিতুম।'

দরবেশ মুখ ঘোরালেন একবার। তখন আবদুল্লা ওঁকে আশ্বস্ত করে বলল—'খান, আপনি খান হুজুর। ডিসটাব করব না।'

'ডিসটাব' শুনে আমার অবাক হবার কিছু নেই। নানা জায়গায় ঘোরে ও। নিশ্চয় ইংরেজি শব্দ আরও অনেক শিখে ফেলেছে। পিদীমের আলোয় ওর মুখে হতাশার ভাব লক্ষ্য করছিলুম। বললুম—'যা হবার হয়েছে, শোন। বাইরে শুলে ঘুম হবে না। এখানেই শুয়ে পড়ি দুজনে। ভোরে বেরিয়ে পড়া যাবে। আর ভাল ঘুম দিতে হলে ছিলিম টানা দরকার। আছে তো ?'

আবদুল্লা মাথা দোলাল। আছে। তারপর গাঁজার পুরিয়া বের করতে করতে বলল—'শালা মাস্তানকে বলে এসেছি, খেলি ভালই করলি। কিন্তু যদি জান্ বাঁচাতে চাস, আমার গামছাখানা ফেরত দিয়ে যাবি।'

আমি নারকোল ছোবড়ার গুলতি পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলুম। আবদুল্লা যথারীতি এলাচগুঁড়ো এবং আদার রসে চটকানো গাঁজাটা চমৎকার গন্ধে স্বাদে ভরিয়ে তুলল। ওদিকে দরবেশের খাওয়া শেষ। গন্ধ পেয়ে হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে বসলেন। বেদীতে হেলান দিয়ে বললেন—'বেটা ! আমি অন্ধা মানুষ। আমার ওপর রাগ করিস নে। এক চুমুক দে। টেনে আপন কাজে বসব। তোরা নাক ডাকিয়ে ঘুমো না !'

গাঁজার লোভে বুড়ো ফকির অস্থির হয়েছে। আবদুল্লা মুচকি হেসে ছিলিম ধরিয়ে দিল হাতে। বলল—'খবরদার বাপজী ! বুঝে সুঝে দম

মারবেন। আপনার দমের যা জোর, আমার বাঁশি (ছিলিমের সাংকেতিক নাম) ফেটে বেসুরো বাজবে।'

দরবেশের দাঁতগুলো খুব সরু আর প্রচণ্ড সাদা। কালো রঙের মানুষের সাদা সরু দাঁতে সৌন্দর্য আছে। হাসলেন নিঃশব্দে। সেলাই করা চামড়ার ভাঁজ যেমন, তেমনি দুটো অন্ধ চোখ তির তির করে কাঁপতে থাকল। টান দেখে তাক লেগে গেল।

আমরা বার দুই পালাক্রমে টেনেছি, হঠাৎ শুনি দরবেশ গুন গুন করে সুর ভাঁজছেন। আবদুল্লা বলে উঠল—'ঝেড়ে কাসুন বাপ্‌জী!'

দরবেশ গেয়ে উঠলেন। আবদুল্লার একতারা নেই ডুবকিও নেই। শুধু ঘুঙুরটা আছে ঝোলায়। সে ওটা বের করে তাল দিতে থাকল। কিন্তু এমন সাধা গলা, এত মিঠে স্বর আর এমন বিচিত্র গান কখনও শুনিনি।

'ওরে, দেখবি যদি বৃন্দাবন
বাবু সাজ্‌রে মন।
কালুল্লাহ্‌-কালা বলে
বসে কষে লাগা দম॥'*

এতক্ষণে বুঝলুম 'কালুল্লাহ্‌' শব্দটা কী। ওটা কোরাণের একটি শ্লোকের 'কুল্‌হু-আল্লাহ্‌'। এর মানে—'বলো, ঈশ্বর", কালা কিন্তু স্রেফ হিন্দু কালাচাঁদ কৃষ্ণ। বাঙালী আউল বাঙালী বাউলের বৈষ্ণবতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামী বিশ্বাসকে মিশিয়ে ফেলেছে।

অন্ধকার রাতে নদীর ধারের নির্জন জঙ্গলে আস্তানায় বসে গান শুনতে কেমন লাগে—বিশেষ করে ছিলিমে দম মারার পর, ভাষা দিয়ে একটুও বোঝানো যাবে না। গানটা শেষ হতে সময় নিল। তারপর দরবেশ বললেন,—'ছেড়ে দিয়েছি। দমে কুলোয় না। তোমরা গাও বাবা, শুনি।'

আবদুল্লার কী হল হঠাৎ। ঘুঙুরটা প্রথমে যেমন উৎসাহে শুরু করেছিল, শেষ দিকে তেমনটা নয়। ঝোলায় ভ'রে বলল—'নাঃ! ও লাইনে আমি আর নেই বাপজী। এখন নিদ যাব। আপনি সাধনভজন করুন গে।'

দরবেশ হেসে বললেন—'কেন বেটা? মনে কিসের দুঃখ? লাইন ছাড়বি কেন রে?'

আবদুল্লা গম্ভীর মুখে জবাব দিল—'আপনি অলি-আউলিয়া সাধক মানুষ। অত খোঁজে আপনার কী বাবা? যান—নিজের কাজে যান।'

বলেই সে সটান শুয়ে পড়ল। দরবেশ একটু বসে থাকার পর উঠে বাইরে গেলেন। জলচৌকিতে বসলেন। তখন আমিও শুয়ে পড়লুম। ক্ষিদের সময় ছিলিম টানলে নেশা প্রচণ্ডই হয়। শোবার আগে ফু দিয়ে পিদীমটা নিবিয়ে দিলুম। আশ্চর্য! অমনি দরবেশ বলে উঠলেন—'বুতিয়ে দিলি? গোনা হবে

---

* এই গানটি অন্যভাবেও শুনেছি। 'যদি করতে চাস্‌ সাধনভজন/বাবু সাজ্‌ রে মন॥'

রে।'

ও কি সত্যি অন্ধ? মনে হল, ওঁর চোখে প্রকৃতির নিজের হাতে সেলাই করা চামড়ার ভাঁজে হয়তো কোন ফাঁক আছে—যেখানে লোকটার দৃষ্টিশক্তির একটুখানি টিঁকে থাকতে পারে। অথবা সবটাই ভান।

ঝিমঝিম ভাব এবং মগজে ঘূর্ণী হাওয়ার দাপট ক্রমশ বাড়ছে। শোবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভাঙল একেবারে ভোরে। ভাঙত না—খোনা মাস্তানের পা টেপার উপদ্রবেই ভাঙল। ওর নোংরা হাতের কথা মনে পড়তেই তেড়েমেড়ে উঠলুম। তারপর চোখে পড়ল, আবদুল্লা নেই। ওর ঝোলাটাও নেই। মাস্তান হিঁ হিঁ করে হেসে অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল—'ভেঁগেছে!'

—'ভেগেছে মানে?'

মাস্তান দুটো আঙুল তুলে কী দেখাল। বুঝলুম না। বাইরের উঁকি দিয়ে দেখি, কানা দরবেশ সম্ভবত গরমের জন্যেই অমনি করে কুঁকড়ে জলচৌকিতে রাত কাটান। বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। বেরিয়ে গেলুম।

মাস্তান দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছিল। সেও বেরোল পিছনে। তারপর আস্তানার উঠোনে গিয়ে সেই সুন্দর কাঠমল্লিকার সুগন্ধে ভরা ধূসর ভোরবেলাটা খানখান করে ফেলল তার ভূতুড়ে নাকি স্বরেঃ 'মাঁরি মাঁ! ছোঁড়া পিঁরীত কঁরেছে...'

আবদুল্লা এমনি করে চলে গেল কেন? আস্তানার জঙ্গল ঘুরে নদীর ধারে গেলুম। দেখলুম, বালির চড়া পেরিয়ে মদনচাঁদ হন হন করে আসছে। খালি গা—গলায় অবশ্য মালাগুলো ঝুলছে। আমাকে দেখতে পেয়েই সে দৌড় শুরু করল।

ঢালু পাড় পেয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল—'মাস্টারজী! সে-বেটা আছে আস্তানায়? আছে?'

—'নেই। রাতেই পালিয়েছে কখন।'

অমনি মদনচাঁদ বুক চাপড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করল। মাটিতে হাঁটু দুমড়ে ভর-ওঠা মানুষের মতো মাথা নাড়া দিয়ে সে বুক-চাপড়াতে থাকল। তার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলুম—'কি হয়েছে মদনচাঁদ? কি হয়েছে?'

মদনচাঁদ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মতো সুর ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'ওরে বেটি মরজিনা রে? তোর মোনে যদি এই ছিল, বলীল না কেন রে! আমি এখন কি ক'রব রে!...'

এ তো জানতুম। যেন সবই জানা ছিল। অথচ ভাবিনি। তলিয়ে দেখিনি। কিন্তু ক্ষতি কি? মদনচাঁদের তো খুশি হওয়া উচিত। এবং আমারও।—

অন্ধ দরবেশ বলেছিলেন, একরাতে সব ওলটপালট হয়ে যায়।

তাই-ই হল। কিন্তু আমার নয়—অন্য একজনের। তাহলে আমাকে কেন বলা? এতক্ষণে বুঝলুম, ও কথা আসলে মতিজনার উদ্দেশেই বলেছিলেন দরবেশ। আর, চিরাগের তলায় অন্ধকার। সেটা থেকেই যাচ্ছে। আমার মনে জ্বালা এখন। চর্যাপদের হরিণী দেখতে দেখতে বাঘিনী হয়ে গেছে। শিকারের ঘাড়ে কামড় দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে গহন অরণ্যে। তবে আর কি, এবার আমি মানে মানে গা ঢাকা দিই। রাস্তা আমার সামনে। পা বাড়াই।

'তিরপিনীর ঘাটে এক মড়া ভাসতেছে
মড়ার ওপর সর্পের ডিম্ব হরিণ চরতেছে'...

সেই মড়া আমার সামনে, পিছনে, পায়ের তলায়, মেরুদণ্ডের পথে মস্তিষ্কের দিকে বিস্তৃত—যেখানে কামনার ডিম্ব, হরিণ-হরিণা চরে বেড়ায়। দেখতে পাচ্ছি, তাই জ্বলছি। হরিণ-হরিণার মিলনের দিকে তাকিয়ে আছি। মিলনই যে জীবন—বিরহে মৃত্যু।

ঘাড় ঘুরিয়ে সূর্য ওঠা দেখতে গিয়ে খালের ঢ্যাঙা বিশাল মাদার গাছ চোখে পড়ল। ডালপালায় রক্ত ফুল হয়ে ডগমগ। প্রতীক্ষার অবসান ঘটল কি কারও? শীর্ষে লাল নীল তেকোণা ঝাণ্ডা পবিত্র বাতাসে পতপত করে উড়ছে। যেন ফিসফিস করে বলছে—এ বড় সুখের সময়।

দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে কতক্ষণ ফোঁস ফোঁস করার পর বুড়ো ফকির উঠল—'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল গো আমি।'...বলে আস্তে আস্তে পাড় বেয়ে নেমে গেল। যতক্ষণ না সে নদী পেরোল, তাকে দেখতে থাকলুম। দু'পাশে হাত ঝুলিয়ে সে হাঁটছে। নদীটা পার হতে খুব বেশি সময়ই নিয়েছে সে।

পাচণ্ডীতে আলকাপের আসরে যাব—নাকি অন্য কোথাও, হরিণ মারার একজিবিশনের মেলায়, আবুল মহাজনের বাড়ি? কবিগান এ রাতেই শেষ। তা হোক্। কোথাও যেতে হবে। শূন্যতা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। ভাঙা হাটে আর দাঁড়িয়ে থেকে করবটা কী?

সিগরেট শেষ। বিড়ি পেলেও চলত। ইন্দ্রা গিয়ে কেনা যায়। পা বাড়াতে গিয়ে বাঁধের দক্ষিণে বাঁকের মুখে এক মূর্তির আবির্ভাব এবং...

'ভাবে-ভাবে ভাব লাগায়ে
গাব্-গুবা-গুব্ বাজাস মোন/

আদেখ্‌লামো দেখাস্‌ নে।
ও মোন, মোন রে ভোলা ॥

মাথায় পাগড়ি, হাতে গাব-গুবা-গুব যন্তর, সেই 'বাতনে'র (অদৃশ্য লোকের) বাসিন্দা তো বটেই। কিন্তু পোশাক আসাকের ঢঙে মালুম হচ্ছে, আউল ফকির নয়। হিন্দু বাউলই বটে। বাঁধের ওপর দিয়ে বটের একটা ছড়ানো ডাল নদীর আকাশে দুলছে। তার তলায় দাঁড়িয়ে গেল সে। গাব-গুবা-গুব হঠাৎ থামিয়ে চেঁচিয়ে কাকে বলল—'কই গো? হল তোমার?' এবং ফের যন্তরে বোল তুলল।

আমাকে দেখেই যেন দ্বিগুণ উদ্যমে গানটা জুড়ে দিল। একটু একটু নাচতেও থাকল। কাছে গেলে সে মাথা ঝুঁকিয়ে আদাব দিল। খুশি হয়ে বললুম—'হরিপদ যে! তুমি এদিকে কোথায়?'

হরিপদ বাউল মুচকি হেসে গানটা শেষ না হওয়া অব্দি কোন কথা বলল না। আর কিছু না হোক, বিড়ি খাওয়ার অভাবিত সুযোগ পাওয়া গেছে। শান্তভাবে অপেক্ষা করলুম। গান শেষে তেহাইয়ের মাথায় এক লাফ মেরে মাথা ঝুঁকিয়ে হরিপদ সেলাম দিল। তারপর বলল—'বাবা রে বাবা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম গো! এ যে দিন দুপুরে চাঁদের উদয়! জয় গুরু, জয় গুরু!'

—'বিড়ি দাও হরিপদ!' বলে বসে পড়লুম।

হরিপদও বসল। ঝুলি থেকে সশব্যস্তে কৌটো বের করে দু' হাতে তুলে ধরল।—'জয় গুরু, জয় গুরু! গোঁসাইয়ের সেবায় লাগবে বলেই রেখেছিলুম —নেন গোঁসাই!'

হরিপদ বকুলপুর আখড়ার বাসিন্দা। আমার গ্রাম কুতুবপুরের ওদিকে। বরাবর সে আমাকে গোঁসাই বলে সম্ভাষণ করে। ওর মতে, আমি খাঁটি হিন্দু—মুসলমানের চেহারায় আছি। কেন ওর এই ধারণা জানি না। চেপে ধরলে বলে—'আপনার চলন বলনে মোছলমানের মও নেই গো! আমি চোখ বুজলেই দেখি আপনার ভেতরে বসে আছেন বাঁকা গোঁসাই, মুখে বাঁকা হাসি। আপনি গোঁসাই না তো কে?'

আরামে ও সুখে বিড়ি টানতে টানতে দহের দিকে তাকালুম। যাকে ডাকছিল, তাকে দেখতে পেলুম। হুঁ, হরিপদ বোষ্টুমী জুটিয়েছে এতদিনে। বোষ্টুমী পিছনে ফিরে শাড়ি বদলাচ্ছে—গেরুয়া শাড়ি। সবে ডিমের কুসুমের মতো আঠালো লাল-হলুদ রোদ পড়েছে পিঠের ভিজে চুলে। মরজিনার কথা মনে পড়ল। তাকেও প্রথমে এভাবে দেখেছিলুম।

আমাকে তাকাতে দেখে হরিপদ দুষ্টু হেসে বলল—'সদ্য তিন চার মাস বয়স। বোরেগীতলার মেলা থেকে কুড়িয়ে এনেছি। একা না বোকা। তাই না?'

—'ঠিকই' করেছ।'

হরিপদ খিকখিক করে হাসতে থাকল, যেন খুব মজার কীর্তি করে বসে আছে। তারপর বলল—'গোঁসাই, এখানে কী করছেন?'

—'মাদারপীরের বিয়ের মেলায় গান শুনতে এসেছিলুম।'

—'ভাল, খুব ভাল।'

—'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

—'আজ্ঞে গোঁসাই, আবার কোথা? মাধুকরীতে।'

—'কিন্তু এতদূরে?'

হরিপদ আবার দুলে দুলে হাসল।—'আমি স্যাঙা করেই আখড়া ছেড়েছি জানেন না বুঝি? এখন থাকি গুরুলিয়ায়। হুই যে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছেন বিলপারে, ওই গাঁয়ে।'

—'বকুলপুর ছাড়লে কেন?'

—'অত্যেচারে।' হরিপদ গম্ভীর হয়ে গেল। 'বুঝলেন গো? মানুষের অত্যেচারে। আমার বউয়ের মেজাজ অবশ্যি একটুখানি চড়া। অসইলো (অসহনীয়) কথা সইতে পারে না। মুখের ওপর পষ্টাপষ্টি জবাব দেয়। সেও একটা কারণ। অন্য কারণ, আমি নাকি ছুতোরের মেয়ে ঘরে তুলেছি। গোঁসাই, শালা মানুষের সব গেলেও যেন জেতের গুমোর যায় না।'

—'ছুতোরের মেয়ে! তার মানে?'

—'আজ্ঞে, কিভাবে যে কথাটা রটল, কে জানে! আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন ছুতোর—সেটা ঠিকই। পরে বোরেগী হয়ে দীক্ষা নেন হেতমপুরের আখড়াওলা বাবাজীর কাছে। বিয়েও দিয়েছেন বাবাজী। শেষ বয়স তখন। একটা মেয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রীর সমাধি হয়। বাবাজী মেয়েটাকে মানুষ করে-ছিলেন। বিয়েও দিয়েছিলেন। বনিবনা হল না। পালিয়ে এল। জোয়ান বয়েস। লোকের চোখে লাগে। পাঁচ কথা কয়। অবশেষে আমি গিয়ে পড়লুম বাবাজীর আখড়ায়। বাবাজী বললেন—হরিপদ, স্যাঙা করবি? ভেবেচিন্তে বললুম—তা আপনি যখন বলছেন, তখন না বলার সাধ্যি নেই। তখন বাবাজী বললেন—তবে সামনে মাসে বোরেগীতলার মেলায় যাস্। ওখানেই ও সব কাজ হয় ফি বছর।'

কথা বলতে বলতে বোষ্টুমী এল।

কথা শেষ না হওয়া অব্দি অপেক্ষা করল একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। তারপর বলল—'কাপড়খানা ততক্ষণ শুকিয়ে নিই। তোমরা গল্প করো।'

বোষ্টুমী মরজিনার মত সুন্দরী নয়। কিন্তু গোলমাল চেহারা। স্বাস্থ্য-বতী যুবতী। রঙটা একটু ময়লা। কিন্তু চেহারায় চনমনে ভাব আছে। চাপা চিবুকের ওপর পেলব দুখানি ঠোঁট। পুষ্ট গাল, সরু নাক, ছোট্ট কপাল। নদীর পলি তুলে রসকলি এঁকে নিয়েছে নাকে। এখনও শুকোয়নি। মাথায়

মরজিনার মত অত ঘন আর লম্বা চুল নেই—তবে যা আছে, তা কুচকুচে কালো। চোখের তারাও ঘন কালো—মরজিনার মত পিঙ্গল নয়। দৃষ্টি ভাসা-ভাসা, কিন্তু চঞ্চল। এ সব মেয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে নেয়।

ঝোপের ওপর গেরুয়া চুলপাড় শাড়িটা সে মেলে দিল। তারপর রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকাতে থাকল।

হরিপদ বলল—'তা গোঁসাই, এখন কি ঘরে চললেন,—নাকি গানের বায়না আছে? আপনার দলবলের খবর কি?'

বললুম—'দলবল পাচন্ডীতে। আমি একা কেটে পড়েছিলুম। এখন ভাবছি, কোথায় যাই।'

হরিপদ হেসে উঠল।—'বাবা রে বাবা! গোঁসাই যে আমাদের পথের পথিক গো! ওগো, এখানে এস। মানুষটাকে চিনে রাখো। শ্রীহরির অবতার গো! অগেরাহ্যি কোরো না। একবার বাঁশিতে ফুঁ দিলে রাসলীলের যোগাড় হবে। গোঁসাই, একবার বাঁশি হোক। আহা, বড় মধুর আপনার সুর।'

আমার ব্যাগে বাঁশি আছে। কিন্তু বাজাবার মেজাজ নেই। বললুম—'থাক্ হরিপদ। রোদ বাড়ছে। ক্ষিদেও পেয়েছে।'

—'বালাই ষাট্!' বলে হরিপদ জিভ কাটল। তারপর বিনীত ভাবে বলল—'গোঁসাই, বড় মুখ করে বলেছিলেন মনে আছে? হরিপদ, মানুষ শুধু মানুষ! মনে পড়ছে? সেই যে গো, আদি বড় রাস্তার ধারে গাছতলায় দেখা হ'ল?'

—'হ্যাঁ, মনে আছে।'

—'তাহলে আর কী?'...বলে সে ঝোলা থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা মুড়ি বের করল।—'পাটালিও আছে। রুমাল টুমাল বের করুন। আমরাও দুমুঠো খেয়ে নিই।'

রুমাল বের করতে হল। সত্যি ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। মুড়ি পাটালি চিবুতে থাকলুম। হরিপদ বউকে ডাকল। বোষ্টুমী সংকোচ করল না। পাশাপাশি পা ছড়িয়ে বসে ওরাও খেতে থাকল। খাওয়ার মধ্যে হরিপদ নানান কথা বলে গেল। মাঝে মাঝে বোষ্টমী ওকে ধমক দিচ্ছিল—খাওয়া শেষ ক'রেই কথা বলবে, বাপু! গোঁসাইয়ের গায়ে এঁটো পড়ছে—চোখের মাথা খেয়েছে?' হরিপদ লজ্জা পেয়ে সতর্ক হচ্ছিল।

খাওয়া শেষ করে তিনজনে দহে নামলুম। বোষ্টমীর চোখ বার বার পাড়ের দিকে কাপড় শুকোতে দিয়েছে। জল খেয়ে উঠে এলুম আমরা। হরিপদর বিড়ি খাওয়া হল পরম সুখে। তারপর সে জিগ্যেস করল—'তা হলে গোঁসাই? গা তোলার আদেশ দিন। আসি।'

পেটে খাদ্য পড়লে বরাবর আমার আলসেমি জাগে। বললুম—'হুঁ। কিন্তু তোমার বউয়ের নাম তো বললে না হরিপদ?'

হরিপদ জিভ কেটে বলল—'বলিনি বুঝি? ওগো, তুমিই বলে দাও নিজ মুখে।'

বোষ্টুমী মিষ্টি হেসে মুখ ঘুরিয়ে আস্তে বলল—'কাঞ্চন।'

—'কাঞ্চন! বাঃ! কাঞ্চন মানে কী জানো তো হরিপদ? সোনা।'

বোষ্টুমী ফের সলজ্জ হেসে মুখ ঘোরাল। হরিপদ আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠল—'বাবা রে বাবা! আমি কি হলুম রে! ওরে, সোনা আমার ঘরে। আমি যে রাজার বেটা মহারাজ রে!'

তখন বোষ্টুমী ওকে ধমক দিয়ে বলল—'ঢঙ করো না তো!'

বললুম—'হরিপদ তোমার বউয়ের গলা বেশ মিঠে। একখানা গাইতে বলো!'

হরিপদ সাধাসাধি শুরু করল। অনেক চেষ্টার পর কাঞ্চন বোষ্টুমী শান্ত-মুখে বলল—'কই? খঞ্জনী দাও।'

হরিপদ ঝুলি থেকে একজোড়া খঞ্জনী বের করে দিয়ে বলল—'ও আমার এই যন্তরে গলা লাগাতে পারে না। খঞ্জনী চাই।'

খঞ্জনী বাজিয়ে কাঞ্চন গেয়ে উঠলঃ

'হরি, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল
পার করো আমারে॥'

হরিপদ হেসে খুন—'এই সাত সকালে সন্ধ্যা এনে ফেললে, বুঝুন কান্ড!' গানটা শেষ করে খঞ্জনী-ধরা হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে কাঞ্চন প্রণাম করল তার ইষ্টদেবতাকে—তারপর আমার দিকেও দ্বিতীয় প্রণামটা ছুঁড়ে দিল।

তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—'চলো, স্টেশনে যাব। তোমরা কোথায় যাবে?'

কাঞ্চন দ্রুত ঝোপ থেকে শাড়ী গুটিয়ে ঝোলায় ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিলে। হরিপদ বলল—'চলুন তো একসঙ্গেই যাই। তারপর কপালে ঘটলে ছাড়াছাড়ি হবে।'

আমরা আস্তানার ঘাটে নদী পেরোলুম। ইন্দ্রায় ঢুকেই একটা দোকান পড়ল। দোকানে সিগ্রেট নেই—বিড়ি আছে। তাই কিনলুম। গাঁয়ের লোক হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল তিন মূর্তিকে। মুসলমানদের গ্রাম। হরিপদই জানাল। এখানে মাধুকরী করে সুবিধে হবে না। না—জাত-ধর্মটা কোন কারণ নয়। এখানে যে ফকিরপাড়া আছে। মাধুকরীর চোটে গাঁয়ের লোক চিরকাল অস্থির। কত দেবে, বলুন?

গ্রাম পেরিয়ে ছোট্ট মাঠ। মাঠ পেরিয়ে বাদশাহী সড়ক। কিছুদূর উত্তরে এগিয়ে পশ্চিমে একটা বড় গাঁয়ের মধ্যে ঢুকলুম। ভাবলুম, এবার হরিপদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে। কিন্তু না। হরিপদ নিজে থেকেই বলল—'গোঁসাইকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। চলুন—রেলগাড়িতেই ঘুরব আজ। কী বলো গো?'

কাঞ্চন কিছু বলল না। ওর মতামত শোনার জন্যে আমি পিছু ফিরতেই চোখে চোখ পড়ল। অমনি বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বোষ্টুমী কেমন হাসছে। হাসিটা...না, আমার ভুল হতেও পারে।

কিন্তু যতদূর যাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমার পিঠ ফুঁড়ে ওই হাসিটা বুকে গিয়ে বিঁধছে। মনে পড়ল দরবেশের কথা—আমি চিরাগ, আমার তলায় অন্ধকার আছে। অমনি শিউরে উঠলুম। তখন ফাঁকা মাঠে হরিপদ গলা ছেড়ে গান ধরেছে—

'সহজ ভাব দাঁড়াবে কিসে রে
মনের মানুষ না হইলে,
মনের কথা না কইলে,
সহজ ভাব দাঁড়াবে কিসে রে॥...

হয়তো বাড়ির দিকেই মন টেনে ছিল। কিন্তু হাঁটাপথের ধকল সইবে না। তাই ভায়া আজিমগঞ্জ জংশন খাগড়া ঘাট রোডের টিকিট কেটে ফেলেছিলুম। দশটা পাঁচে ট্রেন ছাড়ল। সেই ট্রেন আজিমগঞ্জ জংশনে পেঁছিল সওয়া একটায়। তখনও বাউল-বাউলনী সঙ্গ ছাড়েনি। হরিপদর গলাটি খাসা। আর বাউলনীও লজ্জা করছে না। দুজনে গলা মিলিয়ে গাইছে। এর ফলে বেশ কিছু রোজগার হয়ে গেল ওদের। বলল—'চেপেছি যখন, তখন আর নামছি না। কদ্দুর গাড়ি যায়, দেখি। জংশনে তিনজনে নামলুম। নামার পর হরিপদ বলল—'এলুমই যখন, গঙ্গা পেরিয়ে, জিয়াগঞ্জে রাসের মন্দিরে যাব। ঝুলন তো সেই শাঁওন মাসে। এখন ভাঙা হাট। তা হোক, তা হোক...'

আমাকে আবার ট্রেন বদলাতে হবে। খাগড়া ঘাট রোডে নামব। তারপর দশ মাইল বাসে কুতুবপুর। ট্রেন সাড়ে তিনটের আগে নেই। এখন খাওয়াটা সেরে নিতে হবে।

হরিপদ বলল--'আমাদের আজ পালনের দিন। শুকনো খেতে হবে—ভাত চলবে না। দেখি, বাজারে চিঁড়ে পাই নাকি। তুমি গোঁসাইয়ের কাছে বসো গো!'

বেঞ্চ খালি নেই। প্লাটফর্মে একটা পিপুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কাঞ্চন সিমেন্টের চত্বরে বসে রইল। সামনে খানিকটা দূরে রেলের ক্যাটারিং। ওখানে গিয়ে খাওয়াটা সেরে নেব। তাই ওকে বসতে বলে চলে যাব ভাবছি, কাঞ্চন বলল—'গোঁসাই বসুন। দাঁড়িয়ে কেন?'

মনে হয়তো পাপ, একটু তফাতে বসে পড়লুম। হরিপদ আসুক বরং। ঘুরে ফের চমকাতে হল। বোষ্টুমীর ঠোঁটে সেই হাসি।'গোঁসাই একটা কথা বলব? রাগ করবেন না তো?'

—'না, না। রাগ করব কেন? বলো!'

—'আমাকে পাঁচটা টাকা দেবেন?'

এ কি কথা ওর মুখে? মাথায় বাজ পড়ার মতো। বুকে ঢি ঢি পড়ে গেল। উরু দুটো ভারী মনে হল। এ ভাবে টাকা চাওয়ার একটি মাত্র অর্থ থাকতে পারে। এবং হতভাগ্য হরিপদ এ কাকে নিয়ে ঘুরছে?

—'গোঁসাই বুঝি রাগ করলেন?'

—'না। টাকা কী করবে তুমি?'

—'টাকা নিয়ে কী করে মানুষ?'

—'কিন্তু...', বলে চুপ করে গেলুম।

—'দুটোও দিন তাহলে!'...বলে মধ্যের ফাঁকটুকু ঢেকে সরে এল। জংশন স্টেশনের প্লাটফর্ম। অনেক লোকের ভিড় আছে এখানে ওখানে। পিপুল তলাটা শেষদিকে বলে লোক নেই। সে নিঃসঙ্কোচে আমার বাঁ হাতটা নিয়ে ফের বলল—'গোঁসাই, ভাবছেন কি? হাত দেখে বলতে পারি।'

—'তুমি হাত দেখতে জানো বুঝি?'

—'হুঁ।' বলে সে তার চিরোল ফ্যাকাশে আঙুলে আমার হাতের রেখায় বুলোতে থাকল।—'আপনার মনে এক সন্নেসী আছে, জানেন? সে আপনাকে থিতু হয়ে বসতে দেবে না—আপনি যতই করেন।'

—'তারপর?'

—'আপনার মন টানে একদিকে, তো সন্নেসী টানে অন্যদিকে।'

—'এখন কোনদিকে টানছে?'

আমার হাতটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দেবার ভঙ্গী করল সে—কিন্তু ছাড়ল না। বলল—'যান্! আপনি খুব চালাক গোঁসাই। ছিপে খেলিয়ে-খেলিয়ে মাছ তুলতে ভালবাসেন। মাছ যতই 'তনছোট্' (যন্ত্রণায় ছটফট) করুক, আপনার সুখ তাতে।'

—'বুঝলুম। মাছ কি সত্যি বিঁধেছে?'

কাঞ্চন মুখ ঘুরিয়ে বলল—'হুঁউ।'

—'এ মাছের টোপ খাওয়া অভ্যেস আছে কিনা। বঁড়শি ভাঙতেও জানে।'

কাঞ্চন হাতটা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল। এই অভিমানের নাম সরল ভাষায় ছেনালিপনা—তা তো জানিই। হায় হরিপদ, তোমার এ কি দুর্মতি ঘটল?

আমি হাসতে হাসতে পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে বললাম—'নাও।'

নিল না। তখন ওর পাশে রেখে দিয়ে বললুম—'হরিপদকে বলো, খেতে যাচ্ছি। আর দেখা না হতেও পারে।'

কাঞ্চন একবার তাকাল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমি চলে এলুম। আসতে আসতে পিছু ফিরে একবার দেখলুম—কাঞ্চন টাকা দুটো দ্রুত কুড়িয়ে নিয়ে ওর বুকের ভিতর চালান করে দিচ্ছে।

হরিপদকে সাবধান করে দেব কি? বিবেক বলে যা আছে, তা উত্যক্ত করে। কিন্তু শেষ অব্দি বলতে পারব বলে মনে হয় না। একটু পরে খেতে বসে ভাবলুম—মরুক গে। পৃথিবীতে কত কিই ঘটছে—তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এবং আমি তো সত্যি সত্যি পাপীর ত্রাণে এবং দুষ্কৃতকারীর বিনাশে জন্মগ্রহণ করিনি! হরিপদ যাই বলুক, আমি অবতার নই। নিতান্ত রক্তমাংসের মানুষ। আমার জ্যোতি নেই—নিছক শিখা আছে। তার তলায় কত অন্ধকার।...

খেয়ে বেরিয়ে স্টেশনের ঘড়ি দেখলুম। এখনও দেড় ঘণ্টার বেশি সময় হাতে আছে। ততক্ষণ একটু এদিক ওদিক ঘোরা যাক্। প্রখ্যাত নওলাক্ষার বাগান দেখা যেতে পারে। কিন্তু খরার প্রচণ্ড রোদে সেটা খুব সুখের ব্যাপার হবে না। তাই স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাজারে ঘুরব ভাবলুম।

গেট পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা সেখানে রিকশা ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। বাঁ দিকে একটা আটচালা—কয়েকটা থামের ওপর ছাউনি। জৈনদের গড়ে দেওয়া পান্থশালার মতো। কিছু লোক গড়াচ্ছে—কেউ বসে আছে। সাধুসন্ন্যাসীও আছে। হঠাৎ দেখি, থামে হেলান্ দিয়ে বসে হরিপদ ছিলিম টানছে। দেখা মাত্র লোভ হল। ঝিমুতে ঝিমুতে দিব্যি যাওয়া যাবে। ওর কাছে চলে গেলুম।

তারপরই আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। স্বপ্ন দেখছি না তো?

আবদুল্লা হরিপদর হাত থেকে ছিলিম নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। একটু হেসে ছিলিমে মুখ দিল।

মরজিনা মাথায় ঘোমটা দিয়ে থামের পিছনে বসে আছে—দুটো পা ওপাশের ধাপে। মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই ঘোমটাটা আরও টেনে দিল।

হরিপদ বলল—'আসুন গোঁসাই, আসুন। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা—একটুখানি আলাপ করেই যাই ভাবলুম।'

বললুম—'শিগগির যাও হরিপদ। বোষ্টুমী এতক্ষণ ভেসে গেছে অনেক দূরে।'

হরিপদ হাসতে হাসতে চলে গেল। তখন আবদুল্লার পাশে বসে বললুম—'কী আবদুল্লা, আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি—তাই না?'

আবদুল্লা কাঁচুমাচু মুখে বলল—'জী না। ত নয়।'

—'যাই হোক, শোন। মরজিনার বাবা নির্ঘাৎ থানায় খবর দিয়েছে। পুলিশে ধরবে।' ...সকৌতুকে বললুম কথাটা।

মরজিনা ঘোমটার ফাঁকে হিস হিস করে বলল—'ইস! খুব ধার ধারি পুলিশের। ক্যানে? ধরবে ক্যানে?'

আবদুল্লার পুলিশ ভীতির ব্যাপারটা টের পেয়েছিলুম। তার মুখটা সাদা

হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বলল—'কাউকে কারো পছন্দ হলে যদি বিয়ে করে, সেটা কি বেআইনী স্যার?'

হো হো করে হেসে উঠলুম।—'আরে না, না। মিছে মিছে বলছি। তোমরা যাবে কোথায় এখন? এখানে এলে কেন?'

আবদুল্লা বলল—'ভোরের গাড়িতে এসেছি। নামতে নামতে কাটোয়ার গাড়িটা ছেড়ে দিলে। আমি উঠতে পারতুম। ও মেয়েছেলে—তা কি পারে? সাড়ে তিনটের গাড়ি ধরার অপিক্ষা করছি। নামব সালারে। বাপের ভিটেটুকু আছে। গিয়ে উঠব।'

'তুমি বলেছিলে, বাবা মায়ের খোঁজে...'

অমনি আবদুল্লা হাত তুলে বলল—'ওকথা এখন থাক্ স্যার। চাপা থাক। এখন আমি অন্য রাস্তায় পা দিয়েছি। এত লোক তো হাঁটছে—আমার হাঁটায় দোষ হবে কি? ছিলিমে মাল শেষ। আবার সাজি?'

—'থাক।' বলে মরজিনার উদ্দেশ্যে বললুম—'ঘোমটা কেন মরজিনা? ঘোর এদিকে।'

আবদুল্লা সতর্ক ভাবে বলে উঠল—'চেনা লোকের চোখে পড়ে যায়, তাই।'

মরজিনা কিন্তু ঘোমটা খুলল। আমার দিকে ঘুরে শান্তভাবে বলল—'বাপজানের সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার? খুব কান্নাকাটি করছিল? কী বলল আপনাকে?'

মোটামুটি জানালুম। শুনে মরজিনা চুপ করে থাকল। চোখ ছল ছল করছিল ওর। নাকটা একবার মুছলও। আবদুল্লা বলল—'সব ঠিক হয়ে যাবে। খবর পাঠাব। পোস্টোকার্ট যাবে। উনি নিজের হাতে সঁপে না দিলে বিয়ের কলমাই পড়ব না। আবদুল্লা জারজাত (জারজ) নয়।'

মরজিনা অস্ফুট স্বরে বলল—'খুব কষ্ট হবে বুড়ো লোকটার। খুবই কষ্ট হবে। যোয়ান বেটি আমি—তবু ছুঁয়ে শুয়ে থাকা চাই। নয়তো ঘুমের ঘোরে গোঙাবে।'

আবদুল্লা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—'বেটি কেউ চিরকাল ঘরে পোষে না। তা অত যদি ভাবনা হয়—না এলেই পারতে!

মরজিনা কোন জবাব দিল না। ফের নাক মুছল।

আবদুল্লা ঝোলা গুছিয়ে কাঁধে নিল। বলল—'প্লাটফরমে যাই। কী বলেন স্যার? টিকিটে লাইন লাগাতে হবে। উঠবে—না বসে থাকবে?'

কথাটা মরজিনার উদ্দেশ্যে। এতক্ষণে দেখলুম মরজিনার হাতের কাছে একটা স্যুটকেস রয়েছে। নীলরঙের স্যুটকেস, তার ওপর সাদা সাদা ফুল। আবদুল্লা আগে, আমি তার পাশে, পেছনে মরজিনা, গেট পেরিয়ে স্টেশনে ঢুকলাম। আবদুল্লা বলল—'দেখছেন লাইন? আমি জানি। খুব ভিড় হয়

গাড়িতে। আপনি কদ্দুর যাবেন স্যার? টিকিট কাটতে হবে তো।'

—'আমি টিকিট কেটেই রেখেছি। খাগড়াঘাট রোড অব্দি।'

—'তাহলে আর কী? গিয়ে কোথাও বসুন। আমরা যাচ্ছি। খুঁজে নেব।'

আমি এগিয়ে গেলুম। হরিপদদের দেখতে পেলুম না পিপুলতলায়। ছায়ায় বসে পড়লুম। কতক্ষণ পরে টিকিটের ঘণ্টা বাজল। কাউণ্টার তা হলে এতক্ষণে খুলল।

মিনিট কুড়ি পরে আবদুল্লাকে দেখা গেল। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। আমার সামনে ওপারের প্লাটফর্মে একটা ট্রেন সবে ছেড়ে যাচ্ছে। ওটা নলহাটির লাইনের গাড়ি। গাড়ি ছেড়ে দেওয়া দেখতে ভালই লাগে। মনে মনে বললুম—নিরাপদে পৌঁছে যাও সবাই—যে যেখানে চলেছ। কেন ও কথা বললুম, নিজেই জানি না।

আবদুল্লা এসেই বলল—'ও কোথায় গেল, স্যার?'

—'মরজিনা? কই—সে তো আমার সঙ্গে আসেনি। ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না?'

আবদুল্লা ব্যস্তভাবে বলল—'না তো। আপনার পেছন পেছন গেল দেখলুম!'

—'বারে! আমি তো দেখিনি।'

আবদুল্লা হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। ভাবলুম—কোথাও আছে মরজিনা। পেয়ে যাবে'খন। আপে সিগনাল কাত হল। ট্রেন আসবার সময় হয়ে এল। দূরের বাঁকের আকাশে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল। মনে ধীরে ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। চোখে ভেসে আসছে আমার সেই দক্ষিণের জানলাটা—মাথার কাছেই নীচে পুকুর। টলটলে জলে বাঁশপাতা ভেসে থাকে। হাঁসগুলো ডেকে ওঠে। পাতকোখা পাখি লেজ ঝুলিয়ে দোলে। আঃ, সেই নির্জন পৃথিবী কতকাল দেখা হয়নি।

আবদুল্লা এল। অস্বাভাবিক থমথমে, ক্লান্ত, হতাশ চেহারা। মাথাটা আস্তে দুলিয়ে বলল—'পালিয়ে গেছে। যাক্ গে। আমিও বেঁচে গেছি—খুব বেঁচে গেছি স্যার।'

বলে সে পাশে বসে পড়ল। একটা চুপ করে থেকে হঠাৎ সেই রাতের মতো হিংস্র ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—'বাঁচিনি আমি? বলুন? বাঁচিনি? বলুন—আপনি বলুন?'

কী বলব? চুপ করে থাকলুম।

ডাউন ট্রেন বাঁকের মুখে তীক্ষ্ণ হুইশল দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালুম। ওর চোখে জল, কিন্তু ঠোঁটে আশ্চর্য হাসি। অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—'আমি পারতুম না। কিছুতেই পারতুম না...'

পদ্মবাড়ির কানাই খ্যাপা বলেছিল—'মানুষ যখন দেখে, তার পায়ের তলায় মাটি নেই—সে এক অবস্থা। আর মানুষ যখন দেখে, মাটি আছে—আদতে পায়ের তলায় শেকড়বাকড়ই নেই,—তখন আর এক অবস্থা। বাবার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, শেকড়বাকড় নেই।'

কানাই বাউল ধরেছিল ঠিকই। কিন্তু সে তো আমার মতো 'ছিক্ষিত বেক্তি' নয়, বাবু ভদ্রলোকও নয়। আমার ধূর্তামি সে টের পাবে কেমন করে? আমার শেকড় ঠিকই গজাত, আর আমি তা ছেঁটে সাফ করে ফেলতুম।

আর আবদুল্লার যেমন নাকি পায়ের তলায় চাক্কা ছিল, আমারও ছিল। হাঁসখালির আখড়ায় আমার রকমসকম দেখে নয়ান ফকির রেগেমেগে বলেছিল—'পোঁদে হনুমানের হাড় আছে নাকি রে? শুধু এ-ডাল ও-ডাল এ-খেত সে-খেত করে বেড়াচ্ছিস। বস্ দিকিনি এক জায়গায়।'

নয়ান তুইতোকারি করত। শুধু আমাকে নয়, সব্বাইকে—সে হাকিম হোক কী মন্ত্রী হোক। হ্যাঁ, স্বয়ং মন্ত্রীকেও। যেবার প্রথম ব্লক আপিস বসল দেশের নানান জায়গায়, সেবার মহকুমা শহরে ব্লক অফিসের উদ্বোধন করতে এক মন্ত্রী এলেন। এস. ডি. ও. সাহেব সেই উপলক্ষ্যে লোকসংগীতের আসর বসালেন। আউল-বাউলেরও ডাক পড়ল। হাঁসখালির নয়ান ফকির এসেছিল আসরে। গাইতে-গাইতে হঠাৎ আঙুল তুলে মন্ত্রীমশায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—'হেই বাপ মন্ত্রীমশাই! বল দিকিনি, মলে মানুষ কোথায় যায়? যদি বলিস্ সগ্‌গে, নয় তো নরকে—নয়ান বলবে, সত্যি নাকি? সত্যি নাকি? সত্যি নাকি?'...প্রতি প্রশ্নে এক পা করে নাচের ভঙ্গিতে সে এগোয় তাঁর দিকে। তারপর সামনে গিয়ে চোখ পাকিয়ে বলে—'তুই দেখেছিস? আপন চক্ষে? হ্যাঁ?'

পরিষদের কেউ কেউ ধমকে উঠল—'এই নয়ান! গান গাও—গান। ফাজলেমি কোরো না।' আসরে গুঞ্জন শুরু হল। বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে যে! এস. ডি. ও সাহেবের মুখ চুন। উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছি, এই বুঝি পুলিশ গিয়ে নয়ানের আলখেল্লায় থাবা হাঁকড়াবে।

কিন্তু হুঁশিয়ার নয়ান তক্ষুনি মন্ত্রীমশায়ের সামনে ঝুঁকে একতারাসুদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে দু'মিনিট কুর্নিশ ঝেড়ে দিল। তারপর মাথা তুলে চোখে বিচিত্র মিস্টিক ঝিলিক খেলিয়ে নাচতে নাচতে সরে এল। সেইসঙ্গে একখানা গান—

'চিন্তারাম দারোগা বাবু আমায় করলে জ্বালাতন।
উপায় কী করি এখন॥...
চিন্তারাম নাম যার, আমায় করলে গেরেফতার
হাতে বেঁধে ফেলে রাখলে হাজতের মাঝার।
আমায় ধরে চুলে চড় চাপড় ঘুষি কিলে
তৌসিলে বাবার নাম ভুলিয়ে দিলে।
না জানি বিচারে কী হয় এখন॥'

তখন সবার চোখ পুলিসের দিকে। মন্ত্রীমশায় হাসলেন। দারোগাবাবু হাসলেন। আমলাতন্ত্র হাসতে লাগল। কানে এল, এক অফিসার কাকে বোঝাচ্ছেন—'ওঁরা সাধু-সন্ন্যাসী লোক। তুই-টুই বলা ওঁদের মুখে সাজে বইকি।' পরে শুনেছিলুম, মন্ত্রীমশাই নিজে গিয়েছিলেন হাঁসখালির আখড়ায়। আখড়া অব্দি গাড়ি যায় নি। আলপথে কিছুটা হাঁটতে হয়েছিল।

আসলে এস. ডি. ও. ভদ্রলোক ভয় পেয়ে নয়ান ফকির সম্পর্কে অনেক আজগুবি গল্প শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'খুব উচ্চমার্গের সাধক পুরুষ স্যার। উনি কি এমন আসরে আসেন? আপনার জন্যেই আখড়া ছেড়ে এসে-ছিলেন স্যার।' চাকরি বাঁচাতে একরাশ মিথ্যে বলা।

তার পরেরটুকু নয়ানের মুখে শোনা। যেমনি খবর পেল যে মন্ত্রী আসবেন, অমনি সে জামাকাপড় খুলে মালা লেংটি পরে গাছতলার বেদীটায় গিয়ে বসল। চোখ বুজল। হাতে লম্বা লোহার চিমটে। তার গোড়ায় অনেকগুলো আংটা। বুকে চিমটে ঠুকতে লাগল। ঠোঁটে বিড়বিড় করে 'জিগির' বা সাধনমন্ত্র পড়তে থাকল। মন্ত্রীমশাই সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। নয়ানের সাগরেদ পীরুকে আগে থেকে শেখানো ছিল। সে কাঁচুমাচু মুখে জানাল—'হুজুর! বাবাসায়েবের এখন 'মুনি' (মৌনব্রত) হয়েছে। তিন দিন কথাবার্তা বলবেন না।'

অগত্যা মন্ত্রীমশাই ফিরে যান। নয়ান ফকির হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তারপর বেশ কিছুদিন আখড়া ছেড়ে কেটে পড়েছিল। বেচারা পীরু একা থাকত। জিগ্যেস করলে বলত—'বাবাসায়েব বীরভূমের পাথরচাপড়ির মেলায় গেছেন। ফিরতে দেরী হবে।'

নয়ান ফকির ছিল প্রচণ্ড ধূর্ত আর রসিক। বলত—'অব্যেস! বুঝলি বেটা? তুইতোকারিটা বরাবরকার অব্যেস। আদতে কী জানিস? আপনি-তুমি এইসব কথায় মানুষকে বড্ড পর লাগে। সংসারে সবাই মানুষ, সবাই আমার আপন—একই রক্তের কারবার। কারণ? কারণ হল আদম। এক আদম থেকেই মানুষ-কুলের ছিষ্টি।'

তবে সেবার সত্যি বড্ড ভয় পেয়েছিল নয়ান ফকির। সেই থেকে পারত-পক্ষে বড়জায়গা অর্থাৎ বাবু ভদ্রলোক সাহেব-সুবোর দিকে পা বাড়ায় না।

পুলিস দেখলেই আঁতকে ওঠে। 'চিন্তারাম দারোগার' গানখানা ভাগ্যিস তখন মাথায় এসেছিল!...

হাঁসখালির এই নয়নচাঁদ কিংবা পদ্মবাড়ির কানাই খ্যাপা আমাকে মোটা-মুটি চিনেছিল বলা যায়। পায়ের তলা কুটকুট করলেই তখন সোজা নাক বরাবর বেরিয়ে পড়ি—'ওঠ্ মুসাফির, তোল্ গাঁঠেরি, আভি দূর যানা হ্যায়।'

কিন্তু এত ঘুরি, অত ঘুরি—আর আবদুল্লার দেখা পাই নে। এই তরুণ বাউলটিকে আবার দেখবার জন্যে মাঝে মাঝে খুব তাড়া জাগে। ইন্দ্রার মেলায় সেই অদ্ভুত রাতের স্মৃতি মাছির ঝাঁক হয়ে ভনভন করে। কিংবা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ি, মদনচাঁদের সঙ্গেও আর দেখা হয় না কোথাও।

সালার-এলাকায় আলকাপ দলের সঙ্গে কতবার গেছি। খোঁজ করেছি আবদুল্লার। কেউ জানে না কোথায় গেছে সে। জুয়াড়ীদের আসরে সুদর্শনের দেখা পেয়েছি। কথায়-কথায় আবদুল্লার প্রসঙ্গ উঠেছে। সুদর্শন বলেছে—'শালা নির্ঘাত জেলফেল খাটছে তাহলে।'

সব তাগিদই একদিন শেষ হয়ে যায়। আবদুল্লা-মরজিনার ব্যাপারটা ক্রমশ মনের ভিতর তলিয়ে গেল।...

বছর-সালের হিসেব দিতে পারব না—ওই জীবনের সবটাই খাপছাড়া আর এলোমেলো। বাংলার পাড়াগাঁয়ে তখনও ঘড়ির যুগ চালু হয়নি বস্তুত। সময় ঘণ্টা মিনিট নিয়ে মানুষ হিসেব কষত না। বেশ চলে যেত প্রহর, দিন, রাত, মাস, বছর। তেমন কোন ব্যস্ততা গাঁয়ের মানুষকে তখনও একগুচ্ছের হাত-পাওলা মাকড়সা করে ফেলে নি।

সেবার স্বরূপনগরের বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি বাসের অপেক্ষায়। বছর সাত-আট বয়সের একটি সুন্দর ফর্সা চেহারার ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে খয়েরি হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা নীল স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে স্যাণ্ডেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে তারপর একটু ঘুরল। যেদিকে ঘুরল, সেদিকটায় একসার দোকানপাট। চা সন্দেশ পান সিগারেট এইসবের। সবে রাস্তা চওড়া হয়েছে এখানটায়। খাল ভরাট করে ওই দোকানগুলো গড়ে উঠেছে। ছেলেটি যেন ওদিক থেকে কার ইশারা পেয়ে আমার দিকে ফের ঘুরে মিষ্টি হাসল। একটু অবাক হয়েছিলুম। বললুম—'কিছু বলবে খোকা?'

ছেলেটি সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল—'মা আপনাকে ডাকছে।'

'তোমার মা? কোথায়?'

সে আঙুল তুলে ওদিকটা দেখাল। পা বাড়ালুম সে দিকে। সে আগে চলল। ছেলেটি নিশ্চয় বাবুবাড়ির—সম্ভবত আমাদের গাঁয়েই কোন বাবুবাড়ির চেনাজানা মহিলা কোথাও যাচ্ছেন। এই ভেবেই আমি গেলুম। কিন্তু তারপর

যখন তার মায়ের দিকে চোখ পড়ল, প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম—'মরজিনা! তুমি!'

হ্যাঁ, মরজিনাই বটে। চওড়া নকসীপাড় হলদে শাড়ি, লাল জবলজবলে ব্লাউস, কপালে লাল টিপ, সদ্য স্নান করেছে সেবারকার মতো, চুলের ঝাঁপি পিঠ বেয়ে ছত্রখান—উপমা দিয়ে বলা যায়, ওদিক রাত শেষ—সবে সূর্য উঠছে, এমন পৃথিবীর সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিটিমিটি হাসছে। কিন্তু এতো সেই ইন্দ্রার নদীর ধারের পাড়াগেঁয়ে সূর্যোদয়, নয়! সূর্য উঠেছে শহরে।

ওই এক পলকেই টের পেয়ে গেছি—এ মরজিনা ইন্দ্রার সেই বাউলকন্যা মরজিনা নয়। এর মুখে সেই সরল প্রাকৃতিক শক্তির বিচ্ছুরণ নেই, যেন এক প্রগল্‌ভতা ঝকমক করছে। মরজিনার চাহনি আর হাসি এমন সপ্রতিভ ছিল না।

কথা বলার সময় তার চোখের পাতা আস্তে পড়ত এবং উঠত দেখেছিলুম। এখন সে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে পারে অনেকক্ষণ। মুখে ছটা ঝলমলিয়ে বলল—'কেমন আছেন?'

'ভাল। কিন্তু এখানে কী ব্যাপার? আর...', বলে সেই ছেলেটির দিকে ঘুরলুম।

মরজিনা মায়ের মিষ্টি হেসে বলল—'সানু, মাস্টারমশায়কে সালাম করো।'

ছেলেটি আমার পায়ে হাত দিতে এলে তাকে দু'হাতে টেনে নিয়ে বললুম—'তোমার ছেলে? বাঃ। কবে কবে এতখানি কাণ্ড হয়ে গেছে দেখছি।'

মরজিনা বলল—'তা তো হয়েইছে। সময়টা কি কম, মাস্টারমশায়? আট-নটা বছর গড়িয়ে গেল। আসুন, আমার ঘরে আসুন।'

সব প্রশ্ন চেপে ওর সঙ্গে এগিয়ে গেলুম। দোকানগুলোর শেষ দিকটায় দুদিকে গভীর খাদে জল জমে আছে—মধ্যিখানে একটা বাঁধ। সেই বাঁধটা পার হয়ে গেলুম—একেবারে চুপচাপ। ওর মুখেও কোন কথা নেই।

ছেলেটি আগে আগে দৌড়ে চলে গেল। বাঁধের শেষে ঘন গাছপালার মধ্যে কিছু ঘরবাড়ি রয়েছে। একটা গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল একটু দূরে—খুব পুরনো মসজিদ নিশ্চয়। স্বরূপনগরের এই পাড়াটা আমার অচেনা। কখনও আসার দরকার হয়নি। রাঙচিতার বেড়া দেওয়া এক টুকরো সবজী এবং ফুলের বাগান দেখিয়ে মরজিনা বলল—'বাপজানের হাতের বাগান। দিনরাত ওই নিয়ে থাকত ইদানীং। সব ছেড়ে শেষে এই!' বলেই সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুঝলুম মদনচাঁদ বেঁচে নেই।

ছোট্ট বাগানের সামনে একটা সুন্দর ঝকঝকে মাটির ঘর দেখা যাচ্ছিল। টালির চাল। ইন্দ্রার সেই বাড়িটার চেয়ে অনেক দামীই বটে। ছেলেটি বাগানে ঢুকে গাঙফড়িং ধরার চেষ্টা করছিল। মরজিনা ধমক দিয়ে বলল—'সানু!

কাজ আছে। আয়।' সে গ্রাহ্য করল না।

সদর দরজা খোলা ছিল। ঢুকে দেখি ছোট্ট উঠোন—মাটির পাঁচিল ঘেরা। সেই পাঁচিলেও টালির চাল। সচ্ছলতার ছাপ খুব স্পষ্ট। ভিখ মেঙে খেত মদনচাঁদ—কোথায় এত টাকা পেল?

'ব্যাঙা! বেঙু রে।' মরজিনা ডাকতে থাকল।

উঠোনের দিকে নীচু মেঝেওয়ালা রান্নাঘর থেকে একজন যুবক বেরিয়ে এল। পরনে খাকি ময়লা হাফপ্যান্ট এবং ছেড়াখোঁড়া। গায়ে তেমনি ময়লা গেঞ্জি। মোটামুটি শক্তসমর্থ গড়ন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল আছে। হাতের কব্জিতে তামার বালা আছে। আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। চাউনিটা যেন অপরিচ্ছন্ন।

সে মাথা নাড়ল। কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকেই রয়েছে।

'একমুঠো চাল বেশি দিবি। অতিথ আছে। আর শোন, চায়ের কেটলি চাপা।' মরজিনা বারান্দায় উঠে কোমর থেকে চাবির রিঙ বের করল। ঘরের দরজার তালা খুলে ফের ব্যাঙার উদ্দেশে বলল—'সানুকে একবার ডেকে দিস তো ভাই!'

বারান্দায় লাল সিমেন্ট। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘর খুলে ডাকল আমাকে—'ভেতরে আসুন মাস্টারমশাই।' দরজায় পর্দা ঝুলছে। সেটা এক-পাশে টেনে দিল সে।

একটু ইতস্তত করে ঘরে ঢুকলুম। সে জানলা দুটো খুলে দিল। দেখলুম, জানলাতেও পর্দা রয়েছে। বড়বড় ফুল আঁকা মামুলি ধরনের পর্দা। কিন্তু সেই পর্দা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, গ্রামকন্যাটির খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে নগরকন্যার আদল। একই জীবন কত না রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীতে। আর আমার অবাক লাগছিল না। হাতে পয়সা আছে, মনে নিশ্চয় এসবের প্রতি—অর্থাৎ সৌখিনতার দিকে বরাবর চাপা টানটা ছিল তীব্র, তাই সুযোগ পেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে। শহুরে সৌখিনতার দিকে টান আসা তার মত দেশচরা বাউল ফকিরের মেয়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সারাজীবন বাবার সঙ্গে নানান জায়গা ঘুরেছে। অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে। জীবনের অনেকগুলো স্তর আছে—তাও জেনে গেছে। উন্নত জীবনযাত্রার দিকে মানুষের লোভ স্বাভাবিক।

ঘরের ভিতর যথেষ্ট আলো এল। উত্তরে ও পশ্চিমে খোলামেলা জায়গা আছে। এতো সেই ইন্দ্রার গ্রাম্য ঘর নয়। মফস্বল শহরের একটা শহরতলী বলা চলে। এতকাল পোড়ো ছিল। এখন লোকেরা এসে এদিকটায় ঘরবাড়ি করে ভিড় বাড়াচ্ছে। ইন্দ্রার সেই ঘরটায় ছিল একটামাত্র দরজা—ভেতরে চিরকালের ঘুপচি অন্ধকার। এখানকার এই ঘর সভ্যতার আসার পথ হাট করে খুলে রাখতে চেয়েছে।

ঘরের আসবাবের দিকে চোখ পড়ল। দামী না হলেও একটা পালিশকরা মশারি স্ট্যান্ড লাগানো খাট রয়েছে—গদী আছে। তার ওপর তাঁতের নীল বেডকভার। একটা কাঠের আলনায় কাপড় চোপড় ঝুলছে। শাড়ি আছে কয়েকটা—একটা লুঙি আছে। কিন্তু ওই গেরুয়া আলখেল্লাটা আবার কার? আর দেওয়ালের পেরেকে আটকানো একতারা গুপীযন্ত্র বাঁয়া ডুবাকি ঘুঙুর—একটা বাঁধানো ফটো,...চোখ ঘুরল—কভার দেওয়া ছোট টেবিলে মেয়েলি প্রসাধনের কৌটো এবং শিশি, দেয়াল বরাবর বড় আয়না। আবার ঘুরে দেখতে পাই, খাটের ওপাশে কভার দেওয়া তোরঙ্গ সুটকেশ তার ওপর তানপুরো। নীল খদ্দরের খাপে মোড়া। স্বপ্ন দেখছি না তো? ওই তো টুলের ওপর হারমোনিয়াম! কে সঙ্গীতচর্চা করে?

মরজিনা আমার বিস্ময় উপভোগ করছিল বুঝি নিষ্পলক তাকিয়ে। ঠোঁটে চাপা হাসি। বিছানা দেখিয়ে বলল—'বসুন মাস্টারমশাই। দাঁড়িয়ে কেন?'

তখন বসলুম। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতেই মরজিনা জানলা থেকে একটা এ্যাশট্রে রাখল। দেখি, কেউ সিগ্রেট খেয়ে এ্যাশট্রেটা ভরে রেখেছে। কে সে?

মরজিনা সামান্য তফাতে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বলল—'ভোল পালটে ফেলেছি মাষ্টারমশাই।'

'দেখছি।'

'জানতে ইচ্ছে করছে না'?

'তা আর বলতে?'

'আগে ওই ছবিটা দেখে আসুন। আমার হাত যাবে না পেরেক অব্দি।'

তক্ষুনি উঠে গিয়ে দেখে এলুম। পা তুলে বসে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললুম—'বলে যাও। শুনি।'...

সেদিন মরজিনা বাপকে ছেড়ে পালাতে পারে নি। ফিরে এসেছিল। মদনচাঁদ মেয়েকে ফিরে পেয়ে হেসেকেঁদে পাগল হবার তালে। কিন্তু পরে মাথা ঠিক হলে মাঝে মাঝে বেটিকে বলছে—'দ্যাখ মা, সাদী তো তোর দিতেই হবে। তিন মাস দশদিন পরে যদি হুকুম করিস, আবদুল্লা বেটা যে মুল্লুকে থাক্, তার ঘাড় ধরে তোর সামনে হাজির করব। বল্ মা, কী তোর ইচ্ছে?'

মরজিনা রাগ দেখিয়েছে। কিন্তু তার মনেও তো অশান্তি কম নেই। তিন মাস দশ দিন সহজ কথা নয়। ইসলামী কানুনে ওই এক আদেশ জারি আছে। কারণ ওই সময়ের মধ্যে যদি দেখা যায়, স্ত্রীলোক তার তালাকদাতা স্বামীর সন্তান গর্ভে ধরেছে, তাহলে তালাক তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। সন্তান

ভূমিষ্ঠ হলে তখন তার দায়দায়িত্বের বোঝাপড়া চুকিয়ে সেই তালাক কার্যকর হবে। আবার, পুরুষ যদি ওই সময়ে মত বদলে স্ত্রীকে নেয়—কোন বাধা নেই নিতে। তালাক অকেজো হয়ে যাবে। মারফতী মতানুগামী মদনচাঁদের এই শরিয়তী বিধি মানায় অবাক লাগল। মদনচাঁদ আত্মভোলা মানুষ। সে বলেছে —'মনসুর শালার আশা করিস নে বেটি। তুই শুধু মুখের কথাটা বল্—আবদুল্লা শালাকে দেখি।'

মরজিনা সায় দেয়নি। অথচ মনে চাপা আশঙ্কা—এক লহমার মনের ভুলে সে রাতে নদীর নির্জন চরে যা ঘটে গেছে, বাউল তত্ত্বে তাকে বলে 'প্রকৃতি-পুরুষ মহাযোগ'। মরজিনা একমাস পরেই টের পেল কী ঘটেছে। ঘুষঘুষে জ্বর, বমি—তাই দেখে মদনচাঁদ ভাবল. সেই ছেলেবেলার মতো কৃমির অসুখ, অম্বল-পিত্তির দোষ। না বললেও ওষুধ এনে দেয়। মরজিনা লুকিয়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'খেয়েছি।' তিন মাসের সময় সে আর নিজেকে বাগ মানাতে পারল না। হু হু করে কেঁদে বাবাকে জানিয়ে দিল—মা হতে যাচ্ছে। মদনচাঁদ নেচে-হেসে অস্থির। তার নাতি হবে। সে মনসুরকে খবর দিতে গিয়েছিল বহরমপুর জেলে। মনসুর বলেছে—'খবর্দার! যাও তোমার মেয়েকে নিতুম, আর নেব না। তালাক তালাক তালাক—ফের তিন তালাক।'

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল মদনচাঁদ! জামাইয়ের নামে মামলা করবে খোরাক পোশাক দাবি ক'রে—তেমন পয়সাও নেই। ইন্দ্রার মোড়লদের ধরেছিল। তারা বলল—'আসামী তো এখন কয়েদ খাটছে। ছমাস পরে ছাড়া পাবে। ফিরে আসুক—তখন বিচার করব।' মদনচাঁদ ছ'মাস পথ তাকিয়ে রইল। কিন্তু মনসুরের পাত্তা নেই।

অনেক পরে খবর পেয়েছিল, নলহাটির ওদিকে কোথায় বিয়ে করে সংসার পেতেছে। টেস্টরিলিফের মজুর হয়েছে। সারাদিন মাটি কোপায়। আর সে তেজ নেই। ফকিরি ছেড়ে দিয়েছে।...

মরজিনার খোকা হল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে—কিন্তু চোখের রঙ নীলচে কেন? চোখের তারা পিঙ্গল কেন? মনসুর ছিল শ্যামবর্ণ। ধরা যাক্, ছেলে বাপের বদলে মায়ের রঙ পেয়েছে। কিন্তু ওই চোখ দুটো কার? অমন চোখ তো মরজিনার নয়—মনসুরেরও নয়।

সবাই জানত মনসুরেরই সন্তান পেটে ধরেছে মদনচাঁদের বেটি। কিন্তু এখন ছেলের চেহারা দেখে গুঞ্জন শুরু হয় ফকিরপাড়া শেখপাড়া, মোল্লাপাড়ায় —সারা ইন্দ্রা জুড়ে। তারপর রটল ফকির-বাউলের মুখে-মুখে নানান এলাকার। মদনচাঁদ একদিন হঠাৎ বলল, 'বেটি মরজিনা! সে বেটার খোঁজ পেয়েছি। ঈশানপুরের মেলায় এসেছে। রববানি শাহের আখড়ায় এখন সাতদিন সাতরাতের আসর বসেছে। গিয়ে ঘাড়ে কামড়ে ধরলুম। সব বললুম। বললুম—ওরে শালার বেটা! ছেলেটাকে দেখে যদি চিনতে না পারিস, ওই মুখেই

ফিরে আসিস। ওরে শালার পুত! ওর চোখে তোর চোখ দুটো খোদাই করে দিয়েছেন সাঁই। যাবি কোথা?'

মরজিনা রেগে আগুন এবং লজ্জায় আড়ষ্ট। কিন্তু মদনচাঁদ নাচানাচি করে উঠোনে ভূমিকম্প তুলেছে। আবেগ শেষ হলে বলল—'তারপরে শালাবেটা বললে—তাহলে তো বড় কঠিন কথা। বললে—আসবে। বললুম—আমার বুকে হাত দিয়ে বল্। বুকে হাত দিয়ে বললে—যাব।'

ঈশানপুরের মেলা তিন ক্রোশ দূরে। মরজিনা, যত বেলা যায়—চুপিচুপি কাঁদে—শুধু কাঁদে। ছেলেকে মাই দিতে ভুলে যায়। দুটো দিন দুটো রাত পথ চেয়ে কাটল বাপবেটির। আবদুল্লা এল না। তখন মদনচাঁদ বলল—'তবে আমার সঙ্গে আয়। ওঠ্—বেরিয়ে পড়ি। ইয়ারকি পেয়েছে শালা? মানব-জম্মো কি সহজকথা ভেবেছে গুখেকোর বেটা? বাঃ রে বাঃ! চাঁদসুরুয এমনি—এমনি উঠছে?'...

মরজিনাকে চুপ করতে দেখে বললুম—'তাহলে গেলে?'

মরজিনা মুখ ঘুরিয়ে আস্তে বলল—'হ্যাঁ। সানুকে কোলে নিয়ে বাপজানের সঙ্গে গেলুম। সানুর তখন দেড়বছর বয়েস।'

'আবদুল্লা কী বলল?'

'সানুকে কোলে নিয়ে কাঁদল।'

'তারপর?'

'আমাদের সঙ্গে চলে এল।'

'ইন্দ্রায়?'

'হ্যাঁ। আবার কোথায় যাব?'

'তোমাদের শাদীর ধুমধাম নিশ্চয় হল? কেন আমাকে নেমন্তন্ন করোনি।'

মরজিনা ঘুরে একটু হেসে মাথা দোলাল।

'সে কী!'

মরজিনা খুব গোপন কথা বলার মতো ফিসফিস করে বলল—'আমাদের মারফতী বিয়ে হয়েছে!'

ওর কথার ভঙ্গিতে সিরিয়াস হবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু আমি হেসে ফেললুম।—'কণ্ঠিবদল নাকি?'

মরজিনা হাসল না। গম্ভীর হয়েই বলল—'সে তো বোরেগী বোষ্টমদের হয়। আমাদের অন্যরকম।'...সে আমার চোখে-চোখ তাকিয়ে ফের বলল—'আপনি তো আউলবাউল ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন। জানেন না?'

চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললুম, 'বুঝেছি।' নির্জন প্রকৃতিতে শরীরী প্রকৃতি বাঘিনীর মতো পুরুষ হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর আর কোনও মহফিলের দরকার ছিল না।

হঠাৎ মনে হল, যদি মরজিনা আমার প্রকৃতি হত? খুব ভাবনার কথা। এই তো ওর দিকে তাকিয়ে আছি। আমার শিক্ষাদীক্ষা, আমার সভ্যতা-সংস্কৃতির তথাকথিত উচ্চমার্গীয় বোধ—আমার সব সংস্কার—টালমাটাল হচ্ছে। রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে। এ কি নিছক জৈবপ্রবৃত্তি শুধু?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মরজিনা বলল—'কী এত ভাবছেন মাষ্টারমশাই?

'তাহলে তোমরা দু'জনে সেরাতেই মারফতী বিয়ে করেছিলে?' বলেই হেসে ফেললুম।

মরজিনা লজ্জায় মুখ নামিয়ে বলল—'আপনি তাহলে জানেন!'

'হুঁ, জানি।'

'বসুন আসছি।' বলে সে হঠাৎ বেরিয়ে গেল। যেন গুরুতর দুষ্কর্মের লজ্জা ঢাকতে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে গেল। বাইরে ব্যাঙাকে কী বলছে শুনলুম। অতিথিসেবার ব্যবস্থা হয়তো বাৎলে দিচ্ছে। তার অপেক্ষায় বসে থাকতে-থাকতে আবার ঘরের ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলুম।...

একটু দেরী করে ফিরল সে। বললুম—'খুব ব্যস্ত গিন্নি হয়ে উঠেছ, দেখছি।'

হেসে বলল—'না। ওকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম। আপনার নাম শুনেও এল না।'

'আবদুল্লা?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সে?'

'ওই যে ওখানে একটা পীরের আস্তানা আর মসজিদ আছে—সেখানেই দিন রাত পড়ে থাকে। ডেকে-ডেকে হন্যে হলে একবার বাড়ি আসে। মন হলে একবেলা খায়, নয়তে খায় না।'

আবদুল্লার ব্যাপারটা তাহলে বোঝা গেল। বললুম—'এখানে কদ্দিন এসেছ তোমরা?'

'বছর পাঁচেক হয়ে গেল। এই ভিটেটা আমার খালার (মাসির)। বিধবা মানুষ ছিল। ছেলেপুলে ছিল না। ওই পীরের মাজারের খাদিম (সেবক) ছিল খালু (মেসো)। সানুর বাবাকে এখানে সবাই বললে—তুমিই মাজারের খাদিম হও। বারোবিঘে জমি আছে পীরান জমার। ভোগ করো। তা দশের কথায় কান দিলে না। তখন দশের হুকুমে অন্য একজন খাদিম হল। সে বারোবিঘে জমি ভোগ করছে। দেখুন তবে, কেমন মানুষ! বলে কি না—আমি কি সেই ফকির নাকি? আমি আউলবাউল লোক। যেন আউলবাউল আর নেই সংসারে—তারা কেউ যেন জমিজমা ঘরকন্না নিয়ে থাকে না? ও দুনিয়ায় একা আউলবাউল।'...মরজিনার মুখ ক্ষোভে রাঙা হয়ে উঠল।

জানালা দিয়ে আসা আলোর ঝলকানিতে ওর নাকছাপি ঝিলিক তুলল। ভুরু কুঁচকে নখ খুঁটতে থাকল সে। লক্ষ্য করলুম, হাতে অনেকগুলো সোনার চুড়ি রয়েছে। কানে ইয়ারিং ঝুলছে লাল পাথর বসানো। গলার চেন চিক-চিক করছে। বিধবা মাসির অনেক টাকা পেয়েছিল নিশ্চয়।

'এ বাড়িটা আগে থেকে ছিল তাহলে?'

'ছিল। আমরা এসে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিলুম। মেঝেয় সিমেন্ট করা হয়েছিল।'

'ইন্দ্রা থেকে চলে এলে—সে কি খালার ব্যাপারেই?'

'না। আমরা...আমরা চলে এসেছিলুম। ওখানকার লোকে শাসাচ্ছিল।'

'আবদুল্লার জন্যে?'

মুখ তুলে কী জবাব দিতে গিয়ে সে শুধু মাথাটা দোলাল ঠিক বোঝা গেল না, কেন শাসাচ্ছিল ইন্দ্রার লোকেরা।

'তোমাদের ইন্দ্রা গ্রামটা ভারি ভাল লেগেছিল। নদীটাও খুব সুন্দর। আর ওই কানা দরবেশের আস্তানা আর মাদার পীরের মাজার...'

কথা ছেড়ে মরজিনা বলল—'আপনি আর ইন্দ্রায় যাননি—তাই না?'

'নাঃ। ওদিকে আলকাপ দল নিয়ে আর যাবার সুযোগ পাইনি—তাই।'

একটু হেসে বলল—'দল ছাড়া বুঝি যাওয়া যেত না? আমরা কেমন আছি—জানতেও ইচ্ছে করত না বুঝি?'

'করত। কিন্তু...'

'ভাবতেন মরজিনা একটা খারাপ মেয়ে। কানা দরবেশ তাই বলেছিল মনে পড়ছে না? আর বলেছিল—...'

'আমার নাম চিরাগ, আমার মনে পাপ আছে।'

'যাঃ! আমি এখনও মানিনে ও কথা। আপনি খুব ভাল মাষ্টার মশাই।'

'হয়তো তোমার ধারণা ভুল, মরজিনা।'

'আমি মানুষ চিনি।'

হাসতে হাসতে বললুম—'ওকথা থাক্। কানা দরবেশ কিন্তু লোক হিসেবে খারাপ ছিলেন না। আর সেই খোনা মাস্তান সত্যি, বেচারার কথা ভাবলেই মন কেমন করে ওঠে।'

মরজিনা একটু চুপ করে থাকল। যেন স্মৃতির দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—'মাদারপীরের ভিটেয় এখন সাঁঝবাতি জ্বলে না, জানেন? কানা দরবেশ মারা গেছে। সেবার আশ্বিন মাসে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। বিছানায় মরে পড়ে ছিল বেচারা। মরার সময় মুখে একটুকু পানিও পায় নি। আহা!'

'খোনা মাস্তান তো ছিল!'

'মাষ্টারমশাই, সে এক ভারি আজগুবী কান্ড। একই রাতে দু'জন দু'জায়গায় মরে পড়ে ছিল। খোনা মাস্তান ঝড়বিষ্টিতে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। সারা গায়ে কাদা—মুখে রক্ত।। কলজে ফেটে গিয়েছিল।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলুম। সেই রাতে পা টিপে দেওয়ার কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সেই দিনটার কথা—আমরা বনভোজন করলুম আস্তানায়। খোনা মাস্তানের সে কী খুশি! মুরগীর ঝোল দিয়ে ভাত খেতে খেতে ও শিশুর মতো হাসছিল।

'জানতুম, গাছই ওর কাল হবে। লোকে বলে—খোনা মাস্তানের বয়সের হিসেব নেই। মাদার পীর নাকি কবে ওকে গাছে উঠে পথ দেখতে বলেছিল—মেয়েটা আসছে নাকি। তা সেই থেকেই বেচারা গাছে থেকে গেল।'

'জানি। শুনেছিলুম—তোমার মুখেই যেন।'

আবার দু'জনে চুপ করে কিছুক্ষণ স্মৃতির দিকে তাকিয়ে থাকলুম। একটু পরে বললুম—'হারমোনিয়ামটা কার? তুমি গান শিখছ নাকি?'

মরজিনা সলজ্জ জবাব দিল—'হুঁ।'

'তানপুরাও দেখছি।'

'দু'টো যন্তরই আমার খালুর। ওনার নাম শোনেন নি? আপনি তো ওস্তাদ মানুষ।'

'কে বল তো?'

'মকবুল খাদিম। বড়বড় জায়গায় জলসায় যেতেন। নবাববাহাদুরের বাড়ি থেকে ডাক আসত। কান্দির রাজবাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে তলব হত।...'

অবাক হয়ে বললুম—'মকবুল ওস্তাদের কথা কে না জানে! কী কান্ড! উনি এখানকার লোক জানতুম না তো। আরে—আমি তো লালবাগে ওঁর জলসায় রাত কাটিয়েছি একবার। মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল ছিল। গেরুয়া আলখেল্লা পরতেন। কী অবাক! উনিই তোমার খালু ছিলেন?'

জেলায় মকবুল খাদিম ক্লাসিকাল সংগীতে নামকরা ওস্তাদ ছিলেন। ওই একবার তাঁর গান শুনেছিলুম। তখন আমি নিতান্ত কিশোর। তাঁর শালীর মেয়ে মরজিনা? ইন্দ্রার মদনচাঁদ শাহ ফকিরের মেয়েকে আমি তখন এক-চোখে দেখেছি—এখন অন্যচোখে দেখছি। আসলে ওই দু'তিনটে দিনে মানুষের কতটুকু আর জানা সম্ভব ছিল?

মরজিনা বলল—'খালুর ছেলেমেয়ে ছিল না বলে বরাবর আমাকে টানতেন। বাপজান তো অন্য লাইনের মানুষ। ভাইরাভাইকে দু'চখে দেখতে পারতেন না। বছরে দু'একবার খালু যেতেন। বলতেন—এভাবে পড়ে আছ কেন? স্বরূপনগরে চলে এস। আর মরজিনার অত সুন্দর গলা, গান শিখলে দুনিয়া জয় করবে। তা শুনে বাপজান আরও রেগে যেত। বলত—হুঁঃ!

মেয়েছেলে হয়ে গান করবে কী? ঝুমুর মেয়েরা গান করে—তারা নষ্টা মেয়েমানুষ। খবর্দার খাদিমভাই! আমার মেয়ের লোভ কোরো না। ঠ্যাঙ ভেঙে দোব।'

মরজিনা হাসতে লাগল। তারপর বলল—'সেই খালুর বাড়ি আসতে হল একদিন। তার বাড়িতে নতুন সংসার পাততে হল। সবই হল। কিন্তু বড্ড দেরি করেই আসা হল। খালু তখন বেচে নেই—খালাও নেই। ঘরের জিম্মা দিয়ে ছিল ওই ব্যাঙার কাছে। বিশ্বাসী ছেলে। তাকে খালা খবর দিতে বলেছিল মরার সময়। আমরা রাতারাতি এসে দেখি, পাড়ার লোকেরা অপেক্ষা করে নি। কবর দিয়ে ফেলেছে।'

বললুম—'তাহলে তুমি এতদিনে খালুর ইচ্ছে পূর্ণ করছ। বাঃ! কার কাছে শিখছ?'

'খালুর এক সাকরেদের কাছে। আবার কার কাছে শিখব?' মরজিনা জানাল। 'তবে সেও বাপজান গতবছর মারা গেল, তার পরে। বেঁচে থাকলে বাধা দিত।'

'ভাল। কই, শোনাও—কেমন শিখছ।' বলে আমি আরাম করে বসলুম এবং সিগারেট ধরালুম।

মরজিনা সঙ্কোচ দেখিয়ে বলল—'যাঃ! কিছু না। আজ আপনি থাকুন। ওস্তাদজীকে খবর পাঠাই। ওবেলা আসর জমবে।' বলে সে হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠল। 'দেখি—সানু কোথায় গেল। ওকে ঘরে আটকানো মুশকিল। সব সময় পাকা রাস্তার ধারে গিয়ে খেলা করবে। আজ ভাগ্যিস ওকে খুঁজতে গেলুম—আপনার দেখা পাওয়া গেল!'

সে বেরিয়ে গেল।......

মরজিনা আসতে দেরী করছিল। তখন বেরোলুম ঘর থেকে। বেরিয়ে দেখি উঠোনের টিউবওয়েলে মরজিনা ছেলেকে স্নান করাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল—'চান করবেন তো? একটু অপেক্ষা করুন। ব্যাঙা পানি টিপে দেবে। করবেন তো চান?'

'করছি। একটু ঘুরে আসি...'

আমার হাসিতে সব টের পেয়ে মরজিনা গম্ভীর মুখে বলল—'শিগগির চলে আসবেন। সাধাসাধি করবেন না যেন। আরও পেয়ে বসবে।'

হ্যাঁ, আবদুল্লাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠছি ততক্ষণে। এই নতুন

জীবন সে কীভাবে নিয়েছে জানতে ইচ্ছে করছিল। এই শহুরে শৌখিনতা—তার মানে যাকে বলে কি না আধুনিকতা, তার সঙ্গে কতটা খাপ খেয়ে মিলেছে—নাকি আদতে মেলেইনি, জানবার জন্যে অস্থির হয়েছি। গেরস্থ বাউল বিত্তশালী বাউল কত না দেখেছি। আবদুল্লাকে দেখতে চাই।

বাইরে গিয়ে ছোট্ট রাস্তায় পৌঁছতে গম্বুজ দেখা গেল গাছপালার আড়ালে। এদিকটায় আগাছার জঙ্গল শুধু। একটা দীঘি দেখতে পেলুম। তার পাড়ে আস্তানা আর মসজিদটাও দেখতে পেলুম। ছোট-বড় উঁচু-নীচু গাছের মধ্যে দিয়ে, কখনো পুরনো ইটের স্তূপের পাশ দিয়ে মসজিদের পিছনে পৌঁছলুম। অনেক কালের মসজিদ মনে হল। গম্বুজে ফাটল ধরেছে। সামনে যেতে চোখে পড়ল, এটা একটা পোড়া মসজিদ। মেঝেতে আগাছা গজিয়ে রয়েছে। উঠোনেও একসময় পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল। এখন থেকে জায়গার মাটি বেরিয়ে পড়েছে। পাথর তুলে নিয়ে গেছে কারা। শান্ত নির্জন পরিবেশ। থমথম করছে পুরানো সময় থেকে বয়ে আসা এক চিরকালের শুদ্ধতা যেন। পাখপাখালির ডাক সেই শাশ্বত শুদ্ধতার গায়ে আঁচড় কাটছে সারাক্ষণ। উঠোনের পূর্বদিকটায় মাজার! পুরনো শ্যাওলাপড়া উঁচু জায়গার ওপর একটা পাথরের কবর। সেই উঁচু জায়গাটা ইট দিয়ে বাঁধানো এবং বেশ প্রশস্ত। কবরের শিয়রে কাঠমল্লিকার গাছ। সময়টা চৈত্রের শেষ। সবে কুঁড়ি ধরেছে গাছে। কবরের ওপর বড়-বড় হলুদ পাতা আর কাঠকুটো পড়ে রয়েছে। আবদুল্লাকে দেখতে পেলুম না। কবরের ওপাশে নীচে একটা ভাঙা ঘর রয়েছে। উঁচু জায়গায় উঠে সেই ঘরটা লক্ষ্য করলুম। কিন্তু কেউ নেই। নোংরা হয়ে আছে ঘরের মেঝে। চামচিকের নাদিতে ভর্তি। তখন ডাকলুম—'আবদুল্লা! আবদুল্লা আছ নাকি?'

তক্ষনি সাড়া এল—'আছি সার। আসুন!'

সেই ভাঙা ঘরটার পিছনে সার-সার অনেকগুলো কবর দেখতে পেলুম। সবই পাথরের। একটা প্রকান্ড আর বেঁটে গেরোচনা গাছ গজিয়েছে মধ্যিখানে। তার তলায় খানিকটা জায়গা সাফ করা। সেখানে একটা চট বিছিয়ে বসে মিটি-মিটি হাসছে আবদুল্লা। গাছের নীচু ডালে ওর ঝোলা টাঙানো আছে। খালি গা, পরনে একটা চেক লুঙি, যথেষ্ট নোংরা। গলায় সেই চাঁদির তক্তি ঝুলছে। বাঁহাতে তামার বালাটাও আছে। পাশের কবরটার ওপর একটা গাঁজার কল্কে উপুড় করা এবং খানিকটা ছাই।

'আসুন সার। অনেক কাল পরে দেখা।' আবদুল্লা আবার বলল। 'খবর পেয়েছি অনেকক্ষণ। একবার ভাবলুম যাই, দেখা করে আসি। আবার ভাবলুম—মোনে টান বাজলে তিনিই আসবেন। দেখছি, টান, বেজেছে। বসুন।'

কিন্তু আমি বসব কী—কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছি। দুটো উরু অবশ

হয়ে গেছে। গলা শুকনো লাগছে। উঁচু জায়গাটা থেকে ছায়ার মধ্যে ওর সেই সুন্দর তরুণ শরীর যেন অলৌকিক কী এক রক্তছটায় ঝলমল করতে দেখছিলুম—মনে হচ্ছিল, আবদুল্লা মরজিনার চেয়েও কত সুন্দর হয়ে উঠেছে যেন—কিন্তু কয়েকটি পা বাড়িয়ে এখন যা দেখছি, আতঙ্কে শিউরে উঠেছি। মুখে কথা আসছে না।

আবদুল্লার মুখের হাসি কিন্তু আজ যেমন সুন্দর দেখছি, তেমনি আগে দেখিনি। ও হাসছে। ও হাসি কিসের জানতে ইচ্ছে করছে। 'বসুন স্যার! কী দেখছেন?'

আস্তে বললুম—'মরজিনা আমাকে বলে নি।'

'বলেনি বুঝি?' সে এবার জোরে হেসে উঠল, 'ভয় পাবেন বলে বলেনি।'

'এমন কেন হল আবদুল্লা?'

'আপনি বসুন সার।'

এতক্ষণে চোখে পড়ল ওর পিছনে আরেকটা কবরের পাশে দুটো ক্রাচ পড়ে রয়েছে। বেশ দামী ক্রাচ বলে মনে হল। বসে বললুম—'কদ্দিন হয়েছে?'

'মাসছয়েক হবে। প্রথম প্রথম খুব চুলকোত। ঘা করে ফেলতুম নখের ঘায়ে। তারপর ফুলতে শুরু করল। যাক্ গে, কতকাল পরে দেখা মাষ্টার সার!' আবদুল্লা খুশি প্রকাশ করল দুলেদুলে। ওর বড়বড় চুলগুলো কপালে নাচতে থাকল। 'ভালই আছি। বেঁচে গেছি সার—এ আমার নতুন জন্ম। যাক্ গে—সিগারেট দেন দিকি। খচ্চর ছেলেটাকে বললুম—ফুরিয়ে গেছে। এনে দে। শালাবেটা ভেংচি কেটে পালিয়ে গেল।'

আবদুল্লা কী পাপ করেছিল যে, ওর কুষ্ঠব্যাধি হল? পাপ করলে তবেই নাকি কুষ্ঠ হয়! লোকে এত সব বাজে কথায় বিশ্বাস করে।

'আমার দিকে অমন করে তাকাবেন না গো! আপনার দিষ্টিটা কলজেয় গিয়ে বাজছে। দুটো ভাল কথা বলুন।' আবদুল্লা হাত বাড়িয়ে সিগারেট বেশ কায়দা করে ধরে ঠোঁটে রাখল। আগুন জেবলে ধরিয়ে দিলুম। ও চুপচাপ টানতে থাকল।

'আবদুল্লা!' একটু পরে ডাকলুম।

'বলুন সার!'

'তোমাকে মরজিনা ঘেন্না করে, তাই না?'

আবদুল্লা হাসতে লাগল। 'তাই বলছিল বুঝি?'

'না না। ও কেন বলবে? আমার মনে হল, তাই বলছি।'

আবদুল্লা গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। 'ওর দোষ আমি দিই না। বরাবর একটু স্বার্থপর মেয়ে তো বটেই। আমার মহাব্যাধি যখন হল, তখন থেকে ওর হুকুম হল—পাশের ঘরে গিয়ে থাকো। ছেলেকে ছুঁয়ো না। আমার ঘরে ঢুকো না। আলাদা থালা বাসনে খাও। তো, সেটা অন্যায় কিছু বলে নি।

এই কেরাচ দুটোও কিনে দিলে। না সার, মরজিনা খুব ভাল মেয়ে। ওর দোষ আমি দিই না।'

একটু চুপ করে থাকার পর ফোঁসফোঁস করে নাক ঝেড়ে সে বলতে থাকল—'আচ্ছা মাষ্টার সার, আপনি তো বিদ্বান লোক। এক কথার জবাব দিন দিকি। যদি আমার এই মহাব্যাধির কারণ হয় পাপ, তাহলে একই পাপের পাপী যারা—তাদের তো কিছু হল না? তারা তো চুটিয়ে সুখে রাজত্ব করল! ক্যানে অমন হয়—বলুন তো? বলুন সার—চুপ করে থাকবেন না! আপনি বলুন।'

আজিমগঞ্জ স্টেশনে পালিয়ে গিয়ে ঠিক এই উত্তেজনায় ও আমাকে প্রশ্ন করেছিল। সেই একই ভঙ্গী—একই তীব্রতা। বললুম—'কী পাপ করেছিলে?'

'কানা দরবেশ ঝড়ের রাতে মারা গেল। সকালে আমিই আস্তানায় গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে পাই। আমি সার, দরবেশের লাস পড়ে আছে, আর তছনছ করে ঘর হাতড়াচ্ছি—জানতুম, ওনার অনেক টাকা আছে। লোকের মানতের টাকা। কাক পক্ষীতেও জানে না তখন কী হচ্ছে। ওদিকে খোনা মাস্তানও মরে পড়ে আছে গাছতলায়—পাখি মরা দেখেছেন তো ঝড়-পানিতে? সেই রকম।'

'টাকা পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ সার। মেঝের এক জায়গায় তক্তা ছিল দেখেছেন নিশ্চয়। তার ওপর চালের কুঠিটা ছিল। তক্তার তলায় ইট চাপানো গর্ত ছিল। তার মধ্যে ন্যাকড়ায় জড়ানো এক পুঁটুলি নোট আর পয়সা। দশ টাকা পাঁচ টাকা এক টাকার নোট, আধুলি সিকি দুয়ানি আনি—গুণে দেখিনি। শ্বশুরকে দিলুম। উনিই গুণেছিল। বললে—তিন হাজার মতো। আমার বিশ্বাস হয় নি সার। আমার শ্বশুরশালা বড় ধড়িবাজ ছিল। মুখে এক—ভেতরে আলাদা।'

'তারপর?'

'পরে দরবেশের ঘরে ইন্দ্রার মোড়ল-মাতব্বররা এল। এসে অনুমান করলে টাকা ছিল। গর্তে খুচরো পয়সা পড়ে গিয়েছিল—তাড়াহুড়োর সময় অতটা লক্ষ্য করিনি। সেই দেখে ওনারা পঞ্চায়েতী বসাল। আবদুল্লারা শ্বশুর জামাই মিলে প্রথমে লাস দেখেছে। তাহলে ওরাই টাকা মেরে দিয়েছে। ডাকো ওদের।'

'তোমরা গেলে?'

'না। সব আঁচ করে আগেভাগে আমি ইস্টিশানে গিয়ে অপেক্ষা করছিলুম। শ্বশুরও কেটে পড়েছিল বাড়ি থেকে ঠিক সময়ে। রাতের বেলায় সবাই মিললুম এক জায়গায়। মরজিনা যতটা পেরেছিল, পুঁটুলি করে

গেরস্থালীর মাল বয়ে এনেছিল। শলাপরামর্শ করে ঠিক হল—চলো, স্বরূপ-নগরেই যাওয়া যাক্। মরজিনার খালা কদিন আগে মারা গেছে তখন। ওনাদের লোক এসে ঘরের চাবিও দিয়ে গেছে। অসুবিধে নেই। ওই ব্যাঙা, সার! ব্যাঙা চাবি দিয়ে এসেছিল। খাদিম সায়েবের কাছে ব্যাঙা বরাবর বাড়ির লোকের মতো আছে। শালা হিন্দু না মোছলমান, জাতের ঠিক নেই।'...বলে আবদুল্লা গাম্ভীর্যটা ভেঙে দিল। খুক খুক করে হাসতে থাকল।

বললুম—'দরবেশের টাকা নিয়েছ বলে পাপ হয়েছে—তা আমি মনে করি নে আবদুল্লা।'

আবদুল্লা মুহূর্তে হাসি থামিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল।...'তাহলে আমার কুষ্ঠ হল ক্যানে?'

'এ একটা ব্যাধি, আবদুল্লা।'

আবদুল্লা জোরে মাথা দোলাল। তারপর বলল—'আমার তাজ্জব লাগে সার, বড় তাজ্জব লাগে। ভেবে-ভেবে কুল পাইনে। পাপটার ফল শুধু আমার একলার বেলা? ওরা তো বাপবেটি বেশ বেঁচে গেল!'

একটু হেসে পরিহাসের ভঙ্গীতে বললুম—'মদনচাঁদ পরলোকে গিয়ে ভুগবে ফলটা। আর মরজিনার কিছু হলে তুমি খুশি হতে?'

আবদুল্লা নড়ে উঠল। সোজা হয়ে বসে বলল—'হুঁ-উ।'

'তুমি ওকে ভালবাস না আবদুল্লা?'

আবদুল্লা বিকৃত মুখে থুথু ফেলে বলল—'মরজিনাকে আপনি চিনতে পারেননি সার। ও পাক্কা ছেনাল!'

'ছিঃ! ও কী বলছ তুমি!'

'সত্যি বলছি সার। যে লোকটার কাছে ওর গান শেখার বাতিক, আজকাল তার সঙ্গে ছেনালি করে। রাতের বেলা ওর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। আমি কি কম দুঃখে ওর ঘরে আর যাই না?'...আবদুল্লা হাঁফাতে থাকল।

ফের বলল—'পুরুষমানুষ তো বটি। মহাব্যাধিতে ধরেছে বলে কি আমি ওর পুরুষ নই সার? আমার চোখের সামনে ঢলাঢলি করবে, আমাকে তা তাকিয়ে দেখতে হবে?'

'না—না। গান শেখে—গানের জন্যে...'

কথা কেড়ে আবদুল্লা বলে উঠল—'ওটা লোক দেখানো ভড়ং। গউর গোঁসাইয়ের সঙ্গে পীরিতের একটা ছল, সার! ও আমি বেশ বুঝি! হায় রে হায়! ওর জন্যে আমি লাইন ছাড়া বেলাইনে এসে কাটা পড়লুম! ক্যানে আমার এ ভুল হল! আঃ আহা হা হা!'

ইন্দ্রার মেলার রাতে নদীর ধারের সেই আর্তনাদ আবদুল্লার। তেমনি পেট খামচে ধরে মুখ নীচু করে আছে। মাথাটা নাড়া দিচ্ছে দু-পাশে।

'বাপ-মার তল্লাসে হাঁটা শুরু করেছিলুম-গো! কোথায় এসে ঠেকলুম।

আঃ আহা হা হা!'

কী বলে ওকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। জীবনের এইসব জটিলতার গিঁট ছাড়াবার সাধ্য মানুষের হাতে নেই। নিজেকে খুব অসহায় মনে হল।

হঠাৎ আবদুল্লা মুখ তুলে ভেজা চোখে হাসল। বলল—'তবে সার, খুশির কথা। বাবাটার খোঁজ পাই নি। মায়ের পেয়েছি। গত মাসে গুরুলিয়ার মেলায় গিয়েছিলুম। বোষ্টমদের মেলা আউল বাউলেও যায় অনেক। সেখানে গিয়ে মাকে খুঁজে পেলুম। সে এক ভারি মজার ব্যাপার।'...

মজার ব্যাপার শোনবার জন্যে সে একটু কেসে হঠাৎ মসজিদের দিকে তাকাল। তারপর চাপাগলায় হিস হিস করে বলে উঠল—'মাগী আসছে! শুনতে আসছে, কী সব লাগাচ্ছি মাষ্টারকে।'

ঘুরে দেখি, মরজিনা হনহন করে আসছে। তার এক হাতে একটা বড় থালা। অন্যহাতে একটা এনামেলের বদনা। উঁচু মাজারের পাশ দিয়ে ঘুরে সোজা চলে এল আমাদের কাছে। চোখে নিরাসক্ত ধরনের দৃষ্টি। থালাটা নামিয়ে রেখে বলল—'চলুন মাষ্টার মশাই! বড্ড দেরি হল দেখে চলে এলুম। ওর তো বাড়ি মুখো হবার ইচ্ছে নেই। আমার হাতের খাবারেও অরুচি। না খেয়ে পিত্তি পড়ুক না—আমার কী!'

আবদুল্লা মুখ নামিয়ে আড়চোখে ভাতের থালা দেখে বলল—'খেয়েছি, নিয়ে যাও।'

'শুনছেন বুলি?' মরজিনা হাসবার চেষ্টা করে বলল। 'এমনি করে কি মরতে বসেছে? জিজ্ঞেস করুন তো! শতবার ডাকলেও বাড়ি যাবে না। এই ভূতপেতের জায়গায় পোকামাকড়ের রাজত্বে সারারাত গ্যাঁজা খেয়ে নাক ডাকাবে। কেন? আমাকে এমন শাস্তি দেওয়ার সাধ কেন ওর?'

আবদুল্লা গোঁ ধরে বলল—'নিয়ে যাও। খাব না।'

মরজিনা বলল—'কেন? কেন খাবে না, আজ পষ্ট করে বলো তো শুনি! এই একজন জ্ঞানী মানুষ সামনে আছে—তাকে জজ মানলুম। বলো, কেন খাবে না?'

আবদুল্লা বাঁকা ঠোঁটে বলল—'ইস্! দেখাচ্ছে। মাস্টার সারকে দেখাতে এসেছে, কত ভালবাসি আমার মরদকে। ও হো! মরে যাই!'

মরজিনা ফোঁস করে উঠল।—'কী? আমি দেখাচ্ছি? দেখাতে এসেছি? কোনদিন খাওয়াতে আসিনি এখানে? বলুক তো ভালমানুষের ছেলে—বলুক!'

'একশো বার বলব। আজ তুমি ওনাকে দেখাতে এসেছ!'

মরজিনা ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। যেন খুব হতভম্ব হয়ে গেছে।

আমি বললুম—ছিঃ আবদুল্লা। ঝগড়া করে না। খেয়ে নাও।'

আবদুল্লা জোরে মাথা দোলাল। 'না। না। না।'

'কেন আবদুল্লা ?'

'কতকাল পরে আপনার সঙ্গে দেখা। ও আমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আপনার সঙ্গে খেতে বসতে দিল না তো মাষ্টার সার!! বড় মুখ করে অন্তত বলতেও পারত। সেই যেমন বিকেল বেলা পেথম ওর হাতে দু'জনায় পাশাপাশি বসে খেয়েছিলুম—মনে পড়ছে?' গভীর অভিমানে ছটফট করে বলতে থাকল আবদুল্লা। 'না হয়—আমি কুষ্ঠো রুগী। মাষ্টার মশায়ের তিনহাত তফাতে বসতুম! কিন্তু ও তো আমাকে ডাকতে এল না। আমি বনের জানোয়ার যে এখানে আপনার সামনে আমাকে খাওয়াতে এল? বলুন সার? আমি মানুষ, না জানোয়ার? বলুন!'

তারপর সে আচমকা থালাটা বিকৃত দু' হাতে আঁকড়ে ধরে ছুড়ে ফেলে দিল। ভাত তরকারি ছড়িয়ে পড়ল কবরগুলোতে। মরজিনা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'আমি একা থাকলে যদি এমন করে আসত—আমি খেতুম। কিন্তু আপনার সামনে আমাকে অপমান করতে এল! আঃ আহা হা হা!' বলতে বলতে আবদুল্লা উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে ক্রাচ দুটো নিল। ঝোলাটা নিল। কলকেটা তুলে ঝোলায় রাখল। তারপর সে পা বাড়াল।

বললুম, 'আবদুল্লা। কোথায় যাচ্ছ?'

আবদুল্লা জবাব দিল না ক্রাচ দুটোতে ভর করে সে কবর ডিঙিয়ে চলতে থাকল। একটু পরে জঙ্গলে সে অদৃশ্য হল। আমি মরজিনার দিকে তাকালুম। দেখি, সে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে জঙ্গলের দিকে। তার দুচোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে। নিঃশব্দে কাঁদছে সে।

স্তব্ধ নিঃঝুম মাজারে ওই গভীর প্রস্থানের একটা বিষণ্ণ ছায়া ঘনিয়েছে যেন। পাখিগুলোও ডাকছে না আর। তারপর মরজিনা বলল—'আসুন মাষ্টারমশাই।'...

চোখের সামনে একদিন একটা সাজানো-গোছানো পৃথিবী দেখেছিলুম। উৎসব ছিল সেখানে। সুখ ছিল দুঃখের সঙ্গে মিলে-মিশে। এখন দেখতে পাচ্ছি সেটা তাসের বাড়ির মত ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। বিষাদ, নির্জনতা আর শূন্যতা ওতপ্রোত হয়ে গেছে।

দ্বারকা নদীর ধারে ইন্দ্রার ওপারে সেই সুন্দর বনভূমির কি হাল হয়েছে, অনেক পরে গিয়ে দেখে এসেছিলুম। সব গাছ কেটে নিয়েছে লোকেরা। মাদার-পীরের কবরে সাঁঝবাতি জ্বলে না। কানা দরবেশের ঘরটা ধসে পড়েছে। কাঠ-মল্লিকার গাছটা মরে গেছে। মাজারের চারপাশটা ধানক্ষেত হয়ে হয়ে উঠেছে।

কানা দরবেশের কবর ছিল মাটির—একটা ঘাসে ঢাকা ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। খোনা মাস্তানকে নাকি ওঁর পায়ের দিকটায় কবর দিয়েছিল। কিন্তু কোথায় সেই কবর? মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। মাদারপীরের মাজারের সেই মাটির ক্ষুদে ঘোড়াগুলো আর খুঁজে পাই নি। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে রোববারে আর পীরের বিয়ের পরব করতে কেউ আসে না।

এখন আউলবাউল ফকির-ফাকরারা যায় ব্লক অফিসের কৃষি-প্রদর্শনীর মেলায়। সেখানে মাইকের সামনে তারা 'আধুনিক' সুরে চেঁচামেচি করে। একশো মাইকের সে কী জঘন্য উপদ্রব! কানে হাত চেপে পালিয়ে এসেছি। চেনা আউলবাউল খপ করে হাত ধরে বলেছে, 'একবার সেণ্টারে নিয়ে যেতে পারেন মাষ্টার বাবা?' সেণ্টার মানে অল ইণ্ডিয়া রেডিও, ক্যালকাটা সেণ্টার। কলকাত্তার ফোককালচার-প্রেমিক দিশী সায়েবরা টেপরেকর্ডার নিয়ে আঁকড়ে বসে থাকেন। ছিলিম টানেন কেউ-কেউ। বিদেশী সায়েবরাও থাকেন। মেম এবং বিবিরাও থাকেন। বিদ্যুতের প্রচণ্ড জেল্লা দিয়ে সভ্যতা পুরানো বাংলার এই মিস্টিক খেড়ো ঘরগুলো পলকে পলকে জ্বালিয়ে দেয়। আউল-বাউল গাঁজার ঘোরে একদা দেখতে পেত চর্যাপদের সেই নিলয়-না-জানা হরিণাকে—এখন দেখে, বিলেত-আমেরিকার হলঘরে হাজার হাজার লালমুখো মানুষেরা হাততালি দিচ্ছে।

'অচিনমানুষে'র দেশে যাবার পথ হাতড়ে জীবন কাটাত যারা, আজ তারা বিলেত-আমেরিকার পথ হাতড়াচ্ছে হন্যে হয়ে।...

যাক্ না। ক্ষতি কী তাতে? দেশের বিদেশী মুদ্রার ভাঁড়ার ভরবে। ওরা ভাল খেয়ে-পরে বাঁচবে। সিল্কের গেরুয়া হবে, পাগড়ি হবে। গাড়ি হবে। আধুনিক কেতায় বাউল-আশ্রম হবে। ফিল্মে নামবে অরিজিনাল চরিত্র হয়ে। ওরা সভ্যতার দেওয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাক। দুটো খেয়ে-পরে ভদ্রভাবে বাঁচুক। আমার তাতে বলার কিছু নেই।

শুধু ভাবি, এ যেন মূলতঃ প্রাকৃতিক বিবর্তনেরই ধারা। সব গ্রামীণ গুটিপোকা শহুরে সভ্যতার রঙচঙে প্রজাপতির ঝাঁক হয়ে উঠল। সেই নিলয়-না-জানা হরিণও যেন খোলস ছেড়ে বেরোয় অন্য চেহারায়। সেই হরিণটা কি তাহলে ছিল পার্থিব ভোগ সুখ আর সম্পদের হরিণ? এতদিনে ধরা পড়ল হাতের মুঠোয়? মনের পুরনো বাউল বলে—ছি ছি! ওকী কথা!

রবীন্দ্রনাথ বাউলের ভাষায় বলেছিলেন—

'হাট করতে এলাম আমি অধরার সন্ধানে
সবাই ধরে টানে আমায় এই যে গো, এইখানে'

...অধরাকে ধরলেই তো সব অন্যরকম। যা দেখেছি রূপের অচিন মায়া, হাতে ধরে দেখি তা একতাল মাংসপিণ্ড হাড় শিরা মেদমজ্জা মাত্র। অরূপ রূপে এসেই বস্তু হয়।

হিজল এলাকায় চমৎকার বাউল গেয়েছিল—'মরা মানুষ পড়ল ধরা শ্রীমতী ভাগীরথীতে।।' আউল-বাউলের মড়া আজ ধরা পড়েছে আধুনিক সভ্যতার বিশাল নদীতে। তবে কি না—ও তো মড়াই বটে। পচে ভুটভুট করছে। কুগন্ধে বাতাস কটু।...

গুটিপোকা প্রজাপতি হয়েছে। মদনচাঁদ শাহ বাউলের বেটি মরজিনা খাতুন ধ্রুপদী সংগীত গাইছে। মন্দ কী! সবে একবছরের রেওয়াজ। গলা একটু-একটু বেটালে যাচ্ছে। কাঁপছে। শেষবেলায় পূরিয়া-ধানেশ্রীর গায়ে ভীরু হালকা—যেন আসন্ন রাতে একটুখানি ছায়া এসে কেঁপে-কেঁপে দুলছে। তারপর গউর গোঁসাই গলা দিলেন। সঙ্গিনীর পাশে সঙ্গী জুটল। হাত ধরাধরি চলেছে দুটিতে। সূর্যাস্তের লালচে ছটা পড়েছে যেন দুটি গায়ে। নিলয়-না-জানা সেই হরিণার মায়া সুরের সুদূর দিগন্তের আলোছায়ার মধ্যে চঞ্চল হয়ে ফুটেছে যেন। সেই সময় ব্যাঙা তবলায় ঠেকা দিতে থাকল। 'বিলম্বিত্' 'দ্রুতে'র স্রোতে এসে মিশল। চর্যাপদের হরিণাকে ঘিরে দুজোড়া বাহু এগিয়ে যাচ্ছে আর এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় আমি চোখ বুজে ফেললুম।

গান শেষ হলে গউর গোঁসাই হাসতে হাসতে বললেন—'বলুন স্যার, চলবে মনে হচ্ছে তো?'

লোকটার বয়স আমার চেয়ে সামান্য বেশি হতে পারে। লম্বা রোগা ফর্সা চেহারা। মকবুল ওস্তাদের শিষ্য তাই মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল। গোঁপদাড়িবিহীন মাকুন্দে মুখ। গায়ে গেরুয়া খদ্দরের পান্‌জাবি, পরনে ধপধপে পরিচ্ছন্ন পাজামা। পায়ে দেখছি লাল বিদ্যাসাগরী চটি। কড়ে আঙুলে মোটা একটি চাঁদির আংটি আছে। আলাপের সময় করজোড়ে নমস্কার করে বলেছেন, 'বান্দার নাম গৌরগোপাল গোস্বামী।'

জানিয়েছেন, শিষ্যা মরজিনা খাতুনকে নিয়ে মাঝে মাঝে বড় জলসায় যান। গতমাসে কলকাতাও গিয়েছিলেন। দরকার বুঝলে ওকে কলকাতার থেকে আরও বড় ওস্তাদের কাছে গান শেখার সুযোগ করে দেবেন। ওর মধ্যে নাকি ভগবৎদত্ত সংগীত-শক্তি আছে। গানের টান শুনেই বুঝবেন।

ইন্দ্রার মেলার রাতে আমি মরজিনার গানের ক্ষমতা থাকতে পারে কি না ভাবিই নি। এখন মনে হচ্ছিল, ভাবা তো খুবই উচিত ছিল। আউল-বাউলের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই সুর-তালের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। মদনচাঁদ ফকির বেশ ভালই গাইত। গায়কের ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে করলে গায়ক-গায়িকা হতে পারে, এটা সবাই জানে। গউর গোঁসাইকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। উনি এক গোপন প্রতিভার বিকাশের পথ খুলে দিচ্ছেন।

কিন্তু রক্তমাংসের মানুষের বড্ড গোড়ায় গলদ। আমার মনে কিন্তু নিরঙ্কুশ খুশি দেখছি না। ওই লোকটাকে পছন্দ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে,

হামবড়াই ভাবটা ওঁর বড় বেশি। ওঁর বিনয় আর ভদ্রতার মধ্যেও সেটা ফুটে বেরুচ্ছে। আর, মরজিনা যেন ওঁরই নিজস্ব সম্পত্তি।

আর, কেন এই চাপা ঈর্ষা মনের মধ্যে ঘুণপোকার মতো সব খুশিকে কুরে খাচ্ছে? আবদুল্লা মরজিনার স্বামী। তার ঈর্ষাকে দোষ দিতে পারছি না আর। ঈর্ষায় আমার কিছু ভাল লাগছে না। শুধু মনে হচ্ছে, মরজিনার ওপর আমারও কী যেন অধিকার ছিল, অবহেলায় সেই অধিকারের ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলুম—আজ হঠাৎ সেটা প্যাঁটরা থেকে বের করে দেখি, পোকায় কেটে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

আসলে আমি সেই পুরনো মরজিনাকে দেখতে চাইছিলুম। তাই যেন বেমক্কা বলে ফেললুম—'মরজিনা, তুমি বাউল গাইতে পারো না?'

মরজিনা জবাব দেবার আগেই গউর গোঁসাই বলে উঠলেন—'রামোঃ! এ্যাদ্দিন যা শিখেছে, সব গোল্লায় যাবে মশাই। বুঝলেন তো? ক্লাসিকাল জিনিস বড্ড জটিল। অনেক ঘাম খচ্চা হয়। ওসব সহজিয়া-টহজিয়া করতে গেলে সবটাই বরবাদ হবে।'

জেদ ধরে বললুম—'কেন?'

'কেন?' গউর গোঁসাই সোজা হয়ে বসলেন। 'আপনি তো মশাই এজুকেটেড লোক। এটা বুঝলেন না? ধরুন—আগে লোকে স্বরূপনগর থেকে বহরমপুর যেত পায়ে হেঁটে। এখন বাস হয়েছে। বোঁও করে চলে যাচ্ছে এক ঘণ্টায়। বলুন—এবার ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? আর কেউ পায়ে হেঁটে যেতে চাইবে? চাইবে না। কষ্টকে সবাই ফাঁকি দিতে চায়।'

উপমাটা ঠিক মিলল না। কিন্তু তর্ক করলুম না। আমার মন ভাল নেই, হয়তো তাই। মরজিনা একটু হেসে বলল—'মাষ্টার মশাই বাউল গানের ভক্ত। নিজেও গান করেন।'

'তাই বলুন!' বলে গউর গোঁসাই হারমোনিয়ামটা আমার দিকে ঠেলে দিলেন। 'তবে চুপ করে আছেন যে বড়? নিন—মুখ খুলুন। ব্যাঙা, রেডি।'

লোকটার চোখের কোণায় বাঁকা ঠার যেন। গোঁ ধরে বললুম—'নাঃ মুড নেই।'

মরজিনা বলল—মাষ্টারমশাই কিন্তু আলকাপের আসরে কেমন নেচে-নেচে গাইতেন। আমি দেখেছি।'

গউর গোঁসাই বসা অবস্থায় প্রায় ছইঞ্চি লাফ দিয়ে বললেন—'সর্বনাশ! আলকাটাকাপ! লে হালুয়া! ও মশাই! ওই দেখুন, ঘুঙুর আছে—পরে নিন। ব্যাঙা! লাগাও ভেল্কি। আমি হারমোনিয়াম ধরছি।"

উনি আলকাপের দলের হারমোনিয়ামের বাজনাকে যেন ভেংচিকাটার মতো নকল করে দ্রুত আঙুল চালালেন এবং ব্যাঙাও অবিকল সেই ব্যঙ্গ নিয়ে আল-

-কাপের দলের তবলার বাজনাকে ভেংচি কাটতে থাকল। কান গরম হয়ে গেল আমার। আলকাপকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় আলকাটাকাপ।

তারপর দেখি, সেই তুলকালাম ব্যঙ্গ-বাজনার মধ্যে মরজিনাও সায় দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। শক্ত ধারাল নুড়ির মতো সেই হাসি আমার ওপর এসে পড়তে থাকল।

—'মাষ্টারমশাই! একবার হোক না সেই গানটাঃ ও আমার ময়না পাখি...'

আমি চুপ করে আছি দেখে গউর গোঁসাই বাজাতে-বাজাতেই বললেন—'বেশ তো! মন না চায়, বাউলটাউলই হোক। ব্যাঙা, ওই আলখেল্লাটা পেড়ে দে। একতারাটা নামা। ডুবকি লাগবে নাকি?'

ব্যাঙা বাঁয়ায় জোর আওয়াজ তুলে বলল—'আলাকাটাকাপ হোক, আলকাটা-কাপ! আমার রসের বঁধুরে/আমার প্রাণের মধুরে...'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালুম। ওরা চেঁচিয়ে উঠল—'বহুত আচ্ছা! নেচে-নেচে।'

তারপর মরজিনা বলে উঠল—'ও কী মাষ্টারমশাই!' কোথায় যাচ্ছেন?'

বাইরে এসে দেখি সন্ধ্যার হাল্কা ছায়া জমেছে। আর তার মধ্যে আবদুল্লার ছেলে সানু হাফপেণ্টুল পরে খালি গায়ে এবং খালি পায়ে মদনচাঁদ ফকিরের বাগানে প্রজাপতি ধরতে ব্যস্ত। অন্য কোনদিকে মন নেই তার। আমার দিকে ঘুরেও তাকাল না। অথচ কী যে ইচ্ছে করছিল, ওর সেই পিঙ্গল চোখের নীলচে তারা দেখতে।

পরে মনে হল, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। আমি আবদুল্লার মতো চলে এলুম!

এর একটাই মানে হয়। মরজিনাকে ছেড়ে তার পুরনো পৃথিবীর অবশিষ্ট যা কিছু ছিল—শেষ বারের মতো দূরে সরে গেল সব।...

একমাস পরের কথা।

গাঁয়ের পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, হরিপদ বাউলের সঙ্গে দেখা। হরিপদ করযোড়ে ঝুঁকে বলল—'প্রোণাম হই গোঁসাই! পথবাগে তাকিয়ে কার পিতীকে করছেন গো? দূর থেকে দেখছি আর ভাবছি, উনিই তো তিনি বটেন। কিন্তুক ই কী উদেস-উদেস চেহারা গো গোঁসাই? এ্যাঁ?' আমুদে হরিপদ হাসতে লাগল।

বললুম—'তোমারও চেহারা বদলে গেছে হরিপদ। অসুখবিসুখ হয়েছিল নাকি?'

হরিপদ বলল—'ঠিক ধরেছেন। হয়েছিল নয়—হয়েছে। শূলের ব্যারামে ভুগছি।'

'তোমার সাধিকাটি কেমন আছেন? একা কেন?'

আমার প্রশ্ন শুনে হরিপদর মুখটা মুহূর্তে গম্ভীর হল। তারপর জোর করে হেসে বলল—'আপনার কাছে নুকোছাপা করে কী হবে? যার যা রাস্তা। আমি হাঁটি আপন রাস্তায়—আপনি হাঁটেন অন্য রাস্তায়। সবাই জন্মো থেকে হাঁটছে। সবাই ভাবছে এই রাস্তায় হেঁটে গেলেই পাব—মনের বাঁধা বই তো নয়। কাঞ্চন দেখলে ভুল রাস্তায় চলে এসেছে—তখন নিজের রাস্তা খুঁজতে গেল। আমি আপিত্যি করিনি। ক্যানে বাগড়া দেব বলুন?'

ওকে চুপ করতে দেখে বললুম—'তাহলে তোমাকে ছেড়ে গেল কাঞ্চন!'

'আজ্ঞে গোঁসাই।' হরিপদ শুকনো কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি করতে থাকল। মুখটা মাটির দিকে।

'আমি যেন জানতুম, হরিপদ।'

'জানতেন নাকি?' বলে সে আমার দিকে হাসিমুখে তাকাল।

'জানতুম। ভেবেছিলুম তোমাকে সাবধান করে দেব। পারিনি—পাছে তুমি কী ভেবে বসো।'

হরিপদ ঠোঁটে তাচ্ছিল্য ফুটিয়ে বলল—'ছেড়ে দিন। যার যা পথ। তবে মেয়েটা পরিণামে কষ্ট পাবে বড্ড। পথটা তো ভাল নয়। তাই ভাবি, হায় রে মানুষ! সুখ-সুখ করে এত যে ছোটাছুটি, সুখ কাকে বলে যদি জানতিস! কাঞ্চন সুখ ভেবে এমন বিছানায় শুল, তার তলায় কালসাপের গর্ত।'

প্রশ্ন করতে ওর দিকে তাকালুম।

হরিপদ আস্তে বলল—'শহরের বাগানপাড়ার গলিতে আছে এখন।'

চমকে উঠলুম। বাগানপাড়ায় গলি ব্যাপারটা কী—এলাকার সবাই জানে। ঝগড়াঝাঁটিতে কথাটা ব্যবহার করা হয়। সদর শহরের পতিতালয়ের নাম বাগান-পাড়া গলি। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকলুম। বটতলায় বসে আছি। মাথার ওপর লাল বটফল ধরে আছে। পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। বটতলা জুড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হলুদ শাঁস পড়ে আছে। দুধারের মাঠে খরার রোদ্দুর ঝকমক করছে কাঁসর ঘণ্টার মতো। আকাশে মেঘ নেই কোথাও। একটু পরেই লু হাওয়া বইতে থাকবে। তখন আর এখানে বসা যাবে না।

'মাধুকরীতে বেরিয়েছ তাহলে?'

হরিপদ পেটে হাত বুলিয়ে বলল—'না গোঁসাই। গুরুলিয়ায় মায়ের কাছে যাচ্ছি। মায়ের আশ্রমে। শুনেছি, সব রকম ব্যামো মায়ের হাতের ছোঁয়ায় সেরে যাচ্ছে। যাই, দেখি দয়া পাই নাকি।'

অমনি মনে পড়ে গেল আবদুল্লার কথা। গুরুলিয়ায় ওর মাকে নাকি খুঁজে পেয়েছে বলছিল। তাহলে কি...

'হরিপদ, চলো—আমিও বেরিয়ে পড়ি তোমার সঙ্গে।' বলে উঠে দাঁড়ালুম।

হরিপদও উঠল। খুশি হয়ে বলল—'ভাল, ভাল। চলুন।' বলে সন্দিগ্ধ-

দৃষ্টে আমার দিকে তাকাল—'আপনার ব্যামোটা কী গো? চেহারা দেখে ঠিকই ধরেছিলুম দেখছি।'

'আমার?' বলে একমুহূর্ত চুপ করে থাকলুম। তারপর বললুম—'সে বড় জটিল।'

হরিপদ সিরিয়াস হয়ে বলল—'মায়ের হাতের ছোঁয়া পেতে দেরি গোঁসাই। ভাববেন না। চলুন, চলুন। মা সবারই মা—হেঁদু মোছলমান বলে কথা নেই। সবাই ওনার ছেলে গো, সবাই সমান। জয় মা জয় মা!'

কিছুদূর হাঁটতেই একটা ট্রাক পেয়ে গেলুম। গুরুলিয়া যেতে ঘণ্টা দুই।...

অজস্র ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ উবুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে—দু'হাত সামনে বাড়ানো। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! শেষদিকটায় এক সন্ন্যাসিনী উঁচু বেদীতে বসে আছেন। মাথায় একরাশ জটা। সিদ্ধাই যোগিনী বা ভৈরবী মনে হল। ত্রিশূল আছে। মড়ার মাথা আছে। তাঁর বাঁহাতে ত্রিশূল, ডানহাতে ওপরে সোজা উঠে রয়েছে বরাভয়ের মুদ্রায়। চোখ বন্ধ। পাতলা টুকটুকে ঠোঁটে স্মিত হাসি। আমার মতো যারা দর্শক, একপাশে দাঁড়িয়ে তারাও হাত জোড় করে রেখেছে। বিড়বিড় করে করে কিছু বলছে। শুধু আমিই ভক্তিহীন—পাষণ্ড নাস্তিক। নির্বিকার। আমার কোন প্রার্থনা নেই।

খুঁজছি আবদুল্লাকে। সে তাহলে অবশেষে এই মাকেই খুঁজে পেয়েছে? কিন্তু সেও কি তাহলে ব্যাধিমুক্তি চায়?

ভৈরবীর উদ্দেশে মনে মনে বললুম—না, সন্ন্যাসিনী, না। এই হোক তার জীবনের শেষ অধ্যায়। সন্ন্যাসিনী, তুমি কি টের পাচ্ছ না, আবদুল্লার কুষ্ঠ সেরে গেলে কী দারুণ ব্যাপার ঘটতে থাকবে? অন্তত মদনচাঁদ শাহের মেয়ের দিকে তাকিয়ে তুমি আবদুল্লার ওপর থেকে করুণা প্রত্যাহার করো। আর, নিজেও তো কম কষ্ট পাবে না। আবদুল্লা! কী লাভ ওর কাটাঘায়ে নুনের ছিটে ছড়িয়ে?

নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভেবেছিলুম বুঝি। কিছুক্ষণ পরে আশ্রমের বাকি অংশটা দেখতে গেছি। ঘুরতে ঘুরতে একখানে দেখি ঘনপাতায় ঢাকা বকুল গাছের ছায়ায় কে চিত হয়ে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলুম। আবদুল্লা! মায়ের ভর ওঠার সময় রোগ সারানো বর নিতে সে যায় না তাহলে!

সে চোখ বুজে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে। হয় তো গাঁজার নেশায় দিন-দুপুরে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। বুঝলুম ও ব্যাধিমুক্তি চায় না। কী চায় তবে? মায়ের স্নেহ? তাছাড়া আর কী! ওর ঘুমন্ত মুখে সেই সুখ দেখলুম। মায়ের কোলে ছেলে যখন ঘুমোয় তখন যে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আরামের ভাবটি ফুটে ওঠে—সেই ভাব ওর মুখে রয়েছে।

জাগাতে ইচ্ছে করল না। আস্তে আস্তে চলে এলুম।

বিভ্রান্ত

দীপংকর চক্রবর্তী

লোপামুদ্রা চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু

হৈমন্তীর চিঠি পেয়ে পারু বিব্রত হয়েছিল। কতকাল পরে হৈমন্তীর সাড়া এলো ভেবে প্রথমে খুব খুশি হলেও পরে পারু টের পেল, চিঠিটা আসলে ডালিমেরই। তার বন্ধু ডালিম।

পারুর মতে, মানুষের মূল্যবোধ ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। বন্ধুত্বের কথা ধরা যাক। বন্ধুত্ব একটা বিশুদ্ধ মূল্যবোধ, যাকে বলা যায় পারফেকশান। কিন্তু খুনী ও লম্পটের মধ্যেও তো বন্ধুত্ব হয়। চোরে ও মুনাফাখোরে হয়। ঘুষখোর ও বেশ্যায় হয়। এসব বন্ধুত্বের খাতিরে স্বার্থত্যাগ, প্রচুর মহত্ত্ব, এমন কি অনেক সময় প্রাণ বিসর্জনও দেখা যায়।

আবার আত্মহত্যা নাকি পাপ। এতে কোন মূল্যবোধই থাকতে পারে না। অথচ দেশ বা আদর্শের জন্য আত্মহত্যার বেলায়? আমৃত্যু অনশন কিংবা আগুনে আত্মাহুতি কি আসলে আত্মহত্যা নয়?

এবং আদর্শের কথাও ধরা যাক। আদর্শের জন্যে হত্যাকেও মানুষ বিরাট মূল্যবোধে সম্মানিত করে। দেশের জন্যে যুদ্ধ হয় এবং অজস্র হত্যাকান্ড ঘটে। ক্ষুদিরাম স্বাধীনতার আদর্শের জন্যে মানুষ মেরেছিলেন। নাথুরাম গডসে নিজের মতাদর্শের জন্যে গান্ধীজীকে হত্যা করেছিল এবং সেজন্যে তাকেও ফাঁসিতে মারা হয়েছে। অথচ হত্যাকে মূল্যবোধ বলে কেউ মানবে না, বরং তা মূল্যবোধের হানি এবং তা ঘৃণ্য পাপ।

বড্ড গোলমেলে ব্যাপার সব। সবই যেন আপেক্ষিক সত্য। পারু ভাবতে গিয়ে খেই পায় না। সে স্বভাবে শান্ত, নিরীহ, বন্ধুত্বপ্রিয়, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। ঈষৎ অভিমানীও। তার অনুভূতিশীলতা বেশ প্রখর।

সে বরাবর বন্ধুত্বকে মূল্যবোধের বড় ব্যাপার বলে মনে করে, তাই মাঝে মাঝে কোন ঘটনায় সে বিচলিত হয়। প্রচুর ভাবে। জট ছাড়িয়ে খেই পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। একবার একটা অদ্ভুত ঘটনা সে লক্ষ্য করেছিল। কলকাতা এসে প্রথম একটা বাণিজ্যিক বেসরকারী অফিসে চাকরি পেয়েছিল সে। হেড ক্লার্ক ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ওধারে। রোগা খট্‌রাগী লোক। দাঁত-মুখ খিঁচিয়েই থাকতেন। নাম ছিল সত্যব্রত মজুমদার। কিন্তু খুব কাজের লোক বলে কর্তৃপক্ষের কাছের লোক ছিলেন। সেজন্য তাঁর অত্যাচার আপিসের সবাই বরদাস্ত করতে বাধ্য হত। কি এক অজ্ঞাত কারণে সত্যব্রত নকুল নামে ছোকরা বেয়ারাটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। কতবার নকুলের চাকরি যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল। তা হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করল, সত্যব্রত ও নকুলের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গেছে যেন। ব্যাপারটা ক্রমশ এতদূর গড়াল যে দুজনে নাকি রীতিমত বন্ধুতা হয়েছে এমন সব লক্ষণ দেখা গেল। সত্যব্রতর বাড়ি কালনায়। থাকেন শেয়ালদার দিকে একটা মেসে। নকুলকেও সে মেসে টেনে নিয়ে গেলেন। বেচারা নকুল থাকত আপিসের নীচের তলায় লিফটের পাশে দারোয়ানের সঙ্গে।

কেউ কেউ বলল, নির্ঘাৎ নকুল ব্ল্যাকমেইল করছে বড়বাবুকে। কিন্তু ব্ল্যাকমেইল যদি করবে, তাহলে সত্যব্রতর ভাবভঙ্গীতে তো সেটা টের পাওয়া যাবে। আপিসের ছুটির পর কেউ কেউ দুজনকে প্রায় হাত ধরাধরি অন্তরঙ্গ ভাবে হাঁটতে দেখেছে। রসিকতা করে হাসতে দেখেছে। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা জানতে আরও দেরি হত, যদি না আচমকা একদিন সত্যব্রত থ্রম্বসিসে মারা পড়তেন। নকুলের সে কি শোক! যেন বউ মারা গেছে! দাড়ি গোঁফ চুল গজিয়ে ফেলল সে। তার মনমরা শোকার্ত ভাব কিছুতেই যাচ্ছে না। এমন সময় নতুন বড়বাবু বহাল করলেন কোম্পানি। ইনি সত্যব্রতর উল্টো মানুষ। ভারি অমায়িক, হাসিখুশি, স্নেহপরায়ণ। নাম অমিয় তরফদার।

হঠাৎ একদিন এই অমিয় তরফদার নকুলের চাকরি খেয়ে বসলেন। নকুল কান্নাকাটি করে পা ধরে সাধাসাধি করেও পার পেল না। তখন অফিসের সবাই ওর হয়ে অমিয়কে ধরল। অমিয়র মত মানুষ, কি আশ্চর্য, একেবারে বদলে গেছেন! রুদ্র মূর্তি ধরে গর্জন করে বললেন, ওই হারামজাদা স্কাউণ্ড্রেলের জন্যে আপনারা রিকোয়েস্ট করতে এসেছেন? জানেন ব্যাটার স্বরূপ? তারপর ইংরেজি ভাষায় যা বর্ণনা করলেন, সবাই শুনে তো হতভম্ব।

নকুল নাকি সোনাগাছির দালাল। অমিয়কে চুপি চুপি সেধেছিল, যাবেন স্যার? কলেজ গার্ল স্যার। আগের বড়বাবু তো প্রত্যেক দিনই...

নকুলের কাছেই কেউ কেউ ব্যাপারটা পরে শুনেছিল। এই বাজারে চাকরি যাওয়া! মাসখানেক আসা-যাওয়া করেছিল বেচারা। তার কাহিনী বেশ মজার। নকুলের বাড়ি মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে। বউ ছেড়ে একা পুরুষ-মানুষের থাকা—তার ওপর এই শহরে সারাক্ষণ কত রঙবেরঙের স্ত্রীলোক সে দেখছে। দৈবাৎ (?) গিয়ে পড়েছিল এক জায়গায় নেহাত রিপুর বশে। গিয়েই পড়বি তো পড় মুখোমুখি সত্যব্রতর পাল্লায়। সবে দরজায় বেরুচ্ছেন, ছুঁড়িটা ওঁর গোলে ঠানা দিয়ে বলছে, আবার কবে আসবে নাগর, এবং নকুল...

আসলে দুজনেরই সমস্যাটা মৌলিক এবং একান্ত ভাবে জৈবিক। আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানীর মধ্যে যত ফারাকই থাক, শরীরের রকমসকমে কোন এদিক-ওদিক নেই। মহাপুরুষরাও যে আহার নিদ্রা ও মৈথুনের অনুগামী, কেউ মনে রাখে না এ কথা।

সত্যব্রত-নকুল, দুই মেরুর দুটি মানুষের মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা বন্ধুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বন্ধুতার ভিত্তি বেশ্যা।

অতএব পারু টের পেয়েছিল, বন্ধুত্ব যে সব সময় পারফেকশন থেকেই জন্মাবে তার মানে নেই। খুব খারাপ খারাপ ব্যাপার থেকে পৃথিবীতে অনেক ভাল ব্যাপারের উদ্ভব হয়। আর খুব ভাল ব্যাপার থেকে খারাপও জন্মায়। মূল্যবোধ তাই বড্ড গোলমেলে জিনিস। অতি বড় খুনীও যখন তার বাচ্চাকে আদর করে, তখন তার পিতৃস্বরূপ এবং বাৎসল্য তো অস্বীকার করা যায় না।

ত্যাগব্রতী মহান দেশনেতা যখন তাঁর নারীর ওষ্ঠে চুম্বন করেন, তখন তাঁর প্রেমিক সত্তাটাও কি সত্য হয়ে ওঠে না? হিটলারও নাকি নিজের ভাগ্নীর প্রেমিক ছিল। সম্পর্কটা অবৈধ এবং হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য দায়ী, অথচ প্রেম একটা বিশুদ্ধ উচ্চতর মূল্যবোধের ব্যাপার। প্রেমের জন্যে বিশ্ব জুড়ে কত না সাহিত্য কাব্য শিল্পকলার আবির্ভাব, যা নিয়ে মানুষের সভ্যতার এত বড়াই।...

সত্যি, মূল্যবোধ বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। পারু হাল ছেড়ে দিয়ে হাই তোলে। আড়ামোড়া দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েকটি মুহূর্ত। একটু রোগা দেখাচ্ছে কি তাকে? চোখের তলায় তামাটে রঙ জমেছে দিনে দিনে। আজ যেন রঙটা আরও গাঢ়। রাতে ঘুম হয়নি। কত রকম আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখেছে। ভোরের দিকে ঘুম হয়তো গাঢ় হত, হঠাৎ আবার চিঠিটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আর ঘুম এলোও না, শুয়ে থাকতেও ভাল লাগল না।

আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একই সঙ্গে তার কতকগুলো কথা মনে আসে। গত রাতে ঝোঁকের বশে মদ্যপানটা একটু বেশিই হয়েছিল। তার পক্ষে পুরো তিন পেগ খুব বেশি। বার থেকে ট্যাক্সি করে ফিরে টলতে-টলতে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম তো গভীর হবারই কথা। হঠাৎ চিঠিটা আবার পড়ার ইচ্ছে হল। ওটাই সম্ভবত কাল হল ঘুমের। নাকি খালি পেটে শুয়ে পড়ার জন্যেই?

হঠাৎ কী হয়েছে যেন, রাতারাতি দাড়ি এত বেশি গজিয়ে গেল? আর কি সর্বনাশ! এত পেকে গেছে দাড়ি? এখনই দাড়িটা সাফ করা দরকার। সে নিজেকে এত রোগা দেখছেই বা কেন? ট্রেনটা ছাড়ে নটা পাঁচে। পেঁছয় বিকাল তিনটে বেয়াল্লিশে। টাইম টেবিল দেখেছে মোটে একবার। অথচ দিব্যি মুখস্থ হয়ে গেছে।

সঙ্গে কী নেবে? আয়না থেকে ঘুরে সে ঘরের ভিতরে চোখ বুলোয়। এক ঘরের ফ্ল্যাট। ওপাশে একটুকরো ব্যালকনিতে কয়েকটা টব আছে। কাল বিকেলে জল দেওয়া উচিত ছিল। এবার শীতে গোলাপ ফুটল না। এখন তো মার্চ। খুব জোর দিয়ে পাতা ডালপালা গজাচ্ছিল। পাতাগুলো হলুদ হয়ে ঝরে যাচ্ছে। নিশ্চয় কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে। সব কিছু পায়ে মাড়িয়ে তার ওই রুগ্ন ও বন্ধ্যা নারীর মত পান্ডুর ও করুণ গোলাপ গাছের কাছে যেতে ইচ্ছে করল।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, কাল রাতে রুচিরা থেকে তার খাবার কি এসেছিল? মহিলারা বড্ড ভুলো যেন। রুচিরা থেকে খাবার এলে পারু যদি না থাকে, দোতলায় মীরা বউদির কাছে রেখে যাওয়ার কথা। মীরা বউদি যত

রাতই হোক আসবেন এবং টিফিন কেরিয়ারটা দিয়ে যাবেন। কাল রাতে কি উনি এসেছিলেন? কাল রাতে ফেরার পর বেশ কিছুক্ষণ পারু অবশ্য অন্য জগতের বাসিন্দা ছিল। কিন্তু চিঠিটার কথা যদি মনে পড়ে, কলিং বেলের শব্দ কেন সে শুনতে পাবে না?

ব্যালকনিতে প্রচুর রোদ। গিয়ে দাঁড়াতেই আবার চিঠিটা তাকে ভেতর থেকে খোঁচা দেয়। মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মাছির মত ভনভন করে উড়ে আসে মগজের ভিতরে। বন্ধুতা একটা পারফেকশন। অথচ তার সঙ্গে ডালিমের বন্ধুতা ছিল, ভাবতেই তার অস্বস্তি হচ্ছে। কী নয় ডালিম? মাতাল, খুনী, গুণ্ডা, জেলখাটা দাগী!

আর এই ডালিমই একদিন তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল। সেই সন্ধ্যায় রেল-ইয়ার্ডের কাছে হঠাৎ ডালিমের যদি দেখা না পেত, বীরেশ্বরের চেলারা তাকে স্ট্যাব করত। ড্যাগার তুলেছিল, নাকি ভোজালি, আবছা অন্ধকার ছিল, একটা মালগাড়ির ছায়া পড়েছিল সেখানে। পারুর কাঁধে ডালিম যখন হাত রেখে বলেছিল, শিগগির চলে আয়! পারু যেন ঘুমোচ্ছিল। রেল লাইন ডিঙিয়ে যেতে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। ডালিম তাকে প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে দৌড়ল।

অনেক ঠকে অনেক শিখেছে পারু। জেনেছে, জীবনের অসুন্দর ব্যাপার যত প্রচুর থাক, ইচ্ছে করলে সেগুলো এড়িয়ে জীবনে শুধু সুন্দর নিয়ে বাঁচাও সম্ভব। এখনও মানুষের সমাজে নেই-নেই করেও অনেক ভাল ব্যাপার আছে। সে বুঝেছে, জীবনকে বাইরে থেকে ভোগ করাই ভাল। অনাসক্তি দাঁড় করিয়ে রেখেও আসক্ত হওয়া যায়। পাঁকাল মাছের মত, কিংবা যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না। মন্দিরের পথের পাশে কুষ্ঠরোগী বসে আছে বলেই দেবতার সামনে সিক্তবসনা যুবতীর কেশ লুটানো প্রণাম অসুন্দর হয়ে যায় না। হিংস্র জন্তুর নখের আঘাতে যন্ত্রণায় হরিণী আর্তনাদ করলেও বসন্তের বন-ভূমিতে রঙের বাজার কালো হয়ে যায় না। ওটা মানুষের মনের কারচুপি। প্রকৃতি সুন্দরই থেকে যায়। চিকন হয়ে ওঠা নতুন পাতায় তলার হলুদ শুকনো ঝরাপাতার দুঃখ ঘোচাবার আয়োজন আছে। বন্যার পর মাটি উর্বর হয়।

চিঠিটা হৈমন্তী লিখলেও ওটা আসলে ডালিমেরই চিঠি। হস্তাক্ষরে কি আসে যায়! এমন কি স্বাক্ষরেও? পারু তো তার কোম্পানীর কত চিঠি সই করে। কখনও লেখে 'উই' আর এক্সট্রিমলি সরি ফর...' তাই বলে পারু নিজে কি দুঃখিত হয়?—'তোমাকে অনেকদিন দেখিনি, তুমি কি বদলে গেছ পারু, শরীরে কিংবা মনে—অথবা দুইতেই?' এ খবর হৈমন্তী জানতে চায়নি, চেয়েছে ডালিমই। হৈমন্তী তার স্বামীর মাইক্রোফোনের কাজ করেছে। অতএব ওর জন্যে কিছু না ভাবাই ভাল। ভাবতে হলে ডালিমের জন্যে।

বেচারা ডালিম! ওর জীবনটাই বড় অদ্ভুত। ওকে কেউ যেন কোনদিনও বুঝতে চাইল না বলেই ওর অত সব হাঙ্গামা, হুলুস্থুলু, দাপাদাপি। ওর সব কুকীর্তি আসলে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে স্নেহ-বঞ্চিত শিশুর এটা ভাঙা ওটা ভাঙা অস্থিরতা হয়তো। সবাই যে পারুর মত শান্ত ভাবে মুখ বুজে প্রত্যেকটা বঞ্চনা ও ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেবে, এ আশা করা ভুল। মানুষের স্বভাব, সে জন্মাবার পর থেকেই নানা দাবি তোলে। দাবির ফিরিস্তি নিয়েই তার পৃথিবীতে আসা। এটা চাই, ওটা চাই। তাকে জীবন দেওয়া হবে, অথচ দাবিগুলি আদৌ মেটানো হবে না, কিংবা টালবাহানা করা হবে, এ কেমন কথা? জীবন মানেই তো দাবির ইস্তাহার। জীবন মানেই চাওয়ার একগুচ্ছ স্লোগান। জীবন মানেই অন্ধ, তীব্র, প্রবল কামনা-বাসনা। কেউ কেউ কামনা-বাসনাকে চাপা দিয়ে বাঁচতে পারে, কেউ কেউ পারে না। ডালিম পারে নি। এখনও পারছে না। সম্ভবত এখন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে তার চাওয়ার তালিকা। কারণ, ঊরুর নীচে থেকে একটা পা কেটে ফেলা হয়েছে তার। ক্রাচ ছাড়া চলা-ফেরাই করতে পারে না। হৈমন্তীর লেখায় ডালিম নিজেকে অনেকটা তুলে ধরেছে।

পারুর চোখে সামান্য দূরে পার্কের থ্যাঁতলানো খয়েরি ঘাসের ওপর ক্রাচে ভর দিয়ে ডালিম হেঁটে যায়, কিছুতেই অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারছে না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পারু আবার আয়নার কাছে ফেরে। শেভিং পেস্টের ছিপি খুলতে থাকে। ক্যালেণ্ডারের বুকে ঝোলানো ঘড়িটা দেখে নেয়। ইস! সাড়ে আটটা বাজে প্রায়।...

মোট কথা, কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরত্ব পেরিয়ে পারুর এই স্বদেশযাত্রার পিছনে অনেক মানসিক ঝড় রয়েছে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসেছে। হাওড়া স্টেশনে এসেও হঠাৎ চুলোয় যাক বলে ফেরার জন্যে ঘুরেছে। কিন্তু ট্রেনটা যখন হুইসিল বাজিয়ে ছেড়েছে, তখন অগত্যা নিজেকে সময়ের হাতে তুলে দিয়েছে।

ব্যাণ্ডেল থেকে মোড় নিয়ে সোজা উত্তরে চলতে থাকা লুপ লাইনটার অবস্থা সেই ১৯১৮ থেকে একই রকম। পারু বাবার কাছে এই লাইন পাতার গল্প শুনেছে। পলাশপুর তখন নিতান্ত একটা পাড়াগাঁ। বাদশাহী আমলের কাঁচা রাস্তায় খোয়া ফেলে জেলাবোর্ড সদর শহরের সঙ্গে মফস্বল শহরের যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিল। তার মাঝখানে পড়ে পলাশপুর। তারও আগে ছিল ছোট্ট চটি একটা। চটির পিছনে পুকুর ছিল, তার পারে ছিল বটগাছ। তার নাম ছিল নির্বংশতলা। রেল লাইন পাতার সময় গাছটা কাটা হল। তার কোটরে আর ডালের গর্তে মানুষের মাথা পাওয়া গিয়েছিল। রেল কোম্পানি পুকুরটার সংস্কার করতে গিয়ে আরও অনেক কঙ্কাল পেয়েছিল। নির্বংশতলার

এই ইতিবৃত্ত।

হরনাথ ছিলেন ডাক্তার। পাস করা ডাক্তার নন, কম্পাউণ্ডারের চাকরি করতেন মফস্বল শহরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে। মহারাণী অমলাসুন্দরীর দান সেটা। পরে চাকরি ছেড়ে গাঁয়ে আসেন। নিজেই ডাক্তারি শুরু করেন। তখন পলাশপুর প্রায় বাজার জায়গা হয়ে উঠেছে। একটা ছোট লাইন ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে পাশের জেলার সদরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তখন প্ল্যাটফর্মও হয়েছে উঁচু। ওভারব্রীজ হয়ে গেছে। শাণ্টিং ইয়ার্ড ছড়িয়ে গেছে বিশাল এলাকায়। হলদে বিশাল বোর্ডে লেখা আছে পলাশপুর জং। মধ্যরাতে শাণ্টিং ইয়ার্ডের ওপর ভাঙা চাঁদ তখন অলীক লাগে। তীব্র শিস দিয়ে একলা ভুষকালো ইঞ্জিন মসমসিয়ে ঘোরে। মাঠের ওপর রেলের ডাকবাংলোতে পাহারাদার সুখলাল আড়বাঁশি বাজাচ্ছে শোনা যায়।

ওভারব্রীজে অত রাতে দাঁড়িয়ে থাকত দুটি ছোট্ট ছেলে। পারু আর ডালিম। বয়স তখন দশের বেশি নয়। ডালিম ওই বয়সেই সিগারেট খেতে শিখেছিল। অনেক রাতে বাড়ির ভেতর সব শব্দ থেমে গেলে দুটিতে বেরিয়ে পড়ত চুপি চুপি। ওরা থাকত ডিসপেন্সারির পাশের ঘরটায়। একই তক্ত-পোশে শোওয়া। একই সঙ্গে খাওয়া স্কুলে যাওয়া, সব কিছু। ডিসপেন্সারির মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকত ধরণী কম্পাউণ্ডার। সে ছিল গাঁজাখোর। তাকে ডিঙিয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরুনো একটুও কঠিন ছিল না।

রাতে ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার মধ্যে হয়তো স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল পারু, এবং ডালিমও। পৃথিবীতে কী বিরাট আর তীব্র স্বাধীনতাস্রোত বয়ে যাচ্ছে! সেই প্রথম যেন পারুকে ডালিমই চিনিয়ে দেয়। কিন্তু পারু স্বভাবে শান্ত, ভীতু, নিরীহ। তার মধ্যে সাহসের ব্যাপারটা পরি-মিত। তাই সে সাবধানে পা ফেলেছে। ডালিমের সাহসের কোন গণ্ডিরেখা ছিল না। হয়তো ওর রক্তটাই অন্য রকম।

কিন্তু অপরিমিত প্রাকৃতিক সাহসই কি ডালিমকে স্বাধীনতা চিনিয়েছিল? পারু বুঝতে পারে না এখনও। নাকি দৈবাৎ চিনে ফেলেছিল ডালিম? অত রাতে ওভারব্রীজে গিয়ে সিগারেট খাওয়ার কথা কী ভাবে তার মাথায় এসেছিল?

ডালিম ছিল হরনাথ ডাক্তারের আশ্রিত ছেলে। ওঁর অদ্ভুত অদ্ভুত বাতিক ছিল। তেমনি মানুষও ছিলেন খুব কড়া ধাতের। যা গোঁ ধরতেন, তাই করা চাই। এখন তো পলাশপুর রীতিমত একটা টাউনশিপ, তার ওপর ইস্টার্ণ রেলের কলোনিও বটে। নানা জায়গার নানা রকম মানুষ এসে ভিড় করেছে। এখন সমাজ-টমাজ জাত-বেজাত ও সবের কোন বালাই বিশেষ নেই-টেই। কেউ মাথাও ঘামায় না ও নিয়ে। কিন্তু পারুর ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ের সব রকম ব্যাপার-স্যাপার পলাশপুরে ছিলই।

ডালিম একে মুসলমানের ছেলে, তার ওপর বাবা রমজান ছিল চোরচোট্টা লোক, খাঁটি মুসলমান হলেও কথা ছিল, ওরা তো বেদে। পলাশপুরের সমাজপতিদের মনোভাব ছিল কতকটা এ রকম। হত যদি আরশাদ কাজী কিংবা ইরফান মীর্জার বংশোদ্ভূত কেউ, তাহলে কথা ছিল। ওঁদের চালচলন খানদানী। আদবকায়দা উচ্চস্তরের। আরশাদ সায়েব সাব-রেজিস্টারি করে চুল পাকিয়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন সবাই বড় অফিসার। দেশ ভাগ হলে সবাই অবশ্য পাকিস্তানবাসী হলেন। ইরফান মীর্জা তো জমিদার বংশের লোক। তাঁর ঠাকুরদা মুরশিদাবাদ নবাবী সেরেস্তায় দেওয়ান ছিলেন। সে রবরবা যারা দেখেছে, তারা দেখেছে। এখন কথা হচ্ছে, ওই সব খানদানী পরিবারের ভূলুণ্ঠিত ইজ্জত বাঁচাতে হরনাথ ডাক্তার যদি কিছু করতেন, আনন্দের ব্যাপার ছিল।

তা নয়, রমজান বেদের ছেলে ডালিম—এই সেদিনও মা সুবাসিনীর সঙ্গে তাকে ন্যাংটো হয়ে সবাই ভিক্ষে করতে দেখেছে, তাকে হরনাথ এনে তুললেন নিজের বাড়িতে। নিজের ছেলের সঙ্গে স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। একই ঘরে থাকা, পাশাপাশি বসিয়ে খাওয়ানো, একই ছিটের জামা কিনে দেওয়া।

আমার ইচ্ছে! মাই উইশ! হরনাথ উঠোনে কুয়োতলায় গাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে গর্জন করেছেন। পারুর মা বনশোভা গম্ভীর মুখে বারান্দার রোদে বসে ডালের কুটো বাছছেন। ইয়েস, আমার খুশি। তোরা কেউ ডাকিস নে আমায়। আসিস নে আমার ডিসপেন্সারিতে। ব্যাস!

পারু এই দৃশ্যটাও স্পষ্ট দেখতে পায়। তখন তার একটুও অবাক লাগেনি, হঠাৎ এক অচেনা সঙ্গী পেয়ে কী খুশি যে হয়েছিল! ওর জাতটাতের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেইনি পারুর। ডালিম দেখতে বড় সুন্দর ছিল। পৃথিবীর—নাকি এই পলাশপুরেরই কত অজানা জিনিস পারুকে চিনিয়ে দিয়েছিল। পারু কৃতজ্ঞ থেকেছে ডালিমের কাছে।

হরনাথের ডাক্তারির কোন ক্ষতি অবশ্য হয়নি। পারু এখন বুঝতে পারে, পুরনো গ্রামসমাজ আর তার লোকাচারে ততদিনে মুহুর্মুহু এসে আঘাত পড়ছে বাইরের। এককেটা ইঞ্জিন যেন টেনে নিয়ে আসছে কোত্থেকে এককেটা জটিল বিশাল ট্রেন। পলাশপুর জংশনের মাটি ও আকাশ কাঁপছে থরথর করে। উজ্জ্বল নতুন এসে ময়লা-মাখা পুরনোকে ঢেকে ফেলেছে ক্রমশ। স্টেশনের পিছনের বাজারে চায়ের দোকান করেছিল তারক মেকদার। তার আগে সে প্রতিমা গড়ত। চায়ের দোকান খোলার কারণ যা-ই থাক, প্রতিমা গড়া কেন ছাড়ল, সারাক্ষণ শোনাত চা-পিয়াসীদের। হ্যাঁ গো, পলাশপুরের বাবুদের আর কি সে-দিন আছে? রায়বাবুদের ঘরের মায়ের পুজো যদ্দিন নিজেরা দিতেন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই তারককেই ডাকো। এখন বারোয়ারির হাতে ছেড়ে

দিয়েছেন। জমিদারির পটল তো পয়মালের গো! আর বারোয়ারি? ঝাঁটা মারো! বলে, টাউন থেকে আর্টিস্ট দিয়ে ঠাকুর গড়িয়ে নেব! তারকের কাজ মোটা দাগের! শোন কথা তাহলে। আর সিংগীমশায়ের পুজো? ও দেড় টাকার কারবারে তারক নেই বাবা। সেদিন কি আর আছে?

আসলে তারক সময়ের নতুন রুচির সংগে এগোতে পারছিল না। না— ভুল বলা হল। একটা রুচির নাগাল না পেয়ে অন্য একটা সহজ নতুনের সংগ নিল। তারক হল চা-ওয়ালা। স্টেশনে ট্রেন থেকে নামে ছত্রিশ জাতের মানুষ। মুসলমান পাইকাররা মাথায় গামছা জড়িয়ে বেঞ্চে বসে থাকে। তারিয়ে তারিয়ে চা খায়। সেই এঁটো গেলাস ধোয় তারকের খাকি হাফ পেন্টুল পরা ছেলে তপন। পেন্টুলের দড়ি কিছুতেই টিকবে না কোমরে। ফস করে খুলে পড়বেই। নবীন অধিকারী ফিক করে হেসে বলবেন, এই বারবেলায় ভগবানের জিভ দেখাস নে মানিক!

ডালিম বলেছিল, এই পারু, ভগবানের জিভ দেখবি?

সে কী রে?

পুবের মাঠে রেলের বাংলোয় সুখলাল তখন নেই। টিশনবাজারে গেছে ময়দা কিনতে। চারপাশে কল্কেফুলের জংগল। এক সময়ে ওটা একটা উঁচু পোড়ো জমি ছিল। বাংলোর চারিদিকে উঁচু বারান্দা। পিছনের বারান্দায় বসে ছিল দুজনে। কল্কেফুলের জঙ্গলের ওধারে পুকুর। পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলেছে ডালিম। জোঁক লেগেছিল। জোঁকটাকে ছাড়িয়ে দুটো খেজুর কাঁটায় বিঁধিয়ে টান টান করে রোদে রেখেছে। পুকুরের ওধারে দিগন্ত অব্দি ছড়ানো ধানক্ষেত। টেলিগ্রাফের তারে নীলকণ্ঠ বসে আছে। এমন সময়ে পদ্মফুলের কলি নিয়ে খেলতে খেলতে ডালিম বলেছিল, ভগবানের জিভ দেখবি পারু?

ডালিম সম্ভবত সেদিনই পারুকে শরীর সচেতন করে ফেলেছিল। এ দৃশ্যটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে পারুর। আসলে ডালিম তার আগে পৃথিবীটা চিনে ফেলেছিল অনেকখানি। তার মা সুবাসিনী প্রথম প্রথম খেজুর তালাই বানিয়ে বেচে বেড়াত। শেষদিকে খেজুর পাতা কাটতে গিয়েই একটা চোখে খোঁচা লাগল। হরনাথ ওষুধ দিতেন। কাজ হয় নি। ক্রমশ অন্য চোখটাও গেল। তখন ভিক্ষে করে বেড়াত। সংগে ন্যাংটো ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটা। মায়ের মতই সুন্দর। এবং পারু আরও বড় হয়ে টের পেয়েছিল, লোকে হরনাথ আর সুবাসিনীর গোপন ভালবাসার কথা বিশ্বাস করে। হয়তো তা সত্য হতেও পারে।

সুবাসিনী ডাউন ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের কাছে, যেখানে একটা মস্ত কয়েতবেলের গাছ আছে, সেখানে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ডালিম নাকি শেষ মুহূর্তে মায়ের শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। কয়েতবেলের গাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে, নেমে এসে গার্ডসাহেবের

প্রথমে এই দৃশ্য চোখে পড়েছিল।

পারু বোঝে, ডালিমের মধ্যে প্রকৃতি দিয়েছিলেন এক তীব্র অতিকায় চেতনা—ওর শরীরের আধারে তা কুলোত না। তাই এত অস্থির ছিল সে। অথচ অস্থিরতাকেও তো চেপে রাখতে সে ছিল অদ্বিতীয়। তার মুখ দেখে বোঝার উপায় ছিল না কী ঘটেছে।

রমজান বেদের ছোট ভাই আনিস এক মুসলমান স্টেশনমাস্টারের সুনজরে পড়ে লেখাপড়া শিখেছিল। বউদির সঙ্গে তার যোগাযোগই ছিল না। থাকত মুঙ্গেরে। পরে পাকিস্তানে চলে যায়। পারু অনেক পরে শুনেছিল, আনিস খুলনায় সাবজজ।

রমজান আর আনিসের বাবা কাল্লু চমৎকার পট আঁকত। পোস্টাপিসের ঘরটা তখন মাটির ছিল। তার দরজার দুধারে দেয়ালে দুটো সায়েব এঁকে দিয়েছিল কবে। পারুও দেখেছে। একটু একটু মনে পড়ে। পোস্টমাস্টার শ্যামবাবু তা সযত্নে রক্ষা করতেন। ১৯৪২-এর ঝড়ে ঘরটা ভেঙে যায়। কাল্লু পট নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গো-মাহাত্ম্য শোনাত ছড়া ও গানের সুরে। আবার সাপও ধরত। গোবদ্যির কাজও করত। ইরফান মীর্জার নবাবী আমলের প্রকাণ্ড বাড়ির কিছু অংশ ধসে গিয়েছিল। সেখান থেকে গোখরো বেরিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। সেকেলে খাটের তলা থেকে সেই গোখরো ধরে কাল্লু মাটির হাঁড়িতে পুরেছে, বুড়ো মীর্জা বায়না ধরলেন, খেলা দেখাও কাল্লু!

কাল্লু বলে, হুজুর, আ-কামানো সাপ। সাক্ষাৎ আজরাইল!

আজরাইল হলেন মৃত্যুর দূত। মীর্জা জেদ ধরলেন, ঠিক হ্যায়! আজরাইল দেখব!

কাল্লু অনেক কাকুতি মিনতি করেও রেহাই পেল না। মীর্জাদের দেওয়া মাটিতে তার ঘর। তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। জমিদারি দাপট সমানে চলেছে। কাল্লু হাঁড়ি খুলতেই ক্রুদ্ধ অপমানিত সাপটা তার কপালেই ছোবল দিল...

এই গল্পটা ডালিম হয়তো তার বাবা-মার কাছে শুনেছিল। রেল লাইনের ব্রীজে বসে পারুকে শুনিয়েছিল সে। তখন দুজনে ক্লাস নাইনে উঠেছে। ডালিম ছাত্র হিসেবে ভালই ছিল। ফার্স্ট না হলেও সেকেণ্ড বা থার্ড হত বরাবর। পারু তো টেনেটুনে পাস করত। রেজাল্ট বেরুলে হরনাথ ডালিমকে টেনে নিতেন।—মাই গোল্ডেন আইজ! আমার চোখ জহুরীর চোখ!

হরনাথ ক্লাস এইটের বেশি পড়ার সুযোগ পাননি এবং কম্পাউণ্ডার হয়েছিলেন, পারু বোঝে, তাই যেন অদ্ভুত সব কমপ্লেক্স ছিল বাবার। ভুলভাল ইংরেজি বলে তার মাকে তাক লাগাবার চেষ্টা করতেন। সবাইকে অশিক্ষিত ভূত মুখ্যু বলতেন। মোটা মোটা বই দিয়ে ডিসপেন্সারির একটা দিক ভরে তুলেছিলেন। বিকেলে ডিসপেন্সারির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া টানতেন, হাতে থাকত প্রকাণ্ড বই। ধর্ম ইতিহাস দর্শনের উৎকট সব বাংলা

ইংরেজি বই। বারান্দার নীচে একটুকরো লন। লনে ফুলের বাগান করেছিলেন। গেটে ল্যাভেন্ডার লতার ছাউনি ছিল। তার ওধারে জেলাবোর্ডের সড়ক। সড়কের ওপাশে প্রসারিত ধানক্ষেত। রেল লাইনটা কোণাকুণি চোখে পড়ে। হঠাৎ ডেকে বলতেন, পারু! ডালিম! কাম হেয়ার! পারু, এই প্রিফেসটা পড়ে মানে বল্ তো দেখি!

ক্লাস নাইনে ব্যাপারটা অত সোজা ছিল না। পারুর মুখে তখন যেন খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার রঙ এসে লেগেছে।—কী পড়ানো হয় তোদের? ডালিম, কাম অন!

ডালিম রিডিং ভালই পড়ত। ওর গলাটা ছিল জোরালো। একটু পড়া হতে না হতে বাগ্দীপাড়ার ভুজঙ্গ এসে বলে, ডাক্তোরবাবু, অনুগ্রহ করে একবার চলুন, মেয়েটা কেমন যেন করছে!

হো হো করে হাসেন হরনাথ। তোর মরণ নেই রে ভুজঙ্গ! কি হল মেয়ের? এগো, যাচ্ছি।

ভিতরে ব্যাগ আনতে গেছেন, বনশোভা বললেন, ভুজঙ্গ এসেছে মনে হল! ওকে বোলো তো, ভোরবেলা জাল আনতে। কাটোয়া থেকে ছোট্‌ঠাকুর আসবেন, বলে পাঠিয়েছেন। সেবারে খুব ঠাট্টা করেছিলেন না? খুব তো মাছ খাচ্ছ!

নিবারণ আসবে? তবেই হয়েছে! হরনাথ বলেন, তোমার মাথা খারাপ? নিবারণ! ওর স্বগগো লুঠ হয়ে যাবে না? হুঃ, নিবারণ!

না না, আসবেন। বাণীকে বলে পাঠিয়েছেন।

হরনাথ স্ত্রীকে পাত্তা দিতেন না কোন কিছুতে। বনশোভা ছিলেন পারুর মতই শান্ত চুপচাপ মানুষ। হরনাথ কোন কারণে রেগে গেলে যেন মুখে ভয়ের ছায়া পড়ে থাকত। তাই বলে বাবা-মায়ে মনের অমিল ছিল এমন মনে হয় না পারুর। স্বামীকে নির্বিচারে মেনে নিতে জানতেন বনশোভা। বরং হরনাথ কোন ব্যাপারে মতামত চাইলে বনশোভা একটু চুপ করে থাকার পর মিষ্টি হেসে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, তুমি বলছ যখন তখন তাই। কখনও বলতেন, অতশত বুঝি নে। যা ভাল হয় কর। আমি কি কখনও কোন ব্যাপারে বাধা দিয়েছি?...

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ন্যাংটো ডালিম বসে ছিল। স্টেশন মাস্টার কোয়ার্টার থেকে একটা জামা আর পেণ্টুল এনে দিয়েছিলেন। পোশাক দুটো খুব আগ্রহের সঙ্গে উল্টেপাল্টে দেখে সে ব্যস্ত ভাবে পরে ফেলেছিল। তারপর স্মার্ট হয়ে দাঁড়াল। ঠোঁটের কোণায় হাসি। ওদিকে তখনও তার মায়ের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে, কয়েতবেলের তলায়। মাটিটা ওখানে একেবারে নগ্ন। গরুর পাল মাঠে নামার পথে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত। গায়ে গা ঘষত। সেই মাটিতে সুবাসিনী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ওপরে একটা

ছেঁড়া তেরপল চাপানো।

কাটোয়া থেকে হরনাথ ফিরছিলেন ট্রেনে। সেই অনিচ্ছুক ঘাতক ট্রেনের একটা কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে লাশের দিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন।—সরো, সরো সব! আই অ্যাম এ ডক্টর! লেট মি সি ফার্স্ট!

হাস্যকর নিশ্চয়। ঘন একরাশ চুল ছিল সুবাসিনীর মাথায়। একটুও পাক ধরেনি। তার রোদ-বৃষ্টি-শীত খাওয়া তামাটে শরীরটায় কোন আঘাত লাগেনি। চুলগুলোয় চাপ চাপ রক্ত ছিল। মাথাটা চেপ্টে গিয়েছিল। হরনাথ ধমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুবাসিনী না?

কতক্ষণ পরে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন, ছেলেটা কোথায়? ওর ছেলেটা? হোয়্যার ইজ হার সন?

রামধন পয়েণ্টসম্যান বলল, গাঁটসাহাব উনহিকো লিয়ে গেসলে টিশানমে।...

পারুর ঘুম পেয়েছিল। এ লাইনে সচরাচর ভিড়টা কম এখনও। সেই আগের মত কয়লার ইঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ুচ্ছে। কামরাগুলোর চেহারায় পুরনো সময়ের ছাপ রয়ে গেছে। ফার্স্ট ক্লাসে সে একা। কিন্তু এ কি সত্যি ফার্স্ট ক্লাস? সেকেণ্ড ক্লাসে গেলেই পারত। তত কিছু ভিড় ছিল না। তবে হাত পা ছড়িয়ে শোয়া গেল, এও মন্দ নয়। রাতের ঘুমটা পুষিয়ে নেওয়া গেল। সে ঘড়ি দেখে, আড়াইটে বাজে। টানা তিনটে ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। কেউ লক খোলার জন্যে তাকে বিব্রত করেনি। এ লাইনে চেকারবাবুদের দেখা কদাচিৎ মেলে। কিংবা হয়তো উঁকি দিয়ে দেখে গেছেন ওঁদের কেউ, সায়েবসুবো বলে জাগাতে চাননি। পারু উঠে বসে। তার ঘাড় ব্যথা করছে। সুটকেসে মাথা রেখে শুয়েছিল।

সরে এসে জানলার ধারে সিগারেট ধরায় সে। কতকাল পরে যাচ্ছে। সব অচেনা লাগছে। সময় দেখে বোঝা যায়, এবার জায়গাগুলো তার চেনা উচিত। পারছে না। বাজারসহু স্টেশন নিশ্চয় পেরোয়নি। ওখানে পাকা আধঘণ্টা স্টপেজ। ইঞ্জিনে জল ভরা হবে। দুধারে বিশাল মাঠ। কোথাও কোথাও সবুজ হয়ে আছে। আগের দিনে এমন চৈত্রে ধু-ধু করত মাঠগুলো। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে ইলেকট্রিক লাইন চলেছে। বড় বড় ফ্রেম মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দেশটা বদলেছে অনেক। যে যা-ই বলুক, অনেক রূপান্তর ঘটেছে। পারু দেশের কথা ভেবে খুশি হয়। একেই কি বলে দেশাত্মবোধ? মানুষের অবচেতনায় যেন এইরকম যূথবদ্ধতার সংস্কার আছে। এই সব মাঠে সবুজ বিপ্লব ঘটলে তার নিজের কতটা লাভ হবে, না হবে না, ভাবতেই ইচ্ছে করে না। প্রচুর কলকারখানা গড়লে তার কি মাইনে বাড়বে? হয়তো তাও না। তবু ভাল লাগে ব্যাপারটা।

আর এই ভাল লাগা, নতুনকে ভাল লাগার মধ্য দিয়েই ডালিম নামে একটা অস্বস্তিকর ব্যাপারকে পারু সহজ করে তোলার চেষ্টা করে, যেন গাছ ভরা সবুজ চিকন পাতার মধ্যে একটা হলদে পোকায় খাওয়া পাতা থাকলেও কিছু যায় আসে না।...

স্টেশনে নেমে পারু অবাক হল। কিছু চেনা যাচ্ছে না তো! শান্টিং ইয়ার্ডটা কত দূরে ছড়িয়ে গেছে! রেল লাইনের দু'ধারে নানান চেহারা ও সাইজের কত সব ঘরবাড়ি হয়েছে। পূবের মাঠে সেই ডাকবাংলোটা খুঁজে পায় না সে। তরুণ ইউক্যালিপটাস, ঝাউ আর কৃষ্ণচূড়ার বনের ফাঁকে হলদে অনেকগুলো কোয়ার্টার দেখতে পায়। শুনেছিল, পলাশপুরে ব্লক অফিস হয়েছে। ওটাই কি?

স্টেশনের পশ্চিমে নীচুতে অজস্র দোকানপাট। ভিড় গিজগিজ করছে। কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। সাইকেল-রিক্শোগুলো বিকেলের আপ ট্রেনের যাত্রী বোঝাই করতে ব্যস্ত। ইটবোঝাই ট্রাকটা বিকট আওয়াজ দিয়ে ভেঁপু বাজাচ্ছে। বাসের মাথায় দাঁড়িয়ে এক ছোকরা যাত্রীদের মালপত্র সামলাচ্ছে। মাঝে মাঝে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠছে, 'কদমপুর! হাতিমারা! লোটনগঞ্জো—ও—ও'—

তিনটে প্ল্যাটফর্ম জুড়ে টুকরো-টুকরো ভিড়। হঠাৎ পারুর মনে ক্লান্তি আর তেতোভাব এসে পড়ে। বড় অশ্লীল লাগে পলাশপুর জংশনকে। নামেই জংশন ছিল একসময়, নির্জন চুপচাপ হয়ে থাকত সারাক্ষণ। ছোট লাইনের প্ল্যাটফর্ম একেবারে শেষ প্রান্তে। সেখানেও লোকরা গিজগিজ করছে। উত্তর-পশ্চিমের মাঠে ছোট লাইনটা এখন ইটখোলা আর গুদামঘরের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। ওদিকে নিরিবিলি একটা মালগাড়ির ভাঙা কামরা দাঁড়িয়ে থাকত ডেড স্টপের পাশে। বড় বড় ঘাস গজিয়ে উঠেছিল তার তলায়। ভজুয়া খালাসীর সংসার ছিল ওখানে। ডালিমকে ধারে-কাছে দেখলেই তাড়া করত। পারুকে শাসিয়ে বলত, ঠাহারো! ডাগদারবাবুকো বোল দেগা! কেন অমন শাসাত কে জানে? ওরা তো কোন খারাপ মতলব নিয়ে যেত না ওখানে। বিশাল মাঠের বুকে ছোট একটা রেল লাইন বাঁক নিতে নিতে দূরের দিকে চলেছে, ওপাশে বড় রেল লাইনটার চেয়ে তাকে কত অনাথ দেখাচ্ছে, তার সেই নির্জন তুচ্ছতাটুকুর প্রতি হয়তো গভীর মমতা ছিল দুটি ছোট্ট ছেলের। হঠাৎ বাবার সঙ্গ ছেড়ে একলা ভুলোমন তাদের মতই ছোট্ট ছেলে যেন তেপান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে, এ

রকম মনে হত।

ডাউনের দিকে ছিল রেলের ওয়ার্কশপ। প্রায় এক মাইল দূরে ছিল সেটা। স্টেশন থেকে বাঁক নিয়ে পাশাপাশি বড় আর ছোট দুটো রেল লাইন পশ্চিমে এগিয়ে ওয়ার্কশপ অব্দি পৌঁছেছিল। দক্ষিণ ওয়ার্কশপ, উত্তরে ছোট রেল, এর মধ্যে পলাশপুর গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমে জেলাবোর্ডের সেই সড়কটা। স্টেশন থেকে এখন পীচের ঝকঝকে পথ গিয়ে সোজা মিশেছে সেটার সঙ্গে। এখন আর কিছু চেনার উপায় নেই। রেলকলোনির আড়ালে পড়ে গেছে পলাশপুর। পারুর অস্বস্তি হচ্ছিল। না আসাই হয়তো ভাল ছিল। এত সব অশালীন জটিলতার তলায় পুরনো পলাশপুর খাতার পাতায় ভরে রাখা প্রজাপতির মত মরে শুকিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

পারু সিগারেট ধরায়। অচেনা লোকের ভিড়ে সেও এক অচেনা মানুষ। কেউ তাকে চিনতে পারছে না, সেও চিনতে পারছে না কাকেও। এটাই হয়তো তার খারাপ লাগছে। পনেরো বছর আগেও স্টেশনে দাঁড়ালে কত লোক তাকে চিনতে পারত। কথা বলত। কুশল প্রশ্ন করত। এখন সে পুরো বাইরের লোক হয়ে গেছে।

এই সময় দু-তিনজন কমবয়সী ছেলে তার দিকে দৌঁড়ে এলো।—আমাকে দিন সার! আমি লিয়ে যাব সার! ওদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। পারুর স্যুটকেসটা পায়ের কাছে দাঁড় করানো। হাল্কা ব্রিফকেসটা বাঁ হাতে ঝুলছে। একজন স্যুটকেসে হাত রেখে বলে, বলোক আফিসে তো সার? চলুন সার!

ব্লক আপিসের লোক ভেবেছে পারুকে। পারু লক্ষ্য করে। সঙ্গীদের চেয়ে এই ছেলেটা রোগা। অথচ জোরটা এরই বেশি। অন্যেরা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন পারুর দিকে চোখ টিপে বলে, দেখবেন সার, মাল লিয়ে কেটে পড়বে। খুব চিটিংবাজ সার!

অমনি স্যুটকেস ছেড়ে রোগা ছেলেটা ওর দিকে তেড়ে যায়। সেই ফাঁকে আরেকজন এসে স্যুটকেসে হাত দেয়। রোগা ছেলেটার পক্ষে দুদিক সামলানো কঠিন। সে চেঁচিয়ে ওঠে, মারব! মারব শালাকে! এ ছেলেটা মরীয়া হয়ে স্যুটকেস মাথায় তুলতেই সে এসে আক্রমণ করে। পারু ধমক দেয়, এই! কী হচ্ছে সব! তারপর স্যুটকেসটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় ছেলেটা আক্রমণের মুখে বিপন্ন, তার মধ্যেই সে কাকুতিমিনতি করে, আমায় দেন সার! আমি নিয়ে যাই সার! পারু বুঝতে পারে, রীতিমত রুজির সংঘর্ষ চলেছে। এতটুকু ছেলে সব। দল বেঁধে একসঙ্গে ঘোরে। ভাবও আছে। অথচ এখন পরস্পর শত্রু। রেলের উর্দি পরা একটা লোক যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে এসে পটাপট থাপ্পড় লাগায় ওদের। ওরা একটু তফাতে সরে যায়। পারু স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে বিব্রত মুখে হাসে। উর্দি পরা লোকটা বলে,

ভাগ্! ভাগ্ কুত্তার পাল! কোথায় যাবেন স্যার? এক মিনিট—লোক দিচ্ছি।

পারু কিছু বলার আগেই সে ছাউনির দিকে হাত তুলে কাকে ডাকে, এই ঘোড়ে! এখানে আয় রে! মাল লিয়ে যা।

বেঞ্চ থেকে ন্যালাখ্যাপা গোছের এক যুবক দাঁত বের করে উঠে আসছে। পারু স্যুটকেসটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। রেলের লোকটা বলে, ওকে দিন স্যার। নিয়ে যাবে।

পারু গম্ভীর স্বরে বলে, দরকার হবে না। সে বুঝতে পারে, এই সামান্য ব্যাপারেও স্বজনপোষণ চলেছে। সে হনহন করে স্টেশন ঘরের পাশ দিয়ে গেটে যায়। গেটে কেউ টিকিট নিচ্ছে না আর। যাত্রীরা কখন চলে গেছে। সিঁড়িতে নামার পর সে সাইকেল-রিকশো ডাকে। একসঙ্গে কয়েকজন সাড়া দেয়। পারু আবছাভাবে টের পায়, পলাশপুরে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা যেন বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার তার মনটা তেতো হয়ে ওঠে। পলাশপুরে আসা তার উচিত হয়নি।

কতটুকুই বা হাঁটতে হবে। গম্ভীর মুখে সে পা বাড়ায়। দাড়িওলা বুড়ো এক রিকশোওলা তার মুখের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়েছিল। সিটে থাপ্পড় মেরে বলে, আসুন সার। লিয়ে যাই। যা মন চায় দেবেন।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চেনা লাগে পারুর। লোকটা অবশ্য তাকে চিনতে পারেনি। পারুর নীরবতায় উৎসাহ বেড়ে যায় ওর। হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে বলে, উঠুন সার। বলক আপিসে যাবেন তো!

পারু বলে, না। ওখানে—পীরতলার কাছে।

রিকেশোওলা হনুমানের মত সিটে লাফ দিয়ে ওঠে। তারপর পারু ওঠে। চাকা গড়াতে থাকে। সোজা পশ্চিমে এগিয়ে চলে রিকশো। এটা এখন স্টেশন রোড। আগে ছিল কাঁচা রাস্তা। দু'ধারে নিশিন্দা ঝোপ আর কেয়াগাছ ছিল। সোমলতার ঝালর ঝুলত। বাঁদিকে গ্রাম, ডাইনে মাঠ, মাঠের মধ্যিখানে ছোট রেল লাইন। এখন দু'ধারে সে-সব ঝোপ-ঝাড় বিশেষ নেই। তরুণ শিরীষ অশ্বত্থ অর্জুনের চারা লাগানো হয়েছে। ডাইনে কয়েকটা নতুন বাড়ি হয়েছে। বাঁদিকে ইটখোলা হয়েছে। সামনে একটু দূরে পুরনো প্রকাণ্ড বটগাছটা দেখা যাচ্ছে। পারু একটু আশ্বস্ত হয়। ওটাই পীরতলা। কোন এক পীরের গোরস্থান আর দরগা আছে ওখানে। তার ডাইনে মীর্জাদের দালানবাড়ি। ধ্বংসস্তূপ বলাই ভাল। ওরই মধ্যে একটা দোতলা অংশ টিকে আছে। ডালিম ওটার মালিক হয়েছিল অনেক লড়াই দিয়ে। মীর্জারা একে একে দেশত্যাগ করেছিলেন। ডালিম সুযোগটা নিয়েছিল। সেট্‌লমেণ্ট রিচেকিং-এর সময় সে নিজের নামে দখল দেখিয়েছিল। তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও ছিল না।

পীরতলায় স্যার? কাদের বাড়ি যাবেন?

রিকশোওলার প্রশ্নে পারু সোজা হয়ে বসে। আস্তে বলে, মহারাজার!

রিকশোওলা আচমকা প্যাডেল থামিয়ে ব্রেক কষে। ঘুরে সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, মহারাজার বললেন?

পারু একটু হাসে।—হ্যাঁ। কেন?

রিকশোওলা একটু থেমে গিয়েছিল। আবার চলতে থাকে। কিন্তু আগের মত গতি নেই। রিকশোওলা ভারি গলায় বলে, ওনার সঙ্গে আগে চেনাজানা আছে স্যার? নাকি নতুন যাচ্ছেন?

পারু গম্ভীর হয়ে যায়।—কেন?

এমনি বলছি স্যার। রিকশোওলা চুপচাপ প্যাডেলে চাপ দেয়। বাতাস ঠেলে এগোতে যেন এতক্ষণে খুব মেহনত হচ্ছে তার।

মহারাজা। ডালিমের এই ডাকনামটা হঠাৎ কী ভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে এতদিন পরে! আসলে তার সঙ্গী ছেলেটি ছিল ডালিম, পরে সে 'মহারাজা' হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পারুর কাছে ডালিমই সত্য। কারণ ডালিমকেই সে চেনে, মহারাজাকে চেনে না। একদা কে কিংবা কারা ডালিমকে আড়ালে মহারাজা বলে ডাকতে শুরু করেছিল, বোঝা যায়নি। স্কুলের থিয়েটারে ডালিম একটা ছোট্ট পার্ট পেয়েছিল। সেটা ছিল রাজভৃত্যের। সংলাপ ছিল মোটে দুটো। দুটোই একটিমাত্র শব্দ ঃ মহারাজ! স্টেজে ডালিম ভড়কে গিয়ে মহারাজা বলে ফেলেছিল। তারপর থেকে কেউ কেউ ওকে মহারাজা বলত আড়ালে। এক সময় দেখা গেল, ডালিম নিজেও মেনে নিয়েছে নামটা। ডাকলে সাড়াও দিচ্ছে। তারপর একদিন তার ডালিম নামটাও হারিয়ে গেল সবার কাছে, সে মহারাজা হয়ে উঠল। এমন কি হরনাথও মৃত্যুর সময় অব্দি এই নামেই তাকে খুঁজেছিলেন।

কিন্তু তখন ডালিম কোথায়? গুজব রটেছিল, সে নাকি মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে। বছর পাঁচেক পরে যখন সে ফিরল, তখন দেখা গেল সত্যি তাই। পারু জানে, ডালিম ফ্রন্ট লাইনেও গিয়েছিল। তবে যুদ্ধ করতে নয়, সে ছিল নেহাত ক্যান্টিন-বয়। বর্মা ও আসামে ট্রেঞ্চে গিয়েও সৈনিকদের খাবার পৌঁছে দিত। তার সাহসের তুলনা হয় না। তার গায়ে ক্ষতচিহ্ন ছিল অনেক।

তবু কোনদিন পারুর কাছে ডালিম মহারাজা হয়ে ওঠেনি, আজও নয়। মহারাজা একটা অচেনা নাম পারুর কাছে। সে চেনে ডালিমকে।

এই রিকশোওলার কাছে হয়তো নিছক মুখ ফসকে মহারাজাটা বেরিয়ে গেছে, কিংবা এ নামেই ওকে সবাই চিনবে বলে তার মনে হয়েছে। তাই বলেছে। আর রিকশোওলা তা শুনে সন্দিগ্ধ হয়েছে। কেন হয়েছে বুঝতে পারছে পারু।

ডালিমের মত কুখ্যাত একটা লোকের কাছে সে যাচ্ছে, রিকশোওলার পক্ষে সম্ভবত এটা অস্বস্তিকর। সে হয়তো ভাবছে তার এই যাত্রীও একই গোত্রের। কিংবা এক সময় যেমন ডালিমকে দিয়ে লোকে কাজ উদ্ধার করত, এও তাই যাচ্ছে। অবশ্য এখন তো ডালিমের একটা পা-ই নেই। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না। ঘর ছেড়ে বেরোয় না।

মাফ দেবেন স্যার, একটা কথা শুধোচ্ছি। রিকশোওলা চাপা ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল স্বরে বলে ওঠে।

পারুর হাসি পায়। সে বলে, বল!

আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

হ্যাঁ।

মহারাজার কেউ হন নাকি? মানে...রিক্‌শোওলা ঘোঁত ঘোঁত করে বিকৃত মুখে কেমন হাসে।...মানে ওনার কেউ আছে বলে তো শুনিনি, তাই শুধোচ্ছি।

পারু ইচ্ছে করেই ওর সঙ্গে তামাশা করতে চায়। বলে, তুমি হরনাথবাবু ডাক্তারকে চিনতে?

খুউব স্যার! চিনব না কেন? ওরে বাবা, গরীবের মা বাপ। ধন্বন্তরী ছিলেন। বলে রিকশোওলা কপালে হাত ঠেকিয়ে সম্মান জানায় হরনাথের উদ্দেশে।

পারুর ভাল লাগে এটা। সে বলে, মহারাজাকে উনি ছেলেবেলায় মানুষ করেছিলেন, জানো তো?

রিকশোওলা হতাশভাবে মাথা দুলিয়ে বলে, দুধ দিয়ে কালসাপ পোষা স্যার, বুঝলেন কিনা! ভগবানের ইচ্ছেয় তিনি গত হলেন। নৈলে বড্ড কষ্ট পেতেন মনে। আরে বাবা, বীজ যেমন বিরিক্ষ হবে তেমনি। খুব রক্ষে পেয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। স্যার, কথাটা হল কী জানেন? জ্ঞানী হলে কী হবে? বীজ চিনতে ভুল হয়েছিল।...

লোকটা আপন মনে এ সব বলতে থাকে। পারু ভাবে, এই সামান্য রিকেশোওলাও হরনাথের প্রশংসা করছে। বাবা সত্যি বিচিত্র মানুষ ছিলেন। এখনও তাঁকে হয়তো কেউ ভোলেনি। ডালিমের ব্যাপারটা নিয়ে একসময় আড়ালে যত কুৎসাই রটুক, অমন সহৃদয় ডাক্তার তো সচরাচর মেলে না। মন দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করতেন। পয়সার কথা মুখ ফুটে বলতেনই না। যে যা হাতে তুলে দিত, হাসিমুখে নিতেন। নিজের পয়সায় ওষুধ কিনে দিতেন গরীব রোগীকে। ডাক্তারী বিদ্যা বলতে তো কিছুই ছিল না, ছিল মেধা আর অভিজ্ঞতা। শহরের বড় ডাক্তারের কাছে হন্যে হওয়া রোগীরা এসে ভিড় করত তাঁর ডিস্পেন্সারিতে। রোগীকে দেখেই টের পেতেন রোগটা কী। সার্জারিতেও হরনাথের হাত ছিল কুশলী। কাজীসায়েবের এক ধনী আত্মীয়ের ছেলে, বাচ্চা

এতটুকু ছেলে, তার গলায় টিউমার গজিয়েছিল, হরনাথ অপারেশন করেছিলেন। পারুর মনে পড়ে, কাজীসায়েবের ইচ্ছে ছিল, শুক্রবারে দুপুরে জুম্মা নামাজের সময় যেন তার অপারেশন হয়। এদিকে দরজা বন্ধ করে অপারেশন চলছে, ওদিকে মসজিদে এলাকার কয়েকশো লোক মিলে প্রার্থনা করছে। সারা পলাশপুরে সেদিন অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। কী হিন্দু, কী মুসলমান—সব বাড়িতে লোকেরা উৎকণ্ঠায় সময় গুনছে। সে এক আশ্চর্য পরীক্ষার সময় হরনাথের জীবনে। জীবন ও মৃত্যুর লড়াই চলেছে তাঁর সাদা শীর্ণ আঙুলের ইশারায়। পাতলা ঠোঁটের নীচে আত্মবিশ্বাসের সেই পরিচিত রেখাটি স্পষ্টতর হয়েছে। দুই ভুরুর মধ্যিখানে তীক্ষ্ন ভাঁজটা স্থির। দৃষ্টি তীব্র। খাড়া নাকের ডগায় বাঁধা সাদা কাপড়ের টুকরো ঘামে ভিজে যাচ্ছে। দূরের মসজিদ থেকে ভেসে আসছে সমবেতভাবে প্রার্থনার গম্ভীর ধ্বনিপুঞ্জ। এদিকে ঠাকুরঘরে এলোচুলে বনশোভা চুপচাপ বসে আছেন করজোড়ে। চোখ বন্ধ। বাড়ি প্রচণ্ড স্তব্ধ।...

হরনাথ জিতে গিয়েছিলেন। সুনাম আরও বেড়ে গিয়েছিল। প্রচুর টাকা দাবি করতে পারতেন—ওঁরা ছিলেন ধনী মানুষ। কিন্তু কিছু নেননি। পীড়াপীড়ি করায় হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বেশ, আমায় একটা ঘোড়া কিনে দিন না দেখি। এ বয়েসে আর সাইকেলের প্যাডেল করতে বড্ড পরিশ্রম হয়।

ঘোড়াটা এসে গেল। কালচে—নাকি খয়েরী রঙের মস্ত ঘোড়া। আবছা মনে পড়ে পারুর। ডালিম ঘোড়াটাকে বড্ড জ্বালাত। হরনাথ ওষুধ কিনতে শহরে যেতেন বাসে চেপে। কখনও ট্রেনেও যেতেন। আর সেই ফাঁকে পুকুরের ধার থেকে ঘোড়াটা নিয়ে ডালিম সওয়ার হত। কতবার আছাড় খেয়েছিল। হাড় নড়ে গিয়েছিল। ডিসপেন্সারিতে ওকে ধরে আছে ধরণী কম্পাউণ্ডার। আর হরনাথ হাতের হাড় বসাচ্ছেন। ডালিম লাল চোখে যন্ত্রণা সইছে। আশ্চর্য, মুখে এতটুকু বিকৃতি নেই। শুধু বড় বড় জলের ফোঁটা গালের ওপর। হরনাথ হাসছেন আর বলছেন, কাঁদবি তো হাউহাউ করে কাঁদ না বাবা। তোর মুখ দেখে যে ভিসুভিয়াস মনে হচ্ছে। কি করি বল তো তোকে নিয়ে! কিছু বললে ভাববি, আফটার অল পর—পর বলেই বকছে। তার চেয়ে এদিকে আয় হতভাগা। হাতজোড় করে বল্, আই বেগ ইওর পারডন স্যার!

নির্বিকার ডালিম মিনমিনে গলায় বলল, আই বেগ ইওর পারডেন স্যার!

নট পারডেন! পারডন! হরনাথ গর্জে উঠেছিলেন, বানান করে বল্।

রিকশোওলা চলে গেলে বটতলায় দাঁড়িয়ে পারু বড় নিঃশ্বাস ফেলে। লোকটা হরনাথ ডাক্তারের কথায় ডুবে গিয়ে তার পরিচয়টা জানতে ভুলে গেল। ভালই হল। বাঁদিকে রাস্তার ধারে খালের ওপর কাঠের ব্রিজ হয়েছে দেখে পারু অবাক হয়। মীর্জাবাড়ির সদর দরজাটা ছিল পশ্চিমে। উত্তরে এই রাস্তা। এখান থেকে ও-বাড়ি ঢোকার জন্যে খিড়কি অব্দি একটা সরু পায়ে-চলা পথ

ছিল। কিন্তু এই ব্রিজটা ছিল না। ডালিম তৈরি করে নিয়েছিল হয়তো। পনেরো বছরে পলাশপুর জুড়ে যে তৈরি করার হুলুস্থূল চলেছে, তার হিড়িকে ডালিমও নিশ্চয় কত কিছু তৈরি করে নিয়েছে!

যেমন হৈমন্তীকে। তৈরি করে নেওয়া বইকি। হৈমন্তী নিশ্চয় ডালিমের জন্যে রেডিমেড গুড্‌স ছিল না।

হৈমন্তীর কথা মনে আসতেই পারুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা জেগে ওঠে। তীব্র কৌতূহল পারুকে নাড়া দেয়। কীভাবে ডালিমের ঘর করছে সে? ডালিম জন্মসূত্রে মুসলমান। সেটা পারুর কাছে কোন ব্যাপারই নয়। ধর্মের কথা তুললে বলতে হয়, ডালিম না-ঘরকা না-ঘাটকা। ধর্ম তো বরাবর ওর চক্ষুশূল ছিল। কিন্তু হৈমন্তী যে দারুণ মানত-টানত সব।

সেই হৈমন্তী। পারুর মাথার ভিতরটা এতক্ষণে, এই নড়বড়ে কাঠের ছোট্ট ব্রিজে দাঁড়িয়ে শূন্য লাগে। তার মুখোমুখি এতদিন পরে দাঁড়াতে চলেছে সে। হৈমন্তী মাথা কুটে লিখেছিল, তোমার পথ তাকিয়ে রইলুম। এক্ষুনি চলে এসো লক্ষ্মীটি। কলকাতা কখনো যাইনি—একা মেয়ে কী ভাবে যাবো! হয়তো বেরিয়ে পড়তুম। তুমিই এসো। আসবে তো?

পারু সামনে চারপাশে ছড়ানো ধ্বংসস্তূপ আর আগাছার জঙ্গলের দিকে শূন্যদৃষ্টে তাকায়। আর তার এগোতে ইচ্ছে করে না। যেন ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এতদিন পরে খুঁজতে এসেছে কুলুঙ্গিতে রাখা সোনার পিদীম।

ইতিমধ্যে মার্চের বিকেলের রঙ ফিকে হয়েছে। পারু নড়ে ওঠে। পিছনে স্টেশন রোডে যেতে যেতে লোকেরা তার দিকে তাকাচ্ছে। এমন জায়গায় একটা চুপচাপ-দাঁড়িয়ে-থাকা লোক দেখে নিশ্চয় তারা অবাক হচ্ছে। তারপর এল একটা বাচ্চা মেয়ে। লাল ফ্রক পরা মেয়েটা সোজা দৌড়ে কাঠের ব্রীজে উঠল। পারুকে দেখে থমকে দাঁড়ায় সে। পারু তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। অমনি মেয়েটা যেন ভয় পেয়ে আড়চোখে এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যায় ধ্বংসস্তূপের দিকে। একটু পরেই আগাছা ও ঢিবির আড়ালে সে অদৃশ্য হয়। তখন পারু পা বাড়ায়।

সরু একফালি রাস্তা। ঘুরে ঘুরে এগিয়েছে রাস্তাটা। এটাই ছিল মীর্জাদের প্রাইভেট রোড। পর্দানশীন মেয়েরা বাইরে থেকে এ রাস্তায় খিড়কির দরজা দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকত। অজস্র কল্কেফুল পড়ে আছে দেখে পারু নিজের অজান্তে একটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর মুখ তুলতেই দেখে রাস্তার বাঁকে ঢিবির ওপর একটা ঝাকড়মাকড় জংলী গাছের নীচে কে দাঁড়িয়ে আছে। আলো খুব কম এখন। পারুর লংসাইট ইদানীং ভাল নয়। তবু বুঝতে পারে, ওই হৈমন্তী।

প্রায় পনেরো বছর পরে হৈমন্তীকে সে দেখতে পাচ্ছে, ব্যাপারটা এখন স্বপ্ন মনে হয়। একমুহূর্ত পরেই পারু স্মার্ট হয়ে ওঠে। লম্বা পা ফেলে

এগিয়ে যায়। তার যাওয়ার মধ্যে একটা প্রবল সাড়া, যেন বলতে চায়, আমি এসে গেছি, হৈমন্তী!

মুখোমুখি গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। হৈমন্তীকে উচ্ছ্বাসে আবেগে চঞ্চল দেখার আশা ছিল কি মনে? হৈমন্তী শান্ত। ঠোঁটের কোণায় একটা ভাঁজ, হাসিটা খুব সামান্যই আঁকা হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ। তারপর হৈমন্তী বলে, এস। বলেই সে ঘোরে। চলতে থাকে।

পারুর আলোড়নটাও আর নেই। পিছন থেকে শান্তভাবে সে বলে, ভাল আছ তোমরা?

হৈমন্তী যেতে যেতে ঘুরে জবাব দেয়, আছি। তুমি?

আছি।

রাস্তাটার শেষে একটুকরো উঠোন দেখা যাচ্ছিল। একদিকে দোতলা একটা পুরনো বাড়ি—দেয়ালে অজস্র ফাটল। কার্নিশে গাছের চারা। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে বাড়িটা। কোথায় পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে রয়েছে। নোনা-ধরা মেটে সিঁদুরের মত ইটগুলোর বয়স অনেক। ওই রকম ছোট্ট ইট একশো-দেড়শো বছর আগে বানানো হত। মীর্জাদের এই সব বাড়ি সম্ভবত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি।

পারু দেখল, উঠোনের তিনপাশে পাঁচিল নেই, শুধু ধ্বংসস্তূপ। তার ওপর আগাছার জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। এমন একটা জায়গায় ওরা থাকে দেখে পারুর অবাক লাগে। ডালিমের দাদু কাল্লু বেদে তো এখানেই কোথাও গোখরো সাপ ধরেছিল।

সেই বাচ্চা মেয়েটা উঠোনে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। হৈমন্তী তাকে ডেকে বলল, মিলু, শোন্! এদিকে আয়। তারপর পারুর দিকে ঘুরে সে একটু হেসে বলে, তোমার বন্ধু ওপরে আছে।

এই নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা পারুকে ক্ষুব্ধ করেছে ততক্ষণে। চিঠিটা যে সত্যি বকলমে ডালিমেরই, তা প্রমাণিত হল। সে দাঁড়িয়ে আছে দেখে হৈমন্তী ফের বলে, ওপরে চলে যাও। নীচের ঘরে আমরা থাকি না। সাপের বাসা।

হঠাৎ এতক্ষণে পারুর কানে আসে, ওপরের ঘরে বেহালা বাজছে। খুব ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডালিম ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে! বারান্দায় উঠে সে ডাইনে সিঁড়ি দেখতে পায়। সিঁড়িতে ওঠার সময় বেহালার সুরটা হঠাৎ তীব্র বেসুরো বাজে। যেন দুষ্ট বাচ্চা ছড় নিয়ে জোরে একটা টান দিল।

ওপরের বারান্দায় পৌঁছলে বেহালা থেমে যায়। তারপর ভারি গলায় আওয়াজ আসে—নিরু এলি? আয় শালা, দেখাচ্ছি মজা! সিগারেট আনতে পাক্কা তিন ঘণ্টা। ঘড়ি ধরে বসে আছি। বাপ্তোৎ!

সামনের প্রথম ঘরটার দরজা বন্ধ। ওপাশের ঘর থেকে আওয়াজ এলো। পারু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, এই সেই ডালিমের কণ্ঠস্বর!

আরও গম্ভীর, আরও জোরালো যেন।

ফের আওয়াজ আসে, বাঘের গলার চাপা গর্জন।—অ্যাই শুওরের বাচ্চা! আসবি, নাকি যাব?

পারু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাসিমুখে ডাকে, মহারাজা!

ডালিমের গায়ে একটা ময়লা ধূসর পাঞ্জাবি, পরনে পাজামা। এক হাতে বেহালা কাঁধের ওপর, অন্য হাতে ছড়—সে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল। পাশে একটা টেবিল। টেবিলের গ্লাসে যে তরল পদার্থ তা নিশ্চয় জল নয়। তার চোখ দুটো বরাবর বিশাল। তলায় সেই ঘুম-ঘুম ভাবটা এখনও আছে। তার গোঁফ, জুলপি, বড় বড় এলোমেলো চুল সবই ধূসর হয়ে গেছে। লম্বা তীক্ষ্ন নাকের ওপরদিকে কাটা দাগটা কালচে হয়েছে। কপালের ভাঁজগুলো হয়েছে আরও গভীর। এবং মুখে একটা হিংস্র ভাব—নাকি রুক্ষতা, ঠিক বোঝা যায় না। তার চোখের পাতা ঘোলাটে। প্রথম সে পাথরের মূর্তির মত স্থির হল। তারপর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। তারপরই সে আচম্‌কা এই পোড়ো বাড়ি তোলপাড় করে চেঁচিয়ে উঠল, হিমি! হিমি! মাই ফ্রেন্ড আ গেয়া। হিপ হিপ হুররে!

প্রথম কয়েক মুহূর্ত ওকে ওভাবে স্থির ভাবে সোজা দাঁড়াতে দেখে পারু ভুলেই গিয়েছিল, ওর বাঁ পা হাঁটুর ওপর থেকে কাটা গেছে। পাজামার বাঁদিকটা সোজা মেঝে ছুঁয়েছে—হয়তো সেজন্যই। পারুর সব অস্বস্তি-দ্বিধা মুহূর্তে কেটে গেছে। সে ঘরে ঢোকে। স্যুটকেসটা রাখে। ব্রিফকেসটাও রাখে।

এক পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ডালিম লাফ দিয়ে চলে এসেছে তার কাছে। তারপর হাহা হাহা প্রচণ্ড রকমের হেসে বেহালা ও ছড়সুদ্ধ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। পারু মদের গন্ধ পায়। ডালিম তার বুকে কাঁধে গলার কাছে মুখ ঘষতে থাকে। অস্পষ্ট স্বরে কী বলতে থাকে একটুও বোঝা যায় না।

পারু শান্ত স্বরে বলে, তুই...তুই আমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছিস মহারাজা!

ডালিম চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে, অ্যাই শালা! খবর্দার! মহারাজা কে রে? আমি তোর ডালিম! ইওর লাভার ডালিম, ওরে পারু বাঞ্চোৎ! তোর গায়ে ঠ্যাঙ তুলে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতুম। তখন হিমি কোথায় রে! অ্যাই হিমি, জলদি আ যাও বেগম!

বলে সে দুষ্ট হেসে ফিসফিস করে, বেগম শুনলে চটে যায় হিমি। মাইরি।

পারুর কাঁধে হাত দিয়ে বিছানায় নিয়ে যায় সে। ঘরটা বড়। একটা সেকেলে প্রকাণ্ড মেহগিনি পালঙ্ক আছে। বেশ উঁচু বিছানাটা। পারুকে বসিয়ে দিয়ে সামনে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। মিটিমিটি হাসে।

পারু বলে, খুব মেজাজে আছিস দেখছি। আর সব খবর বল্।

ডালিম হাতের ছড় তুলে বলে, খবর-টবর রাখ। ব্যাপারটা বলি শোন! হঠাৎ সেদিন পুরনো জিনিসপত্র হাতড়াতে গিয়ে একগোছা চিঠি পেয়ে গেলুম। তোর চিঠি।...

পারু একটু চমকে গিয়ে বলে, আমার চিঠি? কাকে লিখেছিলুম?

ডালিম হাসতে হাসতে বলে, নেভার মাইন্ড! যাকেই লিখে থাকিস কিছু যায় আসে না। তো চিঠিগুলো দেখতে দেখতে তোর জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। বিশ্বাস কর্ পারু। শালা আমার মত পাপীতাপী লোকের চোখে জল এসে গেল। তো হিমিকে অবিশ্যি চিঠির কথা বললুম না। জাস্ট ক্যাজুয়ালি ওর সঙ্গে তোর কথা আলোচনা করলুম, পারু তো আজ অব্দি আমার কোন চিঠির জবাব দেয়নি। তুমি লেখ না। অনেক সাধাসাধি করে অনেক গালমন্দ—আমার শালা মুখ তো জানিস, ও রাজী হল। লিখল। আমি জানতুম, তুই ওকে অস্বীকার করতে পারবি না।

পারুর ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল ওর কথা শুনতে শুনতে। সে এক সময় কিছু চিঠি হৈমন্তীকে লিখেছিল তার বিয়ের আগে। সেগুলোই কি? হৈমন্তী কি বোকার মত সেগুলো রেখে দিয়েছিল কোথাও? পারুর অস্বস্তি হয়। কিন্তু মুখে শান্ত হাসি ফুটিয়ে বলে, তাহলে আমাকে ট্র্যাপ করে ফেলেছিস বল্! তুই বরাবর সাংঘাতিক ট্র্যাপার!

ডালিম তার পাশে বসে পড়ে। জোরে মাথা দোলায়, না রে শালা না। আমি হারামজাদা হতে পারি, আমি মানুষ। আমার একটা স্মৃতি বলে বস্তু আছে। আমার...আমার...তার মুখটা উত্তেজনায় আবেগে লাল হয়ে ওঠে। সে আচম্কা উঠে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে টেবিলের গ্লাসটা নেয়। এক চুমুক খেয়ে গ্লাসটা হাতে নিয়ে পারুর কাছে ফিরে আসে। তারপর চোখ নাচিয়ে বলে, হ্যাঁ রে, এখন তো শুনছি দু-হাজারী মস্‌নবদার হয়েছিস! ড্রিংক নিশ্চয় করিস। বল্ না, করিস না কি! নয়তো তোর সামনে খাব না।

পারু আস্তে বলে, খাই। একটু-আধটু।

খাস! ডালিম নড়ে ওঠে। হিপ হিপ হুররে! আলবাত খাবি। তো এই বাঞ্চোৎ, আমাকে তো মহারাজা বলে ডাকলি লোকের মত, মহারাজার জন্যে উপঢৌকন আনিসনি? জানিস আমাকে ভেট দিতে হয়?

এনেছি। বলে পারু উঠে যায় স্যুটকেসের কাছে।

ডালিম আরও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বলে, সাবাস! দিশী খেয়ে বড্ড কষ্ট হয় রে। আজ অনেকদিন পরে ভাল জিনিস খাব।

হুইস্কির বোতলটা পারুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর কেমন নিস্তেজ হয়ে যায়। বোতলটা রেখে পারুর দিকে তাকায়।

পারু বলে, কী হল?

ডালিম মাথা নাড়ে।—কিছু না। কিন্তু হিমি আসছে না কেন? হিমি! হিমি!

হিমি—হৈমন্তী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, পারু বুঝতে পারে। সে এবার দরজার কাছে এসে বলে, পারু, ওর ড্রিঙ্ক করা বারণ। হার্ট অ্যাটাক হয়ে হাসপাতালে ছিল এক মাস।

পারু বিব্রত হয়ে বলে, আমায় তো জানাওনি তোমরা! তাহলে আনতুম না।

ডালিম ভুরু নাচিয়ে বলে, হিমি অনেকটা বাড়িয়ে বলছে রে! তুই তো চিনিস ওকে। সব তাতেই ওর বাড়াবাড়ি। পারু, সিগারেট দে। কখন আনতে পাঠিয়েছি, এলো না।

হৈমন্তী ঘরে ঢোকে। জানলার কাছে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, সিগারেট খাওয়াও বারণ। অথচ শুনবে না। আমার কী!

ডালিম পারুর কাছে থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে, দিনে-রাত্তিরে দুটো-তিনটে খেলে দোষ নেই। আসলে হয়েছে কি জানিস পারু? এক বছর জেলে ছিলুম। ওই সময়টা আমার হেলথ একেবারে টেঁসে গেছে।

দরজার কাছে সেই বাচ্চা মেয়েটি এসে বলে, বউদি, জল ফুটছে।

ডালিম চোখ নাচিয়ে বলে, হিমি! আমার ফ্রেন্ডের খাতির না হলে আমার সেকেন্ড হার্ট অ্যাটাক হবেই। তখন তুমি টু-থার্ড বিধবা হবে। পারু, ও এখন ওয়ান-থার্ড বিধবা।

পারু এবার হো হো করে হেসে ওঠে। হৈমন্তী বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বলে যায়, তুমি জামাকাপড় বদলে নাও পারু। নীচে জল দেওয়া আছে।

সে চলে গেলে ডালিম সিগারেট বের করে। বলে, ধরিয়ে দে পারু! ডাকবাংলোর কল্কেফুলের জঙ্গলে যেমন করে ধরিয়ে দিতিস। তুই তখনও টানতে শিখিসনি কিন্তু। মনে আছে? তোকে মেরে মেরে টানা শেখাতুম!

পারু সহজ হয়ে ওঠে। সব অস্বস্তি কেটে যায় তার। ডালিম—ডালিমও স্মৃতি নিয়ে তার মতই দিন কাটায়। তারও সব মনে আছে। আশ্চর্য তো!

সিগারেটে জোরালো একটা টান দিয়ে কতক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়ে ডালিম। তারপর বলে, চাকরি যারা করে না, তারাও যে রিটায়ার্ড লাইফের খপ্পরে পড়ে, ভাবতেই পারিনি। আর এ কী বিচ্ছিরি সময় রে! নো ওয়ার্ক, নো পে। রোজগার বন্ধ। এখন প্র্যাকটিক্যালি হৈমন্তী আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। মার্কেটিং কো-অপারেটিভে ওকে দয়া করে একটা চাকরি দিয়েছিল সত্যদা। সত্যদাকে তো চিনিস! মানে, ভেঁটুবাবু রে! ইলেকশানওয়ালা!

ডালিম হাসতে থাকে। পারু বলে, ভেঁটুবাবুর ইলেকশানে তুই খেটেছিলি

নিশ্চয় ?

ঠিক বলেছিস। কারও কারও উপকার-টুপকার করেছিলুম এক সময়। তারা অনেকেই ভোলেনি দেখলুম। আমি যখন জেলে, এ বাড়িতে একা থাকত হৈমন্তী।

বলিস কী! পারু চমকে ওঠে।—এই বাড়িতে একা থাকত ?

হ্যাঁ একা। তবে ওকে তো চিনিস, ওর ক্ষমতা প্রচণ্ড। অত হুলুস্থুলের বিরুদ্ধে ড্যাম কেয়ার করে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল। পরে সব শুনবি! তো আমার জেলে থাকার সময় ভেণ্টুবাবু ওকে চাকরিটা দেয়। মাসে শ'দেড়েক টাকা। তাতেই মাইরি টাকা-ফাকা জমিয়ে এক কাণ্ড করে ছিল। ফিরে এসে খুব নবাবী করলুম।

ডালিম আবার হাসতে থাকে। কিন্তু তার সেই তীব্রতা, পারুকে দেখে হইচই করা, ক্রমশ যেন থিতিয়ে আসছে। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গলার স্বরটা ভাঙা, নিস্তেজ। পারু বলে, তুই বেহালা বাজাতে শিখেছিস দেখছি!

হুঁ। বুড়ো বয়সে এই রোগ। করবটা কী বল্! বলে সে আঙুল তোলে টেবিলের দিকে।—ওখানে দেখছিস কী ব্যাপার ?

কী ওগুলো ? পারু তাকায়। দেখে, একটা কালার বক্স, অজস্র তুলি, কয়েকটা রঙের কৌটো। একগাদা কাগজ। ছবি আঁকে ডালিম ?

ডালিম ফের আঙুল তোলে দেয়ালে।—ওই দ্যাখ্! দেখতে পাচ্ছিস ?

দেয়ালে চোখ যায় পারুর। ছবি এঁকে কোণায় পেরেক পুঁতে টাঙিয়ে রেখেছে। উঠে গিয়ে ছবি দেখে সে। সবই ল্যাণ্ডস্কেপ। একটা মোটে পোর্ট্রেট-গোছের ছবি। মুখ ফিরিয়ে থাকা স্ত্রীলোক।

ডালিম বলে, হিমিকে এঁকেছি। হয়নি ?

ডালিম স্কুলে মোটামুটি ভাল ছবি আঁকত। ম্যাগাজিনেও বেরিয়েছিল ওর ছবি। পারু এসে তার পাশে বসে। বলে, খুব ভাল লাগল। তোর তো বড্ড ন্যাক্ ছিল এতে!

ডালিম হাসবার চেষ্টা করে।—আমরা পোটো বংশ, মাইণ্ড দ্যাট। আমার ঠাকুর্দা পট আঁকত। পোস্টাপিসের দেয়ালের সায়েব দুটোর কথা মনে আছে ?

আছে।

নেই!

হঠাৎ ওর গর্জন শুনে চমকে ওঠে পারু। সে তাকায় ওর দিকে।

ডালিম হাঁসফাস করে বলে, নেই। তোর কিছু মনে নেই। তাহলে অ্যাদ্দিন তোকে পঞ্চাশটা চিঠি লিখেছি, ডেকেছি, দৌড়ে চলে আসতিস! চালাকি করিস নে। আমি সব সইতে পারি, মিথ্যে কথা চালাকি জোচ্চুরি সইতে পারি নে!

পারু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, প্লীজ ডালিম!

ডালিম ক্লান্ত স্বরে বলে, বীরেশ্বরবাবুকে ভোজালিতে কুপিয়ে কেটে-

ছিলুম। আমাকে জাস্ট একটা মিথ্যে বলেছিল, সেজন্যে।

ও কথা থাক ডালিম। বরং...

ওকে থামিয়ে ডালিম একটু হেসে বলে, এখন বুঝতে পারি। আমার মধ্যে কিছু ভাল জিনিসও ছিল। কী ভাবে বুঝলাম জানিস? জেল থেকে ফিরে অ্যাকসিডেণ্ট ঘটল। পা কেটে ফেলতে হল। তখন বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। আর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি সেল্‌ফ অ্যানালিসিস করতুম। বুঝতে পেরেছি, আমি যদি ছবি আঁকতুম, নাম-করা পেণ্টার হতুম। যদি মিউজিক নিয়ে থাকতুম, ফেমাস হতুম। পারু, বড় সায়েণ্টিস্ট হতেও পারতুম। কারণ আমার হেরিডিটরি ক্ষমতা ছিল। আমার পূর্বপুরুষদের বলা হয় বেদে। তারা ছবি আঁকতে, গান গাইতে, গান বানাতে জানত। বংশপরম্পরা এ ক্ষমতা ছিল তাদের। তারা বিষাক্ত সাপ ধরতে পারত। সাপের সব কিছু তারা জানত। তুই জানিস, আমি কিছুদিন সাপ ধরতুম? সাপে-কাটা রোগীর চিকিৎসাও করতুম, জানিস?

শুনেছি। অমুর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। সে বলেছে।

মোটামুটি ভালই চলছিল সাপ-টাপ নিয়ে। নীচের ঘরে সাপগুলো রেখে দিতুম। মাসে একবার করে বিষ চালান দিয়েছি কলকাতার একটা কোম্পানিকে। ভাল রোজগার হত। তখন অবশ্য হিমি আমার ঘরে আসেনি। কিন্তু আমার ভেতরেই ছিল ভয়ংকর একটা সাপ। তাকে বাগ মানাতে পারিনি।

হৈমন্তীকে আবার দেখা গেল দরজায়।—হী হল পারু? কথা পরে বলা যাবে না!

ডালিম বলে, হ্যাঁ, কাপড় বদলে নে। নীচে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আয়। পাক্কা ছ' ঘণ্টার জার্নি! এই লাইনটা শালা তেমনি থেকে গেল। সেই হেঁপো এনজিন। নড়বড়ে হাড়।

পারু পোশাক বদলাতে ওঠে। হৈমন্তী চলে যায়। ডালিম ফের বলে, ওঃ, আজ কতকাল পরে তোকে নিয়ে শোব রে পারু!

পারু ছেলেবেলার মধ্যে থেকে হাসে। এতক্ষণে সে পরিষ্কার টের পেয়েছে, ডালিমের ডাক দুর্ধর্ষ মানুষ মহারাজার ডাক নয়। স্মৃতির ডাক। এখন বেচারার স্মৃতি ছাড়া আর কী-ই বা আছে! পারুর মনে একটা আবেগ আসে, গতরাতে যেমন এসেছিল। সে পাজামা পরতে পরতে বলে, আমরা কি খুব বুড়ো হয়ে গেছি রে ডালিম? আমারও চুল-টুল প্রায় পেকে গেছে। তোর বয়স কত হল রে?

ফর্টিফাইভ প্রায়।

আমারও।

তুই আমার তিন মাসের ছোট নাকি। তো পারু—!

উঁ?

তুই কি সত্যি আর বিয়ে করিসনি? অমুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল কোথায়, অমুই বলছিল। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। অমু ভীষণ গুলবাজ তো!

হঠাৎ পারুর চোখ চলে যায় দেয়ালে। হরনাথ ডাক্তারের ছবি। সে ছবিটার দিকে এগিয়ে যায়। ডালিমও তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দুজনেই নিঃশব্দে ছবিটা দেখতে থাকে। তারপর অস্ফুট স্বরে পারু বলে, বাবার ছবি! কোথায় পেলি ডালিম?

ডালিম ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, দৈবাৎ পেয়েছি।

দুজনে চুপচাপ ছবিটা দেখতে থাকে। হরনাথ হাসিমুখে ওদের দেখছেন।...

তাহলে কি হৈমন্তী চায়নি পারু আসুক? মনের মধ্যে এই সংশয় নিয়ে পারু হৈমন্তীর হাবভাব লক্ষ্য করছিল। পোশাক বদলে সে নীচে গেছে, দেখেছে বারান্দার কোণায় হৈমন্তীর রান্নাঘর। থামের সঙ্গে ভাঙা ইটের দেয়াল মাটি দিয়ে গাঁথা। ভেতরটা অন্ধকার গুহার মত। তার মধ্যে হৈমন্তীর ফ্যাকাশে মুখে খুব শান্ত একটা ভাব। এ যদি হৈমন্তীর সাম্প্রতিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ-ভঙ্গী হয়, পারুর অস্বস্তি ততটা হবে না। তার গাম্ভীর্য যদি অন্তত বয়সেরও লক্ষণ হয়, তাতেও পারুর খারাপ লাগবে না। কত বয়স হয়েছে হৈমন্তীর? পারু হিসেব করেছে মনে মনে। অন্তত দশ বছরের ছোট ছিল হৈমন্তী। তাহলে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ কি বড়জোর ছত্রিশ। অথচ ওর শরীরে তো বয়সের ছাপ তেমন কিছু পড়েইনি। ওকে অনায়াসে ত্রিশের কোটায় ফেলা যায়। একটু রোগা দেখাচ্ছে, কিন্তু মুখের ডিমালো গড়ন, গালের মাংসের ড্যাবড়েবে ভাব, উদ্ধত ঋজু গ্রীবা, আর ওর মাথার একরাশ চুলে নারীর যৌবনের সব কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে।

আর হৈমন্তী কি ডালিমের কাছে সুখী? এও একটা তীব্র প্রশ্ন পারুর কাছে। জাতিধর্মের ব্যাপারটা আপাতত অবান্তর লাগছে। এ মেয়ের সাহস এবং হয়তো বা নির্লজ্জতাও চূড়ান্ত রকমের। একালের সমাজ—বিশেষ করে এমন একটা আধা-গ্রাম আধা-শহরের মত জায়গায় অনেক নতুন ঘটনা মানিয়ে যায়। দেশভাগের পর আরও কত বাইরের মানুষ এসে জুটেছে এখানে। জীবন জটিল হয়েছে, জটিলতর হচ্ছে। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না হয়তো, কিম্বা তার সময়ও পায় না। কলকাতার সঙ্গে সাঁকো বাঁধার কাজ

রেল কোম্পানি তো ১৯১৮ সালেই করে গিয়েছিল। কাজেই হৈমন্তীর ব্যাপারটা মানিয়ে গেছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়। হৈমন্তীর নিজের মনের অতল তলে যে অবচেতন সংস্কার, তা কি কখনও ফুঁসে ওঠে না?

ওর বাবা ছিলেন স্কুলের মাস্টারমশাই। বাংলা পড়াতেন। রোগা একটু কুঁজো মানুষ। পদ্য আওড়াতে গিয়ে আবেগে চোখে জল এসে যেত। মধুবাবুর সেই পদ্য পড়ার ক্যারিকেচার ডালিম চমৎকার দেখাতে পারত। বড্ড ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন। তেমনি সম্মানজ্ঞানও ছিল টনটনে। সামনের লোকটি রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে ওঁকে যেতে না দিলে অপমানিত বোধ করতেন। পিছন থেকে কেউ চেঁচিয়ে ডাকল ক্ষুণ্ণ হতেন। কেন—সামনে এসে নম্রভাবে কথা বলতে কি বাধে মানুষের? দোকানদার তাঁকে সবার আগে সওদা না দিলে রেগে যেতেন। আসলে নিজেকে খুব উচ্চস্তরের মানুষ মনে করতেন মধুবাবু।

ডালিমকে উনি বলতেন রাঙামুলো। ডালিম পিছন থেকে বক দেখাত। বারোয়ারিতলার বটগাছে গয়লাদের বিনোদ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল। সন্ধ্যে-বেলা ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মধুবাবু বাড়ি ফিরছেন। ছাতি নিয়ে বেরোননি। বটতলায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটুখানি। বৃষ্টিটা ধরলেই আবার হাঁটবেন। এমন সময় ডালিমের সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। পারুকে ইসারায় ডেকে নিয়ে বেরিয়েছে দুজনে। রাস্তার ওধারেই বটগাছটা। দৌড়ে এসে সেখানে দাঁড়াতেই অন্ধকারে মধুবাবুর মুখোমুখি হল। মধুবাবু কিছু বলার আগেই ডালিম চেঁচিয়ে উঠেছিল, ভূত! ভূত! পারু রে. বিনোদ গয়লার ভূত রে!

মহাখাপ্পা হয়ে মধুবাবু পাল্টা চেঁচালেন, তুই ভূত!

সে এক হই-হই কাণ্ড। আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকেরা লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এলো। ডালিম তখনও পারুকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে ভূত ভূত বলে চেঁচাচ্ছে।...

তারপর হাসাহাসি পড়ে গেল। কিন্তু মধুবাবুর রাগ আর পড়ে না। ব্যাপারটা প্রচণ্ড অপমান বলেই ধরে নিলেন। তাঁকে ভূত বলার চেয়ে মর্মান্তিক ঠাট্টা আর কি হতে পারে? নালিশ তুলেছিলেন হরনাথের কাছে। হরনাথ বোঝালেন—ছেলেমানুষ, সত্যি ভয় পেয়ে ভূত বলেছে। মধুবাবু শুনবেনই না। ও জেনেশুনেই ভূত বলেছে। তাও শুধু ভূত বললে কথা ছিল, বিনোদ গয়লার ভূত! মধুবাবুকে বিনোদ গয়লার সঙ্গে তুলনা?

ডালিম সেবার বাংলায় টেনেটুনে তেরোর বেশি পায়নি। আর ক্লাসে এসে মধুবাবু বলতেন, ডাক্তারের পালিতপুত্র বলুক, বিজিগীষার অর্থ কী? ডালিম মানে বলতে না পারলে বলতেন, ডাক্তারের পালিতপুত্র বেঞ্চে উঠে দাঁড়াক।

তখন হৈমন্তী হয়তো সবে জন্মেছে কিংবা জন্মায়নি। ওর ছেলেবেলাটা

পারুর অজানা। তখন কত মেয়ে পলাশপুরে জন্মেছে, বেড়েছে, শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। হৈমন্তীও একদিন চলে যেত। তার যাওয়া হয়নি। কেন হয়নি, মনে পড়ে না পারুর। শুধু মনে পড়ে, ওদের সংসারটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। পাড়াগাঁয় জমিজমা না থাকলে যা হয়। ওর এক মামা থাকতেন শহরে। সেখানে চলে গিয়েছিল হৈমন্তী। তখন অবশ্য পারুর কলেজে পড়া শেষ। মাও বেঁচে নেই। ডালিম নিরুদ্দেশ। পারু চাকরির চেষ্টা করে হন্যে হচ্ছে। মুসলিম লীগের আমল চলছে। পারু রাজনীতিতে নেমেছিল। গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে বেড়াত। বক্তা সে মোটেও ভাল ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে জানত। গাঁয়ের লোকে তখন তার দলকে বলত লাল ঝাণ্ডার দল। অনেকবারই আক্রান্ত হয়েছে পারু। মারধোরও খেয়েছে। সেই সব সময়ে তার তীব্র ভাবে মনে পড়ে গেছে ডালিমের কথা। ডালিম যদি পাশে থাকত তার।

পার্টি অফিসেই একদিন আলাপ হল একটি মেয়ের সঙ্গে। বছর পনেরো-ষোল বয়স। সাদাসিদে চেহারা। কিন্তু কী একটা তীক্ষ্ণতার ছাপ আছে। সবে সে ম্যাট্রিক পাস করেছে। পার্টি তাকে কলেজে পড়ার খরচ দেবে। আশ্রয়ও দিয়েছে ইতিমধ্যে। কারণ যে আত্মীয়ের বাড়ি থাকত এতদিন, তারা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নাকি নিজেই ঝগড়া করে চলে এসেছিল সে। হঠাৎ একটু হেসে বলল, আপনাকে চিনি। আমাদের বাড়ি ছিল পলাশপুরেই। আমার বাবার নাম মধুসূদন ত্রিপাঠী।

এভাবেই হৈমন্তীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পারুর। তারপর হৈমন্তীকে এক রকম পারুই টেনে এনেছিল পার্টির পলাশপুর সেলে। মেয়েদের মধ্যে কাজ করার জন্যে। হৈমন্তীদের ভিটেটা আগাছায় ভরে গিয়েছিল। গাঁয়ের কৈবর্ত, বাগদী, ডোম, ছোট চাষী আর ক্ষেতমজুর তখন পার্টিতে এসে গেছে। বর্ণশ্রেষ্ঠদের মধ্যে কিছু নিম্নবিত্ত পরিবারের যুবকরাও এসেছে। মধুবাবুর ভিটেয় ঘর বানানো হল। হৈমন্তী সেখানে থাকে। পার্টির অফিসও সেখানে। পলাশপুরে তখন দলের একটা বড় ঘাঁটি। কলকাতা থেকে নেতারা যাতায়াত করছেন। হৈমন্তীকে আদর করে অনেকে বলতেন, কুইন অফ দি রেড এরিয়া!

হৈমন্তী কিছু বলত না। পারুও খুশি হত। কিন্তু পরে দলের তাত্ত্বিকরা কেন্দ্রীয় বৈঠকে কড়া সমালোচনা করতেন কথাটার। কুইন-টুইন মধ্যযুগীয় সংস্কার। ওসব কেন? বরং রেড এরিয়ার নেত্রী বললে ব্যাপারটা বস্তুতান্ত্রিক হয়।

যাই হোক, তবু কুইন কথাটা বেশ চালু হয়েছিল। কাজের চাপে হৈমন্তীর কলেজে পড়াটাই বাতিল হয়ে গেল। তার নিজেরও আর তাগিদ

ছিল না। সারাদিন হৈমন্তী আর কিছু মেয়ে এলাকায় ঘুরত। পারুও তাদের সংগে গেছে। ফেরার সময় সন্ধ্যায় মাঠে দল বেঁধে 'ইন্টারন্যাশন্যাল' গাইতে গাইতে এসেছে। সদ্য ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের ঝড়ঝাপটা সামলে লোকেরা উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ছিল যেন এক সন্ধিকাল।

কিন্তু হৈমন্তীর সংগে তখনও কোন গোপন আবেগময় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পেরেছিল পারুর? পারুর ওদিকে ততটা মন ছিল না। হৈমন্তীরও যেন তাই। তারপর কী একটা ঘটতে থাকল। আঠারো—নাকি উনিশ বছরের এক নারীর সংগে সাতাশ-আটাশ বছরের এক যুবক কী ভাবে যেন টের পেয়ে গেল রাজনীতির যোগসূত্রের চেয়ে গভীর এক যোগসূত্র—যা নিছক জৈবিকও নয়—অন্যরকম কিছু।

কত তুচ্ছ ঘটনায় যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভালবাসা স্বরূপে বেরিয়ে আসে—অপ্রত্যাশিত!

পারুকে সদর কেন্দ্রে থেকে কাজ করার নির্দেশ এসেছিল। পারুর পলাশপুর ছেড়ে যাবার ইচ্ছে নেই। সে মনমরা হয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে কেউ নেই—একা হৈমন্তী। পোস্টার গোছাচ্ছে। পারু বিকেলের বাসে কিংবা ট্রেনে রওনা হবে। হঠাৎ হৈমন্তী ডাকল, পারুদা!

কমরেড বলেই ডেকেছে বরাবর। পারুও ডেকেছে, বয়েসে যত ছোটই হোক। সে আমলে কমরেড শব্দে কী এক আবেগ ছিল, নতুনত্ব ছিল। পারুদা শুনে পারু ঘুরে একটু হেসেছিল, ভাবলুম অন্য কেউ ডাকল!

কেন? আমি কি পারুদা বলে ডাকি নে কখনও?

হয়তো ডেকেছ, খেয়াল নেই। বলে পারু জানলার ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছিল।—বল হৈমন্তী।

কখন যাচ্ছ?

ঘণ্টা দুই পরে। কেন?

হৈমন্তী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, না। এমনি জিজ্ঞেস করলুম।

পারু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু...

কিন্তু কী? ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে, এই তো?

ঠিক তাই। তাছাড়া হঠাৎ আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? ওঁরা তো বেশ জানেন, আমি এখান থেকে গেলে ক্ষতি হতে পারে।

হৈমন্তী হাসল। তোমার কী ধারণা, শুনি?

পারু চাপা গলায় উত্তেজিত ভাবে বলেছিল, ননীদার কারচুপি ছাড়া এ কিছু নয়। বরাবর ওঁর এই ব্যাপারটা দেখছি। যেখানে সেল বেশ স্ট্রং হয়েছে, উনি সেখানে গিয়ে চার্জ নেবেন। তারপর সেলটা ছত্রভঙ্গ হলে আবার

ডিস্ট্রিক্ট সেলে ফিরে যাবেন। বরাবর আমি এ নিয়ে কথা বলেছি। ননীদা... ননীদা নিশ্চয় কারও এজেন্ট। হয় গভ্‌মেন্টের, নয়তো কংগ্রেসের। এবার পলাশপুর সেলটা ভাঙতে চান।

হৈমন্তী নিষ্পলক তাকিয়ে ওর কথা শুনে বলেছিল, আমিও তাই ভেবেছি।

ভেবেছ? পারু উঠে এসে মেঝেয় ওর মুখোমুখি বসে পড়ল।—তুমি ইনটেলিজেন্ট হৈমন্তী। ননীদা সম্পর্কে পার্টির আস্থা অগাধ। অথচ ওঁরই পরামর্শে কিছু ভাল কমরেড আমরা হারিয়েছি। সৌরীনের ব্যাপারটা দেখ। তার বাড়িতে গিয়ে হামলা করে বইপত্তর কাগজ সব কেড়ে আনা হল। সৌরীন পরে যে চিঠিটা লিখেছিল আমি দেখেছি। লিখেছিল—আমার কাছে সবই এখন গ্রীষ্মের দুপুরের দুঃস্বপ্ন মনে হয়। আমি আপনাদের চিনেছি। অন্তত কমরেড ননীগোপাল ভট্টাচার্যের মুখোসের আড়ালে প্রকৃত মুখটা আমার আগেই চেনা হয়ে গেছে। এর জন্যে আপনাদের প্রচণ্ড মূল্য দিতে হবে।...

হৈমন্তী অস্ফুট স্বরে বলেছিল, তুমি নির্দেশ না মানলে তোমাকেও এক্সপেল করা হবে।

পারু বলেছিল, আমার কেমন যেন ফ্রাস্ট্রেশন এসে যাচ্ছে হৈমন্তী। খুব ক্লান্তি লাগছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, ভুল রাস্তায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের।

যেন আমারও। মাঝে মাঝে সব উদ্দেশ্যহীন লাগে।...বলে হৈমন্তী মুখ নামিয়ে নিজের হাতের আঙুল দেখতে দেখতে ফের বলেছিল, ভবিষ্যৎটা খুব অস্পষ্ট মনে হয় এখন।

সেই দুপুর থেকে বিকেল—দুজনের ওভাবে খোলাখুলি আলোচনার মধ্যে দিয়েই যেন একটা গভীর সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ল, যা এতদিন আড়ালে ছিল। মতামতের মিল, আশা-নিরাশার মিল আর ক্লান্তির মিল। পারু গেল না। তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। প্রথমে চিঠিপত্র, তারপর জেলাস্তরের নেতাদের যাতায়াত, আলোচনা, সে রীতিমত ঝড় একটা। তারপর তোলা হল একটা তীব্র অভিযোগ। পারু ও হৈমন্তীর আচরণ এবং ইদানীংকার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে। ননীদা এলেন যথারীতি। ঠোঁটের কোণায় ওঁর একটা তীক্ষ্ম ব্যঙ্গের রেখা জন্মক্ষণ থেকেই ছিল যেন। তার সঙ্গে মৃদু হাসি জুড়ে বললেন, ঠিক আছে। এটা এখনই সেট্‌ল করা হোক। পার্টির বদনাম রটছে। আমি ওদের পার্টি-ম্যারেজের প্রস্তাব দিচ্ছি। এটা যদি না কার্যকর হয়, এই সেল ঝড়ের মুখে উড়ে যাবে। একে তো লোকে আজকাল প্রজাপতির দফতর বলে ঠাট্টা তামাশা করে। স্ট্রং মরালিটি বজায় রাখতেই হবে। নৈলে আমরা এখানে খতম হয়ে যাব।

পারু কঠোর মুখে বলেছিল, না।

হৈমন্তীও বলেছিল, না।

তারপর পলাশপুরে প্রকাশ্যে সভা ডাকা হয়েছিল। এমন কি কলকাতা থেকে নেতারাও এসেছিলেন। ঘোষণা করা হল, আমাদের পার্টির শৃঙ্খলা ও নৈতিকবোধ খুবই কঠোর। কারণ আমাদের সংগ্রাম সর্বহারার মুক্তিসংগ্রাম। এই সংগ্রামে কোন নৈতিক দুর্বলতা বরদাস্ত করা হয় না। তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে কমরেড পার্বতীচরণ সান্যাল এবং হৈমন্তী ত্রিপাঠীকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা হল।...

সন্ধ্যায় যখন স্কুলের মাঠে সেই সভা চলেছে, তখন পারু আর হৈমন্তী ডাউনে ডিসট্যান্ট সিগনালের ওপাশে রেলব্রীজের চত্বরে বসে আছে। ভালবাসার কথা বলছিল কি? মোটেও না। পারু বরাবর এ সব ব্যাপারে বড্ড লাজুক ছিল। আর হৈমন্তীও কেমন যেন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকত।

অথচ ভালবাসা ছিল। হঠাৎ পারুর ইচ্ছে করত পাশাপাশি হেঁটে আসতে আসতে ওর হাতটা ধরে। সংকোচ এসে বাধা দিত। পারু ভাবত, বয়সে তার চেয়ে কত ছোট হৈমন্তী!

হৈমন্তীর ঘর থেকে পার্টি অফিস চলে গিয়েছিল মুকুলদের একটা ঘরে। মুকুলের বাবা ছিলেন মফঃস্বল কোর্টের মোক্তার। দলের সিমপ্যাথাইজার ছিলেন গোড়া থেকেই। মুকুলও মোক্তারী পাস করে বাবার জুনিয়র হয়ে কোর্টে যেত।

এর কিছুদিন পরেই হৈমন্তীর ও ঘরে একা থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। রাতদুপুরে জানলায় ধাক্কা, উঠোনে ঢিল, বেনামা চিঠি। ভিটের কিছু অংশ সে আগেই বেচে দিয়েছিল একজনকে। সম্ভবত তারই ষড়যন্ত্র। গোটা জমিটা নেওয়ার মতলব ছিল তার। অগত্যা পারুর পরামর্শে সবটাই বেচে দিয়েছিল হৈমন্তী। তারপর পারুদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পারু এতদিন পরে অনেক সাহসে বলে ফেলেছিল, হৈমন্তী, পৈতৃক বাড়িটা তো রয়েছেই আমার, তুমি সারা জীবন থেকে যেতে পারো না?

আনমনে হৈমন্তী বলেছিল, উঁ? কেন?

এ বাড়িতে আর কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি থাকি। লোকেরা কী ভাবে তুমিও জানো, আমিও জানি। তাই বলছিলুম...

বরাবর থেকে যেতে তো?

হ্যাঁ, হৈমন্তী। পারু আরও সাহস নিয়ে বলেছিল। কেউ তো বিশ্বাস করবে না আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিশাল নদী আছে। বল, বিশ্বাস করবে? আমাদের মধ্যে তো কোন রিলেশান নেই। আছে কি? অথচ আমরা একই বাড়িতে থাকি!

হৈমন্তী কেমন হেসে বলেছিল, তুমি এবং আমি যা জানি, তাই-ই কিন্তু

সত্য। লোকের মিথ্যা জানায় কী আসে যায়?

কী জানি আমরা, হৈমন্তী?

হৈমন্তী মুখ ঘুরিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেছিল, আমরা একই ঘরে শুই না। আমরা তো আলাদা ঘরে রাত কাটাই।

পারু একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল এ কথা শুনে।—তুমি কী আশ্চর্য ছেলেমানুষ হৈমন্তী! তোমার কথাগুলো আমার কানে খুব খারাপ শোনাল। তুমি কি আমাকে পরমহংস মনে কর? আফটার অল আমি পুরুষমানুষ!

হৈমন্তী ঠাণ্ডা স্বরে বলেছিল, তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ আমায়?

তোমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল।

পাইনি। পাব না। আমায় কি তুমি এখনও চেনোনি পারুদা?

কিন্তু আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। হৈমন্তী, সব কিছু বোঝার বয়স তোমার কি হয়নি এখনও?

হৈমন্তী কথাগুলো উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে হেসে বলেছিল, কী মুশকিল! আমি তো চলে যেতেই চাচ্ছি।

কোথায় যাবে তুমি? মামার ওখানে? ওখানে তুমি আশ্রয় পাবে ভাবছ?

পৃথিবীটা অনেক বড়, পারুদা।

পারু ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল, না। তুমি মেয়ে। তোমার বয়স কম। তোমার জন্যে পৃথিবী মোটেও বড় নয়।

বেশ তো। আমায় দেখতে দাও তাই কিনা।

না।

সেই প্রথম পারু হৈমন্তীর দু' কাঁধে হাত রাখল। তারপরই ঘটল বিস্ফোরণ। হৈমন্তী ওর বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল। কতক্ষণ কাঁদতে থাকল।

আজ মনে পড়ে না, আর কখনও হৈমন্তীর অমন কান্না সে দেখেছিল কিনা, এমন কি কখনও ওর চোখ ছলছল করে উঠতেও কি দেখেছিল? সম্ভবত না। স্মৃতিটা বড় তালগোল পাকানো। জট খোলা কঠিন।

সেদিন নির্জন বাড়িতে ওই রকম প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশের পর হৈমন্তী আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু তফাতে সরে গিয়েছিল।

আচ্ছন্ন পারু ডেকেছিল, হৈমন্তী!

হৈমন্তী ভাঙা গলায় বলেছিল, আমায় অন্তত একটা দিন সময় দাও তুমি।...

তখন পারু টিউশনি করে পেট চালাচ্ছে। স্কুলে মাস্টারির জন্যে চেষ্টা করতে গিয়েছিল। সেক্রেটারি বীরেশ্বর চক্রবর্তী অন্য দলের রাজনীতির পাণ্ডা ছিলেন। প্রথমে খুব সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, মোহভঙ্গ হল তো পারু? খামোকা আমাদের সঙ্গে অ্যাদ্দিন ধরে শত্রুতা করলে! এখন কথা হচ্ছে, তুমি

আমাদের হরনাথ ডাক্তারের ছেলে। তোমার বাবা ছিলেন গ্রেট ম্যান। তুমি বাবার লাইনে তো গেলেই না, উপরন্তু...

পারু বাধা দিয়ে বলেছিল, সুযোগ তো পাইনি বীরুকা। ম্যাট্রিকের আগেই বাবা মারা গেলেন।

ওয়েট, ওয়েট। শোন। তা না হয় গেলে না কিংবা চান্স পেলে না, তো তারপর যা করলে, সেটাই তো আমাদের কাছে মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

পারু বলেছিল, পার্টি তো আর করি না।

বীরেশ্বর হা হা করে হেসে বলেছিলেন, কর না নয়, তোমাকে ওরা বহিষ্কৃত করেছে বলেই করার চান্স পাচ্ছ না। তবে সে না হয় গেল। ওতে আটকাত না। তোমার প্রতি আমাদের খুবই সিমপ্যাথি আছে। ভাল ছেলে বলেও তোমার সুনাম ছিল। তোমার বর্তমান দুরবস্থার জন্য রিয়্যালি আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু বাবা, স্কুলের শিক্ষকতা তো তোমাকে দেওয়া যাবে না।

কেন দেওয়া যাবে না বীরুদা? আমি তো গ্র্যাজুয়েট।

হাত তুলে বীরেশ্বর বলেছিলেন, নো নো। তুমি গ্র্যাজুয়েট এবং আমাদের স্কুলে অনেক ম্যাট্রিক নন-ম্যাট্রিক টিচারও আছেন। কথাটা তা নয়। আসলে ম্যানেজিং কমিটি মনে করেন, শিক্ষকদের নৈতিক মান থাকা এসেন্সিয়্যাল। কো-এডুকেশনের স্কুল। ভদ্রলোকের মেয়েরা পড়ে। সেখানে একে তো ইয়ং টিচার আমরা বরাবরই নিইনি, তাতে...

বীরেশ্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, মধুবাবু আমাদেরই স্কুলের প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মেয়ের প্রতিও আমাদের—অন্তত আমার তো বটেই, প্রচুর সিমপ্যাথি এখনও আছে। এবার নিজেই ব্যাপারটা বুঝে দেখ।

পারু ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। ক্ষুব্ধভাবে বলেছিল, ওর কথা আসছে কেন? হৈমন্তীর জন্যে আমি তো বলতে আসিনি!

বীরেশ্বর কেঠো হেসে বলেছিলেন, মেয়ে টিচার রাখি না। তাতে শিক্ষক-মশাইদের মর‍্যাল স্ট্যান্ডার্ড ব্রেকডাউন হওয়ার চান্স থাকে। বুঝেছ তো?

কিন্তু আমি আমার নিজের জন্যে আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে এসেছি।

বীরেশ্বরের মুখটা হঠাৎ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।—তুমি কি ন্যাকা পারু? গলা টিপলে দুধ বেরুচ্ছে? বোঝ না কিছু?

কী বলতে চান আপনি?

প্রকাশ্য জনসমাজে অবৈধ ভাবে বাস করছ দুজনে। একই বাড়িতে একই ঘরে নির্লজ্জের মত আচরণ করছ। আবার জাঁক দেখাচ্ছ আমাকে? ইচ্ছে করলে তোমাদের দুজনের মাথা মুড়িয়ে গ্রাম থেকে বের করে দিতে পারি, জানো? নেহাত হরনাথ ডাক্তারের খাতির।...বীরেশ্বর চেয়ার থেকে উঠে

দাঁড়িয়েছিলেন। ভয়ঙ্কর চেহারা।

পারু থরথর করে কাঁপছিল। মাথা ঘুরে উঠেছিল। তখনও অবস্থাটা সে তলিয়ে ভাবেনি, তাই ওই কথাগুলো অশ্লীল কুৎসা হয়ে বুকে বেজেছিল তার। আসলে তখর ওর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা একেবারে কাঁচা। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল, কথা উইথড্র করুন বীরুদা!

গেট আউট—গেট আউট বলছি! এই কে আছিস? একে গেটের বাইরে রেখে দিয়ে আয় তো।

কেউ ঘরে ঢোকার আগেই পারু বলেছিল, এর জন্যে আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল।

বাড়ি ফিরে আসার পথেই তার সব ক্ষোভ কেন কে জানে ফুরিয়ে যায় সেদিন। কিছুক্ষণ বারোয়ারি বটতলায় দাঁড়িয়ে সে ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করেছিল। তারপর মনে হয়েছিল, সত্যি তো! বীরেশ্বরবাবু কোন অন্যায় কথা তো বলেননি। শিক্ষকের চরিত্রের দিকটাই আগে লোকের চোখে পড়ে।

অথচ সে তো অসচ্চরিত্র নয়! এই বোধ তার মধ্যে সাহস এনে দিয়েছিল। তখন সে হৈমন্তীর কাছে গিয়ে শান্তভাবে বলেছিল, তুমি আমার কাছে সারা-জীবন থেকে যেতে পারো না হৈমন্তী?

হৈমন্তী অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, উঁ? কেন?

হঠাৎ পারুর মনে হয়, সে একটা কবরখানায় দাঁড়িয়ে আছে। মীর্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপে, আগাছার জঙ্গলে এই জীর্ণ দোতলা পোড়ো বাড়িটা ঘিরে এক বিশাল ছায়া এসে পড়েছে, সে ছায়া মৃতদের অতীত জীবনের। এখানে না আসাই তার উচিত ছিল। বস্তুত এ সবই তো স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়। সে সোজা স্মৃতির মধ্যেই চলে এসেছে। তাই সব কিছু ধূসর, অস্পষ্ট, রহস্যময় লাগে। অস্বস্তিতে দম আটকে যায়। হৈমন্তীর মুখের ধূসরতা তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। কে ডেকেছিল তাকে? ডালিম, না হৈমন্তী? ভেবেছিল হৈমন্তীর বকলমে ডালিম তাকে চিঠি লিখেছে এবং একটু আগে ডালিমের কথায় সেই অনুমান সত্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন নীচে হাত-পা ধুতে এসে হঠাৎ তার মনে হচ্ছে, আসলে হৈমন্তীই ডেকেছিল। ডেকেছিল একটা কবরখানা থেকে, যেখানে জনমানুষ নেই, শুধু আছে মৃতদের অপচ্ছায়া, তাদেরই দীর্ঘশ্বাস। এই গভীর প্রাকৃতিক স্তব্ধতার মধ্যে তিনজনের কণ্ঠস্বর ভূতুড়ে বলে মনে হতে পারে বাইরের মানুষের কাছে। বড় অদ্ভুত এক পট-ভূমিতে তিনজনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দম-আটকানো ভাবটা নিয়ে পারু চারপাশটা দেখতে দেখতে বলে, তোমাদের সন্ধ্যেটা খুব শিগগির হয় দেখছি।

হৈমন্তী চায়ের ট্রে সাজাচ্ছিল। নীল ফ্রক পরা মেয়েটির দিকে ঘুরে সে

বলে, হেরিকেনটা জেবলে দে মিলু। পারবি তো?

মেয়েটি মাথা দোলায়। হৈমন্তী ট্রে নিয়ে বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে। ফের বলে, হাত পোড়াস না যেন। আর শোন, লম্ফটাও জবালবি। জেবলে রেখে হেরিকেনটা ওপরে দিয়ে যাবি? কেমন?

কথার জবাব দিল না দেখে পারু ক্ষুণ্ণমনে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। হৈমন্তী ততক্ষণে সিঁড়িতে উঠেছে। ওপরের ধাপ থেকে সে এবার পারুকে বলে, আছাড় খাবে। এক মিনিট দাঁড়াও। মিলু হেরিকেনটা আনছে।

পারু অপেক্ষা করে না। হেসে বলে, অন্ধকার দেখতেই তো ফিরে এসেছি।

হৈমন্তী এ কথাও এড়িয়ে ওপরের বারান্দায় পা বাড়ায়। পারু ওকে একটু সময় দিয়ে তারপর এগোয়।

ডালিম ডাকে, পারু, তোর হল?

পারু ভেতরে ঢুকে দেখে ডালিম জানলার পাশে সেকেলে গদী-আঁটা চেয়ারে বসে আছে। টেবিলে হুইস্কির বোতলটা খোলা। গ্লাসে ঢেলেছেও খানিকটা। হৈমন্তী ট্রে-টা একপাশে রেখেছে। ফুলকো লুচি, একবাটি তরকারি, কিছু সন্দেশ, আলুভাজা। ডালিম গ্লাসটা হাতে নিয়ে মুখে মিনতি ফুটিয়ে বলে, জাস্ট একটু টেস্ট করে নিচ্ছি। কিছু মনে করিস নে। বড় আসর বসবে রাত দশটায়।

হৈমন্তী কঠোর মুখে বলে, না।

ডালিম টেবিলে বাঁ হাতে কিল মেরে বলে, আরে ছোড় ইয়ার! কিত্‌নে দিন বাদ মেরা দোস্ত আ গেয়া! ধুস শালা! মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে খোট্টাই বুলি বের হয় কেন বল্‌ তো? আসলে খোট্টাই বুলিতে বেশ জোর আছে, তাই না পারু?

পারু বলে, আছে।

অমনি ডালিম তাকে হ্যাঁচকা টান মেরে কাছে নেয় এবং দু'হাতে পারুর কোমর জড়িয়ে ধরে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, সাবাস! আমার ফ্রেন্ড ছাড়া আর আমার সাপোর্টার কে আছে? হিমি, আর তোমার ভয় পাচ্ছে না মহারাজা! বলেই সে জিভ কেটে হাসে। কী বললুম? মহারাজা! ড্যাম ব্লাডি ফুল মহারাজা! জাহান্নামে গেছে মহারাজা। আমি আবার ডালিম হয়েছি। হিপ হিপ হুররে!

পারু বুঝতে পারে না, ডালিমের নেশাটা বেড়ে যাচ্ছে, নাকি ইচ্ছাকৃত মাতলামি? ও এতক্ষণ নিশ্চয় চুপচাপ হুইস্কির বোতল খালি করছিল। পারু বোতলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ খেয়ে ফেলেছে। তারপর সে হৈমন্তীর দিকে তাকায়। হৈমন্তীর চোখে চোখ পড়ে তার। হৈমন্তীর চোখে স্পষ্ট ভর্ৎসনা ফুটে রয়েছে।

এতক্ষণে পারু হৈমন্তীর অস্বাভাবিক আচরণের অনেকটা ব্যাখ্যা করতে পারছে। হুইস্কিটা দেখেই সম্ভবত হৈমন্তী পারুর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। পারু অপরাধবোধে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

সে হৈমন্তীকে শুধু বলে, ওর অসুস্থতার কথা জানতুম না।

হৈমন্তী আস্তে বলে, খেয়ে নাও।

চোখ পাকিয়ে ডালিম বলে, কী বললি রে ওকে? অসুস্থতা! কার অসুস্থতা, কিসের অসুস্থতা? গডড্যাম শালা অসুস্থতা! আমার ফ্রেন্ড এসেছে, আমার ভাই এসেছে, আমার জন্যে বড় মুখে খানিক মাল এনেছে, আমি খাব না? ও কে আমার জানে না হিমি? ওই ভদ্রলোক আমাদের ফাদার, সে জানে না? বলিনি হিমিকে? হিমি, এখন তুমি যাও। আমাদের গ্রেট ফাদারের পায়ের নীচে বসে আমরা দু-ভাই এখন ন্যাংটো খোকা হয়ে যাব। হিমি, তুমি সরে যাও!

পারু বলে, ডালিম, তুই মাতলামি শুরু করলি এরই মধ্যে?

ডালিম হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, থিয়েটার করে ফেলছি, তাই না? লোকে ভাববে, পোড়ো বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব হয়েছে। না, আমি কথা বলব না। তুই খা। হিমি, ওকে ওই চেয়ারটা দাও।

হৈমন্তী অন্য কোণ থেকে এমনি একটা গদী-আঁটা পুরনো চেয়ার এনে পাশে রাখে। তারপর বলে, তোমার জন্যেও রয়েছে। দুজনেই খাও।

পারু বসে। ডালিম তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। কী রে! আমায় এখন দারুন ভদ্রলোক দেখাচ্ছে না?

দেখাচ্ছে।

তাহলে তুই আমায় খাইয়ে দে। প্লীজ পারু!

দিচ্ছি। তুই হাঁ কর্।

একটু লুচি ভেঙে ওর মুখে গুঁজে দিয়ে পারু লক্ষ্য করে ডালিমের চোখের কোণায় টলটলে কয়েক ফোঁটা জল। কিন্তু সে কিছু বলে না। গোঁফ মুছে ডালিম খুব আস্তে বলে, আচ্ছা পারু, হঠাৎ যদি আমরা নাইন্টিন থার্টিনাইনে ফিরে যাই এখন? তোর ভাল লাগবে?

পারুরও চোখে জল এসে যায় এ কথায়। আবেগে বুকের ভিতরটা অস্থির হতে থাকে। কিন্তু নিজেকে সংযত করে বলে, ফিরে যেতেই তো এসেছি!

একটা আঙুল তুলে ডালিম হৈমন্তীকে দেখিয়ে একটু হেসে বলে, ও তো তখন ছিল না। ওর তখন কি জন্ম হয়েছিল? মনেই হয় না। ও জাস্ট একটা কচি মেয়ে! জানিস পারু, এখনও আমার তাই মনে হয়। ওর সঙ্গে আজ প্রায় এগারো বছর সংসার করছি, ও এখনও তাই থেকে গেল। তুই দ্যাখ্ ওর দিকে তাকিয়ে—দ্যাখ্ না শালা! হিমি, দাঁড়িয়ে থাকো। পারু তোমাকে দেখে বলবে, হিমি, কোথায় যাচ্ছ? প্লীজ...

হৈমন্তী দরজার দিকে এগিয়ে বলে, মিনু, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আলোটা দিয়ে যা। আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুই!

আলো দেখে এতক্ষণ পারু বুঝতে পারে, ঘরে এতক্ষণ একটুও আলো ছিল না। পশ্চিম খাটের পাশের জানলা থেকে দিনের যেটুকু আলো আসছিল, কখন তাকে মাড়িয়ে হাল্কা অন্ধকার এসে ঢুকেছে, যদিও ওখানে আকাশের টুকরোটা লালচে দেখাচ্ছে। তা যেন আত্মদহন। সময়ের বুকের ভেতরকার অংগার। তা বাইরের জন্য নয়। আর এই জানলাটা উত্তরের। উত্তরে ঘন গাছপালা। এখন রীতিমত কালো হয়ে গেছে এদিকটা।

খেয়ে নাও, আসছি। বলে বেরিয়ে যায় হৈমন্তী।

সে চলে যেতেই ডালিম বলে, এক কাজ কর্ তো! বোতলটা তুই লুকিয়ে রাখ্ কোথাও। নয়তো আমার যা লোভ, রাতের আসরটা জমবে না।

বোতলটা সে গুঁজে দেয় পারুর হাতে। পারু টেবিলের তলায় রেখে বলে, তোর আর খাওয়া উচিত নয়। হৈমন্তী দুঃখ পাবে।

ডালিম বলে, দুঃখটুকু পাবে বলেই তো ছেড়ে দিয়েছি শালা। জিজ্ঞেস কর্ না ওকে! মাঝে মাঝে একটুখানি খাই। সেটুকু হিমিই আনিয়ে দ্যায়। দুলেপাড়ায় চোলাই করে, সেখান থেকে। তাছাড়া আমার এতদিনে নিজের ওপর অনেকটা কনট্রোল এসেছে। দেখছিস তো, মাতলামি করতে বারণ করলি, করছি না। আমার বয়েস হয়েছে যে রে! আমার এখন গুরুগম্ভীর হয়ে যাওয়া উচিত না?

পারু না হেসে পারে না—ঠিকই বলেছিস।

চোখ নাচিয়ে ডালিম চাপা গলায় বলে, ছেলে নেই পুলে নেই, একেবারে গোরস্থানের মত জায়গায় বাস করছি, মলে তো কেলেঙ্কারি! কেউ আমাদের মড়া ছোঁবে না। অতএব ওড়াও স্ফূর্তি। যা খুশি কর। তাই না?

যা খুশি করাটা তো তোর বরাবর। সে তো নতুন নয়।

ডালিম তক্ষুনি দমে গিয়ে বলে, এখন যা খুশি আর করা যাচ্ছে না। আমার এই ব্লাডি শুওরের বাচ্চা ঠ্যাংটা! ও, হেল ওফ ইট্! শালা নিজের বাড়িতে নিজের শত্রু ছিল কে জানত! বলে সে গেলাসের বাকিটুকু গলায় ঢেলে নেয়। ওঠে। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে বিছানার কাছে যায় এবং বেহালা আর ছড়টা তুলে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। একটু হেসে বলে, তুই খা, আমি বাজাই। জাস্ট সন্ধ্যেবেলা, পুরিয়া ধানেশ্রী বাজাই। কী বল্?

পারুর মনে হয় অন্ধকার ধ্বংসস্তূপ আর এই পুরনো জীর্ণ বাড়িটার গভীর থেকে নাড়িছেঁড়া যন্ত্রণায় চাপা ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। খেতে তার হাত ওঠে না।...

হৈমন্তী একদিনের সময় চেয়েছিল। ওই একটা দিন পারুর কাছে একটা বছর। হৈমন্তীর চলে যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারছিল না। মনে হচ্ছিল একটা সাংঘাতিক হার হবে তার। ওর জন্যেই তাকে রাজনীতি ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওকে সে তীব্র আবেগে ভালবেসে ফেলেছে। অথচ যতটা পুরুষোচিত সাহস আর আক্রমণাত্মক শক্তি থাকা দরকার, তাই তার ছিল না। পরে মনে হয়েছে, সত্যি, তার এতটা ভীরু হওয়া উচিত ছিল না। নির্জন বাড়িতে সারাক্ষণ সুযোগ অথচ শারীরিক ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছতেও পারেনি পারু। এটাই যেন বরাবর ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। কেড়ে নেওয়া বা দাবি জানাবার শক্তি ওর ছিল না। অনেকেরই থাকে না হয়তো। কিন্তু হৈমন্তী তো তাকে ভালবাসত। অসতর্ক মুহূর্তে হৈমন্তীর সে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। পারু বুঝতেও পেরেছে, তাকে ছেড়ে যেতে হৈমন্তীরও কষ্ট হবে। অথচ মধ্যিখানে যেন বিশাল নদী ছিল।

পারুর মনে হত, ছুঁলেই হৈমন্তী বুঝি ভাববে ওর অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে। তাই সে মনে মনে তৈরি হয়েও শারীরিক ঘনিষ্ঠতার দিকে এগোতে পারেনি।

এদিকে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও অন্তত নীচুতলার নিরক্ষর মানুষগুলোর সঙ্গে পারুর সম্পর্ক নষ্ট হয়নি একটুও। এর পিছনে হরনাথ ডাক্তারেরই অবদান ছিল বেশি। তাঁর ছেলের যত বদনামই হোক, তাকে তারা সাধ্যমত সাহায্য করতে চাইত। শাকতোলানী মেয়েটিও এক কোঁচড় শাক না দিয়ে ছাড়বে না। জেলেপাড়া থেকে মাছ দিয়ে যাবে। চাষী হিন্দু-মুসলমান বাড়ি থেকেও এটা-ওটা এসেছে। আপত্তি শুনবেনই না ওরা। ডাক্তারবাবুর আমল থেকে এটা চলে আসছে। গ্রামের মানুষ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পুরনো রীতিনীতি ও প্রথা তারা মেনে চলতে অভ্যস্ত। পারু তাদের এই সেন্টিমেন্টে আঘাত দিতে চাইত না।

হৈমন্তীর সঙ্গে পারুর সম্পর্ক নিয়েও ওরা তত বেশি মাথা ঘামাত না। ওরা ভাবত, মধুবাবুর মেয়ের সঙ্গে অনেক আগে মালাবদল গোছের কিছু হয়েই গেছে। এখন শুধু হইচই আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা যা বাকি। জেলেবউ নাপিতবউ কুনাই পাড়ার মাঠকুড়োনী মেয়েরা—সবাই হৈমন্তীর কাছে এসে আগের পার্টিজীবনের মতই গল্পগুজব করত। তার পর এক ফাঁকে নিঃসঙ্কোচে বলে উঠত, আমরা ভোজ খাচ্ছি কবে দিদি, তাই বলুন দিকিনি এবার?

হৈমন্তী একটু হেসে বলত, বেশ তো, খাবে!

হ্যাঁগা দিদি, পার্টি থেকে বে হলে বুঝি শাঁখাসিঁদুর পরতে নেই?

পারু আড়ালে বসে ঘামত। এই মেয়েরা পার্টির রীতিনীতি কিছু কিছু জানে। পুরুষদের কাছেও শুনেছে। পার্টিম্যারেজ কথাটা বেশ চালু ছিল তখন। ওরা ধরেই নিয়েছে, পার্টিম্যারেজ হয়েছে বলেই পারু ও হৈমন্তী এভাবে বাস করছে। খেটে খাওয়া মানুষ সব। কোন রকমে বেঁচে আছে। রাজনীতি নিয়ে তলিয়ে ভাবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও নেই, আবার সময়ও নেই। মিছিলে সভায় যোগ দেয়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বক্তৃতা শোনে। বড় জোর টের পায়, তারা খেতে পরতে পাবে দু মুঠো। ব্যস, এটুকুই। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পর এর চেয়ে বেশি কিছু বুঝতে চাইত না ওরা। এবং এজন্যেই পারু ও হৈমন্তীকে জড়িয়ে পার্টির বদনাম ছড়ানোটা অন্তত ওদের মধ্যে কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারেনি। হরনাথ ডাক্তারের ছেলে পার্টি ছাড়ার পরই ওদের উৎসাহ কমে গিয়েছিল। নবীন বাগ্দী বলেছিল, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন তো দাদাবাবু?

কী বলব? বলার কিছু নেই।

তা বললে চলে দাদাবাবু! দল থেকে তাড়িয়ে দেবে আপনাকে, আর আমরাই সেই দলের ঝান্ডাল বইব? আমরা আপনাকে চিনি। আপনি ডেকেছেন গেছি। আপনি নেই, আমরাও নেই।

পার্টির পলাশপুর সেল সত্যি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। হরনাথ ডাক্তারের ছেলে কোন অন্যায় করতে পারে, নীচুতলার ওই লোকগুলো বিশ্বাস করত না। হৈমন্তীকে বাড়িতে যখন আশ্রয় দিল, তখন ওরা ধরে নিল, বিয়ে কবে গোপনে হয়েই গেছে। এখন পয়সাকড়ি জমলে একটু ধুমধাম হয়তো হবে।...

পারু দুবেলা যে দুটো টিউশনি পেয়েছিল, সে ওই মুসলমানপাড়ায়। নিজের পাড়ার ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা তার কাছে পড়বে, ভাবাই যায় না। হিন্দু ও মুসলমানপাড়ার মধ্যে চিরাচরিত ব্যবধান একটা ছিল। পারুর চরিত্রহীনতার বদনাম নিয়ে মুসলমানপাড়াতেও কেউ মাথা ঘামায়নি। যেন দুটো গ্রাম একই গ্রামের মধ্যে। মুসলিম লীগের রাজনীতি হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ছে তখন। ও পাড়ায় লীগের মস্ত ঘাঁটি গড়ে উঠেছে। কম্যুনিস্টরা তো ওদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলই। তাই পারু ওদের চোখে দুশমন ছিল না। সে সহজেই টিউশনি পেয়েছিল। সকালে পড়াত কাজী সাহেবের ছেলেমেয়েদের, বিকেলে ইরফান মীর্জার নাতিদের। বুড়ো মীর্জার আভিজাত্য-বোধ ছিল অসাধারণ। ভাঙাচোরা বিশাল দালানবাড়ির মধ্যে বাদশাহের মতই বাস করছিলেন। পাকা দেউড়িটা ভেঙে পড়েছিল। সেখানে মাটির দেউড়ি বসানো হয়েছিল ফের। বিশাল লনের তিনদিকে ছিল সার-সার একতলা ঘর।

সেরেস্তা, খাজাঞ্চিখানা, মেহমানখানা (অতিথিশালা), চাকরনোকরদের থাকার ঘর। সবগুলোই জীর্ণ ফাটল ধরা। একপাশে পুরনো ঘোড়াশালের ধ্বংসাবশেষ ছিল। দেউড়ি থেকে এগোলে সামনে যে ঘরটা পড়ত তার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া টানতেন মীর্জা ইরফান আলি। বুড়ো বয়সেও কণ্ঠস্বর জোরালো। চোখের দৃষ্টি এতটুকু ক্ষীণ হয়নি। দেউড়িতে ঢুকলেই পারুকে চিনতে পারতেন। চেঁচিয়ে বলতেন, ওরে, তোদের মাস্টারমশাই এসে গিয়েছেন।

মীর্জা ওঁর পাশের ঘরে লীগের অফিস বসিয়েছিলেন। পারুর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। বলতেন, আমার অ্যাংগল এক ভিসন, বাবা অন্যরকম। আমি বুঝি, বড় বটের তলায় কোন গাছই বাঁচে না। তোমরা হিন্দুরা বটগাছ। মুসলমানকে মাথা তুলে বাঁচতে হলে তফাতে সরে যেতেই হবে। নয় তো মুসলমানত্ব থাকবে না।

পারু চুপ করে থাকত। মাঝে মাঝে বলত, হয়তো ঠিকই বলছেন।

আলবৎ ঠিক বলছি। হিন্দুধর্ম সর্বগ্রাসী। বাদশা আকবরের আমলে তো প্রায় গিলেই ফেলেছিল। ঔরঙ্গজীব বাঁচালেন। তারপর ইংরেজ এলো। ইংরেজ নিজের স্বার্থে মুসলমানকে আলাদা হয়ে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছে। ভেদনীতি বলে যতই নিন্দে কর, এতে মুসলমানদের আলাদা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেছে।

পারু বলত, এখন নাকি দেশ স্বাধীন হবে।

বেশ—হোক। হাতি ঘোড়া হবে, কী হবে তাই হোক। কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে বাস করা ভাল। এক জায়গায় থাকলেই ঝামেলা। কি বল?

মীর্জাসাহেবের রাজনৈতিক তত্ত্ব বোধগম্য হওয়া কঠিন। পারু চুপচাপ শুধু শুনত। তারপর ওঁর নাতিরা এসে দাঁড়ালেই উঠে পড়ত।

সেদিন বিকেলে পারুর মন চঞ্চল। হৈমন্তী একদিন সময় নিয়েছে, বিয়ে করবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে। কখনও সে অসহায় রাগে হৈমন্তীর ওপর ফুঁসছে। কখনও ভাবছে, যদি পুরুষ হয়েও ওর সামনে নতজানু হয়ে করজোড়ে বলে, দয়া কর হৈমন্তী! হৈমন্তী কি বলবে, না?

পার্টি যখন বিয়ের কথা তুলেছিল, তখন পারুর প্রস্তুতি ছিল না মনে, তার চেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা তার কাছে অপমানজনক মনে হয়েছিল। বিয়ের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তটাই কি বড় নয়? পার্টি হুকুম দেবার কে?

আর হৈমন্তীও নিশ্চয় একই কারণে কথাটা নাকচ করে দিয়েছিল। পারু জানে, ওর আত্মসম্মানবোধে আঘাত লেগেছিল। তখনই চলে যেতে চেয়েছিল পলাশপুর থেকে। কিন্তু যেন পারুর মুখের দিকে তাকিয়েই সংকল্পটা ছেড়ে দিয়েছিল। পারুর পরামর্শ মেনে নিয়েছিল। এমন কি একদিন পারুর বাড়িতে চলে আসতেও তার বাধেনি।

অথচ যখন বোঝাপড়ার চরম মুহূর্ত এসে গেল, তখন সে কেন ভাববার

সময় নিচ্ছে, পারু বুঝতে পারছিল না।

বিকেলের টিউশনিতে সেদিন মীর্জাবাড়ি গেল না পারু। অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে গেল। প্ল্যাটফর্মের ওভারব্রীজে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। তখন একটা আপ ট্রেন আসত বিকেলের দিকে। ট্রেনটা চলে যেতে দেখল সে। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, এত বেশি ভিড় তখন ছিল না—হঠাৎ পারু দেখল, খাকি প্যান্ট-শার্ট আর মাথায় মিলিটারি ক্যাপ পরা কে একজন চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। তার পায়ের কাছে কালো মস্ত একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক, তার ওপর একটা খাকি হ্যাভারস্যাক, আরও কী সব টুকিটাকি মালপত্র।

সে ঘুরে ওভারব্রিজের দিকে তাকাতেই পারুর বুক কেমন করে উঠল। মুখটা তার চেনা মনে হচ্ছে যেন! ফর্সা, সুন্দর চেহারার এক যুবক—সুচালো মিলিটারি গোঁফ, পাতলা ঠোঁট, কপালের ভাঁজগুলোও বিকেলের রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে ক্যাপটা ঝট করে মাথা থেকে খুলে নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে উঠল, হ্যালো পারু!

আট-দশটা বছর খুব সামান্য নয়। অথচ একটা চিৎকারেই বছরগুলো কোথায় উড়ে গিয়েছিল। পারু দৌড়ে নেমেছিল।—তুমি ডালিম না?

শাট আপ! তুমি ডালিম না!...ডালিম দু হাতে জড়িয়ে ধরে চেঁচামেচি শুরু করেছিল।—ওরে আমার বাঞ্চোৎরে! কতকাল তোকে দেখিনি রে! ওরে শালা! তুই এমন যোয়ান মদ্দ হয়ে গেছিস রে! তুই যে জিরাফের মত লম্বা হয়েছিস্ রে! বলতে বলতে ওর গালে একটা চুমুও খেয়ে বসল। তারপর কানফাটানো হা-হা-হা হাসি।

পারু অবাক হয়ে দেখছিল ওকে। সেই ডালিম। বিশ্বাস হয় না। সে এত স্মার্ট, এমন সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান হয়েছে, সে কল্পনাও করেনি। মাঝে মাঝে তার কথা যখন মনে হয়েছে, তাকে দেখেছে সেই শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ গড়নের ছেলেটি—ষোল-সতেরো বছর বয়স। দুষ্টুমিতে তার জোড়া ছিল না পলাশপুরে। মারামারি করে নিজের মাথাও ফাটিয়ে আসত। হরনাথ ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতেন।

রিক্শায় যেতে যেতে ডালিম বলেছিল, পুনা থেকে আসছি। বাড়তি বলে বাতিল করে দিলে। ওয়ার থেমে গেছে। আবার কি! তবে ভাই, এক্সপিরিয়েন্স হল। ও একটা লাইফের মত লাইফ! সব শুনবি। শুনে বলবি, তোরা কোথায় আছিস, শালা এঁদো গাঁয়ের মধ্যে! দূর দূর!

পারু হাসতে হাসতে বলেছিল, তবে চলে এলি যে?

এলুম। আফটার অল জন্মভূমি! তারপর একটু থেমে বলেছিল, বাবার জন্য জানিস, মাঝে মাঝে ভীষণ মন খারাপ করত। ভাবতুম একটা চিঠি দিই—কিন্তু লিখতে গিয়ে মনে হত, কিছু না বলে চলে এসেছি। থাক গে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কি হবে? বাবা কেমন আছেন রে? আমার কথা

নিশ্চয় বলেন!

পারু ঘাড় নেড়েছিল।

বলেন না, তাই না? ওঁর মনে আঘাত দিয়েছি। দ্যাখ পারু, হঠাৎ অমন করে চলে গেলুম, তোর কি মনে হয়েছিল বল্ তো?

অতদিন আগের কথা আমার কিচ্ছু মনে নেই।

বাবা কিচ্ছু বলেননি? নিশ্চয় বলেছেন। জানিস, আমি কলকাতায় থেকে যেতুম। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, বাবাকে একটা প্রণাম করে আসি। বলেই সে অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে হেসে ফেলেছিল।—এই দ্যাখ, মায়ের কথাটা বলছি নে। মা ভাল আছেন তো? রিয়েল মাদার মাইরি! দুজনকেই প্রণাম করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কলকাতা যাব। আমাদের মেজর সাহেব বলেছেন, দেখা করলেই কাজটা হয়ে যাবে। ফার্স্ট প্রেফারেন্স। পারু, তুই—তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন রে?

পারু ম্লান হেসে বলেছিল, ও কিছু না। কিন্তু বাড়ি গিয়ে তুই আর বাবা কিংবা মা কাকেও দেখতে পাবি নে ডালিম।

কেন, কেন বল্ তো। ওঁরা বাইরে গেছেন?

হ্যাঁ।

কোথায় গেলেন হঠাৎ?

ওই যে কী বলা হয়, স্বগ্‌গো-টগ্‌গো কী সব!

ডালিম অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠেছিল, পারু! বাপ্তোৎ তুই ঠাট্টা করছিস!

না। তুই যাবার কিছুদিন পরে বাবা গেলেন। তার এক বছর পরে মা মারা যান। বাবা মৃত্যুর সময় তোকে দেখতে চেয়েছিলেন।

তাহলে—তাহলে আমি কেন এলুম পারু? আমি কার কাছে এলুম? কোথায় এলুম আমি?...দু হাতে মুখ ঢেকেছিল ডালিম।

পারু ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, তুই বড্ড অকৃতজ্ঞ ডালিম। আমাকে তুই অস্বীকার করছিস! বাঃ, চমৎকার! আমিও কি তোর কথা ভাবিনি? তোর পথ তাকাইনি কোনদিনও? জানিস ডালিম, আজ কেন মন টেনেছিল স্টেশনের দিকে? ইনটুইশান! যেন টের পাচ্ছিলুম, তুই আসছিস। তোকে আমার দরকার মনে হচ্ছিল। আর তুই বলছিস...

কথায় বাধা পড়ল। রাস্তা থেকে কে ডেকে বলেছিল, পারুবাবু! পারুবাবু! শুনুন, শুনুন! আপনার সঙ্গে কে? ও পারুবাবু!

রিকশো দাঁড়াল। মনোরঞ্জন স্যাকরা এসে ডালিমকে দেখে বলেছিল, সেই মহারাজা না? দেখেই চিনেছি। কেমন আছ মহারাজা? ওরে বাবা, কতকাল পরে ফিরলে গো!

তারপর রীতিমত ভিড় জমে গিয়েছিল। সেই ভিড় থেকে বেরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ডালিম পলাশপুরের একটা সেনসেশন

ছিল বরাবর। পারু টের পাচ্ছিল, দলে দলে লোকেরা ওকে দেখতে আসবে। খুবই হইচই চলবে কয়েকটা দিন।

আগে যে ঘরে ডিসপেন্সারি ছিল, সে ঘরে পারু শোয়। পাশের ঘরে হৈমন্তী। উঠোনের অন্যদিকের ঘর দুটো ছিল মাটির। ধ্বসে গিয়েছিল ঝড়-বৃষ্টিতে। বাইরে গেটের এদিকে ফুলবাগানটা নষ্ট হয়ে আগাছার জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। রিকশো থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দুজনে ভেতরে ঢুকল। রিকশোওলার মাথায় বড় ট্রাঙ্ক।

বারান্দায় হৈমন্তী দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল ওদের। ডালিম দূর থেকে ওকে দেখেই পারুর পিঠে চিমটে কেটে বলেছিল, ওরে খচ্চর, নিজের আখের গুছিয়ে বসে আছে, এখনও বলছ না? উরেব্বাস! বৌঠান বলব, না বৌদি বলব রে?

অমনি চাপা গলায় পারু বলেছিল, ওর ব্যাপার পরে বলব। ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী নন। প্লীজ, তুই বেফাঁস কিছু বলবি নে!

ডালিম ওর মুখের দিকে তাকিয়েই আবার হৈমন্তীকে দেখতে দেখতে এগোল। রিকশোওলা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল পারু। তারপর একটু হেসে বলল, হৈমন্তী, তোমাকে মহারাজা, মানে ডালিমের কথা বলেছিলুম!...

হৈমন্তী নমস্কার করেছিল সঙ্গে সঙ্গে। মুখে স্মিত হাসি।—দেখেই বুঝতে পেরেছি।

ডালিম হো হো করে হেসে উঠল। তুই ওঁকে মহারাজার কথাও বলেছিস, আবার ডালিমের কথাও বলেছিস!

ডালিম, ওর নাম হৈমন্তী। আশা করি তুই চিনবি। আমাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই মধুবাবুর মেয়ে।

ডালিম অমনি দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।—মাস্টারমশায়ের কাছে কত যে পাপ করেছি, তার সংখ্যা নেই। কিন্তু ভাবা যায় না, আপনি তাঁর মেয়ে। হ্যাঁ রে পারু, তাহলে ওঁকে আমি নিশ্চয় দেখে থাকব!

হৈমন্তী বলল, হয়তো দেখেছেন। আমার কিন্তু আপনাকে মনে আছে। দেখেই চিনেছি। মানে, মহারাজা নামটাও মনে আছে তো! তাই...

ডালিম পারুকে ঠেলে দিয়ে বলল, শোন্, শোন্! আমাকে দেখামাত্র চিনেছেন। আর তুই ওভারব্রিজ থেকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলি!

পারু খুশিতে অস্থির হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। ব্যস্তভাবে বলল, প্লীজ হৈমন্তী, ওর জন্যে তাড়াতাড়ি কিছু রান্নাটান্না করে দাও!

ডালিম ভেতরের দরজা দিয়ে সটান চলে গিয়েছিল উঠোনে। ছেলেমানুষের মত দাপাদাপি করছিল। মাটির ঘরটার অবস্থা দেখে সে থমকে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। পেয়ারাতলায় গিয়ে তাকিয়ে রইল গাছটার দিকে। কুয়োতে উঁকি মেরে

কু-উ দিল। তারপর উঠোনের মধ্যিখানে দু' হাত কোমরে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সন্ধ্যার আবছায়া নেমেছে তখন। পারু কিছু কিনতে বেরিয়েছে। ভেতরের বারান্দায় হৈমন্তী স্টোভ জেবলেছে। হ্যারিকেনটা জেবলে সে বারান্দার ধার ঘেঁষে রাখল। এই সময় ডালিমের পায়ের কাছে...

ডালিম আস্তে বলে, সেই সন্ধ্যাটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। এতটুকু ভুলিনি। তুই ডিম-টিম আনতে গেলি যেন, আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি।

পারু বলে, ডিম না, মুসলমানপাড়া গেলুম মুর্গি আনতে।

তাই হবে। তো আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হৈমন্তী হ্যারিকেনটা এমন ভাবে রাখল, যেন উঠোন অব্দি আলো পড়ে।

আলো না থাকলে সাপটাপ...

ওয়েট, ওয়েট। আমায় বলতে দে। বলে ডালিম একটা বালিশে কনুই রেখে একটু কাত হল খাটের বিছানায়।—হ্যাঁ, আলোটা ছিল বলেই সাপটা দেখতে পেয়েছিল হিমি। সে চেঁচিয়ে উঠল, সরে আসুন! সাপ যাচ্ছে!

হৈমন্তী টেবিলের কাছে চেয়ারে বসেছে। সে বলে ওঠে, প্রায়ই সাপটা দেখতে পেতুম। পারু বলত, বাস্তু সাপ। কামড়ায় না নাকি।

সাপের কথা আমায় শিখিও না, শোন। আমার পায়ে মিলিটারি বুট। মাথায় বুট চাপিয়ে লেজ ধরে ফেললুম। তারপর বুট তুলে নিয়েই ঝাঁকুনি দিলুম। সাপটা সোজা হয়ে গেল। হিমিকে বললুম, শিগগির একটা হাঁড়ি বা পাতিল যা হয় কিছু দিন। ও তো একেবারে বোবা! প্রায় ফিট হয়ে গেছে।

হৈমন্তী হাসে।—বা রে! আমি তো কখনও দেখিনি ও সব।

তুই বিশ্বাস কর্, প্রায় পাঁচ মিনিট ওভাবে সাপটা রাখলুম। তারপর আমার নার্ভ গেল। ও তো পাথরের প্রতিমূর্তি হয়ে গেছে। তখন কী আর করব? ফের বুটের তলায় মাথাটা চেপে দিতে হল। তোদের উঠোনে লাইম-কংক্রিট ছিল না? ছিল। পিষে থেঁৎলে মেরে দিলুম। প্রকাণ্ড সাপ!

পারু বলে, ইস, পরে যা ভয় পেয়েছিলুম! রাত্রে বেরুতে পারতুম না।

বাস্তু সাপ মাড়ালে নাকি অভিশাপ লাগে। তোর বাড়িটা চলে গেল। তুই আপরুটেড হয়ে গেলি।...ডালিম প্রায় এক নিশ্বাসে বলতে থাকে।

পারু বলে, ও সব কুসংস্কার। বাড়ি তো রোড্স ডিপার্ট নিলে। সাপ থাকলেও নিত। হাইওয়ে হচ্ছিল তো। আরও অনেকের নিয়েছিল।

ডালিম মাথা নেড়ে বলে, না রে, এখন আমি সব কিছুতে বিশ্বাস করি। আমিই তোকে আপরুটেড করেছিলুম। এখন সেই সব ভাবি আর বড্ড কষ্ট হয়। জানিস পারু, সেই সন্ধ্যাটা—দ্যাট ব্লাডি বাগোৎ ইভনিংয়ে কিছু একটা

ঘটে গিয়েছিল—সেটা হৈমন্তী বলতে পারে। তুই যে হৈমন্তীকে দেখে গিয়েছিলি, ডিম কিংবা মুরগী কিনে ফিরে কি সেই হৈমন্তীকে আর দেখতে পেয়েছিলি? কী মনে হয় তোর?

হৈমন্তী একবার তাকিয়ে মুখ নামায়। পারু অস্ফুট স্বরে বলে, জানি না। অত কিছু লক্ষ্য করিনি।

ডালিম বলে, সে হৈমন্তীকে আর তুই দেখতে পাসনি। হৈমন্তী, তুমি বল!

হৈমন্তী মুখ তোলে।—আমিও জানি না।

জানো তুমি। ডালিম সোজা হয়ে বসে। তার মুখে হাসি, কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে।—নিজেকে প্রবঞ্চনা করছ কেন হিমি? আমাদের চুল পেকে গেল। তুমিও কি ভাবছ কালো চুল নিয়েই শ্মশানে কিংবা কবরে যাবে? সে হো হো করে আগের মত হেসে ওঠে হঠাৎ। কথাটায় হৈমন্তী আঘাত পাবে ভেবেই হাসি দিয়ে যেন হাল্কা করতে চায়। কিন্তু তারপর ফের গম্ভীর হয়ে যায়। ফের বলে যে, তুমি আমার মধ্যে কিছু একটা দেখেছিলে। খুব শক্ত কিছু। ভীষণ কিছু। তাই না? এ বয়সে আর লজ্জা-সংকোচের কোন মানে হয় না হিমি। আমরা এখন কী? গোরস্থানের তিনটে গাছ মাত্র! দূরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনটে-পাতা-ঝরা রুক্ষ গাছ। তিনটে ব্লাডি হেল!

এক পায়ে নড়বড় করে খাট থেকে নামে সে। তারপর এক পায়ে লাফাতে লাফাতে টেবিলের কাছে যায়। তলা থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে। অমনি হৈমন্তী বোতলটা কেড়ে নেয়। বলে, না, আর তুমি খাবে না।

পারু ব্যস্ত হয়ে বলে, প্লীজ ডালিম! আর না। এখন না, পরে।

ডালিম বোতলটা কাড়তে হাত বাড়ায়। হৈমন্তী দ্রুত সরে দরজার কাছে যায়। তার নাসারন্ধ্র স্ফীত। চুল খুলে গেছে। সে বলে, বাড়াবাড়ি করলে ভেঙে ফেলব বলে দিচ্ছি। চুপ করে বস।

ডালিম ওর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর ক্লান্তভাবে বলে, পারু এনেছে আমার জন্যে। জাস্ট একটা দিন তো। দুজনে একটু খেতুম।

না। বলে হৈমন্তী বারান্দায় চলে যায়।

ডালিম হাসবার চেষ্টা করে বলে, তাই বলে সত্যি ভেঙে ফেলো না। দামী জিনিস। এই হিমি, সত্যি ভাঙছ নাকি?

আগে তুমি বসো চুপ করে।

বেশ, বসলুম। বলে সে আবার খাটে চলে আসে। বালিশে কপাল রেখে চুপচাপ কিছুক্ষণ একটা পা নাচায়। তারপর মুখ তুলে বলে, সেদিন হৈমন্তী আমার মধ্যে কিছু একটা দেখেছিল, তা সত্যি! কী বলিস, পারু?

পারু বলে, ও কথা থাক। বরং তুই বেহালা বাজা, শুনি।

ভ্যাট্! মাল-ফাল না খেলে হাত খোলে না।—হিমি!

বারান্দার অন্ধকার থেকে সাড়া আসে, বল!

লক্ষ্মীটি! এই একটা রাতের জন্যে দয়া কর।

হৈমন্তী হনহন করে ঘরে ঢোকে। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে দুটো গ্লাসে ঢালে। পারু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর হৈমন্তী বোতলটা রেখে বলে, জল মেশাতে হবে?

ডালিম খুশি হয়ে বলে, এই না হলে বউ? পারু, এবারে টের পাচ্ছিস হিমি কে? তুই চুপ কেন রে? একটা কিছু বল্। এই বুড়ো ভাম! বয়সের তো গাছপালা নেই।

সে তার অক্ষত পা দিয়ে পারুর একটা পা নেড়ে দেয়। পারু সরল ভাবে হাসে।

হৈমন্তী জল মিশিয়ে একটা গ্লাস পারুর কাছে নিয়ে আসতে আসতে বলে, মাতলামি করলে তুলে নীচে ফেলে দেব কিন্তু!

আমি মাতলামি করছি কোথায়?

ওকে তুমি লাথি মারছ।

বেশ করছি। ও আমার ফ্রেণ্ড। আমার প্রাণের ইয়ার। ও আমার—ওই দেখতে পাচ্ছ? আমার গ্রেট ফাদারের রিয়েল পুত্র! ও আমার বউয়ের চেয়েও আপন। আজ ওকে নিয়ে শোব। বেশি বোকো না। গ্লাসটা দাও।

হৈমন্তী গ্লাসটা দিয়ে বেরিয়ে যায়। পারু অনুমান করে, বারান্দায় অন্ধকারে হৈমন্তী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে হয়তো। এই নির্জন ভাঙা ভুতুড়ে বাড়িতে হৈমন্তী কি ভাবে কাটাচ্ছে? সে অন্যমনস্ক ভাবে গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে অস্ফুট বলে, চিয়ার্স।

ডালিম বলে, হ্যাঁ। তারপর শোন্। হৈমন্তী কী ভাবে তোকে ঠকাল।

না। শুনব না।

তুই শুনবি। তোকে শোনাবার জন্যে আসতে বলেছিলুম।...

হৈমন্তী তাকে ঠকিয়েছিল, নাকি সে নিজেই হৈমন্তীকে ঠকিয়েছিল? এতদিনে সেটা জেনেও তো কোন লাভ নেই। অথচ সেই সন্ধ্যায় একটা কিছু ঘটেছিল, তাতে কোন ভুল নেই। স্বাস্থ্যবান সুন্দর এক যুবক, পরনে মিলিটারি পোশাক, তার পা ফেলার ভঙ্গীতে সাহস আর বেপরোয়া ধরনের ঔদ্ধত্য যেন ভালমন্দ সবকিছু মাড়িয়ে যাবে, এতটুকু ভাববে না, সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না, তাকে ভাল না লেগে পারে না। ভাল লাগা অবশ্য অনেক সময় ভালবাসা না হতেও পারে। কিন্তু হৈমন্তীর বেলায় ভাল লাগা ভালবাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল যেন।

প্রায় সারারাত তিনজনে জেগে কাটিয়েছিল সেদিন। ডালিম তার মিলিটারী জীবনের কথা বলছিল। চমৎকার ওর বলার ভঙ্গী। মাঝে মাঝে

পাগলাটে হাসি আর লাফিয়ে ওঠা, গল্পে মরা-বাঁচার সঙ্কট-মুহূর্তেও হাস্যকর কিছু দেখিয়ে দেওয়া, এক কথায় ডালিম হৈমন্তীকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল সে রাত থেকেই।

ঘুম থেকে উঠতে ডালিম ও পারুর স্বভাবত দেরি হয়েছিল। অনেক বেলায় উঠে পারু একটু অবাক হল। অনেক আগেই হৈমন্তী উঠেছে। স্নান করেছে। এবং একটু সেজেছেও। পারুর চোখের ভুল নয়, তা সে হলফ করে বলতে পারত। অবশ্য সাজাটা খুব সামান্যই। একটা হাল্কা নীল শাড়ী ওর বাক্স থেকে বের করে পরেছে। শাড়ির ওপর টুকরো মিহি কিছু নকশা ছিল। এ শাড়ি হৈমন্তীকে কখনও পরতে দেখেনি পারু। আর কী? তেমন কিছু নয় নিশ্চয়। কিন্তু ওই শাড়ি পরা আর সকালের স্নানে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠা চেহারায় নতুন একটা সৌন্দর্য হৈমন্তীকে তীব্র করে তুলেছিল। উজ্জ্বল করেছিল। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। ওর মুখে যেন একটা তৃপ্তির ভাব খেলা করছিল। দৃষ্টিটাও ছিল চঞ্চল।

আর পারু খুব লোভের চোখে দেখল ওকে। তার ভাল লাগল এই ভেবে যে হৈমন্তী তাহলে বিয়েতে রাজী। হৈমন্তী তাকে ছেড়ে যেতে চায় না। যাচ্ছে না।

চা খেয়েই ডালিম হইচই করে বেরুল গ্রাম ঘুরতে। ওর সবার সঙ্গেই ভাব ছিল। পলাশপুরের ছোট-বড় সবাই ওকে পথে দেখলে চেঁচিয়ে উঠত, মহারাজা! মহারাজা! বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল চমৎকার। কেউ ওর কাকিমা, জেঠিমা, দিদি, বউদি। বয়স্করা ওর দাদা, কাকা, খুড়ো, মামা...কত সব সম্পর্ক। ওর দুষ্টুমিতে লোকে রাগ করত। কিন্তু ওকে দেখলেই ভুলে যেত। মানুষকে বশ করার যাদুমন্ত্র জানত ডালিম।

কিন্তু শুধু মুসলমান পাড়ায় কেউ যেন ওকে পছন্দ করত না। হিন্দুর বাড়িতে মানুষ হয়েছে, পুজোপার্বণে মাতামাতি করেছে, কথাবার্তা চালচলনে এতটুকু মুসলমানী ব্যাপার নেই। তাই ডালিমকে ওদের পছন্দ না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া অমন বাচ্চা বয়েসে সে হরনাথের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছে, ইসলাম ধর্মের কোন কিছু শেখার সুযোগই পায়নি। কেবল একটা ব্যাপারে তার যেটুকু মুসলমানত্ব ছিল সেটা সারকামসিশন। মুসলিমরা যাকে বলে 'খৎনা'। আড়াই বছর বয়সেই ওটা তার হয়ে গিয়েছিল। অথচ পলাশপুরের মুসলমানরা তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করত। পারু কিন্তু জানত. ব্যাপারটা সত্য! রেলের নির্জন বাংলোর বারান্দায় বসে ডালিম পেন্টুল খুলে হি হি করে হাসত।

এই পারু! ভগবানের জিভ দেখবি?...

ডালিম বেরিয়ে যাবার সময় পারুকে ডেকেছিল। পারু যায়নি। সত্যি বলতে কি হৈমন্তীর জন্যেই পারুর মনে একটা অস্বস্তি আর সংকোচ ছিল। সে

মেলামেশা ছেড়েই দিয়েছিল একরকম। ডালিম যাবার সময় বলে গিয়েছিল, সব ঠিক হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভাবিস নে। কত দেখলুম!

সে চলে যাবার পর কতক্ষণ অস্থির থেকে এক সময় হৈমন্তীর মুখোমুখি হল পারু। বুকে দুরুদুরু কাঁপন, দু'চোখে নিশ্চয় হ্যাংলামি ছিল, সে অনেক ইতস্তত করার পর মরীয়া হয়ে বলেছিল, কী ভাবলে হৈমন্তী?

অমনি হৈমন্তীর চোখ জ্বলে উঠল।—আপদ বিদায় করতে তর সইছে না। এই তো?

পারু মিইয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।—আঃ! কী বলছ তুমি? আমি তা বলিনি।

ঠিক তাই বলছ।

না। তুমি একটু ভেবে দেখ, হৈমন্তী। ডালিম এসে গেছে। ও না এলে প্রব্লেমটা এতোখানি সিরিয়াস হত না। আর যার কাছেই হোক, ওর কাছে ছোট হয়ে যাওয়া আমার বড্ড খারাপ লাগছে। পারু শান্তভাবে বলেছিল এসব কথা। তাছাড়া ভেবে দেখ, ডালিমও তো তোমার সম্পর্কে কী ভাববে! মুখে যা-ই বলুক না কেন?

হৈমন্তী ঝাঁঝালো করে বলেছিল, কী ভাববেন তোমার বন্ধু? আমি তোমার রক্ষিতা?

পারু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।—ছিঃ! তুমি কি বলছ, হৈমন্তী!

নয় তো কী? রক্ষিতার মতই আছি। লোকে আর কী-ই বা ভাববে? কিন্তু কে কী ভাবল না ভাবল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

এবার পারুর রাগ হয়েছিল।—আমার যে যায় আসে! সে ক্ষুব্ধ মুখে বলেছিল। এতদিন হয়তো গ্রাহ্য করিনি কিছু কিন্তু এর একটা তো সীমা থাকা দরকার। তাছাড়া ডালিমের চোখে...

কথা কেড়ে হৈমন্তী বলেছিল, তোমার বন্ধুর চোখে তোমায় আর ছোট হতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

পারুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বেশ। তাই যাও।...

হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। উঠোনের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তারপর ঘরে ঢুকেছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে পারু শুনতে পাচ্ছিল, জিনিসপত্র গোছাচ্ছে হৈমন্তী। তার প্রতিটি শব্দ প্রচণ্ড জোরে এসে ধাক্কা মারছিল পারুর বুকে। তার চারপাশে এগিয়ে আসছিল কুয়াশা—সব কিছু ঢেকে ফেলছিল সেই ঘন ধূসর কুয়াশার ঝাঁক।

তারপর হৈমন্তীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, একটা রিকশো ডেকে দেবে দয়া করে?...

পরে ডালিম বলেছিল, তুই বাপ্পোৎ হাবা গাধা গাড়োল হাতি ভেড়া উল্লুক!

কী নোস তুই ? ও তোকে রিকশো ডেকে দিতে বলল, তবু তুই উজবুকের মত কিছু টের পেলি নে ? সুড়সুড় করে শালা চাকর রিকশো ডাকতে চলে গেলি ? যে যাবার, সে কি তোকেই রিকশো ডাকতে বলবে, নাকি নিজেই ডেকে আনবে ! তোর বাড়ির দরজার বাইরে সব সময় রিকশো যাচ্ছে। বাসও যাচ্ছে ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। জানলা থেকে ডাকলেই শুনতে পাবে কেউ না কেউ। তোর মত আহাম্মক আমি দেখিনি পারু !

পারু রিকশো ডাকতে বেরুচ্ছে। যন্ত্রের মানুষের মতই তার আচরণ, তার চাউনি, তার পা ফেলার ভঙ্গী। হৈমন্তী বারান্দার কোণায় স্টোভের দিকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে যেতে যেতে বলেছিল, ভাতটা ঠিক সময়ে ফেন গেলে নিও। রাতের মাংসটাও জ্বাল দিতে হবে।

স্টোভে ভাত চাপানো ছিল। স্টোভের চারপাশে অগোছোলা জিনিসপত্র।

পারু বলল, আচ্ছা।

গেটে ডালিমের মুখোমুখি হয়েছিল সে। ডালিম চাবির রিঙ আঙুলে জড়িয়ে শিস দিতে দিতে ঢুকছে। ঢোকার সময় পুরানো ল্যাভেণ্ডারের এলো-মেলো হয়ে যাওয়া লতাপাতা তার মাথায় লাগলে শিস দিতে দিতে সেগুলো সযত্নে সরিয়ে দিচ্ছে। পারুকে দেখে বলল, তুই কুঁড়ের রাজা পারু। ইস ! এমন সুন্দর গাছটা কী হয়ে গেছে দেখছিস ? বাপের কুপুত্র আর কাকে বলে ?

পারুর মুখটা গম্ভীর। চোখ দুটো নিশ্চয় লাল দেখাচ্ছিল। সে ছোট্ট একটা 'হুঁ' বলে পা বাড়াচ্ছিল।

ডালিম বলল, কোথায় যাচ্ছিস রে ? আয়, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব।

আসছি। রিকশো ডেকে আনি।

রিকশো ? রিকশো কেন ?

হৈমন্তী চলে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছে মানে ? কোথায় যাচ্ছে ?

সে জেনে তোর লাভ নেই। তুই গিয়ে বোস্, আসছি।

ডালিম ওর একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলেছিল। ওর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, ঝগড়া করেছিস ? তারপর সে সামনের বাড়িটার দিকে একই দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তখন হৈমন্তী জানলায়। জানলায় কোন পর্দা ছিল না।

পারু ব্যথা পাচ্ছিল। বলেছিল, আঃ, ছাড় ডালিম !

ডালিম ওকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি ঢোকাল। তার পর চেঁচিয়ে উঠল, কই ? শুনুন তো এদিকে ! গেস্টকে না খাইয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার মানেটা কি ? আমি কি আনডিজায়ারেবল গেস্ট ? অ্যাঁ ? শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই না হয় আমাকে কিংবা পারুর মত একটা স্কাউণ্ড্রেলকে মানুষ

করতে পারেননি, নিজের মেয়েকেও কি পারেননি?

হৈমন্তী বেরিয়ে শান্তভাবে বলেছিল, ওই তো রান্না হচ্ছে।

রান্না হচ্ছে আর আপনি ওকে রিকশো ডাকতে পাঠিয়েছেন? আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমাকে খেতে দেবে কে? হাত ধুতে জল ঢেলে দেবে কে?

ডালিম রীতিমত গম্ভীর মুখে বলে যাচ্ছিল। অদ্ভুত ওর বলার ভঙ্গী।... জানেন? এ বাড়িতে আমি খাওয়ার পর পারুর মা ওইখানে আমাদের দুজনের হাতেই জল ঢেলে দিতেন? কেন দিতেন জানেন? আমরা দুজনেই ভাল করে হাত ধুতে পারতুম না। নোংরা ছড়াতুম। মা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ভীষণ কড়া ছিলেন, জানেন? উঠোন হাতের তালুর চেয়ে চকচকে হয়ে থাকত। ওই যে দেখছেন মস্ত জবা গাছটা মাটি ধসে গিয়ে আদ্ধেক চাপা পড়ে গেছে, ওই গাছের তলায় মাদুর বিছিয়ে আশ্বিন মাসের দুপুরবেলা আমরা ছুটির পড়া করতুম। এখন তার তলায় ঘাস গজিয়েছে। আরে বাবা, এ সব তো মেয়েদেরই কাজ! আর...জানেন? কত কাল আমি মেয়েদের হাতে খাইনি?

হৈমন্তী পারুকে অবাক করে হেসে ফেলেছিল। হৈমন্তীকে বোঝা যায় না। আজও বুঝতে পারেনি পারু। কোন্‌টা ওর সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে পারু বোঝে না। হৈমন্তী তারপরই অবশ্য দ্রুত হাসি চেপে বলেছিল, আঃ, থামুন তো এবার! লোকে ভাববে কী হচ্ছে!

থামব! আপনি কুয়ো থেকে জল তুলে দেবেন, আমি চান করব, তারপর খেতে পাব, তখন থামব। আমার পেটে আগুন জ্বলছে।

ডালিম ছাড়া এটা কেউ পারত না। এমন নিঃসঙ্কোচ আব্দার কিংবা আদেশ তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। হৈমন্তী সত্যি কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়েছিল ওকে। ও এতটুকু বাধা দেয়নি। দিব্যি পা ছড়িয়ে খালি গায়ে বসে গেল কুয়োতলায়। অসম্ভব উজ্জ্বল আর বলিষ্ঠ বুক, চওড়া ছাতি, বুকে সামান্য একটু লোম ছিল, দুটো পেশীবহুল বাহু বাড়িয়ে হৈমন্তীর বালতি থেকে বড় বালতিতে জল ঢেলে নিচ্ছিল। কী যেন রসিকতা করছিল। আর তাই শুনে হৈমন্তী চাপা হাসছিল। কিন্তু পারুর চোখে ব্যাপারটা একটুও ভাল ঠেকেনি।...

পাতাঝরা তিনটে রুক্ষ গাছ। কবরখানার তিন কোণায় তিনটে ধূসর একলা গাছ। এ বসন্তে তাদের ডালে পাতা জেগে ওঠার জন্যেই কি এমন গুরুতর আয়োজন! বয়স্ক গাছগুলোর শিরা-উপশিরা শক্ত হয়ে গেছে। শুকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আজ এই রাতের ঝড়ে তারা এত আলোড়িত এত অস্থির!...

পারু আড়চোখে ঘড়ি দেখে নেয়। রাত বারোটা বেজে গেছে। টেবিলে হেরিকেন জ্বলছে। তেমনি ভঙ্গীতে বসেছে তিনজনে। হৈমন্তী টেবিলের কাছে বসেছে। পারু আর ডালিম খাটে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। মাঝে মাঝে দূরে ট্রেনের শব্দ। কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে ডালিম বলে, আমার ডান চোয়ালের তিনটে, বাঁ দিকে দুটো নেই। বাঁধিয়েছি। তোর, পারু?

পারু একটু হাসে—বয়সের সঙ্গে দাঁত পড়ার সম্পর্ক আছে নাকি? আমার একটা গেছে। বাঁ দিকের আক্কেল দাঁতটা।

আদতে ছিল কি কোন দিন? তুই তো বরাবর বেআক্কেলে!

এ কথায় হৈমন্তীও হাসে।—এত অত বীরত্ব, অথচ দাঁত তুলতে গিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল, জানো পারু?

ডালিম গালে হাত রেখে মাথা ঝাঁকুনি দেয়।—ওরে বাবা! হরিবল!

ব্যথা পাওয়া তো উচিত নয়। ইঞ্জেকশন দেয় তো।

দিলে কী হবে? দাঁত ওপড়াচ্ছে, এই সেন্সটাই যথেষ্ট!

হৈমন্তী বলে, শুধু কি এই? নখ কাটতে পর্যন্ত ভয়। নখের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না? কাটা ছেঁড়াতে ভীষণ ভয় ওর। অথচ...,—বলে চুপ করে যায় সে।

ডালিম বলে, জানি, কী বলতে চাইছ! স্ট্যাব করতে হাত কাঁপেনি, এই তো? তোদের দুজনের দিব্যি, ও সব কাজ শালা মহারাজার। ডালিম অলওয়েজ ভীতু গোবেচারা মুখুসুখু লোক। সেজন্যই তার সঙ্গে পারুর এত ভাব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ-ও সত্য, মহারাজা না থাকলে ডালিমকে পারু আমলই দিত না। তাদের বাড়ির আশ্রিত বলে অবজ্ঞা করত—করুণা করত, ছোট করে রাখত। তাই না পারু?

পারু ভর্ৎসনার এবং ক্ষোভের ভঙ্গীতে বলে, তুই তো বরাবর অকৃতজ্ঞ!

ডালিম সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে।—কার কাছে কৃতজ্ঞতা পারু? আমি বুঝি নিজের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতার চেয়ে বড় কিছু নেই। ডালিম আর মহারাজা দুজনেই দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞ। মহারাজা ছিল বলেই ডালিম বেঁচে

থাকতে পেরেছে। আর ডালিম ছিল বলেই মহারাজা অন্তত একটা ঠ্যাং বাঁচিয়েও টিকে আছে। তাই না? কিন্তু এ সব আলোচনার জন্য হুইস্কিটা দরকার। হিমি! লক্ষ্মীটি! দয়া কর, অন্তত একটা রাত!

হৈমন্তী কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর টেবিলের তলা থেকে বোতলটা আবার বের করে। গ্লাস দুটো টেবিলেই ছিল। জগ থেকে জল ঢালে। তারপর খুব অল্প করে হুইস্কি ঢেলে দেয় গ্লাস দুটোতে। ডালিম বলে, এই! আরেকটু, প্লীজ!

কোন কথা না বলে হৈমন্তী গ্লাস দিয়ে যায়। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে। পারু দেখতে পায়, মুখের ভাবে চাঞ্চল্য জেগেছে—যেন ভেতরে অনেক কথা তোলপাড় হচ্ছে, বলতে পারছে না। তাই সে হাসতে হাসতে বলে, হৈমন্তী, তুমি কি চুপচাপ শুনে যাবে? তোমার বলার কথা নেই? ইচ্ছে করছে না বলতে? এমন সময় আর পাবে না কিন্তু।

হৈমন্তী বলে, আমার কোন বলার কথা নেই।

পারু সকৌতুকে বলে, মহারাজার ভয়ে?

মহারাজার ভয় তোমার থাকতে পারে। পলাশপুরের লোকের থাকতে পারে। আমার নেই।

এ কথা শুনে ডালিম হো হো করে হেসে ওঠে। তার গ্লাস থেকে মদ ছলকে পড়ে। তার গলায় আটকে যায়। সে প্রচণ্ড কাশতে থাকে। তারপর সামলে নিয়ে বলে, মহারাজাটা ছিল একটা গুণ্ডা। দলবল নিয়ে এলাকাকে জব্দ করে রেখেছিল। ও শালার এখন তেমনি প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। ঠ্যাং কাটা হয়ে পড়ে আছে। লোকেরা পাপের শাস্তি বলে ভগবানের ঢাক পেটাচ্ছে। কিন্তু তবু শালারা এখনও মনে মনে ভয় পায়। পুলিস লেলিয়ে দেয়। এই তো সেদিনই আই বি ভদ্রলোক হঠাৎ এসে এ ঘরে খুব যত্নআত্তি নিয়ে গেল হৈমন্তীর। কেন এসেছিল, কে জানে!

পারু বলে, বলিস কী!

হৈমন্তী বলে ওঠে, এমন পোড়ো বাড়িতে আমরা থাকি, তাই ভাবে, কোন অপকর্মের ঘাঁটি আছে নাকি! অবিশ্যি ও-মাসে আমরা স্টেশনের কাছে চলে যাচ্ছি। একটা বাসা পাব। বাড়িটা তৈরি হচ্ছে এখনও।

ডালিম অন্যমনস্ক ভাবে বলে, সেখানেও আই বি যাবে। না মরা অব্দি রেহাই নেই। কিন্তু মহারাজা কি সত্যি মরবে? ও শালা অমর। আবার গজাবে। কারণ লোকের দরকার হবে তাকে। তাই না পারু?

লোকের দরকারে সাড়া দিতে পারত বলেই ডালিম খুব শিগগির পলাশপুরে নিজের একটা শক্ত জায়গা করে নিতে পেরেছিল। এটাই অদ্ভুত যে ওর মধ্যে যেন পুরনো পৃথিবীর খুব শক্ত ও স্থায়ী কোন জিনিস ছিল। অন্তত

পারুর তাই মনে হত। এখনও মনে হচ্ছে। নয়তো পারু ও হৈমন্তীর জীবনে অমন একটা সন্ধিকালে ডালিমকে দেখে দুজনেই মনে জোর পেয়েছিল কেন? হৈমন্তী যেন ভুলেই গিয়েছিল, সে ওবেলা রিকশো ডাকতে বলেছিল চলে যাবার জন্যে। পারুও ভুলে গিয়েছিল যেন হৈমন্তীর চব্বিশ ঘণ্টা সময় নেওয়ার কথা। নির্জন বাড়িটা ভরে তুলেছিল ডালিম তার চড়া গলার কথাবার্তায়, হুল্লোড়ে, হাসিতে। পারুর মনেই হচ্ছিল না হৈমন্তী ও তার কোন গোপন সমস্যা আছে।

সমস্যা নিশ্চয় ছিল। ওভাবে তো বেশিদিন থাকা যায় না। পারু ও হৈমন্তীর মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা সাময়িক ভাবে চাপা পড়লেও খুব শিগগির আবার মাথা চাড়া দিত। অসম্ভব ধূর্ত ডালিম পরদিনই যেন একটানে পর্দা ছিঁড়ে দুজনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।—হ্যাঁ রে, তুই তো কম্যুনিস্ট?

পারু বলেছিল, ছিলুম। এখন আছি কিনা বলা কঠিন। কেন?

শুনেছি কম্যুনিস্টরা খোদা-ভগবানে বিশ্বাস করে না। তাই না?

পারু ও হৈমন্তী দুজনেই হেসে ফেলেছিল ওর অবোধ বালকের মত বলার ভংগী দেখে। তারপর পারু বলেছিল, হুঁ, তাতে হয়েছে কী?

ডালিম তখন রীতিমত সিরিয়াস। বলেছিল, তাহলে তো মুশকিলের কথা।

একটা কিছু তো চাই-ই, যাকে তোরা ভয় পাবি!

আমরা কাকেও ভয় পাই নে। কিন্তু কেন ও কথা বলছিস?

ডালিম আঙুলে তুড়ি দিয়ে বলেছিল, হয়েছে! মানুষের মধ্যে বিবেক বলে একটা কিছু আছে তা মানিস, না মানিস নে?

মানি। নিশ্চয়ই মানি। কিন্তু কেন?

বেশ। নিজে নিজের বিবেককে সাক্ষী রেখে তোরা..., হঠাৎ থেমে ডালিম এদিক ওদিক চঞ্চল চোখে তাকাল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি আসছি। এক্ষুনি আসছি। ওয়েট! হাম আভি আতা হ্যায়!

সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরের বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল। জোরালো আওয়াজ। পায়ে বেশির ভাগ সময় সে মিলিটারি বুট পরে থাকত। এমন কি খাকি বুশ শার্ট আর প্যান্টটাও পরনে থাকত। মাথায় ক্যাপ পরতেও ভুলত না। পারুর মনে হত, ওই ভাবে ডালিম যেন পলাশপুরে দাপট দেখাতে চাইছে।

তখন গ্রীষ্মের বিকেল। হৈমন্তী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল পারুর দিকে। তারপর যেন টের পেল, তারা নির্জনে আবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। অমনি হৈমন্তী বাইরে বারান্দায় চলে গেল।

পারু ততক্ষণে অনেকটা সামলাতে পেরেছে নিজেকে। হৈমন্তী কী করে

না-করে তাতে আর যেন তার মাথাব্যথা নেই। হয়তো ওটা ছিল তার অসহায় মরীয়াপনা। গায়ের জোরে তো হৈমন্তীকে সে চায়নি কোন দিনও।

পারু ভেতরের বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে বই পড়তে শুরু করল। ঘণ্টাখানেক পরে হইহই করে ফিরল ডালিম। সে বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছিল, পারু! পারু! কখন হৈমন্তী এসে নিঃশব্দে ও-ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে আছে, পারু টের পায়নি। ডালিমের চেঁচামেচিতে পেল।—এই যে, চলে আসুন! ধরুন এগুলো। জানলা ধরা মেয়েদের ভারি বদ অভ্যেস, চলে আসুন বলছি!

পারু বেরিয়ে গিয়ে দেখে, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। একটা রিকশো দাঁড়িয়ে আছে গেটের ওখানে। ডালিমের এক হাতে দড়ি-বাঁধা একটা প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়ি, অন্য হাতে একগাদা ফুল কিংবা মালা, তার পায়ের কাছে রিকশোর ওপর একগাদা প্যাকেট আর কী সব জিনিসপত্র! সে চোখ পাকিয়ে বলল, হাঁ করে কী দেখছিস শালা? ইধার আ যা!

পারু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে ওই অবস্থায় লাফ দিয়ে নামল। তারপর রিকশোওলাকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, আরে ইয়ার! তুম্ ভি আঁখে ফাঁড়কে কেয়া দেখ্ রাহা? জিনিসগুলো খুব ওজনদার নয়, বাবা! হাত লাগাতে তকলিফ হবে না। ননীর গতর বাপ্‌চোৎ! ওঠা বলছি!

শেষের কথাগুলো বাপ তুলে গালাগালের মত শোনাল। হিন্দুস্থানী রিকশোওলাটাকে পারু চিনত। রেলস্টেশনের খালাসী ভজুয়ার দাদাটাদা হয় সম্পর্কে। পার্টি রিকশোওলাদের সমিতি গড়েছিল। সেই থেকে আলাপ। ডালিমের ধমক শুনে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তড়াক করে নামল। একগাল হেসে প্যাকেটগুলো দু'হাতে বুকের কাছে ধরে তক্ষুনি নিয়ে এলো।

একটু খারাপ লাগছিল পারুর। পার্টিতে থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গী এই সব নীচুতলার মানুষদের প্রতি অন্য রকম হয়ে উঠেছিল। সে ওদের সম্মান করে কথা বলত। কমরেড বলে সম্ভাষণ করত। হাত মুঠো করে ওপরে তুলে লাল সেলাম দিত।

ভজুয়ার দাদা শ্রদ্ধার সঙ্গে জিনিসগুলো বারান্দায় রেখে তারপর যথারীতি পারুকে লাল সেলাম দিল। ডালিম হাঁ করে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল, কি বাবা! তুমি ওকে ঘুষি দেখাচ্ছ কেন?

রিকশোওলা হলুদ ভাঙা দাঁতগুলো বের করে বলল, উন্‌হি হামাদের পার্টির কোমরেড আছে হুজোর! ওহি লিয়ে হামি উন্‌হিকো লাল সেলাম দিচ্ছে। ডালিম মুখ ভেংচে বলল, পয়সা দিচ্ছি আমি, আর ওকে দিচ্ছ সেলাম! তাও আবার লাল রঙের! শোন বাবা, একখানা সেলাম দাও দিকি! লাল নয়, নীল। এই দেখ, ঠিক এরকম। বলে সে গোড়ালিতে শব্দ তুলে একখানা মিলিটারি সেলামের ভঙ্গী করল।

রিকশোওলা খিকখিক করে হাসতে লাগল। তারপর কতকটা ওই রকম

একটা সেলামও দিতে ভুলল না।

একটু পরে সে চলে গেলে ডালিম ধমক দিয়ে বলল, কী রে শালা? গরজ কি আমার না তোদের? হাত লাগাবি, না ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবি?

পারুর মনে পার্টি সম্পর্কে তখন রাগ ছিল প্রচুর। ক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তখনও সে বিশ্বাস হারায়নি। তাই লাল সেলাম নিয়ে আর ওই রিকশোওলার প্রতি ডালিমের ঠাট্টা-তামাশায় মনে মনে খুব রেগে গিয়েছিল। বলল, এ সব কি আনলি?

ডালিম কিছুক্ষণ নিষ্পলক চুপচাপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ঠোঁটের কোণে ওর সেই অনবদ্য বিদ্রূপের ভাঁজটা স্পষ্ট করে আস্তে আস্তে বলল, ন্যাকামি দেখলেই আমার মাথায় খুন চড়ে যায়!

হৈমন্তী এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। তার দিকে চোখ পড়তেই ডালিম নিজেকে যেন সংযত করে নিল। গম্ভীর মুখে বলল, এগুলো কাজে না লাগলে পুকুরে ফেলে দেব, না হয় জাহান্নামে ছুঁড়ে দেব। জানব, এ বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। আমি আউটসাইডার।

তারপর সে সোজা হৈমন্তীর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকল। হৈমন্তী আরও একটু সময় নিয়ে পা বাড়াল। পারু তখনও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

পারু দেখল, হৈমন্তী প্যাকেটগুলো নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ডালিম ভিতরের বারান্দায় কোমরে দু' হাত রেখে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে।

পারু পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।—কিন্তু তুই বুঝতে পারছিস না ডালিম...

পারছি। তুই একটা কাওয়ার্ড! তুই আহাম্মক!

হৈমন্তী যা চায় না...

কথা কেড়ে নিয়ে ডালিম বলেছিল, হৈমন্তীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

কখন কথা হল, কি কথা হল, পারু অবাক হয়ে গিয়েছিল! তাহলে কি দুপুরে যখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল ডালিম? পারু আড়চোখে হৈমন্তীর দিকে তাকাল। হৈমন্তীর ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটে রয়েছে। মুহূর্তে পারুর বুক থেকে বিশাল পাথর নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। পারু শুধু বলেছিল, বেশ, তুই যখন বলছিস!

ডালিম ফেটে পড়েছিল, আমার বলার ব্যাপার নয়! হরনাথ সান্যালের ছেলে তুই। ও মধুসূদন ত্রিপাঠী মশায়ের মেয়ে। প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের ছেলেমেয়েদের এটা সাজে না। লজ্জা করে না তোদের? উইদাউট মর‍্যাল বেসিস এভাবে দুজনে বাস করছিস! ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার! ফ্যামিলির ইজ্জত আছে না? এ বাড়িতে বসে কেলেঙ্কারি না করলে চলত না? এ বাড়ির সম্মান নিয়ে তোরা ছিনিমিনি খেলছিস না? আমার শালা পষ্ট কথা, আমি সেই মহারাজা!

হৈমন্তী এবার মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, আঃ, কি বলছেন ডালিমদা! এবার আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন!

ডালিম অমনি বদলে গেল। হুঁ, খুব চেঁচামেচি করছি বটে। শুনুন, লোকজন এক্ষুনি এসে যাচ্ছে। ন্যাড়া ঠাকুরকে বলে এসেছি, এসে যাচ্ছে'খন। আপনি ঝটপট সেজে নিন। এই যে, শাড়ি-ফাড়ি স্নো-পাউডার সিঁদুর-টিঁদুর যা দরকার, সব আছে। হেরম্বর বোনকে বলেছি, আসব তো বলল! ওর জন্যে দেরি করা ঠিক নয়। ন্যাড়াঠাকুর পাঁজি দেখে বলেছে ছ'টা ঊনত্রিশে লগ্ন। এই বুদ্ধু, এখানে তোর ধুতিটুতি আছে। রেডিমেড পাঞ্জাবি পেলুম না। নেই তোর? সিল্কের হলে ভাল হয়। নয়তো আদ্দি-টাদ্দি। জুতোও এনেছি। হৈমন্তী, আপনার স্লিপার দুটো দেখুন তো, ঠিক আছে নাকি! পাঁচ নম্বর লাগবে বলল।

ডালিম বিপ্লব ঘটাতে পারত। ঘটিয়েছিল।...

এখন সবই ছেলেখেলা লাগে। ছেলেখেলা ছাড়া কী? হৈমন্তী পারুর সঙ্গে কয়েকটা বছর যে-ঘর করেছিল তা খেলাঘর ছাড়া কিছু নয়। দুজনের মধ্যিখানের সেই বিশাল নদীটা ক্রমশ সাগর হয়ে উঠেছিল। সেই সাগরের ঢেউয়ের শব্দ এত জোরালো, কেউ কারও কথা শুনতে পেত না, শুনলেও বুঝতে পারত না।

হৈমন্তীর বাড়ি-বেচা টাকাগুলো পোস্টাপিসে রেখেছিল। পারুরই পরামর্শে। পরে ডালিম স্টেশনের কাছে একটা স্টেশনারি দোকান খুলল। পারুও তার পার্টনার হল। পারুর কাছে কানাকড়িও ছিল না। হরনাথের যা কিছু সঞ্চয় ছিল, এমন কি তার মায়ের টাকাকড়ি আর সোনাদানা, সবই কিছুটা পারুর কলেজের খরচ যোগাতে, কিছুটা পার্টি-ফান্ডে দানে খরচ হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনারি দোকানে পারু হৈমন্তীর টাকাগুলোই লাগিয়েছিল। হৈমন্তীরই পরামর্শে। ডালিম ছিল প্রচণ্ড খরুচে। ওর পুঁজিও খুব বেশি ছিল না।

দোকানের নাম দিয়েছিল ফ্রেন্ডস স্টেশনার্স। ডালিম ছিল বেশ কেতা-দুরস্ত। মিলিটারি থেকে ফেরার পর তার ওই কেতাদুরস্ত ভাবটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্যবসা করার দিকে তার মন ছিল সামান্যই। পারু দোকানে বসত। ডালিম আড্ডা দিয়ে বেড়াত। তার সাঙ্গোপাঙ্গ জুটে গিয়েছিল অনেক। ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল মহারাজা। তার ডালিম নামটা ভুলেই গিয়েছিল লোকে। যখন-তখন একে-ওকে ধরে পেটাত সে। বীরেশ্বরবাবু ইলেকশানে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। ছেচল্লিশের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের হুল্লোড় চলেছে তখন সারা দেশে। মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছে। ডালিমকে মীর্জা আর কাজীরা দলে টানতে চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। বীরেশ্বর ভোটে জিতে-

ছিলেন। কিন্তু পলাশপুরে রাজনৈতিক সংঘর্ষ কখনও হয়নি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও হয়নি। ছোটখাটো সংঘর্ষ যা কিছু হত, তা নিছক ব্যক্তিগত কারণে। ডালিমের আরেকটা কাজ ছিল, বাড়ি বা জমির দখলের ব্যাপারে ভাড়াটে গুন্ডা যোগানো। সে থাকত আড়ালে। তার চেলারা গিয়ে কাজ করত, কড়ি বুঝে নিত ডালিম। পারু তাকে সামলাতে পারত না। নিজেও বড় ভয় করত ওকে।

কিন্তু হৈমন্তীর অদ্ভুত পক্ষপাত লক্ষ্য করত পারু ডালিমের দিকে। তখনও অত কিছু তলিয়ে বুঝতে পারেনি। অনেক পরে পেরেছিল। তখন আর কিছু করার ছিল না। পারু সারাদিন দোকানে থেকেছে। সেই ভোরে সাইকেলে বেরিয়ে এসেছে। ফিরেছে রাত দশটায়। সরাসরি কলকাতা থেকে মালপত্র আনতে হয়েছে প্রায়ই। পারতপক্ষে সে বাইরে রাত কাটাতে চাইত না। দোকানে ডালিমকে পাওয়া যাবে না তা তো জানাই। অগত্যা হৈমন্তী এসে বসত। একজন ছোকরা কর্মচারীও রেখেছিল। সে সুযোগ পেলেই চুরি করত। তাই পারু যেত ভোরের ট্রেনে। ফিরে আসত রাত নটার আগে। বাড়িতে খেতে গিয়ে দেখত, হৈমন্তী একা আছে এবং আশ্বস্ত হত পারু। জিগ্যেস করত, ডালিম খেতে আসেনি? হৈমন্তী মাথা নাড়ত।

পারুর মনে সংশয় জাগত, ও কি সত্যি বলছে? ডালিম কি প্রায়ই দুপুরের খাওয়াটা বাইরে খায়?

তারপর একদিন দুপুরে, একটু আগেই পারু বাড়ি গেল। গিয়ে দেখল, ডালিম খেতে বসেছে। হৈমন্তী তার সঙ্গে যেন খুব হাসাহাসি করছিল এতক্ষণ, একটু হকচকিয়ে গেল দুজনেই। অবশ্য ব্যাপারটা সামান্য। কিন্তু পারুর মনের সংশয় আরও ঘন হল। হৈমন্তী কেন অত সেজেগুজে থাকে? পারু যখন থাকে না, তখন কি ডালিম ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে?

এরপর প্রায়ই পারু যখন-তখন একটা অছিলা নিয়ে বাড়ি এসেছে। ডালিমকে যেদিন বাড়িতে দেখেছে, ডালিম বলেছে, শরীর ভাল না. সেদিনই পারু গম্ভীর হয়ে থেকেছে। ভাল করে কথা বলেনি হৈমন্তীর সঙ্গে।...

এই স্মৃতিটা দীর্ঘ এবং তেতো। পারু ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে, পারেনি। বিশেষ করে এক বর্ষার প্রচন্ড বৃষ্টির দিনে হৈমন্তীর দরজা খুলতে দেরি হওয়া, আলুথালু বেশ, তারপর পাশের ঘরে ডালিমের ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকা!...

যে ফোড়াটা দেখা যাচ্ছিল, ক্রমশ স্পষ্ট হল, পেকে গেল। গলে বেরিয়ে এলো পুঁজরক্ত। সে এক কদর্য সময়!

তখন দেশভাগ হয়ে গেছে। মীর্জা-কাজীসায়েবরা পাকিস্তানে চলে গেছেন। মীর্জার এক বিধবা ভাগ্নী আঞ্জুমান বেগমকে মীর্জার ছেলেরা সম্পত্তি বেচার সময় ফাঁকি দিয়েছিল। মামলা হয়েছিল। কিন্তু হেরে যান

ভদ্রমহিলা। তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার সময় মহারাজার আবির্ভাব হল সদলবলে। ক্র্যাকার ফাটিয়ে হুলুস্থুল করে অন্যপক্ষকে তাড়ানো হল। ওঁরা তখন পাকিস্তানের নাগরিক আইনত। আঞ্জুমান বেগমের সামান্য কিছু জমি ছিল। ছেলেমেয়ে নেই। একা থাকতেন বৃদ্ধা। ডালিম তাঁর ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল।

হৈমন্তী ও পারুর তিক্ততা লক্ষ্য করে একদিন সে নিঃশব্দে আঞ্জুমান বেগমের বাড়িতে গিয়ে উঠল। স্টেশনারি দোকানেও আর যেত না। দেখা হলে পারুর সঙ্গে কথাও বলত না। পারুও না।...

এই সেই বাড়ি। ডালিম এখন সেখানে হৈমন্তীকে নিয়ে ঘর করছে। পরস্ত্রী হৈমন্তী। ডালিম পারুর ঠিকানা যোগাড় করে লিখেছিল, আমার বিবেকে বাধে। পরস্ত্রী নিয়ে লোকে কি ঘর করতে পারে? আমার বড্ড খারাপ লাগে। কিন্তু হৈমন্তী আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমাকে দোষ দিস নে পারু। আমি এখানেই অসহায়। আমি জানি, ও আমার কেউ নয়। আইনত ধর্মত তোর স্ত্রী। অথচ ওকে তাড়াব কেমন করে?

বোতলের শেষটুকু হৈমন্তী কেড়ে নেওয়ার আগেই, ডালিম চোঁ চোঁ করে গিলে ফেলে। তারপর মিটমিট হাসে।—তুই ওকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলি। ওকে কলকাতায় তোর কাছে চলে যেতে ফুসলেছিস বার বার। ও যাবে, না তুই এসে নিয়ে যাবি রে গাড়োল? ও মেয়ে। ও কি যেতে পারে নিজে থেকে? তুই তো ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গিয়েছিলি। এমন কি বাড়িটাও বেচে দিয়েছিলি গোপনে। তারা ওকে উচ্ছেদ করতে এলো। তখন কী করবে ও?

পারু গম্ভীর মুখে বলে, এ কথা বলার জন্যে যদি ডেকে থাকিস, ভুল করেছিস।

ডালিম দুলে দুলে হাসে।—লোকে জানে, তুই পরে ওকে ডিভোর্স করেছিস। সবাই জানে, আমি ওকে বিয়ে করেই রেখেছি। অথচ সব গুল। ধাপ্পা।

পারু বলে, আঃ ডালিম!

ডালিম আরও জোরে হাসতে থাকে। তারপর বলে, কিন্তু এখন এ সবের কোন মানে হয় না। তিনটি শুষ্ক বৃক্ষ। আমরা তো খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি এখন। কারও প্রতি কারও আর এতটুকু মোহ নেই। আমরা প্রত্যেকেই জানি কেউ কারও কাছ থেকে নিঙড়ে কিছু বের করে নিতে পারব না যাতে চিত্ত শীতল হয়।

ক্রমাগত হাসিতে সে অন্ধকার নিষুতি রাত আর এই জীর্ণ বাড়িটাকে তোলপাড় করতে থাকে। হৈমন্তী মুখ নামিয়ে আঙুল খোঁটে।

চিত্ত শীতল হয়। কেমন চমৎকার আমি কথা বলতে পারছি রে, সুশিক্ষিত মানুষের মত! ভদ্রলোকের মত! ডালিমের চোখ দুটো পাগলাটে দেখায়। তার ঠোঁটে লালা চকচক করে। সে বলতে থাকে, বোমার টুকরো লেগে পা-টা গেল। তারপর আমি কী নিয়ে সময় কাটিয়েছি জানিস? শুধু বই। যা পাই, পড়ি। হৈমন্তী আমাকে বই এনে দিয়েছে। শালা ম্যাট্রিকটাও পাস করে মিলিটারিতে যাইনি! এখন আমি বুক অফ নলেজ! আমাদের গ্রেট ফাদার ঠিক যা করতেন। এ আমার দেখে শেখা রে উল্লুক! ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওই শিক্ষিত মহিলাকে আমি ডাক্তার হরনাথ সান্যালের মত জ্ঞান দিই। জিজ্ঞেস কর্! এই হিমি, বল না! বল, তুমি একটা কিছু বল!

হৈমন্তী চুপ করে থাকে। পারু বলে, তুই শুয়ে পড়। রাত হয়েছে।

কভী নেহি। আমিও ঘুমোব না, তোমাদেরও ঘুমোতে দেব না। আমার লাস্ট সাপার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি ক্রুশবিদ্ধ পয়গম্বর ইসা হব। আমার সামনে একটা ক্রুশ পোঁতা হয়েছে।... ডালিম আবার হা-হা করে হেসে ওঠে। তারপর হাসিটা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে আসে। সে বালিশে কপাল রেখে তখনকার মত উপুড় হয়ে শোয়। তার পিঠটা কাঁপতে থাকে। শব্দহীনতার দিকে টেনে নিয়ে গেল সে ওই বিভ্রান্ত হাসিকে, না-কি কান্নায় ডুবিয়ে দিচ্ছে? পারু বুঝতে পারে না। ওর পিঠটা অত কাঁপছে কেন?

পারু ডাকে, ডালিম!

কোন জবাব আসে না। সে হৈমন্তীর দিকে তাকায়। হৈমন্তী উদ্বিগ্ন মুখে উঠে এসে ওকে ওঠাবার চেষ্টা করলে ডালিম চাপা গলায় গর্জায়, আঃ, আমার ঘুম পাচ্ছে! বিরক্ত করো না।

হৈমন্তী বলে, ঘুমোবে তো ভাল করে শোও। বিছানা ঠিক করে দিই।

ডালিম অস্ফুটস্বরে বলে, ঠিক আছে। ঘুমোবে—যাও!

হৈমন্তী পারুর দিকে তাকায়। পারু বলে, থাক। তখন হৈমন্তী উঠে গিয়ে টেবিলের পাশে জানলার কাছে দাঁড়ায়। একটু পরে পারু ডাকে, হৈমন্তী!

উঁ?

ঘুম পাচ্ছে না তোমার?

না।

পারু খুকখুক করে হাসে। গত রাতের মতই নেশা হয়েছে তার। বলে, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি...

হৈমন্তীকে হঠাৎ তার দিকে ঘুরতে দেখে সে থামে। হৈমন্তী ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, তুমি এলে এলে, ও সব কথা না তুললেই কি চলত না?

পারু বিব্রত হয়।—আমি কোথায় তুললুম? ও নিজে থেকেই তুলল।

আমি তো বাধা দিচ্ছিলুম।

তুমিই তুলেছ। মনে করে দেখ।

আহা! সে তো ফর্টিনাইনের ব্যাপার। একেবারে ছেলেবেলার।

জানো না, শেকড় টানলে গাছটাই উপড়ে যায়?

পারু চুপ করে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে, তাহলে আসার আমারই উচিত ছিল না। তাই না?

হ্যাঁ।

উচিত ছিল না? পারু উঠে বসে।

না।

তুমি বলছ, আসা ঠিক হয়নি?

বলছি। কবর খুঁড়ে এখন যা পাচ্ছ, তা তো জ্যান্ত মানুষ নয় পারু!

যাক। খুশি হলুম যে তোমার চোখে এখনও জল আসে।

আমি কাঁদিনি।

তুমি কী হৈমন্তী! এতটুকু বদলাওনি! এতটুকু অনুতপ্ত নও! যেমন ছিলে ঠিক তাই আছ!

হৈমন্তী হিস হিস করে বলে, থামো। আমার নিজের কী হওয়া বা না-হওয়া, কী করা বা না-করা উচিত, সে আমি জানি। তুমি নিজের কথাটা ভাবো।

আমিও কি আগের মতই আছি? পারু তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়।—ভুল করো না হৈমন্তী। যদি আগের মত থাকতুম, এসেই বলতুম, যেহেতু ধর্মত আইনত তুমি আমার স্ত্রী, সেই হেতু তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

লজ্জা করে না বলতে? লজ্জা করেনি এত চিঠি লিখতে? বীরেশ্বর-বাবুর ভয়ে রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলে বউকে ফেলে? হৈমন্তী তীব্র অথচ চাপা স্বরে কথাগুলো বলে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপে। দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। একটু পরে পাশের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হয়। দরজা বন্ধ করার শব্দ হয়। তারপর আবার স্তব্ধতা। কতক্ষণ স্তব্ধতা।

পারু ডালিমকে ডাকে, এই! ডালিম!

ডালিম পাশ ফিরে গড়িয়ে পড়ে। বিড়বিড় করে কিছু বলে। প্রচণ্ড নেশা হয়েছে হয়তো। নাকি উত্তেজনার পর ক্লান্তির সঙ্গে হুইস্কির নেশাটা মিলে মিশে ওকে ঘুমের অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিশ্চেতনার পাতালে নিয়ে চলেছে! ওর ঠোঁটটা কাঁপছে। পারু তবু বলে, চলি রে!

তারপর বাবার ছবির সামনে গিয়ে প্রণাম করে। ঘড়ি দেখে। রাত তিনটে। সে খাটের বাজু থেকে প্যান্ট-শার্টটা টেনে নেয়। সুটকেসে ভরে। তারপর হেরিকেনের পলতেটা কমিয়ে দেয়। দরজা খোলা রেখে বেরিয়ে আসে

জিনিসপত্র নিয়ে। হৈমন্তীর দরজার সামনে গিয়ে ডাকে—হৈমন্তী!

কোন সাড়া আসে না।

সে ফের ডাকে—হৈমন্তী! আমি চলে যাচ্ছি।

তবু কোন সাড়া নেই।

হৈমন্তীর উদ্দেশে মনে মনে পারু বলে, তোমার বোঝা উচিত ছিল হৈমন্তী, এত দিন পরে এ বয়েসে আমি আর কোন দাবী নিয়েও আসি নি, কিংবা তোমাদের সঙ্গে ঝামেলা করতেও আসিনি। এসেছিলুম যে ভাবে লোকেরা একদিন ছেড়ে যাওয়া পৈতৃক বাস্তুভিটে দেখতে আসে। তার বেশি কিছু নয়, হৈমন্তী। তাছাড়া তুমি তো জানো, আমার ছেলেবেলাটা ডালিমের সঙ্গে একাকার। ওর কাছ থেকে আমার অংশটুকু কেড়ে নিতে এসে দেখি, তুমি সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। একেবারে দরজা আটকে আছ। তাই ভেতরে ঢোকা হল না। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখে গেলুম।

তখন কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে। মীর্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ওপর হলদে জ্যোৎস্না পড়েছে। সাঁকো পেরিয়ে রাস্তায় এসে পারু একবার ঘোরে। পোড়ো দোতলা বাড়িটার দিকে তাকায়। ওপরে জানলায় হ্যারিকেনের আলো ভৌতিক মনে হয়। যেন কোন একচোখা ভয়ঙ্কর প্রেত তার চলে যাওয়া দেখছে। ওই প্রেতের নামই তো স্মৃতি।

তারপর একটু চমকায় পারু। আগাছা আর স্তূপের মধ্যিখানে সরু রাস্তাটার ওপর কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। চোখের ভুল ভেবে সে পা বাড়ায়।

স্টেশনের প্লাটফর্মের শেষদিকে একটা খালি বেঞ্চে বসে পড়ে পারু। ফেরার ট্রেন কখন জানে না—হয়তো ভোরের দিকে। নিঝুম স্টেশনের বাতিগুলো এখন ঘুম-ঘুম দেখাচ্ছে। সামনে ফিকে জ্যোৎস্নায় ঢাকা মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় অন্তহীন গোরস্থান, আর সেখানেও ঘুমের আচ্ছন্নতা। বস্তুতঃ এখন এই শেষরাতে ঘুমে শরীরকে যেন ধুয়ে মুছে নতুন করে তোলার আয়োজন চলেছে প্রকৃতিতে—কারণ সকালে আবার সংঘর্ষময় জীবনযাত্রা শুরু হবে।

পারু যদি এখন ঘুমোতে পারত! তার মধ্যে কী এক রাক্ষুসে জাগরণ তোলপাড় হচ্ছে। আর গ্লানি, লজ্জা, ক্ষোভ। এতদিন পরে হঠাৎ কেন এভাবে হুট করে এখানে এসে হাজির হল সে?

এতক্ষণে বুঝতে পারছে, ডালিম তাকে শাস্তি দিতেই ডেকেছিল।

ডালিম তার সামনে একটা পুরনো আয়না দাঁড় করিয়ে দিল, যাতে পারু নিজের চেহারা পুরোপুরি দেখতে বাধ্য হল। এমন করে নিজেকে তো কখনও দেখেনি পারু। নিজের বোকামি, ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা কদর্য ক্ষতের মতো ফুটে উঠল আয়নার মধ্যে।...

যতবার এসব কথা ভাবলো সে, ততবার তার পিঠে যেন চাবুক পড়ল। পারুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চুল খামচে ধরে শূন্যদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। হৈমন্তী আর ডালিমের মূর্তি ক্রমশ বিশাল হতে হতে তার দৃষ্টির শূন্যতা ভরাট করে তুললে অসহায় পারু ভাবল, যদি এখন সে শেষরাতের কোনও হঠকারী ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত!

পারবে না। সে সাহস কিংবা ক্ষমতাও তার নেই। সে বড় লোভী। সে তাই হ্যাংলার মতো জীবনের আনাচেকানাচে লুকোচুরি খেলে যেটুকু বাগাতে পেরেছে বাগিয়ে নিয়েছে। কুকুর, কুকুর একটা!

কিছুক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর সে সিগারেট জ্বালে। সুটকেসটা বেঞ্চে রেখে সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে। সেই সময় তার চোখে পড়ে, স্টেশনের বারান্দা দিয়ে হনহন করে কে এদিকে আসছে। আলো-আঁধারি জায়গাটা পেরিয়ে খোলা প্ল্যাটফর্মের ল্যাম্পপোস্টের তলায় আসতেই পারু চিনতে পারে, হৈমন্তী!

সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেল, নিজের মধ্যে হঠাৎ অমানুষিক ধরনের একটা রদবদল ঘটে যাচ্ছে।

তাহলে মির্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপে সত্যি সত্যি হৈমন্তীকেই তখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সে বেরিয়ে আসার পরই হৈমন্তী তাকে অনুসরণ করেছিল। তারপর হয়তো কিছু ভেবে থমকে দাঁড়িয়েছিল। হৈমন্তী যে অমন করে তাকে মুখোমুখি আঘাত দিল, অথচ তার নিজের কি আঘাত পাওনা নেই? পারু না হয়ে অন্য কেউ হলে তো পাল্টা আঘাত দিতে পিছপা হত না—কিংবা এমন করে তক্ষুনি পালিয়েও আসত না। কারণ হৈমন্তী যা করেছে, তা কোন মেয়ে কি করতে পারত? স্বামী ফেলে গেছে বলেই স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর মতো থাকা! পারুর ঠোঁটের কোণায় বিদ্রূপ ফুটে ওঠে। সে তৈরী হতে থাকে মুহূর্তে মুহূর্তে। হৈমন্তী এখন তার কাছে যে জন্যেই আসুক, পারু তাকে এবার সহজে ছেড়ে দেবে না।

পারু সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অপেক্ষা করে। হৈমন্তী অত দ্রুত আসছে, অথচ মনে হয় একটা যুগ কেটে গেল। দম বন্ধ করে পারু তাকিয়ে থাকে। আর হৈমন্তীর খোঁপাভাঙা চুলের পুরনো গন্ধটাও যেন সে টের পায়, টের পায় তার শ্বাসপ্রশ্বাসের সেই চেনা ঘ্রাণ, এই শেষরাতের নিস্পন্দ নির্জন প্ল্যাটফর্মে আবার যেন স্মৃতির কোণায় পড়ে থাকা এক টুকরো রেশমী রুমাল জ্যোৎস্নার হঠকারিতায় উড়ে আসে তার দিকে। পারু বুঝতে পারে, আবার

সে হ্যাংলা হয়ে যাচ্ছে। অথচ হৈমন্তীকে এমন করে আর বাগে পাওয়া যাবে না—আঘাত দেবার এমন সুযোগও আর এ জীবনে আসবে না। হৈমন্তী সামনে এসে দাঁড়ালে সে খুব গম্ভীর এবং বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলতে চেষ্টা করে—কী? কিন্তু তার স্বরভঙ্গ হয়। শ্লেষ্মায় জড়িয়ে যায় এই দীর্ণ প্রশ্ন ঃ কী?

হৈমন্তী হাঁফাচ্ছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পারু। অনুভূতি, বোধ, স্নায়ুকেন্দ্র—সব কিছু এখন এত তীব্র পারুর! তার প্রতি রোমকূপে এখন যেন একটা করে ইন্দ্রিয়। পারু ফের স্খলিত স্বরে বলে—আবার কী?

হৈমন্তী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে আস্তে বলে—ভুলে গিয়েছিলুম ...তোমার কিছু জিনিসপত্র আমার কাছে থেকে গেছে। ওগুলো তোমার নিয়ে যাওয়া উচিত।

—জিনিসপত্র? যেন আচম্‌কা বুকের মধ্যে কী একটা ঘটে যায় পারুর। কয়েক মুহূর্ত সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

হৈমন্তী বলে—হ্যাঁ। ওগুলো তুমি নিয়ে যাও। কেন আমার কাছে ফেলে রাখবে! তাছাড়া...হয়তো ওগুলোর মধ্যে তোমাদের ফ্যামিলির পুরনো এবং দরকারী অনেক কিছু থাকতে পারে।

পারুর সব উত্তেজনা একটা ভারি নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। খুব ক্লান্তভাবে সে বলে—হ্যাঁ। আমিও ভুলে গিয়েছিলুম। তোমাকে ধন্যবাদ হৈমন্তী। বলে সে একটু হাসবার চেষ্টা করে।...মনে পড়ছে মায়ের কিছু গয়নাগাঁটিও ছিল ওর মধ্যে।

হৈমন্তী যেন চমকে ওঠে। বলে—গয়না ছিল নাকি?

—ছিল মনে পড়ছে। কেন? তোমাকেও তো দেখিয়েছিলুম। পরতেও বলতুম। তুমি পরোনি।

হৈমন্তী আস্তে বলে—কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, তুমি ওগুলো নিয়ে গিয়েছিলে!

—না। নিয়ে যাই নি। মনে ছিল না।

হৈমন্তী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর একটু ব্যস্ততার ভঙ্গীতে বলে—তাহলে এস। গয়নাগাঁটির কথা শুনে আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। অনেক আগেই তোমার তাহলে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কই, ওঠ!

পারু মাথা নেড়ে বলে—থাক্ না। পরে এক সময় নিয়ে যাব'খন।

হৈমন্তী জেদের স্বরে বলে—না।

—কেন? বেশ তো আছে তোমার কাছে। তাছাড়া এখন ফিরে গেলে ডালিম আমাকে আটকাবে।

—ও নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেই নটার আগে ওর ঘুম ভাঙবে না।

তুমি এস।

—তুমি হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন হৈমন্তী?

হৈমন্তীর গলা কাঁপে যেন। সে চাপা স্বরে বলে—এখনই দেখা দরকার, গয়নাগুলো আছে নাকি! আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে।

পারু হাসে একটু।—থাকবে না তো যাবে কোথায়? তুমি মেরে দেবার মেয়ে তো নও। তাছাড়া মায়ের বাক্সটার চাবিও নেই। কবে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি!

এবার হৈমন্তী প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে ওঠে—পারু! লক্ষ্মীটি, জীবনে এই শেষবার তোমাকে অনুরোধ করছি, এস আমার সঙ্গে। এ আমার জীবন-মরণ প্রশ্ন, তুমি জানো না।

পারু অবাক হয়ে বলে—কেন বলো তো?

হৈমন্তী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্নাজড়ানো গলায় বলে—আমার ধারণা, হয়তো গয়নাগুলো নেই...হয়তো...

—হয়তো মানে?

—ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। ওকে তো তুমি জানো পারু।

—ও, ডালিম!...বলে পারু স্যুটকেস এবং ফোলিও ব্যাগটা বেঞ্চ থেকে তুলে নেয়। তারপর পা বাড়িয়ে একটু হেসে ফের বলে—তাই বলে তোমার অত কান্নাকাটির কোন দরকার নেই। যদি সত্যি ডালিম ওগুলো লুকিয়ে বেচে থাকে, আমি কিচ্ছু মনে করবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো হৈমন্তী। আমি তো স্ত্রীলোক নই। গয়নার ব্যাপারে আমার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই।

হৈমন্তী তার আগে হাঁটতে হাঁটতে বলে—তাহলেও তোমার মায়ের স্মৃতি!

—হ্যাঁ, স্মৃতি। কিন্তু সম্পূর্ণ স্মৃতিহীন হয়ে থাকাই আমার পক্ষে নিরাপদ নয় কি হৈমন্তী?

হৈমন্তী কোন জবাব দেয় না। তার চলার ভঙ্গীতে বিপন্ন মানুষের ঊর্ধ্বশ্বাস গতি আছে। ঘুমন্ত মানুষগুলো ডিঙিয়ে সে হনহন করে চলতে থাকে। পারু অনিচ্ছার মধ্যে তাকে অনুসরণ করে। আর বার বার তার মনে হয়, এই হৈমন্তী—ডালিমের কাছ থেকে দূরে চলে আসা হৈমন্তী কি স্বপ্নের, না বাস্তবের? আবার কী এক লোভ জেগে ওঠে মনে। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে ওকে। বলতে ইচ্ছে করে, ক্ষমা করো...ক্ষমা করো...ক্ষমা করো। আর হাঁটু ভাঁজ করে স্মৃতির দিকে করজোড়ে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে।

রাস্তায় নেমে পারু ডাকে—হৈমন্তী!

—উঁ!

—তুমি যদি ভেবে থাকো গয়নাগুলো আছে না নেই, তাই দেখার জন্যে ফিরে যাচ্ছি—তাহলে খুব ভুল করবে কিন্তু। ডালিম ওগুলো বেচে দিয়ে

থাকলেও আমি ওকে ক্ষমা করব।

হৈমন্তী বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলে—জানি। বন্ধুর জন্যে তুমি সব পারো। কত স্যাক্রিফাইস করেছ, সে কি জানি না!

—জানো বুঝি?

—কেন জানব না? একদিন বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েই তো চলে গিয়েছিলে।

পারু একটু হাসে।—হ্যাঁ। এমন কি নিজের স্ত্রীকে ফেলেই।

—ও কথা থাক।

—থাকবে কেন হৈমন্তী! এভাবে যখন সুযোগ দিয়েছ, আমি তার সদ্ব্যবহার করব না, তা কি হয়?

হৈমন্তী ঝাঁঝালো স্বরে বলে—সে সাহস তোমার আছে?

—আছে।

—শুনে ভাল লাগল। কিন্তু বিশ্বাস করব না।

—কেন বিশ্বাস করবে না?

হৈমন্তী ঘুরে দাঁড়ায়। বলে—তোমার এতটুকু সাহস থাকলে আমাকে ডিভোর্স করতে।

পারু একটু দমে যায়। নিস্তেজ স্বরে বলে—তুমিও ডিভোর্স চাইতে পারতে আদালতে! চাওনি কেন?

—তোমার বন্ধুকে জিগ্যেস কোরো।

—তোমার কথা ওকে জিগ্যেস করতে যাব কেন?

হৈমন্তী কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যায়। তারপর বলে—তোমার বন্ধু আমাকে নিষেধ করেছিল। এতে নাকি তোমার নামে অনেক মিথ্যা বদনাম দাঁড় করাতে হবে।

পারু শুকনো হাসে। তারপর বলে—কী আসে যায় এসব মামুলী ব্যাপারে? আমি তো তোমাকে বস্তুত ডিভোর্স করেই চলে গিয়েছিলুম। আইন-আদালতের কোন মানে হয় না। মানুষের মন—তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেটাই আসল কথা। তাছাড়া তুমি তো জানোই আমার ওসব কোন সংস্কারের বালাই নেই। আমি হাড়ে হাড়ে জড়বাদী। পার্টি ছেড়েছিলুম, কিন্তু ফিলসফিটা ছাড়িনি। এবং সম্ভবত তোমারও তেমন কোন সংস্কার নেই। থাকলে...

কথা শেষ করে না পারু। হৈমন্তী যেতে যেতে একবার ঘুরে ওকে দেখে নেয়। তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস মিশিয়ে বলে—আমিও ওসব মানি নে। সবটাই ভণ্ডামি।

পারু না বলে পারে না—তাহলে সিঁদুর পরো যে?

—হয়তো অভ্যাস। হয়তো সৌন্দর্যের খাতিরে। তাছাড়া—তাছাড়া তোমার বন্ধুর তাগিদেও।

—হ্যাঁ, জানি তুমি ওকে কী ভালবাসো!

—ভীষণ বাসি।

—আমার তাতে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা হচ্ছে না হৈমন্তী।

—অবাক করলে পারু। তোমার ঈর্ষার কথা কেন ভাবতে যাব?

পারু হঠাৎ ফুঁসে ওঠে।—এসব কথা থাক। মুখ তেতো হয়ে যায় এতে।...বলে সে ফোলিও ব্যাগটা বগলে চেপে রেখে সিগারেট বের করে। একটু থেমে বাতাস বাঁচিয়ে এক হাতেই দেশলাই জেবলে ধরিয়ে নেয়। ততক্ষণে হৈমন্তী কয়েক হাত এগিয়ে গেছে।

শেষরাতের নির্জন রাস্তায় আর বর্ণহীন জ্যোৎস্নায় হৈমন্তী আবার অনেকটা দূরে সরে গেছে যেন। অগত্যা পারু সেই ঝাল নিজের ওপর ঝাড়ে। —কী, খালি সারাটা রাত আজ ঝগড়াই করে যাচ্ছি! কোন মানে হয় না।

ডাইনে পীরতলা, বাঁয়ে সেই কাঠের সাঁকো। হৈমন্তী এতক্ষণে পিছু ফিরে পারু আসছে নাকি হয়তো তাই দেখে নেয়। পারু এখনও অনেকটা দূরে। পরস্পরের কাছে পরস্পর অস্পষ্ট, প্রতিভাসের মতো। তারপর হৈমন্তী বাঁয়ে ঘুরে কাঠের সাঁকোয় ওঠে এবং দাঁড়ায়। চারপাশে গাছপালায় এতক্ষণে একটা দুটো করে পাখিদের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। কুয়াসাও ঘন হয়েছে। রাস্তার বাতিগুলো আরও ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। গুরুতর নিস্তব্ধতার ওপর ওইসব পাখি নখের আঁচড় কাটছে এবং তাদেরও কী অসহায় লাগে এখন!

কয়েকটা লম্বা আর জোরালো পদক্ষেপে পারু এসে পেঁছয়। যেন আচমকা ভূতের ভয়ে তাড়া খেয়ে মানুষের সঙ্গ নিল।

হৈমন্তী আবার হাঁটতে থাকে। মির্জাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তায় তার দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া দেখে পারুর অস্বস্তি হয়। সে স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসছে না তো? স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে শুয়ে হয়তো এখনও হৈমন্তী-ডালিম পলাশপুরে বৃত্তের মধ্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

বাস্তবতা পরখ করার জন্যে সে হাতের আধপোড়া জ্বলন্ত সিগারেটটায় জোরে টান দিল। গলা জ্বালা করে কাশি এল। খুব শব্দ করে সে কাশল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে এগোল।...

উঠোনে দাঁড়িয়ে পারু ডাকবে ভাবছিল। তার আগেই ওপরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলো এবং হৈমন্তীকে দেখতে পায় সে। চাপা গলায় হৈমন্তী বলে—এস। আলো দেখাচ্ছি সিঁড়িতে।

এখন আর আলোর দরকার ছিল না। উঠোনে ভোরের ফরসা রঙ ফুটেছে। ওপরের বারান্দার অন্ধকার আর অন্ধকার নয়, বরং ওই আলোটাই অন্ধকারের বেশি মনে হচ্ছে। হৈমন্তী এখন স্পষ্ট। অবশ্য সিঁড়িটা ভাঙাচোরা এবং তার কাছেই রাতের অন্ধকার একটুখানি আটকে আছে। উঠতে উঠতে পারুর মনে হয়,

একটা পুরনো বনেদী বাড়ির মধ্যে দুজনে কী সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! ওপরের ঘরে ডালিম গৃহকর্তার মতো ঘুমিয়ে আছে। আর এই ভাবে একটা ডাকাতি চলছে যেন। পারু তাই ইচ্ছে করেই একটু কাশে। কিন্তু হৈমন্তী ফিসফিস করে সিঁড়ির ওপর থেকে কী যেন বলে! হয়তো সতর্কতার সংকেত করে সে।

পারু মেনে নেয়। সত্যি তো, ডালিম জেগে গেলে তাকে যেতে দেবে না।

ওপরের প্রথম ঘরটায়, যে ঘরে তখন হৈমন্তী ঢুকে দরজা বন্ধ করে ছিল, পারু ঢুকে পড়ে—চোর যে ভাবে ঢোকে। পারু ঘরের ভিতরটা দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। একটু অবাকও হয়। কোণার দিকে ঠিক পাশের ঘরের মতোই একটা মস্ত সেকেলে খাট রয়েছে। তাতে যে বিছানা পাতা আছে, দেখেই বোঝা যায়, সাময়িক নয়। তার মানে আজ পারু এসেছিল বলেই হৈমন্তী এ ঘরে এ বিছানা পেতে শুতে আসেনি। এবং সেই বিছানায় বিকেলে দেখা সেই বাচ্চা মেয়েটি একপাশে কুঁকড়ে শুয়ে আছে।

হৈমন্তী যে এ ঘরেই থাকে, তার অনেক প্রমাণ পারুর চোখে পড়ছিল। পারু বিছানার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলে—ও কি তোমার কাছেই থাকে নাকি?

হৈমন্তী আলোটা খাটের ধারে মেঝেয় নামিয়ে বলে—হুঁ। তারপর হাঁটু মেঝেয় রেখে গুঁড়ি মেরে খাটের তলায় হাত বাড়ায়। অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলে।

পারু বলে—উঁ?

হৈমন্তী জবাব দেয় না। সে খুব সাবধানে একটা বাক্স টানছে। ঘষা খেয়ে শব্দ হলেই থামছে। পারুর কিছুতেই মনে পড়ছে না বাক্স কটা ছিল, কী রঙের বাক্স এবং কত বড়, কিংবা আরও কী সব ছিল। না—তেমন বেশি কিছু ছিল না। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর অনেক জিনিস সে পার্টির দুঃস্থ কমরেডদের বিলিয়ে দিয়েছিল। মায়ের শাড়িগুলো পর্যন্ত। বাবার ওভারকোটটা কাকে যেন দিয়েছিল? হুঁ, অনুকূল বাউরীকে। কারণ সে মাঠে শীতের রাতে ফসল পাহারা দিয়ে বেড়াত। বলেছিল, বড্ড শীত লাগে বাবা। বুড়োমানুষ! ওভার-কোটটা গোড়ালি অব্দি হয়েছিল অনুকূলের। সেই নিয়ে ওকে লোকেরা কী জ্বালাতন না করত!

পারুর মুহূর্তে-মুহূর্তে মনে পড়তে থাকে একটা ভরাট সাজানো সংসার কী ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে সে নিজেকে যথার্থ আদর্শবাদী কম্যুনিস্ট ভেবে গর্ববোধ করত। কাঁসা-পেতলের জিনিসগুলো বেচে বিড়ি-শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় সাহায্য করেছিল। টেবিল চেয়ার ওষুধের আলমারি—সব আসবাব দিনে দিনে ওভাবেই একটার পর একটা ঘুচিয়ে দিয়েছিল। কী বিশাল করে তুলেছিল

তখন মনের পরিধি! তুলনায় বসলে এখন নিজের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বড় ভয়ঙ্কর লাগে। কার্ল মার্কসের সিলেক্টেড ওয়ার্কসের প্রথম পাতায় লেখা দেখেছিলঃ 'বিশ্বের শ্রমিকরা এক হও!' তাকে রোমাঞ্চিত করেছিল, দুলিয়ে দিয়েছিল ওই বাক্যটি। এখন এ মুহূর্তে যদি কেউ পাতাটা তার সামনে খুলে ধরে, সে আর পড়তেই পারবে না। হরফ আর ভাষার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র কবে নিজেই গুঁড়ো করে সরে গেছে অন্যখানে—যেখানে বিশ্ব, শ্রমিক, এক হওয়া-মানুষ এইসব শব্দ শৃঙ্খলাহীন পারম্পর্যভ্রষ্ট আঁকজোক মাত্র।

—দুটো বাক্স রেখে গিয়েছিলে। মনে আছে তো?

হৈমন্তী ফিসফিসিয়ে ওঠে এবং পারু চমকায়। বাক্স? হৈমন্তী যেভাবে দুটো প্রকাণ্ড বাক্স বের করেছে, পারু পলকে বুঝতে পারে তার আসার পরই কাজটা অনেকখানি এগিয়ে রাখা হয়েছিল। হুঁ, হৈমন্তী সাংসারিক ব্যাপারে মোটামুটি পরিপাটি। হাতের কাছে কখন কী যুগিয়ে রাখা দরকার সে জানে। হায় রে বরাত হৈমন্তীর! সে পারু এবং ডালিমের মতো বাউণ্ডুলে বিবেকহীন নীতিহীন লোকের পাল্লায় পড়ে নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিল! একেই কি বলে 'অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর?'

—দুটো ছিল না?

হৈমন্তী আবার বলে। পারু বাক্স দুটোর দিকে তাকায়। কিন্তু অন্য কথা এসে যায় তার মুখে।—তুমি এ ঘরে থাকো? সে বলে। কিন্তু হৈমন্তীর মুখের দিকে দৃষ্টি ঘোরায় না।

তার কথার জবাব হৈমন্তী দেয় না। সে একে একে দুটো তালা টেনে পরখ করে। তারপর বলে—দেখ তো এ তালা দুটো তোমার নাকি?

বলার সময় সে পারুর দিকে মুখ তুললে পারু একটু অবাক হয়। এ কি রাতজাগা ক্লান্ত কোটরগত চোখ, নাকি কিসের দীর্ণ চাপা চিৎকার ওই চোখের দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করে উঠেছে? পারু বলে—কেন?

—দুটো তালাই...হৈমন্তী ঢোঁক গিলে একটু সময় নিয়ে বলে ফের—দুটো তালাই মনে হচ্ছে নতুন! অত লক্ষ্য করিনি তখন!

হৈমন্তী মেঝেয় বসে পড়ে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলে—তাতে কী হয়েছে! ডালিম হয়তো ভেবেছিল, পুরনো মরচে ধরা সেকেলে তালার চেয়ে...

হৈমন্তী তাকে বাধা দিয়ে বলে—কিন্তু এ তো আমাকেই চোর সাজানো! বলেই সে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে বদলে যায়। তার মুখ দাউ-দাউ জ্বলে। শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে যায় বুঝি। নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে কাঁপে। সে তক্ষুনি উঠে দাঁড়ায়। পারু তার পায়ের কাছে কাপড় খামচে ধরে আটকাতে চায়। কিন্তু পারে না। হৈমন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায়—এই শেষ বোঝাপড়া!

তার মানে? এ যেন মগ্নচৈতন্যের ভাষা—স্বপ্নের মধ্যে বলে ওঠা। কার

সংগে বোঝাপড়া, কিসের বোঝাপড়া পারু জানে না। সে কান পেতে থাকে, পাশের ঘরে কী ঘটতে পারে ভেবেই। আহা, খামোকা এই হুলুস্থুলের কোন মানে হয়? বেচারা ডালিমকে ঘুম থেকে উঠিয়ে হয়তো চেঁচামেচি করবে হৈমন্তী। কী ফল হবে তাতে? সত্যি বলতে কি, পুরনো জীবন-সংক্রান্ত কোন কিছুতে পারুর এতটুকু টান নেই। কোন মায়া সেই। পস্তানি নেই। হৈমন্তীর এটা বুঝতে আজও দেরি হবে কেন?

নাকি এভাবে এতদিন পরে এসে হাজির হয়েছে বলে হৈমন্তী ভেবেছে, পুরনো অধিকারের দাবি পারুর পকেটে লুকোনো রয়েছে? এ বয়সেও হৈমন্তী কেন তা ভাববে? কী আছে ভেবেছে নিজের—যাতে পারুর মতো মানুষকে ভোলানো যায়?

পাশের ঘরে আবছা শব্দ আর ডাকাডাকি চলছে কানে এল। তখন পারু ওঠে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। তার সুটকেস আর ফোলিও ব্যাগটা মেঝেয় পড়ে থাকে।

প্রথমে সে বারান্দায় যায়। এ ঘরের হ্যারিকেনটা কি নিভে গেছে? অস্পষ্ট হয়ে আছে ভেতরটা। অথচ বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে। পাখপাখালির চেঁচামেচি তুমুল হয়ে উঠছে। তারপর দূরে সম্ভবত চালকলে ভোঁ বেজে উঠল। পলাশপুরের ঘুম ভাঙছে। স্টেশন রোডের দিকে মোটরগাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এতক্ষণ পরে রেল লাইনের ইঞ্জিনের হুইশিলও বাজল। যা কিছু গ্রাস করে নিয়েছিল রাতের প্রকৃতি, এখন সব উগরে দিচ্ছে একে একে। কী এক অদ্ভুত রাত না কেটে গেল!

হৈমন্তী ডালিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কি? পারুর তাই মনে হয়। খাটের উপর ঝুঁকে হৈমন্তী অস্পষ্ট স্বরে কী বলছে আর ওকে টানছে সম্ভবত। পারু ঘরে ঢুকে বলে—আঃ, কী হচ্ছে হৈমন্তী!

হৈমন্তী অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—জানোয়ার! নির্লজ্জ! ঘুমের ভান করে পড়ে আছ এখনও? আজ আমার শেষ বোঝাপড়া জানো না? ওঠ, ওঠ বলছি। তারপর সে হিংস্র হাতে খাটের অন্যপ্রান্ত থেকে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা ডালিমের একটা পা হিড়হিড় করে টানে। কিন্তু ডালিমকে এতটুকু নড়াতে পারে না।

ডালিমের মুখ একপাশে কাত হয়ে আছে। বালিশটা বুকের তলায়। একটা হাত খাটের বাজুতে—বাজুটা আঁকড়ে ধরে আছে যেন। অন্য হাত দুমড়ে বুকের তলায়। তার মাথার ওপাশে জানলার ওপরদিকটা খোলা। তাই আলো এসে পড়েছে কিছু অংশে। পারু রাগ করে বলে—ভীষণ বাড়াবাড়ি করছ হৈমন্তী!

হৈমন্তী ঝাঁঝালো স্বরে বলে—এ তুমি বুঝবে না।

—বুঝিয়ে বলারও কিছু নেই। তোমার চেয়ে আমি বেশি চিনি ওকে।

—কেন ও পরের বাক্স ভাঙবে? ওকে তো এতটুকু অভাব বুঝতে দিইনি! ...হৈমন্তী মুখ নীচু করে। তার কথায় কান্নার আভাস। সে ফের বলে—নিরুর হাত দিয়েই এসব করেছে। আসুক বাঁদরটা!

—কে নিরু?

—তুমি চিনবে না। ওর এক চেলা।

পারুর মনে পড়ল, কাল বিকেলে এ ঘরে ঢোকবার সময় ডালিম নিরুকে ডাকাডাকি করছিল। পারু একটু হাসে এবার।—কিন্তু এ জন্যে বাড়াবাড়ি করার কারণ নেই। এমনও তো হতে পারে, গয়নার কথা আমি বানিয়েই বলছি।

হৈমন্তী জোরে মাথা দোলায়।—না। আমার মনে পড়ছে, মাসখানেক আগে নিরুর সঙ্গে ও স্যাঁকরা-স্যাঁকরা করছিল। তারপর থেকে দেখতুম মাঝেমাঝে নিরু একটা করে বিলিতি মদের বোতল এনে দিচ্ছে। এখন সব বুঝতে পারছি।

পারু ফের হেসে উড়িয়ে দিতে চায়।—বেশ তো! মাতাল ছেলেরা মায়ের গয়নাগাঁটি বেচে এমন করেই থাকে। তুমি তো জানো, আমার মা ডালিমেরও মা ছিলেন। অতএব, ওসব ভুলে যাও। বরং এক কাজ করো। যখন ফিরেই এলুম এবং একটা বিরাট রাত এভাবে কাটানো গেল, এখন চা খাইয়ে দাও লক্ষ্মী মেয়ের মতো। কেমন? আর হৈমন্তী, আবার বলছি, আমার মনে এতটুকু মোহ নেই—কোন গ্লানি নেই। থাকবে কেন বলো তো? আমি বরাবর সংস্কার-জয়ী মানুষ। এ আমার পৈতৃক দান। এবং তুমি তো এও জানো, মার্কসবাদ একসময় আমাকে বিস্তর ছেঁদো ধারণা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। আমি...

বক্তৃতা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পারু থামে। ফের বলে—যাক্ গে। মাথার ভেতরটা খালি লাগছে। কথা বলছি, কিন্তু বুক কাঁপছে। আমি খুব ক্লান্ত হৈমন্তী। তুমি দয়া করে এক কাপ চা খাইয়ে দাও। দেবে না?

হৈমন্তী তবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই আলু-থালু চুল এবং বিশৃঙ্খল বেশ, তার দুই চোখ কোটরগত, কপালের ভাঁজ, আর অগোচরে বুকের একটা পাশ থেকে শাড়ি সরে গিয়ে খুবই ফিকে সবুজে রঙের ব্লাউজ শিথিল একটি স্তনের আভাস তুলে ধরেছে, পারুকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে হৈমন্তীর সেই চেনা শরীরটাকেই। এবং পারু টের পেয়েই দৃষ্টি সরায়। ফের বলে—প্লীজ হৈমন্তী!

নারীর কোন গভীরতর ইন্দ্রিয় আছে, যাতে পুরুষের শরীরখোঁজা দৃষ্টি কী ভাবে টের পেয়ে যায়। হৈমন্তী শাড়ি টেনে বুক ঢেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

পারু বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে উত্তরের জানলার ধারে সেই চেয়ারটায় বসে। শরীরে আর এতটুকু জোর নেই যেন। মাথা ঘুরছে। কী যে একটা বিশ্রী রাত

কেটে গেল! হুঁ, হৈমন্তীর সঙ্গে তার পরিচয়ের শুরু থেকে বরাবর তাই গেছে। হৈমন্তীর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরও নিষ্কৃতি পেতে তিনটে বছর লেগেছিল। তারপর সব সহজ হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। আঃ, ঠিক এমনি করে কত রাত সে হৈমন্তীর সঙ্গে ঝগড়া করে পুইয়ে দিয়েছে! 'ফ্রেন্ডস স্টেশনার্সে'র ঘুপটি ঘরে পালিয়ে গিয়েও তো বাঁচোয়া ছিল না। ঝগড়া চলত মনে মনে। স্টেশন বাজারের প্রতিটি ভোরে কী সব শব্দ ক্রমশ শোনা যাবে, মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। ফেরার পথে দোকানটা একবার দেখে যাওয়া উচিত। শুনেছিল, ঘর ভেঙে নন্দীরা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স করেছে। বাজারটা নাকি চেনাই যাবে না আর, এত বদলেছে।

ঘরে এখন আরও আলো। পারু খাটের দিকে তাকায়। ডালিম বরাবর ঘুমকাতুরে ছিল। কুম্ভকর্ণের তাকলাগানো ঘুম। চিমটি কেটে কাতুকুতু দিয়ে অনেক চেষ্টার পর তার ঘুম ভাঙানো যেত। হরনাথ ওকে মর্নিং স্কুলের সময় অদ্ভুত কায়দায় ওঠাতেন। দেশলাই কাঠি জেবলে পুড়িয়ে কালো হবার পর স্ফুলিঙ্গ থাকতে থাকতে সেটা ওর পায়ের আঙুলের ফাঁকে আটকে দিতেন। এবার স্ফুলিঙ্গের উল্টো গতি। পোড়া কাঠি ফের জ্বলতে জ্বলতে নামত এবং মোক্ষম ছ্যাঁকা খেয়ে ডালিম লাফ দিতে বসত। হরনাথ হা হা করে হাসতেন। কিন্তু স্কুলে গিয়ে ক্লাসে বসে-বসেই ফের একদফা ঘুমিয়ে নিত ডালিম। মনে পড়ছে, হৈমন্তীর বাবা মধুবাবু ওর চুল খামচে মুণ্ডু সোজা করছেন এবং ছেড়ে দিলেই ডালিমের মুণ্ডু আবার ডেস্কে হেলে পড়ছে। ক্লাসসুদ্ধ হাসছে মুখ টিপে। মধুবাবু ওকে-দু-চোখে দেখতে পারতেন না। মাথা জোরে ঠুকে দিয়ে বিকট গর্জন করতেন। এত জোরে যে পাশের ক্লাসগুলোর সব শব্দ থেমে যেত কিছুক্ষণ। একদিন হেডমাস্টার মশাইও অফিস থেকে দৌড়ে এসেছিলেন।...

হুঁ, ডালিমের এটা বরাবর অভ্যাস। ওবাড়িতে থাকার সময় হৈমন্তীকেও ডালিমের চা নিয়ে ওর মাথার কাছে সাধাসাধি করতে দেখেছে। রাগ হত পারুর। কিন্তু হৈমন্তী কি তাকে কোনদিনও গ্রাহ্য করত? পারু যদি বলত—আহা, ঘুমোক না! উঠে চা খাবে'খন। হৈমন্তী বলত—আমার আর তো কোন কাজ নেই! রান্না নামিয়ে আবার কেটলি চাপাব হাজারবার।

—তাহলে এক কাজ করো। ফ্লাস্কে রেখে দাও।

—ফ্লাস্কের চা খায় নাকি তোমার ফ্রেন্ড? সেদিন উবুড় করে ফেলে দিল, দেখলে না? চা নাকি কালো হয়ে যায়!

যায়। পারু দেখেছে। অতএব কী আর বলবে? বিশেষ করে ডালিমকে সেও তো কম পাত্তা দিত না! ডালিম না এলে পলাশপুরে টিঁকতে পারত না পারু। ডালিমকে পেয়ে তার সাহস বেড়ে গিয়েছিল। জানত তার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে লোকেরা যতই দূরে দূরে কটূক্তি করুক, তার ক্ষতি করার ক্ষমতা আর হবে না। ডালিম ছিল তার রক্ষাকর্তা।

এবং ঠিক একই কারণে হৈমন্তীর অনেক আচরণ মেনে নিত পারু। ডালিমের প্রতি তার উৎসাহ, তার সহানুভূতি আর আগ্রহকে মনে মনে সইতে না পারলেও বস্তুত সইতে হত।

কিন্তু তাই বলে ডালিমের বিরুদ্ধে কেন যেন কোন অভিযোগই দাঁড় করাতে পারেনি পারু। তার কোন দোষ চোখে পড়ত না পারুর। বরং কিছুক্ষণ ডালিমকে না দেখতে পেলে পারুর খুব খারাপ লাগত। নিঃসঙ্গ মনে হত নিজেকে। কোথাও ডালিমের গলা শুনতে পেলেই সে খুশি হত।

এ কি তার মনের কোন গূঢ় আতঙ্কেরই প্রকাশ, ডালিম সম্পর্কে? নাকি নিছক অভ্যাস? এই যে এতকাল পরে ডালিমের মুখোমুখি হয়ে তার এতটুকু খারাপ লাগেনি, বরং আবেগময় একটা বিহ্বলতা এসেছিল—এবং অন্তত দু-একটা দিন তার কাছে কাটাতেও খারাপ লাগবে না—তা কি সেই ভয়, নাকি অভ্যাস, নাকি কৃতজ্ঞতাবোধ?

তার চেয়ে বড় কথা হৈমন্তী এবং ডালিমের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক পারু মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়েই ফিরে এসেছে। কোন ক্ষোভ নেই, কোন অভি-যোগ নেই—একটু-আধটু অস্বস্তি আর জ্বালা থাকতে পারে বড় জোর। সেটা নিজেরই মামুলী ব্যাপার নিয়ে—পুরুষত্ব-টুরুষত্ব যাকে বলে, তাই নিয়েই। তার বেশি কিছু নয়।

পারু নড়ে বসে। থাক্, বৃথা বিশ্লেষণ এবং অনুসন্ধানের চেষ্টা। এসবের জন্যে সে এখানে ফিরে আসেনি। হয়তো এসেছে নিছক কৌতূহলেই। খুনী যেমন করে হত্যাকাণ্ডের জায়গায় ফিরে আসে—যে নিয়মে তাকে আসতেই হয়, সেই রকম আসা।

কিংবা এসেছে নিছক পৈতৃক বাস্তুভিটা দেখতে আসার মতো—তখন হৈমন্তীর বন্ধ দরজার সামনে ঠিক যে কথাগুলো মনে মনে বলেছিল, এখন আসছে আর আসছে। পারু চেঁচিয়ে বলে—ডালিম! আমি পারু।...

...ডালিম গলির ওমাথা থেকে বেরিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মুখে কেমন ক্রূর হাসি। আর হাতে ওটা কী মস্ত একটা ছোরা। পারু পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কী ভিড়, গিজগিজ করছে লোকজন! পারু চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করে—বাঁচাও! ও আমাকে খুন করবে। লোকেরা নির্বিকার হয়ে রাস্তা হাঁটছে—কিংবা পারুকে ঘিরে আছে। ডালিম এগিয়ে আসছে আর আসছে। পারু চেঁচিয়ে বলে—ডালিম! আমি পারু।...

—চা।

পারু তাকায়। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে। হৈমন্তী চায়ের কাপ প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে এখন প্রচুর আলো। হুঁ, সে স্বপ্ন দেখছিল। চেয়ারে এলিয়ে পড়া শরীরকে টেনে তোলে সে। একটু হাসে। তারপর হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ প্লেট নেয়। এবং সেই সময় তার মনে হয়,

হৈমন্তী যেন তার কাঁধে হাতও রেখেছিল—একটু ঠেলেছিল। কাঁধের সেই জায়গাটা কয়েক সেকেণ্ড আগের অনুভূতি আরও কয়েক সেকেণ্ড বয়ে নিয়ে এসেছে মস্তিষ্কের দিকে। পারু কাপে চুমুক দিয়ে খুশি হয়ে বলে—অসাধারণ! কিন্তু ওকে এবার হয়তো জাগানো যায়। একা চা খাওয়া উচিত হচ্ছে কি?

হৈমন্তী ততক্ষণে ঘরে একবার ডালিমকে দেখে নিয়েছে। বলে—যখন উঠবে, খাবে। তুমি চা খেয়ে আমার ঘরে এসো। তোমার বাক্স দুটো খোলা দরকার।

—থাক না। পরে হবে। চা খেয়ে আমি কিছুক্ষণ ঘুমোতে চাই।

—বেশ তো। পরে ঘুমিও। আগে দেখে নেবে জিনিসগুলো। হয়তো তালা ভাঙতে হবে। আমি একটা হাতুড়ি খুঁজে আনছি।

হৈমন্তী ঘরে পা বাড়ালে পারু ডাকে—শোন।

—বলো। স্থির চোখে তাকায় হৈমন্তী। নির্বিকার মুখ। ঠোঁটের কোণে পুরনো দৃঢ়তার ভাঁজটা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে যৌবনের মধ্যসীমা ছুঁয়ে।

পারু বলে—একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম, জানো! ভাবা যায় না। কিন্তু অবাক লাগছে, এমন স্বপ্ন তো এতকাল একটিবারও দেখিনি। স্বপ্নটা...

—পরে বলো। আসছি।

—না, শুনে যাও। পারু দ্রুত বলে।...একটা গলির মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছে। পলাশপুরে নিশ্চয় নয়। এমন গলি তো এখানে ছিল না। তো দেখছি, ডালিম...হাসতে হাসতে পারু বলে—ডালিমটা করেছে কি হাতে একটা ইয়া বড় ছোরা নিয়ে আমাকে তাড়া করেছে। আমি ভীষণ কান্নাকাটি করছি। কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছ? এই চেয়ারে বসে কখন ঘুমিয়ে গেছি—আর একটা মারাত্মক স্বপ্ন!

শেষ বাক্য বলার আগেই হৈমন্তী চলে যায়। বাইরে তার গলা শোনা যায় একটু পরে। সেই মেয়েটি ঘুম থেকে উঠেছে এতক্ষণে। তাকেই কিছু বলছে। পারু হাসিমুখে চা শেষ করে। কাপ প্লেটটা মেঝেয় একপাশে সাবধানে রাখে। তারপর পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে সিগারেট বের করে। ধরিয়ে টানতে থাকে। ডালিমের দিকে তাকায়। কী ঘুমোতে পারে এ বয়সেও! একই ভাবে উবুড় হয়ে পড়ে আছে। বাইরে এখন প্রথম রোদের হাল্কা গোলাপী ছটা খেলছে।

একটু পরে হৈমন্তী বারান্দা থেকে তাকে ডাকে—এস। হাতুড়ি পেয়েছি।

—ভাঙার কী দরকার? পারু অনিচ্ছাসত্ত্বে ওঠে। ফের বলে—তালা দুটো নতুন হলে চাবি ডালিমের কাছেই থাকার কথা। ও উঠুক না। তাছাড়া তালা খামোকা ভেঙে ফেলে আবার তো আমাকে পয়সা খরচ করে কিনতে হবে!

হৈমন্তী এ কথায় একটু দ্বিধায় পড়েছে। সে ঠোঁট কামড়ে একপলক ভেবে বলে—ও কি সেটা স্বীকার করবে?

পারু হেসে বলে—স্বীকার না করে তো তখন ভাঙব বরং। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওর ঘুম ভাঙুক।

হৈমন্তী মাথা নেড়ে বলে—না। তুমি দেখ, ওকে ওঠাতে পারো নাকি!

—বুঝলুম, তুমি দ্রুত আমাকে বিদায় করতে চাইছ, এই তো? পারু হাসিমুখে বলে। আমিও তাতে ভীষণ রাজী। তবে আমার ফ্রেণ্ড আমাকে সহজে ছাড়বে না কিন্তু। বিশেষ করে তার সঙ্গে আমার কথা বলা এখনও শেষ হয়নি। তোমার বরাতে এখনও কষ্টভোগ আছে হৈমন্তী।

বলে পারু অবিকল ছেলেবেলার ভঙ্গীতে ঘুমন্ত ডালিমের দিকে ঘোরে। মুখটেপা হাসি। পকেট থেকে দেশলাই বের করে হৈমন্তীর দিকে চোখ টিপে ঠোঁটে আঙুল রাখে। দেশলাই জেবলে কাঠিটা অনেকখানি পোড়ায়। তারপর হরনাথের মতো স্ফুলিঙ্গ থাকতে থাকতে পোড়া কাঠিটা ওর পায়ের আঙুলের ফাঁকে আটকে দেয়। পাজামা অনেকটা-সরে ডালিমের অক্ষত ওই পায়ের রোমশ ডিমটা দেখা যাচ্ছে। দেহের ওপর অংশে তখনও অস্পষ্ট অন্ধকারের রঙ ছড়িয়ে আছে।

স্ফুলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে পারু। ঠোঁটের কোণায় দুষ্টুমির হাসি।

বারান্দায় হৈমন্তী স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি নির্বিকার মুখ।

স্ফুলিঙ্গ বড় ধীরে নামছে। পারু দুটো হাত দু পাশে তুলে ডানা মেলার ভঙ্গীতে তুলে রেখেছে। ছ্যাঁকা লেগে ডালিম ছেলেবেলার মতোই লাফিয়ে উঠলে সে হাতদুটো তুলে ধেই ধেই করে নাচতে থাকবে, এই ইচ্ছে।

স্ফুলিঙ্গ পোড়া কাঠির শেষ সীমায় পেঁছল। তারপর ফুরিয়ে গেল। কিন্তু কিছু ঘটল না।

পারু হতভম্ব হয়ে বলে—অ্যাঁ! তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।—শালার গণ্ডারের চামড়া হয়ে গেছে! অ্যাই ডালিম! সে গলা চড়িয়ে ডাকে। ডালিম! ওঠ্ ব্যাটা! এই কথা ছিল নাকি? ঘরে গেস্ট, আর ব্যাটাচ্ছেলে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে? মাল খাওয়া দেখাচ্ছ! মাল কেউ খায় না! ওঠ্ বলছি!

পারু তার পা ধরে টানে। একটুও নড়াতে পারে না। তারপর তার দৃষ্টি যায় ডালিমের মুখের দিকে এবং সে খাটের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ডালিমের পা তাকে জোরালো শক দেয়। হাত তুলে নিয়ে ফের রাখে। বরফ হয়ে আছে পায়ের ডিমটা।

আর ডালিমের নাকের নিচে রক্তের ছোপ। জমাট বেঁধে আছে একটুখানি রক্ত।

হৈমন্তী বারান্দা থেকে বলে—কী হল?

পারু কোন জবাব না দিয়ে খাটে উঠে যায়। বেশ উঁচু সেকেলে প্রকাণ্ড খাট। ডালিমের বুকের কাছে বসে সে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে চিত করার চেষ্টা করে।

হৈমন্তী এক পা বাড়িয়ে ফের বলে—কী?

পারু জবাব দেয় না। হিংস্রতার যে শক্তি, সেই শক্তি তার মধ্যে ভর করেছে যেন। হাঁটু দুমড়ে বসে অনেক চেষ্টায় ডালিমকে চিত করে শোয়ায়। তারপর দু-হাতে মুখ ঢাকে।

কী বীভৎস দেখাচ্ছে ডালিমের মুখ! চোখের তারা উল্টে রয়েছে। মুখে যন্ত্রণার রেখা আঁকা আছে এখনও। দুই নাকে জমাট রক্ত।

হৈমন্তী ঘরে ঢুকে খাটের ধারে দাঁড়িয়েছে। সেও দেখছে। বুঝতে কি পারছে না? পারু মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয়। তারপর ডালিমের দু চোখের পাতা টেনে বন্ধ করে দেয়। এবং আস্তে আস্তে মাথা কাত করে তার বুকে কান পাতে। তারপর মাথা তুলে ডালিমের ডান হাতের নাড়ি পরখ করে।

হৈমন্তী কাঁপা গলায় এতক্ষণে বলে—কী হয়েছে ওর?

পারু জবাব দেয় না। ডালিমের হাতটা সাবধানে নামিয়ে রাখে। তারপর পশ্চিমের জানলার নীচেটা খুলে দেয়। অনেক আলো আসে ঘরে। সে হৈমন্তীর দিকে তাকায়।

আর হৈমন্তীকে এখন অস্বাভাবিক বয়স্কা দেখাচ্ছে। কিন্তু কেন সে কাঁদছে না? কেন এমন নিঃসাড় এখনও? তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে ডালিমের দিকে। আশ্চর্য নির্বিকার, পাথরের মুখ! পারুর ইচ্ছে করে, ওকে প্রচণ্ড জোরে চড় মারে।

হৈমন্তী খাটের অন্য পাশ ঘুরে ডালিমের মাথার কাছে আসে এবং হাঁটু দুমড়ে বসে একটা বালিশ ডালিমের মাথার তলায় গুঁজে দেয়। তখন পারু নেমে পড়ে খাট থেকে। তার শরীর জুড়ে ছটফটানি চলেছে।

বাইরে বারান্দায় যায়। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করে। দক্ষিণে ঘন গাছপালার আড়ালে পলাশপুরের অনেকটা ঢাকা পড়েছে। রোদ কিছুটা উজ্জ্বল এখন। কিন্তু এ সবই সে স্বপ্নের মধ্যে দেখছে। তাই যেন সব কিছু এত দূরে আর সম্পর্কহীন, এত স্তব্ধ। ডালিম বলেছিল, লাস্ট সাপার খাচ্ছে। সে কি টের পেয়েছিল পারু এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুও কাছে আসছে ক্রমশ? তার পর পারু বুঝতে পারে, তার বুক ঠেলে

কী একটা উঠছে। হ্যাঁ, ভীষণ একটা কান্নার চাপ তাকে নাড়া দিচ্ছে। কিন্তু ছি ছি, কান্না তার শোভা পায় না। সে একজন পরিণত মানুষ। অনেক ঝড়-ঝাপটা খেয়েছে। কোনদিনও তো এমন করে কান্না পায়নি। আর কার জন্যে কাঁদবে সে? মহারাজা, না ডালিমের জন্যে? একজন মস্তান গুণ্ডার জন্যে, না বন্ধুর জন্যে? অথচ তার চোখ ফেটে রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার মতো চুপি চুপি কান্না আসে।

হৈমন্তী তার পিছন দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে টের পায় সে। তারপর তার চেরা গলার ডাক শোনে—মিলু! মিলু! একবার শোন্ তো। নিরু ঠাকুরপোকে ডেকে আন্ তো মা। শিগগির। দৌড়ে যা।

পারু বুঝতে পারে, এ সেই হৈমন্তী। বিপদে-আপদে অবিচল, শক্তিমতী মেয়ে। কিন্তু ওর প্রাণভরা ভালবাসার মানুষটির জন্যেও কি এতটুকু চিড় খাচ্ছে না ওর স্থিরতা? শুধু কণ্ঠস্বরের ঈষৎ কাঁপনেই ওর যা কিছু উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে। তাহলেও ডালিমের জন্যেই তার এমন করে পলাশপুরে থাকা, এত কাণ্ড—অথচ সেই ডালিমের মৃত্যুতে ওর এমন নির্বিকার আচরণ! পারু গভীর দুঃখে মনে মনে বলে—ধিক হৈমন্তী! তুমি কী? শুনেছি, বেশ্যারাও তাদের বাবুর মৃত্যুতে সিঁদুর মোছে, শাঁখা নোয়া ভাঙে, বিলাপে ভেঙে পড়ে। হৈমন্তী, তোমার মন বলে কোন বস্তু তাহলে নেই। তুমি একটা রোবোট। ডালিম তোমাকে চেনেনি। আমি ঠিকই চিনেছিলুম। তাই তুমি কত চিঠি লিখে আমার সাধ্যসাধনা করেছ—আমি সাড়া দিইনি। পাছে তুমি আমার কাছে চলে আসবে, তাই ঠিকানা বদলেছিলাম। দেখছি, তোমাকে ঘৃণা করে কোন ভুল করিনি।

এই সময় সিঁড়ির দিক থেকে হৈমন্তীর আওয়াজ আসে—পারু! তুমি ওঘরে গিয়ে থাকো না একটু। আমি এক্ষুনি আসছি।

কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূরের এবং ক্রমশ একটু রোগাটে মানুষের মতো হয়ে উঠছে। ঈষৎ চিড় খাওয়া—কাঁপন খুব স্পষ্ট হচ্ছে। পারু নাক ঝেড়ে ভাঙা স্বরে বলে—যাচ্ছি। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক এবং চোখ মুছে নেয়। আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে ঢোকে।

আর এ ঘর এখন মৃতের। এর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ ছড়ানো মনে হয়। খাটে মহারাজা, নাকি ডালিমই চিত হয়ে শুয়ে আছে। নাকের রক্তটা আর নেই। মুছিয়ে দিয়েছে হৈমন্তী। কী বিশাল আর সুন্দর আর বয়স্ক দেখাচ্ছে মৃতদেহটা! একপাশে বেহালা আর ছড় পড়ে আছে। গেলাসটাও কাত হয়ে আছে ওদিকে। হঠাৎ দম আটকে গিয়েছিল হয়তো। হার্টের অসুখের কথা বলছিল হৈমন্তী। তাই স্বাভাবিক।

পারুর এবার গা ছমছম করে। জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই জীর্ণ বাড়িটা ক্রমশ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। বাইরে উজ্জ্বল রোদ, অথচ দেয়ালের

ফাটল, ইটের দাঁত বের করে থাকা, আর জানলার ওপরদিকটায় ঘাসের উঁকি দেওয়া, সব মিলিয়ে একটা ভূতুড়ে অস্বস্তিকর ভাব। আর হৈমন্তী তাকে এ ঘরে থাকতে বলে গেল, তার মানে—মৃতের কাছে জীবিতদের পাহারা দেওয়াই নাকি নিয়ম, যতক্ষণ না শেষকৃত্য হয়। এ একটা সংস্কার নিশ্চয়, কিন্তু এ মুহূর্তে সে সংস্কারের কী সত্য আছে। পারু টের পাচ্ছে। আনাচে-কানাচে অশরীরী কারা এসে দাঁড়িয়ে আছে কি? কাল থেকে যারা সারাক্ষণ ওৎ পেতে থেকেছে, এখন তারা একটু একটু করে রূপ নিচ্ছে।

এই অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে পারু। সিগারেট ধরায়। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা চোখের সামনে নিভে যেতে দেখে পুরনো অভ্যাসে মনে মনে বলে—মৃত্যু তো ঠিক এরকমই। আবার কী! অথচ অস্বস্তি তাকে আঁকড়ে আছে। খালি মনে হচ্ছে, যদি ডালিমের মরা শরীরটা হঠাৎ উঠে তার দিকে তাকায় এবং হাসে!

বাইরে কারা কথা বলতে বলতে আসছে মনে হল। পারু উত্তরের জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। আমগাছের ওপাশে হৈমন্তী আর একটা যুবক হন্তদন্ত আসছে। তারা বাড়ির ওপাশে অদৃশ্য হলে সেই বাচ্চা মেয়েটি এবং তার পেছনে আরও কারা সব আসছে দেখা গেল। পারু সরে এসে চেয়ারে বসে। এতক্ষণে তার মনে হয়, ডালিমের শেষকৃত্য কী ভাবে হবে? কবরে, নাকি শ্মশানে? ওর স্বজাতি বেদে সম্প্রদায় অবশ্য কবরেই মৃতের সদ্গতি করে। কিন্তু পলাশপুরে তো বেদেরা নেই। কে কোথায় চলে গেছে। তাহলে?

হৈমন্তীদের পায়ের শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। তারপর শব্দটা জোরালো হয়ে ওঠে। সেই যুবকটি প্রায় লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে ভাঙা গলায় কেঁদে ওঠে—মহারাজদা! তারপর সে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। হৈমন্তী তার কাঁধে হাত রেখে তীব্র স্বরে বলে—নিরু! নিরু! এই নিরু! ছিঃ, কাঁদে না। লক্ষ্মী ভাইটি, কথা শোন।

যুবকটি একটু শান্ত হয়। পারুর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কান্না-জড়ানো গলায় বলে—আপনার অপেক্ষায় ছিল মহারাজদা। আপনি এলেন, আর চলে গেল। জানেন, প্রায় বলত আপনার কথা! হাসপাতালে থাকার সময় খালি আপনার নাম করত।

হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে জানলার কাছে যায়। আপন মনে বলে—ভদ্রলোকের যা গরজ, আসবেন কি না কে জানে! নিরু, তুমি নিজে গেলেই ভাল হত।

নিরু নামে যুবকটি চোখ মুছে হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে যেন। বলে—ওর বাপ আসবে। না এলে আর পলাশপুরে গাড়ি হাঁকাতে হবে না। মহারাজা গেছে, মহারাজার ভাইরা এখনও যায় নি।

হুঁ, এই ধরনের ছেলেরা একদিন পারুর সঙ্গে পার্টি করত। পারুর মনে পড়ে যায়। এই নিরুকেও তার খুব চেনা লাগে। কিন্তু কিছুই মনে

করতে পারছে না। সে শুধু বলে—কে? কে আসবে?

জবাব হৈমন্তী দেয়। খুব আস্তে বলে—হাসপাতালের ডাক্তার ভদ্রলোক।

তাহলে কি হৈমন্তী এখনও ডালিমের মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি? এখনও আশা করছে কিছু? পারু ব্যস্তভাবে বলে—হ্যাঁ, ডাক্তারের কথাটা আমার মাথায় আসেনি। তা ইয়ে...অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা যায় না?

হৈমন্তী অন্যদিকে ঘুরে আছে। তেমনি শান্ত গলায় বলে—না। সেজন্যে নয়, একটা ডেথ সার্টিফিকেট দরকার হবে।

—ও! পারু চুপ করে থাকে।

আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। পারু বুঝতে পারে পলাশপুরে ডালিম হয়তো তত নিঃসঙ্গ ছিল না।...

কতকগুলো ভাসাভাসা অস্পষ্ট দৃশ্য অথবা ঘটনার মধ্যে আঁকুপাঁকু করছিল পারু। স্মৃতি এবং বিস্মৃতির মধ্যিখানে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তারপর সে নিজের শরীর ফিরে পেল। তাকাল। বুঝল কোথায় শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ডালিম মারা গেছে। তখন উঠে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু মাথার ভেতরটা ফাঁকা লাগল। দুর্বলতা তাকে টেনে আবার শুইয়ে দিল।

এই সময় কেউ বলল—কেমন বোধ করছেন দাদা?

পারু তাকায়।

হৈমন্তীর সেই ঘরে শুয়ে আছে কেন সে? খাটের কোণায় নিরুর বয়সী একটি ছেলে বসে আছে। সে ফের বলে—চুপচাপ শুয়ে থাকুন। ঠিক হয়ে যাবে।

পারু বলে—তুমি কে ভাই?

—আমি? চিনবেন না। ছেলেটি একটু হাসে। সেই এতটুকুন দেখেছেন। আমার বাবাকে হয়তো চিনবেন।

—কে তোমার বাবা?

—মনিরুল মিয়া। স্টেশন বাজারে দর্জির দোকান ছিল। আমার নাম আতিকুল। বাবা তো কবে মারা গেছে...

—হুঁ। পারু ওকে থামিয়ে দিয়ে ফের ওঠার চেষ্টা করে। মাথা ঘুরছে কেন? বিরক্ত হয়ে বলে সে।

আতিকুল বলে—মাথা ঘুরেই তো পড়ে গিয়েছিলেন। ভাগ্যিস রেলিং ছিল।

—তাই বুঝি? কিচ্ছু মনে পড়ছে না!

—ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখে গেলেন। ওই দেখুন, ওষুধ দিয়েছেন। আমি নিয়ে এসেছি।

ছেলেটির কথাবার্তা ভারি মিষ্টি। একটু লাজুক যেন। মেয়েলী দৃষ্টি।

চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলতে পারছে না। পারু বলে—বল কী! ওদিকে ওই বিপদ, আর আমি...ভ্যাট্! কোন মানে হয় না।

আতিকুল বলে—আপনার ঘড়ির কাচ ভেঙে গেছে। হাত কেটে রক্ত পড়ছিল।

পারু বাঁ হাত তুলে কয়েকটা টুকরো প্লাস্টার দেখতে পায়। বলে—কী মুশকিল!

—আপনি এবার ওষুধটা খেয়ে নিন দাদা।

—খাচ্ছি। কটা বাজছে বলো তো?

—সাড়ে দশটা প্রায়।

পারু বালিশে মাথা কাত করে দরজার বাইরে শুধু একটুকরো নীল আকাশ দেখতে পায়। পাশের ঘরে কোন শব্দ নেই। বারান্দাও ফাঁকা। কেউ যাতায়াত করছে না। নীচে কারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। আর বাড়িটার পেছনদিকে কোথায় খট খট শব্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ শব্দটা শোনার পর সে জিজ্ঞেস করে—ও কিসের শব্দ?

—খাটুলি বানাচ্ছে। বাঁশ কাটা হচ্ছে।

—ও।...বলে পারু চুপ করে। এতক্ষণে যেন এই বালিশটাতে হৈমন্তীর চুলের গন্ধ।

—লাস নামানো হয়েছে নীচে। চান করিয়ে দিচ্ছে।...বলে আতিকুল উঠে যায়। বারান্দায় গিয়ে রেলিঙে ঝুঁকে ব্যাপারটা দেখে এসে ফের জানায়—কাফন পরানো হয়ে গেছে।

পারু আস্তে আস্তে বলে—কারা এসব করছে বলো তো?

আতিকুল একটু হাসে।—কেন? মহারাজা-ভাইয়ের কি লোকের অভাব?

—কিন্তু তোমাদের সমাজের তো ধার ধারত না ও!

—আজকাল কে ধারে? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর আতিকুল ফের বলে—কত লোকের কত উপকার করেছে, তারা এসময় না এসে পারে দাদা? বলুন না?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

—গণ্যমান্য মিয়াসাবরা না এলেই বা! দেখবেন, কত ভিড় হবে গোরস্থানে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোক আসবে দেখবেন। খবর চলে গেছে মুখে মুখে।

পারু হৈমন্তীকে মনে মনে খুঁজতে থাকে। কী ভাবে ওর কথা একে জিজ্ঞেস করবে ভেবে পায় না। 'তোমাদের বউদি' বলবে—নাকি 'তোমাদের মহারাজা ভাইয়ের স্ত্রী' বলবে? শুধু 'ও কোথায়' বললে কি আতিকুল বুঝবে? পারু অনেক দোনামোনার পর একটু কেশে বলে—ইয়ে, হৈমন্তী কোথায় জানো আতিকুল?

—মানে হিমি ভাবীর কথা বলছেন?

হঠাৎ অকারণ রাগে এবং দুঃখে গা জ্বলে যায় পারুর। হিমি ভাবী! কী ভেবেছে এরা? তারপরই দপ করে নিভে যায় সে। কেন এই হঠকারী আবেগ? সে হাসবার চেষ্টা করে বলে—তোমরা হিমি ভাবী বলো বুঝি?

—হ্যাঁ।

বাঁকা ঠোঁটে পারু বলে—তোমাদের এই ভাবীজী কী জাত জানো তো?

আতিকুল মুখ নামিয়ে বলে—আপনাদের স্বজাতি।

—আর কী জানো?

আতিকুল তার দিকে তাকিয়েই মুখ নামায় ফের। পারু টের পায় তার প্রশ্নটা খামোকা রূঢ় হয়ে গেছে। সে নিজেকে সামলে নেয়। তারপর বলে—ওকে একবার ডেকে দেবে?

—দিচ্ছি। বলে আতিকুল উঠে যায়। সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে পারু আবার ওঠার চেষ্টা করে এবং জেদের বশেই ওঠে। শরীর প্রচণ্ড দুর্বল মনে হয়। সে খাটের মাথার দিকে হেলান দিয়ে বসে থাকে। দেয়ালে চোখ পড়ে। একটু অবাক হয়। গা ছমছম করে ওঠে। এ ঘরটার পড়ো-পড়ো অবস্থা একেবারে। অজস্র ফাটল। পলেস্তারা সামান্যই টিকে আছে। আর ছাদের দিকে তাকিয়ে সে আরও চমকায়। ঠিক পায়ের দিকটায় একটা কড়িকাঠ ভেঙে রয়েছে। সেখানে একটা মোটা বাঁশের খুঁটি। এই ঘরে কী ভাবে কাটায় হৈমন্তী? কেন কাটায়? কতদিন ধরে সে ডালিমের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে না?

পরক্ষণে পারুর মুখে বিকৃতি ফুটে ওঠে। ন্যাকামি এবং লোকদেখানো সতীপনা ছাড়া আর কী!

কিংবা আসলে ডালিমই তাকে এভাবে দূরে ঠেলে দিয়েছে কবে থেকে!

এই কয়েকটা মিনিট সে ভুলে গিয়েছিল ডালিমের মৃত্যুর কথা। তারপর মনে পড়ে। এবং দুঃখিত মনে ভাবে, এতে হয়তো ডালিমের আত্মার অপমান হল। এখন এসব কথা তার উচিত নয়। ডালিমের জন্যে আবার তার কষ্ট হতে থাকে। চোখে জল এসে যায়। কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত চোখ মুছে ফেলে।

হৈমন্তী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলে—কেমন বোধ করছ এখন?

পারু মাথা নাড়ে। বলে—ভাল।

—ওষুধটা খেয়েছ?

—ওষুধ কী হবে! তুমি একটু বসো হৈমন্তী।

হৈমন্তীর মধ্যে এখন আরও তীব্র রূপান্তর দেখতে পাচ্ছে পারু। কান্না না, শোক না। অবিচল গাম্ভীর্য এবং প্রশান্তির শক্ত খোলসে ঢাকা ওর ঋজু

শরীর। হৈমন্তী ভেতরে ঢুকে একটু তফাতে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে। তারপর পারুর দিকে বড় দুটো চোখ রেখে বলে—ওষুধটা দেব?

—থাক।...পারু পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেট হাতড়ায়।

হৈমন্তী বলে—কিছুক্ষণ পরে সিগারেট খেয়ো বরং। আর শোন, স্নান করে নিও। ডেডবডি নিয়ে যাক, তারপর মিলুকে বলব জল এনে দেবে।

ডেডবডি! পারু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এখন ডালিম ওর কাছে একটা ডেডবডি!

হৈমন্তী অন্য দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বলে—ডাকছিলে কেন?

—মনে পড়ছে না। তুমি একটু বসো হৈমন্তী।...পারু সিগারেটের প্যাকেটটা এতক্ষণে বের করে। কিন্তু ধরাবার চেষ্টা করে না। প্যাকেট মুঠোয় ধরা থাকে।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর হৈমন্তী বলে—কী ভাবছ?

—তোমার কথা।

—কেন?

—এবার তুমি কী করবে?

—কী করব মানে? যা করছি, তাই করব।

—ও! তুমি তো একটা চাকরিবাকরি করছ।

—তাহলে জিজ্ঞেস করছ কেন?

পারু তার দিকে ঝুঁকে আসে একটু।—কিন্তু ডালিমের জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে না কেন হৈমন্তী?

—কিসের কষ্ট?

—কিসের! পারু সিগারেটের প্যাকেটটা আচমকা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেয়। এক মুহূর্তের হঠকারিতা শুধু। তারপর খুব নিস্তেজ ভঙ্গীতে বলে—কাকে কী বলছি!

হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ভাঙা গলায় আস্তে বলে—তুমি এতদিন পরে কার ওপর ঝাল ঝাড়তে এসেছ পারু? তুমি...তুমি এত বোকা হয়ে আছ এখনও? আশ্চর্য! আমি সত্যি ভাবিনি। এতটুকু ভাবিনি।

—কী ভাবনি?

—তুমি পুরনো ব্যাপার নিয়ে এখনও বেঁচে আছো, ভাবতেই পারিনি।

—পাশ কাটিয়ে যেও না হৈমন্তী। আমার প্রশ্ন অন্যখানে।

—তোমার বন্ধুর জন্যে শোক প্রকাশ করছিলে কেন, এই কি তোমার প্রশ্ন? ...হৈমন্তী এখন যেন আরও সংযত হয়ে উঠল। ঠাণ্ডা গলায় ফের বলে সে—তাতে কী আসে যায় তোমার? তুমি বোকার মতো আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছ বুঝি? পরীক্ষা কেন দিতে যাব তোমার কাছে?

তারপর সে ওঠে। পারু হাত বাড়িয়ে তাকে আটকাতে যায়। বলে—প্লীজ, বসো হৈমন্তী। আমার অনেক কথা আছে।

—অনেক কথা এতদিন ছিল না পারু?

—ছিল। আমার তৈরী হতে সময় লেগেছে।

—খুব বেশি সময় লেগে গেছে। প্রায় এক যুগেরও বেশি। কাজেই ওসব থাক।...বলে হৈমন্তী দু পা এগিয়ে একবার থামে। ঘুরে ফের বলে—তোমার বোঝা উচিত, এখনও বাড়ি থেকে একটা মৃত্যুর গন্ধ মুছে যায়নি!

পারু বলে—হ্যাঁ, ক্ষমা করো। আমার মাথাটা খালি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—আসছি। ততক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকো।

শেষ কথাটা হৈমন্তীর মুখে যেন মানাল না। আপোস কিংবা বোঝাপড়ার কথা ওটা। কী যেন গভীরতর মোহের উদ্রেক করে। পারু চোখ বুজে থাকে। হৈমন্তীর পায়ের শব্দ নীচে মিলিয়ে যায়। বাইরে কারা একসঙ্গে গম্ভীর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। হয়তো ডালিমের লাস এখনই গোরস্থানে নিয়ে যাচ্ছে।...

পনেরটা বছর খুব সামান্য সময় নয়। হৈমন্তী বলে গেল, প্রায় এক যুগেরও বেশি। মাত্র একটা দিনে কিংবা একটা ঘণ্টাতেই কত সব অদলবদল ঘটে যায়! ঘটে কত জীবন্মৃত্যু, উত্থানপতন, তুমুল বিপ্লব! আর পনের বছর পরে এসে পনের বছর আগের একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজা খুলে পারু ঢুকে পড়েছে হঠকারিতায়। এমন করে পিছু হটে এসে কী খুঁজতে চেয়েছিল সে? খুঁটিয়ে তদন্ত করতে এসেছিল? হৈমন্তীর দুর্বোধ্য অংশটুকুতে পরিণত বয়সের প্রাজ্ঞতা এবং বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণের আলোকপাত করার ইচ্ছে ছিল?

তাহলে কী দেখল? আরও দুর্বোধ্যতা জমেছে হৈমন্তীর। কিংবা বলা যায়, বরাবরকার দুষ্টুমি দিয়ে ডালিমই হৈমন্তীর ওপর কী এক ঘন কুয়াশা ছড়িয়ে দিল—নিজেরই মৃত্যু দিয়ে গুরুতর অস্পষ্টতার দেয়াল দাঁড় করাল! এপারে পারু যে-দূরে সেই দূরেই রয়ে গেল। ডালিম বরাবর এমনি স্বভাবের মানুষ। ওর মধ্যেকার সেই দুর্ধর্ষ মহারাজাকে মাঝেমাঝে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছে গোখরো সাপের মতো, পটভূমি ও পারিপার্শ্বকে বিষাক্ত করেছে। আসলে ওর পূর্বপুরুষের সাপুড়ে স্বভাবটা ওর রক্তে ছিল।

কতক্ষণ পরে পারু হৈমন্তীর খাট থেকে নেমে দাঁড়ায়। মেঝেয় বাক্স দুটো এখনও তেমনি রাখা আছে দেখতে পায়। বাক্স খুলে দেখার জন্যে একটু চঞ্চলতা আসে তার। কিন্তু চঞ্চলতাটুকু চেপে আস্তে আস্তে দরজার দিকে পা বাড়ায়। দুর্বলতা আছে এখনও, তবে মাথাঘোরাটা আর নেই। হঠাৎ মনে হয়, তাহলে হুইস্কিটাই কি যত কাণ্ডের মূলে? বিষাক্ত কিছু ছিল না তো ওটার মধ্যে?

অবশ্য এখন আর তা জানার কোন উপায় নেই। সে খুব সামান্য খেয়েছিল মনে পড়ছে। প্রায় সবটাই সাবাড় করেছিল ডালিম। হয়তো...

আঁতকে ওঠে পারু। ভাগ্যিস ওর লাস পোস্টমর্টেমে যায়নি! তাহলে পারুকেই বিপদে পড়তে হত। বারান্দায় গিয়ে সে রেলিংয়ের খুব কাছে যেতে ভয় পায়। পাছে আবার মাথা ঘুরে পড়ে যায় তখনকার মতো। সে এবার হুইস্কিটার ভালমন্দ নিয়ে ভাবনায় পড়ে। তাহলে কি সে নিজের অজান্তে ডালিমকে মৃত্যু উপহার দিতে এসেছিল? তার পা দুটো কাঁপে। উরু ভারি হয়ে ওঠে। বুক ঢিপঢিপ করে। এতক্ষণ ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবেনি। সত্যি তো, হার্টের রুগীর পক্ষে ওই হুইস্কিটাই মারাত্মক হওয়ার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পারু বাড়িটা লক্ষ্য করে। ভীষণ চুপচাপ হয়ে আছে। হৈমন্তী কোথায় আছে কে জানে! সে নিশ্চয় গোরস্থানে যায়নি। পারু পাশের ঘরটার দিকে তাকায়। দরজায় তালা ঝুলছে। খোলা থাকলে সে হুইস্কির বোতলটা কোথাও ফেলে দিয়ে আসত।

পরক্ষণে সে ভাবে, এসব পাগলামি ছাড়া আর কী! এবং সিঁড়ির দিকে সাবধানে এগিয়ে যায়। দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

নীচের বারান্দা থেকে উঠোন জলে কাদা হয়ে আছে। কেউ নেই। বারান্দার ওপাশে বেড়াঘেরা কিচেনে একটা বেড়াল চুপচাপ বসে আছে। পারু কাদা বাঁচিয়ে খিড়কির দরজার দিকে যায়।

দুধারে আগাছা আর ইটের স্তূপের মধ্যে সরু রাস্তা দিয়ে সে অন্যমনস্ক-ভাবে এগোতে থাকে। বড় রাস্তার কাছে কাঠের সাঁকোয় হৈমন্তী একা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে কী করছে সে? পারু একটু ইতস্তত করে। তারপর পা বাড়ায়।

হৈমন্তী ঘুরে তাকে দেখে। পারু বলে—কী করছ এখানে?

—কিছু না। তুমি চলে এলে কেন?

—চুপচাপ কতক্ষণ থাকব? পারু একটু বিরতির পর ফের বলে—এখন ফেরার ট্রেন আছে জানো?

—অসংখ্য ট্রেন আছে।

—আমি এবার বরং চলে যাই হৈমন্তী! আমার...আমার খুব অসহ্য লাগছে।

—নিশ্চয় লাগবে। কিন্তু স্নানটা করে নাও। আর তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি মিলুদের বাড়ি।

পারু লক্ষ্য করে, হৈমন্তী স্নান করে নিয়েছে কখন। খুব ফিকে নীল একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। কাল এসে সিঁথিতে যে ঘষাখাওয়া সিঁদুরের ছোপ দেখেছিল, তা এখন অস্পষ্ট—কিন্তু মুছে ফেলেনি, তাও বোঝা যায়। শুধু একটা

তফাত, কপালে টিপটা নেই। কানে দুল দুটো আছে। হাতে কাঁকনও আছে। শাঁখানোয়া কাল এসে দেখেনি পারু। আশাও করেনি। কিন্তু তার এই সদ্য-স্নাত মূর্তিতে যেন আবছা সন্ন্যাসিনীর আদল ফুটে উঠেছে। হৈমন্তী যেন টের পায় পারু তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। হয়তো তাই বলে ওঠে—চলো, স্নানের যোগাড় করে দিই। এবং সে সাঁকো থেকে নেমে আসে।

উজ্জ্বল রোদে প্রচণ্ড তাপ আছে। পারু ঘামছিল। কাছেই একটা নীচু গাছের ছায়ায় সরে গিয়ে সে বলে—ইয়ে, তুমি কি কবর দেখতে গিয়েছিলে?

হৈমন্তী মাথাটা দোলায়। তারপর বলে—তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো। তবে স্নানটা করে খেয়ে নিয়ে তারপর বেরিয়ো। বেশ দূরে কিন্তু। ছাতা আছে, দেব! ওই যে, ওদিকে সেই রেলওয়ে ওয়ার্কশপের পিছনে।

—জানি। পারু বলে। কিন্তু ইচ্ছে করছে না। কী হবে?

—এস। পা বাড়িয়ে ডাকে হৈমন্তী।

পারু তার পিছনে হাঁটতে থাকে। একটু পরে বলে—হৈমন্তী!

—বলো।

—একটা কথা খালি মনে হচ্ছে...

—কী?

—হয়তো...হয়তো আমিই ওকে মেরে ফেললুম।

—কেন একথা ভাবছ?

—হুইস্কিটা...

হৈমন্তী দ্রুত ঘোরে। তারপর দৃঢ়স্বরে বলে—না।

পারু দাঁড়িয়ে গেছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে—আমার উচিত ছিল না হৈমন্তী। ওর হার্টের অসুখ ছিল—ওই অবস্থায় অতটা হুইস্কি...তাছাড়া, মনে হচ্ছে জিনিসটা হয়তো ভাল ছিল না। মানে, অনেক সময় সাংঘাতিক পয়জেনাস হয়ে উঠতে পারে তো!

হৈমন্তী বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফের বলে—না। তারপর পা বাড়ায়।

পারু তাকে অনুসরণ করে। দুর্বল কণ্ঠস্বরে বলে—তাছাড়া এমনও তো হতে পারত হৈমন্তী, আমি ওকে মেরে ফেলতেই এসেছিলুম! ও আমার পরম বন্ধু ছিল, পরম শত্রুও তো ছিল। ছিল না? হৈমন্তী! তুমি বলো!

হৈমন্তী জবাব দেয় না।

পারু বলে—তোমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল আমার ওপর। আমি ওর গেলাসে...ধরো, পটাসিয়াম সাইনাইড মিশিয়ে দিয়েছিলুম কিনা, তুমি সহজেই ভাবতে পারতে।

হৈমন্তী ফের ঘুরে ওকে একবার দেখে নেয়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলে—তুমি স্নান করে নাও। তারপর...

—তারপর কী?

—সব বলব।

পারু পা বাড়িয়ে তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে। উত্তেজিত ভাবে বলে—কী হৈমন্তী কী?

হৈমন্তী খিড়কির দরজার সামনে গিয়ে কাঁধটা আস্তে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে বলে—ও সুইসাইড করেছে।

পারু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। হৈমন্তী বাড়ি ঢুকে গেছে। একটু পরে যেন অনেক দূর থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—এস পারু।

পারু দরজাটা আঁকড়ে ধরে আরও একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ভেতরে যায়। কাদায় স্লিপার আটকে যায় তার। ওপরের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। পারু অকারণ ডাকে—হৈমন্তী!

—ওপরে এস।

স্লিপার দুটো কাদায় ফেলে রেখেই খালি পায়ে পারু প্রায় দৌড়ে ওপরে ওঠে।

ডালিমের ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে সে—ডালিম সুইসাইড করেছে, বললে না?

হৈমন্তী টেবিলের ড্রয়ার টেনে কী বের করছিল। বলে—চেঁচামেচি কোরো না। কে শুনতে পাবে!

পারু শূন্যদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর চেয়ারে বসে একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলে ক্লান্তভাবে বলে—সত্যি সুইসাইড করেছে ডালিম?

হৈমন্তী ড্রয়ার থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ খুলে তার দিকে এগিয়ে দেয়। চাপা গলায় বলে—ওর বুকের তলা থেকে বালিশ সরাতে গিয়ে চোখে পড়েছিল। ওর জামার বুকপকেটে ছিল এটা। আমার ধারণা,...আচ্ছা, তুমি আগে চিঠিটা পড়ে নাও।

পারু দ্রুত চিঠিতে চোখ বুলিয়ে নেয়। কিন্তু অক্ষরগুলো অর্থহীন হিজিবিজি মনে হয় তার। ডালিমের হাতের লেখা কত সুন্দর ছিল! মনেই হয় না এ তারই হাতের লেখা। খুব দ্রুত ডটপেনে লিখেছে। চিঠিটা পারুকেই লেখা, এটাই আশ্চর্য। তার মানে, পারু আসার পর লিখেছে। কিন্তু কখন লিখল? সারাক্ষণ তো পারু তার সামনে ছিল!

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খাওয়ার পর নীচে গিয়েছিল পারু। উঠোনে কুয়ো-তলার পাশে জৈব তাগিদে গিয়েছিল একবার। তাহলে তখনই ঝটপট লিখে থাকবে।

পারু হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে—চিঠিটার কথা আর কাকেও বলেছ?

হৈমন্তী গম্ভীর মুখে বলে—না। বললে কী হত, বুঝতে পারছ না?

—হ্যাঁ। পুলিস জানতে পারত হয়তো। পোস্টমর্টেম হত। পারু মাথা নাড়ে। ঠিক করেছ। কিন্তু এটা এখনই নষ্ট করা দরকার। আর ওর গেলাসটা...

হৈমন্তী ফিসফিস করে বলে—ফেলে দিয়েছি।

—ডাক্তার সন্দেহ করেননি কিছু?

—করেছিলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, নিছক হার্ট অ্যাটাক মনে হচ্ছে না। মুখের চামড়ার রঙ, তাছাড়া কষায় ফেনা জমে আছে। সাইনাইড কেস হয়তো!

ওকে নামতে দেখে পারু বলে—তারপর?

—আমি বুদ্ধি করে বললুম, ওর এপিলেপ্সি ছিল। প্রায় ফিট হত। মুখে গেঁজলা ভাঙত। আর ডাক্তার ভদ্রলোক একটু ভীতু জানতুম। তবু দোনামোনা করছেন দেখে নিরুকে লেলিয়ে দিলুম অগত্যা। নিরু বলল—কী হল স্যার? ঝটপট সার্টিফিকেটটা দিন!—তখন লিখে দিলেন।

—পরে হাঙ্গামা করবেন না তো?

—সে-সাহস হবে না। নিরুদের ভীষণ ভয় পায় সবাই।

—চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলা যাক।

—পড়লে?

—হুঁ। কিন্তু আশ্চর্য, সাইনাইড কী ভাবে যোগাড় করল ডালিম? খেলই বা কখন?

হৈমন্তী একটু চুপ করে থাকার পর জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে বলে—আমার ধারণা, রাতে তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার জিনিসগুলোর কথা বলতে আমিও বেরিয়ে গেলুম, হয়তো তখনই খেয়েছিল।

—যাবার সময় তো ওকে মনে হচ্ছিল নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

—হয়তো সত্যি নেশার ঘুম ছিল না।

—ভান করে পড়ে ছিল বলতে চাও?

—হয়তো। হৈমন্তীর মুখ একটু বিকৃত হয়ে যায়। ফের বলে—ও আমাকে বিশ্বাস করত না। কোনদিন বিশ্বাস করেনি। ভাবত, আমি ওকে ঠকাচ্ছি। নেহাৎ দায়ে পড়ে ওর সঙ্গে বাস করছি।

—কিন্তু আসলে তুমি ওকে ভীষণ ভালবেসে—

বাধা দিয়ে হৈমন্তী বলে—কে জানে! ওকথা থাক পারু। ওঠ, প্রায় একটা বাজে।

—হ্যাঁ, উঠি।

বলে পারু আবার চিঠিটার দিকে তাকায়।...'পারু, অনেক আগেই সব ঠিক করা ছিল। আমার এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। আর তুই তো জানিস, আমার বংশটাই যেন সংশপ্তকের। শুধু হৈমন্তীকে তোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার অপেক্ষা ছিল। ওকে ক্ষমা করিস। আমাকেও ক্ষমা করিস। মানুষের এ শরীরই মানুষের শত্রু, ভাই। তাই এই শরীরের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছি। কী জঘন্য তাকে নিয়ে বেঁচে থাকা!'...

উল্টো পাতায় লেখা আছে ঃ 'মাননীয় সরকার বাহাদুর, অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাদের। ক্ষমা করবেন। আমার মৃত্যুর জন্য অনুগ্রহ করে কাকেও দায়ী করবেন না। আমি অনেক মানুষের প্রাণ নিয়েছি। এবার নিজের প্রাণ নিজের হাতেই নিলুম।—'

উঠোনের কোণায় ভাঙাচোরা একটা কুয়ো। ধসে পড়া বাড়ির ইটের পাঁজা তফাতে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে ঘন আগাছা গজিয়েছে। জল তুলতে মিলুকে ডেকেছিল হৈমন্তী। মিলু আসেনি। সে নাকি এত ভয় পেয়েছে যে আর এ বাড়ি প্রাণ গেলেও আসবে না, হিমি মাসি রাগ করলেও না। তাই মিলুর মা এসেছিল জল তুলতে। তার কাছে জানা গেল। তারপর পারুর সামনে ঘোমটা অনেকটা টেনে বলল—কোমরেড দাদাবাবু ভাল আছেন?

এখনও কমরেড দাদাবাবু? পারু বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল শুধু। নীচের বারান্দা থেকে হৈমন্তী বলল—তোমার মনে থাকতে পারে। মধুদার বউ। রিকশো ইউনিয়নের মধুদা। বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে।

প্রৌঢ়া মেয়েটি কুয়োয় বালতি নামিয়ে বলল—সে এক দিনকাল ছিল, এ আরেক। হ্যাঁ গা, কলকেতায় থাকা হয় শুনেছি? যাক বাবু। এলেন তো এতকাল বাদে। এবারে একটা বিহিত করে যান।

হৈমন্তী ধমক দিয়ে বলল—যা করতে এসেছ, করো তো মিলুর মা!

মিলুর মা দমে গেল তক্ষুনি। প্রসঙ্গ বদলে বলল—রান্না কখন হয়ে গেছে। টিফিনকেরিতে ভরে মিলুকে সাধাসাধি করছি। কিছুতেই কথা শুনল না গা!

—তুমি নিয়ে এলে না কেন?

—জলটা তুলে দিই। তারপরে আসছি। তাড়াহুড়ো করে রাগের মাথায় বেরিয়ে এলুম। খ্যাল নেই।...বলে মিলুর মা দোতলার দিকটায় একবার চোখ রাখে। ফের বলে—মড়ার বাড়িতে খাওয়াবেন ওনাকে? বরং আমার বাড়িতে যদি কষ্ট করে যেতেন! না-খাওয়া মানুষ তো নন। কী বলেন, কোমরেড দাদাবাবু? কতবার রাতবিরেতে হঠাৎ গিয়ে হাসিমুখে ডেকে বলেছেন—মধুদা, খেতে এলুম। মিলুর বাবা সেই রেতেই হুটোপুটি বাধিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ—সে এক দিনকাল ছেল গা!

কুয়োর ধারে প্রকান্ড একটা মাটির গামলা আর একটা বালতিতে জল ভরে দিয়ে মিলুর মা চলে গেল। হৈমন্তী বলল—স্নান করে নাও। আমি ওপরে থাকছি।

বলে সে ওপরে চলে গেল। পারু হিসেব করছিল। পাজামা ভেজাবে কিনা। অবশ্য যথেষ্ট রোদ আছে। সন্ধ্যার আগেই শুকিয়ে যাবে। উঠোনে কাপড় শুকোবার তারটার দিকে তাকাল সে। সূর্য দেখে নিল। তারপর হেঁটে

হয়ে জলে হাত রাখল। কুয়োর জলটা কী ভীষণ ঠাণ্ডা!

পাজামা শেষ পর্যন্ত ভেজাল না সে। আণ্ডারপ্যাণ্ট পরা অবস্থায় দোতলার ঘরের দিকে একটা চোখ রেখে গায়ে জল ঢালল। ডালিমের ঘরের দরজায় শেকল তোলা আছে। পাশে সিঁড়ির মুখে হৈমন্তীর ঘরের দরজা খোলা—কিন্তু ভেতরে ঘন ছায়া। তার মধ্যে হৈমন্তী এখন কী করছে দেখা যাবে না। সে কি পারুর শরীর দেখছে আড়াল থেকে? শরীরের কথাটা ডালিম এমন করে বলে গেছে যে হঠাৎ-হঠাৎ চমক খেলে যায়। সত্যি, কী বিপজ্জনক জিনিস নিয়ে মানুষের বেঁচে থাকা!

শরীরকে শাস্তি দেওয়ার ভঙ্গীতে জল ঢালল পারু।

স্নানের পর এতক্ষণে যেন স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। অন্যদিকে ঘুরে তোয়ালেতে গা মুছছে, পিছনে দোতলার বারান্দা থেকে হৈমন্তীর গলা শোনা গেল—কাপড়চোপড় ওখানে রেখে এস। মিলুর মা কেচে দেবে।

পারু কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বলল—থাক। খালি এই আণ্ডারপ্যাণ্টটা তো!

হৈমন্তী বলল—সঙ্গে আর জামাকাপড় আনোনি?

পারু ঘুরে হাসল।—এনেছি। নয়তো স্যুটকেস কেন? বলে সে আণ্ডার-প্যাণ্টটা পায়ের তলায় মাড়িয়ে পাজামার দিকে হাত বাড়াল।

—তাহলে রাতের জামাকাপড় বদলাতে আপত্তি কি?

পারু আবার সূর্য দেখে নিয়ে বলল—সন্ধ্যার আগে শুকিয়ে যাবে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে।

রাতে পাঞ্জাবি আর পাজামা পরেছিল। পাঞ্জাবিটা নীচের বারান্দায় থামের হুকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে। গেঞ্জিটাও। সে পাজামাটা কুয়োতলায় ছুঁড়ে দিল। তারপর পায়ে চটি গলিয়ে উঠোন ঘুরে বারান্দায় গেল। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল আর সিগারেট দেশলাই বের করে নিচ্ছে, তখন হৈমন্তী নেমে এল। বলল—আমি নিচ্ছি। তুমি ওপরে গিয়ে কাপড় পরো।

পারু রুমালটাও ওর হাতে গুঁজে দিল। তারপর সিগারেট দেশলাই নিয়ে তোয়ালে পরা অবস্থায় ওপরে চলে গেল।

একটু পরে সে আরেক প্রস্থ পাঞ্জাবি-পাজামা পরে হৈমন্তীর আয়নায় চুল আঁচড়ে দরজায় গেল। দেখল, হৈমন্তী তার জামা-কাপড়গুলো নিংড়ে মেলে দিচ্ছে রোদে। পারু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

ডালিমের মড়া ছুঁয়েছে, তাই কি? হৈমন্তীর মধ্যে অনেক বাজে সংস্কার ছিল বরাবর। তার পার্টি করার সময়েও সেটা লক্ষ্য করেছিল পারু। ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছিল খুব। পার্টির ক্লাসে বস্তুবাদের ব্যাখ্যার সময় তাকে অন্য-মনস্ক লক্ষ্য করত পারু। এমন কি হৈমন্তীর এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকে ঠাট্টাতামাশা করতেও ছাড়ত না। আসলে হৈমন্তীর মধ্যে অদ্ভুত একটা

বৈপরীত্য ছিল—এখনও আছে। ওর অনেক আচরণের মানে খোঁজা বৃথা। ও নিজেও কি বোঝে কিছু?

অথচ এ ঘরে কোন ঠাকুর দেবতার ছবি নেই। ধর্মের কোন চিহ্ন নেই। এই দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, হৈমন্তী এ পনের বছরে ধর্মটর্ম থেকে দূরে সরে গেছে। সেই অবশ্য স্বাভাবিক ছিল। তবে কিছু মেয়েলী সংস্কার হয়তো তার পক্ষে ছাড়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু হৈমন্তীর তো এ বাড়িতেই আপাতত কিছুদিন জীবন কাটাতে হবে। যদি না...

ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল পারু। এই পোড়ো বাড়িতে, এই ভাঙা ছাদের তলায়, এই মৃত্যুর তীব্র গন্ধে আচ্ছন্ন পরিবেশে!

অবশ্য মহারাজার চেলাচামুণ্ডারা আছে। হৈমন্তীর তবে কাকে তোয়াক্কা? একটা চাকরিও আছে। খাওয়া-পরার অভাব হবে না। ডালিম তাকে অন্তত একটা মাটি দিয়ে গেছে দাঁড়াবার মতো।

মিনুর মা এল এতক্ষণে। সঙ্গে মিনুকে টেনে এনেছে। সম্ভব মারধর দিয়েই আসতে বাধ্য করেছে। মেয়েটির চোখ এখনও পিটপিট করছে। হাসতে গিয়ে পারুর খারাপই লাগে।

তিনজনে ওপরে এল। হৈমন্তী বলল—মিনু, জানলাগুলো খুলে দে তো মা। আর মিনুর মা, তুমি নিরুকে দেখ তো ফিরেছে নাকি!

মিনুর মা বলল—মেঝেটা পোষ্কের করে দিই?

—থাক্। আমি দিচ্ছি।

মিনুর মা মেয়ের দিকে আঙুল তুলে শাসিয়ে গেল—ফের যদি পালাস, হাড়মাস এক করে দোব বলে দিচ্ছি।

এ ঘরের জানলাগুলো জোড়াতালি দেওয়া। খুলে দেওয়ার পর ঘর আলোয় স্পষ্ট হয়েছে। পূবে আগাছার বনের ওধারে স্টেশন রোড দেখা যাচ্ছে। কত যানবাহন আর লোক! দম আটকানো ভাব কেটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। আর বসন্তকালের প্রাকৃতিক যা কিছু চিহ্ন, তা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

—এস। খেয়ে নাও।

পারু তাকাল। মেঝেয় খবরের কাগজ বিছিয়ে ভাত তরকারি সাজিয়ে বসে আছে হৈমন্তী। গতরাতে তার মধ্যে আড়ষ্টতা ছিল। এখন সে সংকোচ-হীন আর স্পষ্ট।

পারু বলে—তুমি?

—আমি খেয়েছি।

—না। খাওনি।

—আঃ! তুমি খেয়ে নাও তো!

পারু একটু চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর ভাতে হাত রাখে।

হৈমন্তী ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবছে। পারু আস্তে গ্রাস তোলে। রাতে পাশের ঘরের মেঝেয় খাওয়ার কথা মনে পড়ছে। ডালিম তার হাত থেকে মুরগীর ঠ্যাং কেড়ে চিবুতে চিবুতে বলেছিল—জানিস, হিমি আমার সঙ্গে কোনদিনও খেতে বসে না? ওর জাত চলে যাবে যেন! হৈমন্তী ঠিক এমনি গলায় তখন ধমক দিয়েছিল।

শরীর! মোক্ষম কথা বলে গেছে ডালিম। শরীরের জন্যেই খাওয়া। নয়তো এখন এখানে এমনি করে হাঁটু দুমড়ে বসে ভাতের গ্রাস তোলা থেকে নিষ্কৃতি মিলত!...

কারা কথা বলছে কোথাও। পারুর তন্দ্রামতো এসেছিল, কেটে যায়। বারান্দায় একদঙ্গল যুবক দাঁড়িয়ে আছে। হৈমন্তীর সঙ্গে কথা বলছে। পারু উঠে বসে। একটু বিরক্ত হয় নিজের ওপর। যেন এ বাড়ির জামাই। খাটে ভাতঘুম দিতে লজ্জা করছে না? অথচ খালি ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতা পেয়ে বসেছে। গায়ে এককোঁটা জোর নেই যেন। পারু উঠে বসে। সিগারেট ধরায়।

বাইরে মার্চের বিকেলটা এখন ফিকে গোলাপী রোদ বিছিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় ক্রমাগত কোকিল ডাকাডাকি করছে। পারু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যে নিরু আর আতিকুলকে চিনতে পারে। ওরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিরু একটু হেসে বলে—দাদার শরীর কেমন এখন?

—ভাল। পারু জবাব দেয়।

—একবার গোরস্থানে যাবেন তো?

পারু একটু অপ্রস্তুত হয়। তারপর বলে—দেখা যাক। আচ্ছা, নেক্সট ট্রেন কটায়?

নিরু বলে—ট্রেন অনেক। ভাববেন না। অত তাড়া কিসের? বরং হিমিবউদির সঙ্গে কবরটা একবার দেখে আসুন। আতিকুল নিয়ে যাবে। রিকশায় যাবেন। বেশি দূরে নয়।

হৈমন্তী বলে—যাব'খন। রোদ একটু কমুক।

—ঠিক আছে। আতিকুল, তুই থাক। রিকশো ডেকে দিস।

হৈমন্তী মাথা নেড়ে চলে—না, না। ওর কাজের ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যাও ভাই আতিকুল।

নিরু যেতে যেতে বলে যায়—খ্যাঁদা মিয়া তবু যদি আসে, সোজা থাপ্পড় মারবেন গালে। শালার বাপের বাড়ি! মির্জারা ওর বাপ ছিল!

সিঁড়ির মুখে ওর সঙ্গীদের একজন বলে—না রে, মহারাজদা নাকি ওর কত্তাবাবা ছিল!

হা হা হো হো করে হাসতে হাসতে এবং সিঁড়িতে জোরালো আওয়াজ দিয়ে দলটা চলে যায়। আতিকুল দাঁড়িয়ে ছিল। হৈমন্তী তাকে বলে—বললুম

তো, তোমার থাকার দরকার নেই।

আতিকুল কাঁচুমাচু মুখে বলে—কিন্তু...

—না। দরকার হলে ডেকে পাঠাব। মিলু তো আছে।

—কোথায় মিলু? কখন পালিয়েছে!

হৈমন্তী রেলিঙে ঝুঁকে চড়া গলায় ডাকে কয়েকবার। কোন সাড়া না পেয়ে বলে—যাক। তুমি এস আতিকুল। নিজের কাজ করো গে।

আতিকুল চলে যায়। তারপর পারু বলে—বাড়ি নিয়ে ঝামেলা করছে নাকি কেউ?

হৈমন্তী মাথা নাড়ে।—খ্যাঁদা মিয়া বলে মির্জাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে। সে নাকি বলেছে, বাড়িটা এবার তারাই পাবে।

—বাড়িটা তো ডালিমের নামে সেটলমেণ্ট রেকর্ড হয়েছে!

—হ্যাঁ।

—তাহলে...

হৈমন্তী বাধা দিয়ে বলে—ওর বাড়ি হলেও আমার কী? এখানে আমার অধিকার কিসের?

পারু বুঝতে পেরে বলে—ঠিকই। কিন্তু এর পর তুমি কোথায় থাকবে?

—কাল শুনলে তো। স্টেশনের কাছে এক ভদ্রলোক বাড়ি করছেন। একটা বাসা পেয়ে যাব।

—কে তিনি?

—যেখানে চাকরি করছি, মানে মার্কেটিং সোসাইটির সেক্রেটারি।

পারু একটু চুপ করে থাকার পর বলে—কোন গ্যারাণ্টি আছে কি? তখন হয়তো মহারাজার ভয়ে বলেছিলেন দেবেন। এখন মহারাজা নেই। তাছাড়া ভাড়া যদি তোমার সামর্থ্যের বাইরে চেয়ে বসেন?

হৈমন্তী ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকায়।—তুমি এসব ভাবছ কেন?

পারু চমকে ওঠে।—ভাবব না?

—না।

পারু বিব্রত ভাবে প্রতিযুক্তি হাতড়ায়। একটু পরে বলে—খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে নিশ্চয়, তাহলেও তোমার কথা ভাববার অধিকার এখন ফিরে পেয়েছি। ডালিম সে অধিকার দিতেই ডেকেছিল।

—কিসের অধিকার?

—তুমি তো আমার স্ত্রী। আইনত এবং ধর্মত। এবং—

হঠাৎ হৈমন্তীর একটা হাত উঠে আসে। ফণাতোলা সাপের মতো। তারপর হাতটা পারুর গালে পড়ে সশব্দে। চড় খেয়ে পারু নিষ্পলক তাকায় ওর দিকে। হৈমন্তীও তাকায়। কয়েকটি সেকেন্ড এভাবে ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে হৈমন্তী ওর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে। পারু ঘরে দেখে, খাটে আছড়ে পড়ে এতক্ষণে হু-হু করে কাঁদছে হৈমন্তী। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

কতক্ষণ সে ফুলে ফুলে কাঁদে। তারপর উবুড় হয়ে শুয়ে থাকে। বালিশ দু হাতে আঁকড়ে ধরে স্থির হয় সে। তখন পারু তার পাশে বসে আস্তে পিঠে হাত রেখে ডাকে—হৈমন্তী, শোন।

হৈমন্তী অস্ফুট সাড়া দেয়—কী?

পারু ধরা গলায় বলে—এতক্ষণ তোমাকে বলি-বলি করেও বলতে পারিনি। চিঠিটা ডালিম তোমাকে লিখতে বলেছিল, কিন্তু ওটাতে তোমারও অনেক চিহ্ন ছিল। ছিল বুঝতে পেরেই কী যে খুশি হয়ে ছিলুম! আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। তা না হলে আসতুম না। কিছুতেই না।

—চিঠি অনেক লিখেছিলুম এক সময়। সেগুলো সবই আমার চিঠি।... হৈমন্তী জড়ানো স্বরে বলতে থাকে।...তখন কিছু বোঝনি। খুশিও হওনি। অথচ তখন আমার সব ছিল। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসার সাধ, ঘরকন্নার সাধ, ছেলেমেয়ের মা হওয়ার সাধ। আজ এতকাল পরে তুমি বুঝেছ। খুশি হতে পেরেছ। চলেও এসেছ। কিন্তু এখন আমার তো আর কিছু নেই। না কোন ইচ্ছে, না কোন সাধ।

—শুধু কি আমি একা এজন্যে দায়ী? তুমিও দায়ী নও?

—সে কি স্বীকার করিনি? তোমার পায়ে মাথা ভেঙে ক্ষমা চাইনি?

পারু চুপ করে থাকে। জবাব খুঁজে পায় না। সত্যি তো, সেদিন অমন করে ওকে ফেলে না পালিয়ে সাহসের সঙ্গে ওকে শাসন করতে পারত। জয় করতে পারত।

পারেনি হয়তো শুধু ডালিম অর্থাৎ মহারাজার ভয়ে। তার খালি ভয় হত, কবে হৈমন্তীকে পুরোপুরি গ্রাস করার জন্যে সে তাকে ছুরি মারবে!

সে-ডালিম গতকালকের দেখা ডালিম তো ছিল না।

হৈমন্তী মুখ তুলে বালিশে চিবুক রেখে বলে—আজ তুমি এসে অধিকারের কথা তুলছ বার বার। তখন কোথায় ছিলে, যখন...সে ফুঁপিয়ে কেঁদে আবার বলে—যখন পলাশপুরের ভদ্রলোকেরা বাড়ির আনাচে-কানাচে অশ্লীল ইঙ্গিত করত! টাকার লোভ দেখাত! এক রাতও ঘুমোতে দিত না! তখন যদি ও না থাকত, আমি কোথায় ভেসে যেতুম বুঝতে পারো না? সেদিন আমার কাছে ও ঈশ্বর হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে অনেক লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছিল। না খেয়ে মরতে দেয়নি। আমি কেমন করে অকৃতজ্ঞ হবো?

সে আবার বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদে। পারু তার দু কাঁধ ধরে ঝুঁকে বলে—হৈমন্তী! শোন! একটা কথা শোন! লক্ষ্মীটি!

কিছুক্ষণ পরে কান্না থামিয়ে হৈমন্তী অস্ফুট স্বরে বলে—তুমি সন্ধ্যার

ট্রেনে চলে যাও।

—আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

হৈমন্তী দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকায়। তারপর উঠে বসে। বলে—কি বললে?

—আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

—গায়ের জোরে বুঝি?

—যদি বলো, তবে তাই!

—পারবে না। নিরুদের আমার পাহারায় রেখে গেছে, টের পাচ্ছ না?

—কিন্তু কেন তুমি এখানে এভাবে পড়ে থাকবে? পারু তীব্র স্বরে বলে কথাটা।—এতদিন না হয় আমার বদলে ডালিম ছিল। ডালিম আর আমি আলাদা নই, জানো না? ডালিম গেছে, এখন আমি যদি তার অধিকারেই বলি, আমার কাছে থাকো?

—আমার কী ভাগ্য! হৈমন্তী চোখ মুছে বাঁকা ঠোঁটে বলে একথা।—তবে শুধু তুমি একা নও, এখন পলাশপুরে আবার অনেকেই করুণা দেখাতে আসবেন, জানো তো? এমন কি আমার অন্নদাতা সেই সেক্রেটারি ভদ্রলোকও।

—তবু তুমি এখানে থাকবে?

—থাকব। তখন বয়স আর অভিজ্ঞতা কম ছিল। এখন দুটোই বেড়েছে। হৈমন্তী আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ফুটিয়ে বলে।—এবার নিজে একা লড়াই করতে পারি কি না দেখতে চাই। শেষ অব্দি যদি হেরে যাই...

—তাহলে? তাহলে আমার কাছে যাবে তো?

—কথা দিতে পারছি না। চেষ্টা করব। আর তখন...তখন তুমিও তো বদলে যেতে পারো!

—বদলাব না। আমি তোমাকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি হৈমন্তী।

পারু হাত বাড়িয়ে তার ডান হাতটা নেয়। হৈমন্তী বাধা দেয় না। পারু ফের বলে—আমি সব সময় তোমার অপেক্ষা করব। যদি অনুমতি দাও মাঝে মাঝে আসব।

হৈমন্তী শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলে—এসো।

পারু তবু কতক্ষণ ওর হাতটা মুঠোয় ধরে থাকে। তারপর ছেড়ে দেয়। খাট থেকে উঠে দাঁড়ায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে—আমার শাস্তিটা অবশ্য খুব বেশি হয়ে গেল। হোক। কিন্তু আমি সত্যি বড্ড একা হৈমন্তী। এত ভীষণ নিঃসঙ্গতা আমার। বড্ড ভয় হয়, কবে না ডালিমের মতো নিজেকে শেষ করে ফেলি!

হৈমন্তী বলে—কথাটা শাসানির মতো শোনাচ্ছে। ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ বুঝি?

—নাঃ! বলে ভারি একটা নিঃশ্বাস ফেলে পারু। তারপর ওর দিকে ঘুরে

বলে—কবর দেখতে আর যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি কি যাবে?

হৈমন্তী খাট থেকে নেমে আসে। মাথা দুলিয়ে বলে—না।

—এখন কোন ট্রেন আছে?

—এখনই যাবে?

—যাই। থাকা মানে সারাক্ষণ তো তোমার সঙ্গে ঝগড়া করা। তাই না?

হৈমন্তী তার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামায় এবং বলে—তুমি আমাকে ভীষণ দুর্বল করে দিয়েছ হয়তো। ইচ্ছে করছে, অন্তত একটা রাত তোমাকে থেকে যেতে বলি। জানো, আজ রাতটা কীভাবে যে কাটাবো, বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে! তুমি থাকবে?

পারু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—আমারও থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু...

—কিন্তু কী পারু?

—একটা শর্ত। তুমি আমার কাছে থাকবে তো?

হৈমন্তীর ফ্যাকাশে মুখে রক্তের ছটা খেলে যায় কয়েক মুহূর্ত। মুখটা দ্রুত নামায়। নাসারন্ধ্র কাঁপে। তারপর খুব আস্তে বলে—থাকব। কিন্তু তোমার খারাপ লাগবে না?

—না, একটুও না। তুমি তো জানো কোন বাজে সংস্কার আমার নেই!

পারু সাহস করে ওর দু কাঁধ ধরে আকর্ষণ করে। হৈমন্তী বাধা দেয় না। তার বুকে মুখ রাখে নিঃশব্দে। মাত্র কয়েকটি সেকেন্ড। তারপর নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—ছোট লাইনের ওদিক বেড়াতে যাবে?

পারু বলে—বেশ তো। চলো! তারপর ওখান থেকে বরং গোরস্থানটা ঘুরে আসবে।...

শেষরাতে পারুর ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। হৈমন্তীর ঘরের সব জানলা খোলা। বাইরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে ঘন কুয়াশা জড়িয়ে আছে। ঘুমঘুম স্বরে পাখি ডাকছে। হৈমন্তী পাশ ফিরে শুয়ে আছে। একটু উঠে কাচভাঙা ঘড়িটা বালিশের পাশ থেকে তুলে সময় দেখে, সাড়ে চারটে বাজে। সাড়ে পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। সে হৈমন্তীর গায়ে হাত রেখে একটু ঠেলে ডাকে—হিম! হৈমন্তী গাঢ় ঘুমে কাঠ হয়ে আছে। থাক, পরের কোন ট্রেনেই যাবে। সে সাবধানে নেমে আসে খাট থেকে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই খুঁজে নেয়। তারপর দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় যায়। ডালিমের ঘরের দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তি হয়। অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসে। কাল অনেক রাত অব্দি বসে কথা বলেছে এখানে—হৈমন্তী পাশে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। পারু সিগারেট জেবলে একবার পিছনটা হঠাৎ দেখে নেয়। মনে হয়, কাল রাত থেকে সারাক্ষণ ডালিম তার পিছনে ঘুরছে। যেন সারাক্ষণ

তার নিঃশ্বাস কাঁধের কাছে এসে লাগছে। পারু কয়েক টানে সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এবং খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর হৈমন্তীকে টেনে নিজের দিকে ঘোরায়। হৈমন্তী ঘুমজড়ানো গলায় বলে—কটা বাজছে?

পারু বলে—দেরি আছে এখনও। ঘুমোও।—